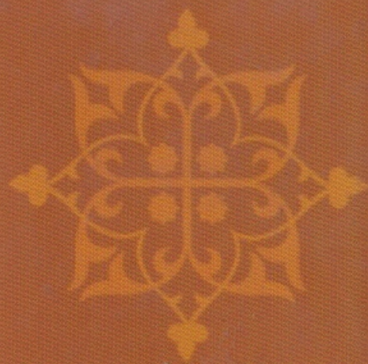


বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ

ভূমিকা ও প্রভাব

(১৯৭২-২০০১)

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান



ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান
মাতা: সুফিয়া ফজল
পিতা: ফজলুর রহমান (মরহুম, ২৬ আগস্ট ২০০৩)
জন্ম: ২৫ জানুয়ারী ১৯৭২
জন্মস্থান: নারায়ণপুর, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া
স্ত্রী: কানিজ মাহমুদা {বিএসএস(সম্মান), এমএসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়} একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত
কন্যা: তামান্না মাহজাবিন মৌমিতা (১৯৯৭)
তাহিয়া মাহজাবিন (২০০৫)

রাজনীতি বিজ্ঞানের মনোযোগী গবেষক ড. তারেক ছাত্রকাল থেকেই লেখালেখিসহ নানামাত্রিক সামাজিক উদ্যোগসমূহের সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮২ সাল থেকে কুমিল্লার সাপ্তাহিক আমোদ ও দৈনিক রূপসী বাংলার মাধ্যমে তার লেখালেখির যাত্রা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকার ও রাজনীতি বিভাগে পড়ার সময়ে তিনি ঢাকার কয়েকটি দৈনিকে সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন। সাপ্তাহিক বিক্রমে তিনি সক্রিয়ভাবে সাংবাদিকতা উপভোগ করেন। ১৯৯৩-র নভেম্বরে তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন এবং বর্তমানে তিনি এ বিভাগের একজন সহযোগী অধ্যাপক। ঢাকার বিভিন্ন দৈনিকে জনপ্রিয় লেখালেখির সূত্রে **তারেক ফজল** নামেই তিনি বেশী পরিচিত। রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে তিনি চলমান ও সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়াদিতে পাঠককে কাঙ্খিত ধারণা সরবরাহে আগ্রহী থাকেন।

১ম ফ্ল্যাপে দেখুন-

শেষ ফ্ল্যাপের পর

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক আলোচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রদের মাঝে তিনিই প্রথম জনপ্রিয় নিবন্ধ ও গবেষণা প্রবন্ধের উপস্থাপক। তার 'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ৭৩: শিক্ষকদের ভাবনা' (১৯৯০) ও 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৭৩ : পরিমার্জন প্রস্তাবনা' (১৯৯৪) শীর্ষক সাক্ষাৎকারভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী দু'টি গ্রন্থ মনোযোগী শিক্ষিতজনের প্রশংসা পেয়েছে। দ্বিতীয় শিরোনামটি প্রকাশ করেছিলো একাডেমিক পাবলিশার্স। তিনি বেশ কিছু গবেষণা প্রবন্ধ রচনা ও প্রকাশ করেছেন।

১৯৯৮-র মার্চে শ্রীলঙ্কায় ও অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি দু'টি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ ও কনফারেন্সে যোগদান করেন।

বিভাগীয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত একটি শিক্ষাসফরের অভিজ্ঞতা যোগ করে তিনি রচনা-সম্পাদনা করেন একটি ভ্রমণ স্মারক গ্রন্থ *বাংলার রূপ* (১৯৯৮)।

শাহীনা রহমান
প্রকাশক

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজঃ ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ: ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)

ড. তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান

প্রথম প্রকাশ: একুশে বইমেলা ১৪১৩/২০০৭
দ্বিতীয় সংস্করণ: একুশে বইমেলা ১৪১৪/২০০৮

প্রকাশক
শাহীনা রহমান
একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরী
প্রান্তিক, এপার্টমেন্ট # ডি২, বাড়ী # ৭০/১, সড়ক # ৬/এ, ধানমণ্ডি আ/এ
ঢাকা-১২০৯
ফোন: ৮১২৫৩৯৪, ফ্যাক্স: ৮১১৭২৭৭
ই-মেইল: appl@ dhaka.net

প্রচ্ছদ: আরিফুর রহমান, কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা। ০১৮১৯-১৮১৪৯২

অঙ্গসজ্জা: মো. মখলেছুর রহমান, একটিভ কম্পিউটার সেন্টার, বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী। ০১৭১৬-৮৮৪০৫৬

মুদ্রণ: চৌকস প্রিন্টার্স, ১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০। ০১৯১১-৪৪১৩৫৯

মূল্য: ৩৫০/- (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Bangladesher Rajnitite Alimsamaj: Bhumika O Probhab (1972-2001) {Alimsociety, the religious leaders of Islam, in Politics of Bangladesh: Role and Influence(1972-2001) in Bangla} by Dr. Tareque Muhammad Taufiqur Rahman, Published by Shahina Rahman on behalf of Academic Press and Publishers Library, Dhaka, Bangladesh in 2007 (2nd ed. 2008), ©Tareque Fazal, price: Tk. 350, $35.

ISBN: 984 08 0216 X

আমার পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের সংবাদ শোনার
জন্য ব্যাকুল ছিলেন তিনি।
শেষ দিনগুলোয় অনেকবার জানতে চেয়েছেন
কবে শেষ হবে 'কাজ'।
আমার 'কাজ' শেষের আগেই আল্লাহ্তায়ালা
নিজের কাছে ডেকে নিলেন তাঁকে,
২৬ আগস্ট ২০০৩ তারিখে।
আমার মরহুম পিতা **ফজলুর রহমানের** রুহের
মাগফেরাত কামনায়
হৃদয়ের গভীর কষ্ট, বেদনা ও অতৃপ্তিবোধসহ
উৎসর্গ করছি
আমার এ অর্জন।

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

আলহামদুলিল্লাহ্। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠকের হাতে যাচ্ছে।

এ সংস্করণের তিনটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বলা যায়:

ক. ষষ্ঠ জাতীয় সংসদের (১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬) নির্বাচনে যশোরের কেশবপুর আসন থেকে বিএনপি-র মনোনয়নে মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ তথ্যটি জানিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম ব্যাচের ছাত্র (মানে সিনিয়র ছাত্রের জুনিয়র শিক্ষক!) এবং বর্তমানে রংপুরের একটি কলেজের শিক্ষক অধ্যাপক জুনায়েদ হোসেন। জুনায়েদকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

খ. একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ নির্ঘন্ট উপস্থাপিত হলো। সময়, শ্রম ও মনোযোগসাধ্য এ নির্ঘন্টটি প্রস্তুত করেছেন আমার তিন ছাত্র নৃবিজ্ঞানের গবেষক মাহবুবুজ্জামান মামুন, অধ্যাপক নূরুজ্জামান মানিক ও অধ্যাপক মো. হাবিবুল্লাহ (শিগ্‌গিরই আমরা তার কাছ থেকে একটি চমৎকার পিএইচ.ডি থিসিস আশা করছি)। তাদের তিনজনকেই কৃতজ্ঞতা জানাই।

গ. আরো ক'টি তথ্য বিভ্রাট নিরসন এবং কিছু বানান বিভ্রাট নিরসন করা হয়েছে। এ কাজে অগ্রজপ্রতীম অধ্যাপক মুহম্মদ মীজানুর রহমান শেলীর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

ডান-বাম-মধ্যপন্থী রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আমলা, বীরত্বের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাসহ সমাজ-রাষ্ট্রের যে অল্প সংখ্যক (গুণ-মান-এর বিবেচনায় শীর্ষস্থানীয় বিবেচিত হতে পারেন) পাঠক এ বইটিতে মনোযোগ নিয়েছেন, এখন পর্যন্ত তাদের নিকট থেকে তুষ্ট, আনন্দিত ও উপকৃত (যথেষ্ট পরিমাণ ও সংখ্যায় অজানা-অনালোচিত কিন্তু অনিবার্য প্রয়োজনীয় তথ্য, উপাত্ত ও প্রমাণাদি পাবার সূত্রে) হবার প্রতিক্রিয়া পেয়েছি। এসব প্রতিক্রিয়া ও মূল্যায়ন এ গবেষণায় নিবেদিত আমার উল্লেখযোগ্য মাত্রার শ্রম ও মনোযোগকে অর্থময় ও সুখময় করছে।

কয়েকজন শুভার্থী বইটির কোনো কোনো তথ্য ও বিশ্লেষণ বিষয়ে নতুন ও প্রয়োজনীয় কিছু যোগ করার আগ্রহ জানালেও প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রাক্কাল পর্যন্ত তারা সে সব তথ্য-বিশ্লেষণ সরবরাহ করতে পারেননি। আমি সাগ্রহে অপেক্ষায় থাকলাম এবং সকল পাঠকের কাছেই আবারো আবেদন করি, বইটিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্ত-বিশ্লেষণে বিভ্রান্তি পেলে দয়া করে আমাকে জানান। পরবর্তী সংস্করণে তা সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতায় স্বীকার করা হবে।

এ সংস্করণের উপস্থাপনাটি (মেকআপ-গেটআপ বিবেচনায়) আগেরটির চাইতে ভালো লাগবে আশা করি।

ফেব্রুয়ারী ২০০৮

তারেক এম তওফীকুর রহমান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

লেখকের নিবেদন

ক. বর্তমান প্রকাশনাটি মূলত আমার ডক্টরাল থিসিসের কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত রূপ। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক ড. তালুকদার মনিরুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে আমি এ থিসিস প্রণয়নের সুযোগ পেয়েছিলাম।

এ গ্রন্থটি মূলত একটি গবেষণার ফল হবার কারণে এর বক্তব্য ও উপস্থাপনায় কঠোরভাবে সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বিশ্লেষিত প্রায় সবগুলো বিষয় ও প্রসঙ্গ বাংলাদেশের সমকালীন রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। রাজনীতি ও রাজনৈতিক বিষয়াদিতে অনিবার্যভাবেই অনেক সক্রিয় পক্ষ থাকে। এসব পক্ষ সর্বদাই রাজনৈতিক বিষয়াদির সুবিধা ভোগে গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে থাকে। কোনো বিশ্লেষণ একটি পক্ষকে তুষ্ট করলে অন্য পক্ষসমূহ তাতে অসন্তুষ্ট ও ক্ষিপ্ত হয়। একটি নির্মোহ ও ন্যায্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণ একইসাথে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে তুষ্ট করবে না এবং করতে পারবে না- এ এক অনিবার্য সত্য ও বাস্তবতা।

সামাজিক বিজ্ঞান এবং নির্দিষ্টভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়াদিতে গবেষকের মূল কাজ সঠিক তথ্য ও সত্য খুঁজে বের করার চেষ্টা করা এবং প্রাপ্ত সম্ভাব্য সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে রাজনীতি বা রাজনীতির বিষয়াদি বিশ্লেষণ করা। সামাজিক বিজ্ঞানের অন্য সব শাখার মতো রাজনীতির বিষয়াদির বিশ্লেষণপর্বে বিভিন্ন গবেষকের বিশ্লেষণে ভিন্নতা থাকার সুযোগ আছে এবং একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা স্বীকৃতও বটে। তাই বিশ্লেষণের ফলপর্বে ভিন্নতা থাকার সুযোগ থাকলেও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিশ্লেষকদের একটি নির্দিষ্ট নীতিমালা মান্য করা বাধ্যতামূলক। তার ব্যত্যয় ঘটানো হলে একটি কথিত রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নেহায়েত পক্ষীয়-দলীয়-গোষ্ঠীগত প্রচারণায় পর্যবসিত হয়। বর্তমান গ্রন্থে সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার স্বীকৃত নীতিমালা কঠোরভাবে সমুন্নত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে সংশ্লিষ্ট আলোচিত-বিশ্লেষিত বিষয়াদির কোনো কোনো পক্ষ অতুষ্ট-অসন্তুষ্ট হতে পারেন। আবার বিশ্লেষিত এক বা একাধিক প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে একটি পক্ষ তুষ্ট হলেও অন্য এক বা একাধিক প্রসঙ্গের বেলায় সেই একই পক্ষ অসন্তুষ্ট হতে পারেন। এ বাস্তবতায় বর্তমান গবেষণার সবগুলো বিশ্লেষিত প্রসঙ্গ

হয়তো প্রায় কোনো পক্ষকেই সামগ্রিকভাবে বাহ্যত তুষ্ট করতে সক্ষম হবে না। একজন ধ্রুপদী গবেষকের অবস্থান হতে সে ক্ষেত্রে বর্তমান গবেষকের পক্ষ থেকে ভদ্রজনসুলভ দুঃখ প্রকাশের অতিরিক্ত কিছু করার সামর্থ থাকার কথা নয়। বর্তমান গবেষক তাই সংশ্লিষ্ট পাঠকবৃন্দকে বিনীতভাবে একটি সম্ভাব্য নির্মোহ অবস্থান থেকে এ গ্রন্থটিকে বিবেচনায় রাখার অনুরোধ করতে চান।

খ. চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. হাসান মোহাম্মদ একটি গবেষণা প্রবন্ধে এরশাদ শাসনামল পর্যন্ত বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের আলিমসমাজের রাজনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। এর উল্লেখ বর্তমান গ্রন্থে রয়েছে। সম্ভবত স্বাধীন বাংলাদেশের আলিমসমাজের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট ভূমিকা বিষয়ে এটিই একমাত্র গবেষণা উদ্যোগ। স্বাধীন বাংলাদেশ-পূর্ব (বস্তুত স্বাধীন পাকিস্তান-পূর্ব) সময়ে বাংলাদেশ অঞ্চলের আলিমসমাজের রাজনৈতিক ভূমিকা বিষয়ে একটি গবেষণাকর্ম পাওয়া যায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুষ্টিয়া) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির শিক্ষক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল লতিফের মাধ্যমে। এটি একটি ডক্টরাল থিসিস। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নীতি নির্ধারণে বাংলাদেশের আলিমসমাজের ভূমিকা এবং নির্দিষ্টভাবে তাদের প্রভাব বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে ব্যাপক ও গভীরতাসম্পন্ন (স্বীকৃত থিসিস প্রণয়ন উপযোগী অর্থে) কোনো গবেষণাকর্ম এ যাবৎ সম্পন্ন হয়নি। এ বাস্তবতায় বর্তমান থিসিসটি এ ক্ষেত্রে ব্যাপকমাত্রার প্রথম উদ্যোগ। চাহিদার ভিত্তিতেই এ গ্রন্থে বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডের আলিমসমাজের বাংলাদেশ-পূর্ব রাজনৈতিক ভূমিকাও উপস্থাপিত হয়েছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনায় মুক্তিযুদ্ধ পর্বে আলিমসমাজের ভূমিকা-কার্যক্রম বিশ্লেষণের কাজটি বর্তমান গবেষণার সর্বাধিক স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। একজন নির্মোহ গবেষকের অবস্থান থেকে রাজনীতি বিজ্ঞানের একজন ছাত্র এ কাজটি প্রথমবারের মতো করেছেন। এ বিশ্লেষণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আলিমসমাজের অবস্থান বিষয়ে একাধিক নতুন তত্ত্ব নির্মাণের এবং নতুন ধারার বিশ্লেষণের সুযোগ সৃষ্টির আশাবাদ ব্যক্ত করা হচ্ছে।

স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন শাসনামলে প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আলিমসমাজের প্রভাব চিহ্নিত করার একটি ব্যাপক প্রয়াস রয়েছে এ গ্রন্থে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ায় আলিমসমাজের নানামাত্রিক সমস্যা ও সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এ গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। আলিমসমাজের একক ও যৌথ পর্যায়ে এ বিশ্লেষণ নতুন উপলব্ধি সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে বলে আশা করছি।

এ গ্রন্থের পরিশিষ্টে বাংলাদেশের আলিমসমাজের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বেশ কিছু দলিল সংযোজিত হয়েছে। এ গ্রন্থের প্রচুর পরিমাণ তথ্য-উপাত্তের পাশাপাশি পরিশিষ্টে সংযোজিত সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরবর্তী সময়ের বিশ্লেষক ও গবেষকদের তথ্য-কাঁচামাল সরবরাহে ভূমিকা রাখবে।

ডক্টরাল থিসিস থেকে কিঞ্চিৎ পরিমার্জিত এ উপস্থাপনায় প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামান, প্রফেসর ড. মীজানুর রহমান শেলী ও প্রফেসর হাসান মোহাম্মদের বিশেষ ঋণ স্বীকার করছি।

আমার থিসিসটি বই আকারে প্রকাশের জন্য অনুপ্রাণিত করেছেন অগ্রজপ্রতীম গবেষক মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, প্রীতিভাজন আরিফুর রহমানসহ অনেকে। তাদের দিক থেকে চাপ বোধের ফলেই বইটি দ্রুত পাঠকের হাতে পৌঁছুলো। বইটি প্রকাশে সম্মতি জানিয়ে একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস শাহীনা রহমান আমাকে সম্মানিত করেছেন। তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

আমার ডক্টরাল থিসিসটির শিরোনাম ছিলো: 'বাংলাদেশের রাজনীতিতে উলামা: ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)'। আমি এমনকি বাংলাদেশী অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির মাঝেও 'উলামা' শব্দের অর্থ জানার বিষয়ে অস্পষ্টতা অনুভব করেছি। আরবী *আলিম* শব্দের বহুবচন *উলামা*। প্রথম শ্রবণে বইটির শিরোনাম উপলব্ধিতে সহজবোদ্ধতার জন্য উলামার স্থলে আলিমসমাজ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। অবশ্য গ্রন্থের ভেতরে উলামা-র ব্যবহার অব্যাহত রেখেছি।

এ গ্রন্থে বিশ্লেষিত তত্ত্ব, তথ্য ও ধারণাগত কোনো ত্রুটি-বিকৃতি-বিভ্রান্তি পেলে পাঠককে তা জানাবার অনুরোধ করছি। এমন যে কোনো চেষ্টাকে সাধুবাদ জানানো হবে এবং বইটির পরবর্তী সংস্করণে এর প্রতিফলন ঘটবে। বইটি বাংলাদেশের আলিমসমাজসহ রাজনীতি সচেতন পাঠকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে উপযুক্ত ও কাঙ্খিত ধারণা ও নির্দেশনা সরবরাহে সক্ষম হলে চর্চিত মেধা ও নিয়োজিত শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ফেব্রুয়ারী ২০০৭

সূচিপত্র

রেখাচিত্র তালিকা

সারণি তালিকা

পরিশিষ্ট তালিকা

প্রথম অধ্যায়
প্রস্তাবনা

এক. সমস্যা

আরব উপদ্বীপে 'ইসলাম' প্রচারের পরপরই মুসলিম ব্যবসায়ী এবং সুফীগণ (সাধু/দরবেশ) 'বাংলাদেশ অঞ্চলে' বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচারের জন্য আসতে শুরু করেন। মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির উত্থান এ অঞ্চলে আরম্ভ হয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার খলজীর 'বাংলা বিজয়ের' সময় থেকে।

'বৃটিশ-ভারত' বিভক্তির পর পাকিস্তানে কিছু *ইসলামী রাজনৈতিক দল* প্রতিষ্ঠিত হয়। সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদূদী প্রতিষ্ঠিত জামায়াতে ইসলামী হিন্দ (১৯৪১)-এর নতুন নাম হয় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান (জামায়াত)। মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর নেতৃত্বে পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম পুনর্গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে 'বেরলবী *আলিমগণ*' পাকিস্তানে জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান-এর ব্যানারে পুনরায় রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হতে থাকেন। কিন্তু তারা পাকিস্তানের রাজনীতিতে সক্রিয় হতে সক্ষম হননি।[১] পাকিস্তানে *আলিম নেতৃত্বের* এ সকল দলই দাবি করে, পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো ইসলাম এবং তাই পাকিস্তান একটি ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া উচিত।[২] *আলিমগণের* চাপের মুখে গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ঘোষণা করতে হয়, যদিও পাকিস্তানের সংবিধান পুরোপুরি শরীয়তভিত্তিক হবে না, তবে তা শরীয়ত পরিপন্থীও হবে না।[৩] ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান গণপরিষদ 'আদর্শ প্রস্তাব' শীর্ষক একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাতে পাকিস্তানের প্রণীতব্য সংবিধানের ভিত্তি হিসেবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও ইসলামী আদর্শের স্বীকৃতি ছিলো। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানকে ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়, ইসলামী আদর্শ বিষয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয় এবং একটি 'ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী' প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরপর ধর্মভিত্তিক সকল সংগঠনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। তারপরও তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের ধর্মীয় মানসিকতাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলো।[৪] আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৫ সালে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' প্রতিষ্ঠা করে। 'আওয়ামী উলামা পরিষদ'কে সরকার কাজ করার অনুমতি দেয়, যদিও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিলো।[৫]

---

১ হামযা আলাভী, *'পাকিস্তান ও ইসলাম : জাতিসত্তা, মতাদর্শ ও রাষ্ট্র'*, অনু : ডালেম চন্দ্র বর্মণ, *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৮, পৃ. ২৭।

২ কামরুদ্দীন আহমদ, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮২, পৃ. ২৩৭।

৩ Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan*, Berkeley : University of California Press, 1963, p. 100.

৪ আবদুল আওয়াল, *বঙ্গবন্ধু : ইসলামিক মূল্যবোধ ও মুসলিম বিশ্ব*, ঢাকা: আওয়ামী উলামা পরিষদ, তারিখ নেই।

৫ গোলাম মুরশিদ, *ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ*, আলী আনওয়ার সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩, পৃ. ৫৯।

১৯৭৬ সালে জিয়াউর রহমানের শাসনামলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা অপসৃত হয়। এ সময়ে রাষ্ট্রযন্ত্র ও সরকার পরিচালনায় ধর্মীয় অনুভূতি ও মর্যাদাকে সম্মান দেখাবার আইনগত ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর আওতায় এইচ এম এরশাদ *ইসলাম*কে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন।

ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রেক্ষাপটে *আলিম* নেতৃত্বের প্রায় সকল নিষিদ্ধ ইসলামী রাজনৈতিক দল বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮০ সালে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর অনুসারীদের একাংশ দীর্ঘ নিরবতার পর প্রখ্যাত পীর ও 'হাফেযজী হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহর নেতৃত্বে রাজনীতিতে সক্রিয় হন। তারা ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯৮১ সালে হাফেযজী হুজুরের নেতৃত্বে ১১টি দলের সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি জোট গঠিত হয়। এর আগে প্রধানত জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি ও খেলাফতে রব্বানী পার্টির নেতা-কর্মীরা মিলিত হয়ে ১৯৭৬ সালে (২৪ আগস্ট) ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ নামে একটি দল গঠন করে এবং এটি ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৬টি আসনে বিজয়ী হয়। ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী পুনর্গঠিত হবার পর ১৯৮৬-র তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১০টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৯১ সালে ৫টি *আলিম* নেতৃত্বের দল ইসলামী ঐক্যজোট (ঐক্যজোট) নামে একটি জোট গঠন করে। ১৯৯১-র পঞ্চম জাতীয় সংসদে এ জোট একটি আসন ও জামায়াত ১৮টি আসনে জয়ী হয়। ১৯৯৬-র (১২ জুন) সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ৩টি আসনে ও ইসলামী ঐক্যজোট একটি আসনে এবং ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ১৭টি ও ঐক্যজোট ৩টি আসনে বিজয়ী হয়। তবে জামায়াতকে যথার্থভাবে *আলিম* নেতৃত্বের দল না-ও বলা হতে পারে। ১৯৮৭ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এ দলটির ৫৮জন জেলা আমীরের মধ্যে ১৮জন '*মাওলানা*'[৬] ও '*হাফেজ*'[৭] পদবিধারী ছিলেন।[৮]

বর্তমানে বাংলাদেশে বাহ্যত ১০টিরও[৯] বেশি *আলিম* নেতৃত্বের রাজনৈতিক দল রয়েছে। *আলিমগণ* বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বিদ্যমান শক্তি। বাংলাদেশে বহু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে *আলিমগণ* নিয়ামকের *ভূমিকা* পালন করেছেন, কিছু ক্ষেত্রে তাদেরকে *প্রভাব বিস্তারকারী* শক্তি হিসেবে দেখা গেছে এবং অন্যসব ক্ষেত্রে তারা কম-বেশি *ভূমিকা* পালনকারী হিসেবে থেকেছেন। *আলিমগণ* বাংলাদেশের সরকারসমূহ ও রাজনৈতিক দলসমূহে তাদের অস্তিত্ব নিশ্চিত করেছেন।

---

৬ ভারতীয় উপমহাদেশীয় অঞ্চলে মাদ্রাসার ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের *মাওলানা* বলা হয়।

৭ পূর্ণ কুরআন শরীফ স্মৃতিতে ধারণকারী ব্যক্তিকে *হাফেজ* বলা হয়।

৮ হাসান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা*, চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, সমাজবিজ্ঞান, নভেম্বর ১৯৯১।

৯ *আলিম* নেতৃত্বের দল: ১. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, ২. নেজামে ইসলাম পার্টি, ৩. খেলাফত আন্দোলন, ৪. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ, ৫. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ৬. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, ৭. খেলাফত মজলিস, ৮. ফরায়েজী জামায়াত, ৯. ইসলামী মোর্চা, ১০. ইসলামিক ফ্রন্ট প্রভৃতি।

দুই. সমস্যার তাৎপর্য

বাংলাদেশের সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক দলসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া তথা বাংলাদেশের রাজনীতিতে *আলিমগণ* তাৎপর্যপূর্ণ *ভূমিকা* ও গুরুত্বপূর্ণ *প্রভাব* বিস্তার করে থাকেন। এ অনুমিতির সাথে প্রায় সকল মহল একমত পোষণ করলেও এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে বাংলাদেশে কোনো গভীরতাসম্পন্ন ও দীর্ঘ (এম.ফিল/পিএইচ.ডি অর্থে) গবেষণাকর্ম সম্পন্ন হয়নি। তেমন একটি গভীর মনোযোগী গবেষণাকর্ম:

ক. ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারকদের *আলিম*কেন্দ্রিক নীতি নির্ধারণে নির্দেশনা প্রদান করবে,

খ. সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহকে যে কোনো নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণের বেলায় *আলিমদের ভূমিকা* ও অংশগ্রহণ বিষয়ে সচেতন করবে এবং

গ. এ বিষয়ে ভবিষ্যতে কাজের জন্য গবেষকদের 'প্রস্তুত কাঁচামাল' সরবরাহ করবে।

তিন. সাহিত্য পর্যালোচনা

'রাজনীতিতে *উলামা'* প্রসঙ্গটি পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, আলজেরিয়া ও সুদানের প্রেক্ষাপটে কম-বেশি অধ্যয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ অঞ্চলে মুসলিম আগমন, মুসলিম রাজনৈতিক শক্তির উত্থান, বিস্তার ও বিলোপ, ফকির বিদ্রোহ, কৃষক-প্রজা আন্দোলন (মীর নিসার আলী ওরুফে তিতুমির) ও ফরায়েজী আন্দোলন (হাজী শরীয়তুল্লাহ) প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রকাশিত গবেষণাকর্ম বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু অবিভক্ত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে *আলিমদের ভূমিকা* বিষয়ে কোনো সুসংবদ্ধ ও রীতিমাফিক গবেষণাকর্ম (এম.ফিল/ পিএইচ.ডি অর্থে) সম্পন্ন হয়নি। আর রাজনীতিতে *আলিমদের প্রভাব* বিষয়ে কোনো রীতিমাফিক গবেষণাকর্মই বর্তমান গবেষকের নজরে আসেনি।

'বৃটিশ-ভারতীয়' যুগে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে *আলিমদের* ভূমিকা বিষয়ে দু'টি গবেষণাকর্ম রয়েছে। প্রফেসর ইশতিয়াক হোসেন কোরেশী-র *ULEMA IN POLITICS* {Delhi, Renaissance Publishing House (reprint), 1985} গ্রন্থটি মোঘল যুগ থেকে বৃটিশ-ভারতের বিভক্তি (১৫৫৬-১৯৪৭) পর্যন্ত সময়কে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

প্রফেসর কোরেশী প্রথমেই মুসলিম সমাজে *'উলামা'*-র অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন এবং যথার্থই উচ্চারণ করেছেন: 'ইসলামে, বস্তুত, চার্চ বা যাজকতন্ত্রের (*প্রিস্টহুড*) স্থান নেই' (পৃ. ১)। তাহলে '*আলিমগণ* কিভাবে মুসলিম সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন?' -নিজের এ প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর কোরেশী লিখছেন: 'তথাপি ইহা (ইসলাম) পথ নির্দেশ ও ব্যাখ্যা দানের প্রয়োজন স্বীকার করেছে। স্রষ্টা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে সঠিকপথে চলার, বিপথগামী মানবতাকে পথ নির্দেশ প্রদান ও তাকে স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞান মানবতার নিকট পৌঁছানোর জন্য নবীর, যিনি একজন মানুষ এবং স্রষ্টার বান্দা, ধারণাটিই এ বাস্তবতার সুনির্দিষ্ট স্বীকৃতি যে, মানুষের পথ নির্দেশ দরকার এবং সে নিজের চেষ্টায়

পূর্ণ সত্যের উদঘাটন করতে পারে না। স্রষ্টা নবীদের দ্বারা এর (পথ নির্দেশ) আয়োজন করেছেন, মুহাম্মদ যাঁদের সর্বশেষ। নবীদের ধারা শেষ হওয়ায় কেবল মাত্র জ্ঞান ও বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারাই মানবতাকে পথ নির্দেশ প্রদান সম্ভব। এ পর্যায়েই *উলামা*-র প্রয়োজন' (পৃ. ৪)।

ড. কোরেশী এ গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে রাজনীতি ও সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে উপমহাদেশের *আলিমদের ভূমিকা* ও *প্রভাবের* বিষয়টি আলোচনা করেছেন। এ দীর্ঘ সময়ের কার্যক্রমে *উলামা*, লেখক দেখিয়েছেন, অনেক লক্ষ্য অর্জন করেছেন, বহু বিষয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন আবার অনেক বিষয়ে সাফল্যের তীরে পৌঁছুতে ব্যর্থ হয়েছেন। *আলিমদের* রাজনৈতিক কার্যক্রমের এসব উত্থান-পতন সত্ত্বেও লেখক যুক্তি দেখিয়েছেন:

১. 'তাদের প্রশিক্ষণ, সংগঠন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও *আলিমগণ* আমাদের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা আমাদের ঐতিহ্য সংরক্ষণে সাহায্য করেছেন'।
২. 'তারা যদি মূলনীতি ও খুঁটিনাটিসমূহ এবং শেকড় ও শাখাসমূহকে একইভাবে বিবেচনা না করতেন, তাহলে এই নিখাদ, আবেগময় ও আপোষহীন আত্ম নিবেদন তাদেরকে আরো ইতিবাচক প্রয়াসের জন্য তাড়া করতো এবং তারা নেহায়েত নেতিবাচক প্রতিক্রিয়ার ওকালতি করতেন না'।
৩. 'ইসলামের প্রতি তাদের ঘনিষ্ঠতার বিবেচনায় তা ছিলো গভীর ও দৃঢ় ... যাবতীয় দুর্বলতা সত্ত্বেও তাঁরা '(ইসলামের) মতবাদের' (ডক্‌ট্রিন) শুদ্ধতা সংরক্ষণে নির্ভীক যোদ্ধার প্রমাণ রেখেছেন' (পৃ. ২১-২২)।

৪৩০ পৃষ্ঠার এই দীর্ঘ গ্রন্থে লেখক 'এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে *আলিমদের ভূমিকা* বিষয়ে মনোযোগী' থেকেছেন। এ গ্রন্থ প্রায় চার শতাব্দীকালকে আলোচনা করেছে, যা বাস্তবে আকবরের ক্ষমতারোহণ থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছে। তাই ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ের রাজনীতিতে *আলিমদের ভূমিকা* বিষয়ে এ গ্রন্থটির আলোচনা করার কথা নয়।

বৃটিশ-ভারতীয় রাজনীতিতে *আলিমদের* ভূমিকা বিষয়ে দ্বিতীয় গবেষণাটি পাওয়া গেছে ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ থেকে {*The Role of Ulama in Bengal Politics (1906-1947 A.D.)*, unpublished Ph.D. thesis, University of Dhaka, 1998}। উপমহাদেশীয় রাজনৈতিক কার্যক্রমে *আলিমদের* ভূমিকার কথা ড. কোরেশী বিস্তারিত আলোচনা করলেও বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলের *আলিমদের* অংশগ্রহণ বিষয়ে তিনি তথ্য-উপাত্তের অপর্যাপ্ততার কথা স্বীকার করেন (কোরেশী, ১৯৮৫: ৩৬৩)। ড. কোরেশীর এই স্বীকৃতির সূত্রেই ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ তার গবেষণাকর্মের পরিধি নির্ধারণ করেন এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বৃটিশ-ভারতের বিভক্তি পর্যন্ত মেয়াদে 'বাংলা প্রদেশের' (পূর্ব ও পশ্চিম-উভয় বাংলা) *আলিমদের* রাজনৈতিক কার্যক্রমের এই বিবরণ ও বিশ্লেষণ প্রস্তুত করেছেন। কাজটির পরিধিগত সীমাবদ্ধতার কারণেই এতে *অবিভক্ত পাকিস্তান* আমল অথবা *স্বাধীন বাংলাদেশ* আমলের *আলিমদের* রাজনৈতিক *ভূমিকার* কোনো ব্যাখ্যা নেই।

উপমহাদেশের বাইরে ইরানের প্রেক্ষাপটে *আলিমদের* রাজনৈতিক সংগ্রাম বিষয়ে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তেহরান থেকে। ইরানের সংগ্রামী *আলিমদের* এক শতাব্দী কালের কার্যক্রমের বিবরণ সংবলিত (*TEN DECADES of ULAMA'S STRUGGLE*, Aqiqi Bakhshayeshi, Tehran: Islamic Propagation Organization, 1985) এ গ্রন্থ 'ইসলামের অনুপ্রাণিত সুমহান লক্ষ্যে নিবেদিত কয়েকজন ইরানী *আলিমের* জীবন বৃত্তান্ত' উপস্থাপন করেছে। এ গ্রন্থে বিবৃত জীবনীসমূহ 'ইসলামের লক্ষ্যে *আলিমদের* রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রামের ইতিহাস তুলে ধরতে এবং বিশ্বের মুসলিম জাতিসমূহ ও সকল নির্যাতিত গণমানুষের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হওয়া উচিত' বলে গ্রন্থটির প্রকাশক মত প্রকাশ করেছেন। এ গ্রন্থে ইরানের ইসলামী বিপ্লবে আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীর নেতৃত্বসহ এক শতাব্দীর বেশি সময়ে একটি ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় ইরানী *আলিমদের* সংগ্রামের বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়ার সাম্প্রতিক গ্রন্থ *'দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান'* (ঢাকা, কওমী পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০০) ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ দারুল উলুম দেওবন্দ নামের বিখ্যাত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ও এর শিক্ষক-ছাত্রদের কার্যক্রম ও অবদান বিষয়ে আলোচনা করেছে। 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর উলামায়ে দেওবন্দের রাজনৈতিক তৎপরতা' শিরোনামে (পৃ. ২০৮-২১৬) লেখক পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে (১৯৯৭ পর্যন্ত) 'দেওবন্দী ধারার' *উলামার* দলীয়-সাংগঠনিক-নির্বাচনী তৎপরতার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থটি একটি সাধারণ ইতিহাস বর্ণনাধর্মী প্রকাশনা। এতে বাংলাদেশের *উলামার* রাজনৈতিক *ভূমিকা* এবং নির্দিষ্টভাবে তাদের *প্রভাব* নির্দেশ করার কোনো প্রয়াস দেখা যায়নি।

অতি সাম্প্রতিক আরেকটি দীর্ঘ গবেষণাকর্ম অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুহাম্মদ কাসিম জামান (Muhammad Qasim Zaman) উপস্থাপিত THE ULAMA IN CONTEMPORARY ISLAM: CUSTODIANS OF CHANGE (Princeton: Princeton University Press, 2002) বৃটিশ-ভারত ও পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে সমকালীন মুসলিম দেশসমূহে পরিবর্তনের অভিভাবক হিসেবে *উলামার ভূমিকা* গভীর মনোযোগের সাথে ব্যাখ্যা করেছে। জামান বলেছেন: 'সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রক্রিয়া ও পরিণতিসমূহ, সেগুলো যেভাবে রূপ ধারণ করেছে এবং যাদের দ্বারা রূপ দেয়া হয়েছে, সেই উলামা এ গ্রন্থের বিষয়বস্তু। বইটি প্রাথমিকভাবে বৃটিশ-ভারত এবং পাকিস্তানের ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে, তবে তা করেছে সমকালীন কয়েকটি মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ধারাসমূহের বিস্তৃত ও নিরবচ্ছিন্ন বিবেচনাসহ একটি তুলনামূলক কাঠামো থেকে' (ভূমিকা-১)। জামানের এ গবেষণাকর্মে *উলামার* অভিভাবকসুলভ *ভূমিকা* ব্যাখ্যা করা হলেও *উলামার প্রভাব পরিমাপের* প্রচেষ্টা দেখা যায়নি। আর পরিধিগত কারণেই জামান রাজনীতিতে বাংলাদেশের *উলামার প্রভাব* বিষয়ে মনোযোগ দেননি।

হাসান মোহাম্মদের *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা* (চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, সমাজ বিজ্ঞান, নভেম্বর ১৯৯১)

শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ খাঁটি অর্থে প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে *আলিম* সমাজের *ভূমিকা* বিশ্লেষণ করেছে। এই সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণটিতে এরশাদ শাসনামল পর্যন্ত সময়কে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

বিভিন্ন পর্যায়ের সাহিত্য-প্রকাশনা বিশ্লেষণ থেকে প্রতীয়মান হয়, বর্তমান গবেষণাকর্ম-সংশ্লিষ্ট কোনো পূর্ণাঙ্গ কাজ ইতোপূর্বে সম্পন্ন হয়নি এবং বর্তমান কাজের এক বিশিষ্ট দিক রাজনীতি তথা রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণে *আলিমদের* ***প্রভাব পরিমাপের*** কোনো প্রচেষ্টা বর্তমান গবেষকের নজরে আসেনি।

চার. উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণাকর্মের দু'ধরনের উদ্দেশ্য আছে:

১। বাস্তব রাজনৈতিক কর্ম ব্যবস্থাপনাগত ও

২। জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তারে তত্ত্ব নির্মাণগত।

রাজনৈতিক কর্ম ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এ গবেষণাকর্মের ফলে:

ক. *রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে উলামাকেন্দ্রিক নীতি প্রণয়নে নির্দেশনা লাভ,*

খ. *রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আলিমদের ভূমিকা ও প্রভাবের মাত্রা নিরূপণ এবং*

গ. *আলিম সমাজের ভূমিকা ও প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।*

একটি প্রশস্ততর ব্যাপ্তি থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে *উলামার ভূমিকা* ও *প্রভাব* অধ্যয়নের ফলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সুস্পষ্ট তত্ত্ব নির্মাণও সম্ভব হতে পারে।

পাঁচ. তাত্ত্বিক ও ধারণাগত কাঠামো: প্রায়োগিক সংজ্ঞা

বাংলাদেশের রাজনীতি বলতে বর্তমান গবেষণায় **১৯৭২ সাল থেকে অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত সময়ের বাংলাদেশের রাজনীতিতে বোঝানো হবে।**

ক. ***উলামা*** শব্দটি আরবী একবাচনিক ***আলিম*** শব্দের বহুবচন। এক বচনে শব্দটির অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তি। পারিভাষিক অর্থে শব্দটির অর্থ 'ন্যূনতম মাত্রায় স্রষ্টা ও বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহর পরিচয়, ইসলামী আইন ও জীবন বিধান সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি'। সমাজবিজ্ঞানী Smith-এর মতে, 'ধর্মের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান অর্জনে জীবনের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় ব্যয়কারী ব্যক্তিকে *আলিম* বলা যায়'।[১০]

Gibb ও Bowen বলেন: 'ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি ইল্‌ম্ পবিত্র শিক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞান এবং ইলমের কিছু অংশ অর্জন 'উলেমা' পদবী অর্জনের প্রয়োজনীয় শর্ত (তারাই উলেমা) যারা জানে অর্থাৎ ইল্‌ম-এর অধিকারীগণ'।[১১]

---

[১০] Donald Eugene Smith, *Religion, Politics and Social Change in the Third World: A Source Book*, New York: The Free Press, 1971, p. 77.

[১১] H.A.R. Gibb and Harold Bowen, *Islamic Society and West*, London: Oxford University Press, 1965, p. 81.

আল কুরআনের সুরা ফাতির-এর ২৮ নম্বর আয়াতে *'উলামা'*-র ('তার বান্দাদের মধ্যে *উলামাই* আল্লাহকে ভয় করে') উল্লেখ আছে।

আলিম-এর সংজ্ঞায় *কুরআন হাদিস* বিশেষজ্ঞ হাসান বসরী বলেন: 'যে একান্তে ও জনসমক্ষে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা কামনা করে এবং আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তা ঘৃণা করে'।[১২]
রবী ইবনে আনাস বলেন: 'যে আল্লাহকে ভয় করে না, সে *আলিম* নয়'।[১৩]
মুজাহিদ বলেন: 'কেবল সে-ই *আলিম* যে আল্লাহকে ভয় করে'।[১৪]
ইমাম আবু হানিফা বলেন: 'যে ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব পাঠ করে নিল, কিন্তু দ্বীনকে পুরোপুরি বুঝতে পারলো না, সে ব্যক্তি কুরআন-হাদীসের পরিভাষায় আদৌও আলিম নয়'।[১৫]

মুফতী[১৬] মুহাম্মদ শফী তার তাফসীরগ্রন্থ *মা'আরেফুল কুরআনে লিখেছেন*: 'আয়াতে উলামা বলে এমন লোক বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহ তায়ালার সত্তা ও গুণাবলী সম্পর্কে সম্যক অবগত এবং পৃথিবীর সৃষ্ট বস্তুসামগ্রী, তার পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও আল্লাহর দয়া-করুণা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন। কেবল আরবী ভাষা, ব্যাকরণ-অলঙ্কারাদি সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিকেই কুরআনের পরিভাষায় আলিম বলা হয় না, যে পর্যন্ত তিনি আল্লাহর মারেফাত উপরোক্তভাবে অর্জন না করেন'।[১৭]

আলিম রাজনীতি বিশেষজ্ঞ আহমদ আবদুল কাদের বলেন: 'বাহ্যিকভাবে আলেম বলতে তাকেই বুঝায় যিনি দ্বীনি বিষয়ে অর্থাৎ কোরআন-হাদীস-ফিকাহ ইত্যাদি বিষয়ে ব্যুৎপত্তির অধিকারী। আর প্রকৃত অর্থে তিনিই আলেম যিনি জ্ঞান বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তির সাথে তার যথার্থ অনুসারীও অর্থাৎ জ্ঞান, আল্লাহর মারেফাত, তাকওয়া ও দ্বীনি চরিত্রের অধিকারী'।

ইসলামী ধর্মতাত্ত্বিক এবং পশ্চিমা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের উপস্থাপিত *আলিম* এর সংজ্ঞা থেকে দু'টি তাৎপর্যপূর্ণ দিক পাওয়া যাচ্ছে:

এক. ***জ্ঞানগত*** তথা *আলিম* হতে হলে স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহর পরিচয় এবং তার সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিষয়ে আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান থাকতে হবে।

দুই. ***কর্মগত*** তথা ন্যূনতম জ্ঞান অর্জনই যথেষ্ট নয়, *আলিম* হবার জন্য কাজে-কর্মে-আচরণে আল্লাহ-ভীতির ন্যূনতম প্রকাশ থাকতে হবে।

প্রায়োগিক সংজ্ঞা হিসেবে বর্তমান গবেষণায় *'আলিম'* বলতে **এমন কাউকে বোঝানো হবে যিনি মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রী অর্জন করেছেন অথবা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে *আরবী* বা *ইসলামী শিক্ষায়* ডিগ্রী অর্জন করেছেন।**

---

১২ দেখুন, আহমদ আবদুল কাদের, *ইসলামী আন্দোলন ও উলামা সমাজ*, ঢাকা: চিন্তাধারা প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৬।

১৩ *তদেব*।

১৪ *তদেব*, পৃ. ১০।

১৫ *তদেব*, পৃ. ৭।

১৬ ইসলামী আইনশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি।

১৭ আহমদ আবদুল কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫-৬।

খ. ***ভূমিকা:*** এ পরিভাষাটি সমাজতত্ত্ব, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানে দু'টি প্রাবরিত (ওভারল্যাপ্‌ড) কিন্তু একই সময়ে ভিন্ন অর্থে ও প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়।

সামাজিক কাঠামোর দিক থেকে *ভূমিকা* একটি প্রদত্ত 'সামাজিক অবস্থান' হিসেবে সংজ্ঞায়িত হতে পারে। এই সামাজিক অবস্থান একগুচ্ছ (ক) ব্যক্তিগত গুণ এবং (খ) কার্য দ্বারা বিশেষায়িত হতে পারে। সামাজিক আন্তঃক্রিয়া বা ভূমিকা পালন বা সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার একটি উপাদান হিসেবে, একটি আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে, *ভূমিকা*কে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রমের ধরনসম্পন্ন পরম্পরা বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

'সামাজিক বিজ্ঞানে প্রায়শ কোনো অর্থ নির্ধারণ ব্যতিতই *ভূমিকা*কে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়েছে'।[১৮] *ভূমিকা*-র দু'টি সাধারণ ব্যবহার হলো: (ক) সমাজে একক হিসেবে *ভূমিকা* এবং (খ) সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার অন্য নাম হিসেবে '*ভূমিকা পালন*'। প্রথমটি ব্যবহার করেছেন R. Linton এবং দ্বিতীয় ধারণার উন্নয়ন ঘটান G. H. Mead (দেখুন, R. Linton, *The Study of Man*, New York: Appleton-Century, 1936, এবং G. H. Mead, *Mind, Self and Society*, ed. by C.W. Morris, Chicago: The University of Chicago Press, 1934)।[১৯]

T.R. Sarbin-র মতে *ভূমিকা* হলো আন্তঃক্রিয়াশীল পরিস্থিতিতে এক ব্যক্তির জ্ঞাত কার্যক্রম বা চুক্তির নির্দিষ্ট ধরনসম্পন্ন পরম্পরা' {দেখুন, G. Lindzey (ed.), 1954: Vol. 1, 223-58}।[২০]

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে *আলিমদের* **যে কোনো কার্যক্রম (যেমন বক্তব্য, ওয়াজ, বিবৃতি, সভা, প্রতিষ্ঠান স্থাপন, দাবি আদায়ে চাপ সৃষ্টি প্রভৃতি)কে *ভূমিকা* হিসেবে গণ্য করা হবে।**

গ. *প্রভাব*-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বোঝার জন্য *ক্ষমতার* সংজ্ঞা পাওয়া দরকার। খুবই সাধারণ অর্থে *ক্ষমতা* বলতে ইচ্ছাকৃতভাবে এবং অন্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে কোনো একজন বা গোষ্ঠী কর্তৃক (ক) নির্দিষ্ট কিছু ঘটাবার *সামর্থ* (অনুশীলিত হোক বা না হোক) অথবা (খ) *প্রভাব*কে বোঝায়।

Lasswell & Kaplan সূক্ষ্ম বিচার প্রক্রিয়ায় *ক্ষমতা* ও *প্রভাব*-এর পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। *ক্ষমতার* ক্ষেত্রে তারা অন্যের আচরণ পরিবর্তনের জন্য তুলনামূলকভাবে প্রতিশ্রুতিপূর্ণ গভীর বঞ্চনা অথবা প্রশ্রয়ের ব্যবহারের কথা বলেছেন।[২১] Lasswell & Kaplan-র ব্যাখ্যা অনুযায়ী: 'নির্দিষ্ট ধরনের একগুচ্ছ বিধানের আওতায় অধিকারসমূহই *ক্ষমতা*।

---

১৮ L.J. Neiman, & J.W. Hugher, *The Problem of the Concept of Role: A Re-survey of the Literature,* Vol. 30, 1951, pp. 141-149.

১৯ G.H. Mead, *Mind, Self and Society,* C.W. Morris, Ed., Chicago: The University of Chicago Press, 1934.

২০ T.R. Sarbin, *'Role Theory'*, G. Lindzey, Ed., *Handbook of Social Psychology*, Vol. I, Cambridge: Mass : Adison-Wesley, 1954, pp. 223-58.

২১ H. Lasswell & A. Kaplan, *Power and Society,* New Heaven: Yele University Press, 1950, p. 84-98.

খুব সাধারণ অর্থে *প্রভাব* যে কোনো সামাজিক এবং বিশেষত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, যে কারণেই হোক, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহের আচরণ-পথের বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। আরো নির্দিষ্ট করে পরিভাষাটি অন্যদের পূর্বানুমিত সাড়ার কারণে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণে পরিবর্তন নির্দেশ করে। এ অর্থে পরিভাষাটি অধিকতর দাবিযুক্ত আইনী অথবা আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বের সাথে যুক্ত *ক্ষমতার* প্রকাশ্য অনুশীলনের বিপরীতে বাহ্যিকভাবে শান্ত এবং ক্ষমতা ও প্ররোচনার সম্ভাব্য ক্রমাগত আরোপণের দ্যোতনা বহন করে।

'সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে' *প্রভাব*-এর সংজ্ঞাসমূহের সাধারণ উপাদানগুলো হলো: (ক) সেই *প্রভাব* একটি পরিবর্তন সূচিত করবে অথবা পূর্ববর্তী কিংবা পূর্বাভাসকৃত সিদ্ধান্ত, নীতি বা আচরণকে উল্টে দেবে, (খ) 'প্রভাবের অনুশীলন' (অর্থাৎ প্রভাব প্রক্রিয়া) 'নিজের' নয় বরং অন্যদের নীতিকে প্রভাবিত বা ক্ষতিগ্রস্ত করবে।[২২]

সমাজবিজ্ঞানীরা যখন 'খ'-র ওপর 'ক'-র *প্রভাব*-এর কথা বলেন তখন তারা 'ক'-র সাথে আদৌও সম্পর্কিত না হলে বা 'ক'-র অস্তিত্বই না থাকলে 'খ'-র যে প্রকৃত আচরণ হতো তার সাথে 'ক'-র সঙ্গে সম্পর্কিত হবার পর 'খ'-র পরিবর্তিত আচরণ ধারার পার্থক্যকে চিহ্নিত করে থাকেন।

R.K. Morton-এর মতে, '*প্রভাব* কোনো ব্যক্তির বিমূর্ত প্রতীক নয়, এটি দুই বা ততোধিক ব্যক্তিকে জড়ানো একটি প্রক্রিয়া'।[২৩]

সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে '*ক্ষমতা*' থেকে *প্রভাব*-এর পার্থক্য নির্ধারণে ভিন্নতা, যদিও সহজে দৃশ্যমান নয়, দেখা যায়। এ ধারণা দু'টো বেশ ঘনিষ্ঠ, তবে অভিন্ন নয়। Morton-র মতে, 'পদসোপানের প্রেক্ষাপটে *ক্ষমতা, মর্যাদা, অবস্থান* ইত্যাদি সম্ভাব্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'আন্তঃব্যক্তিক প্রভাব' ফেলতে পারে, কিন্তু তা প্রকৃতপক্ষে *প্রভাব* বিস্তারের মাত্রা নির্ধারণ করে না'।[২৪] অন্যদিকে H.A. Simon তার 'Notes on the Observation and Management of Political Power' শীর্ষক প্রবন্ধে[২৫] '*ক্ষমতা*' ও *প্রভাব* সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। H.D. Lasswell দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণেই বলেছেন 'রাজনীতির অধ্যয়ন মানেই *প্রভাব* ও *প্রভাবকের* অধ্যয়ন'।[২৬]

প্রভাব-এর বিদ্যমানতার ভিত্তি, এর অনুশীলনের ধরন এবং এর পরিমাপের পদ্ধতি নিয়েও তাত্ত্বিকদের মাঝে মতের ভিন্নতা রয়েছে। নিপীড়ন অথবা আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব

---

২২ Ibid., p. 71.

২৩ R.K. Morton, *Patterns of Influence*, P.F. Lezerfeld & F. Stanton (eds.), *Communication Research* (New York: Harpers, 1948), p. 208.

২৪ দেখুন, P.F. Lezerfeld & F. Stanton (eds.), *Communication Research*, p. 217.

২৫ H.A. Simon, "Notes on the Observation and Management of Political Power", *Journal of Politics*, Vol. 15, 1953, p. 501.

২৬ H.D. Lasswell, *Politics, Who Gets What, When, How?* (New York: Mc Graw-Hill, 1936), p. 3.

ব্যবহারের স্থলে পরামর্শ, ব্যবহার করা, অনুকরণ প্রভৃতির কারণে প্রভাবিতের আচরণে পরিবর্তনকে *প্রভাব* বলে, *ক্ষমতা* নয়। নতিস্বীকারের মূল্য 'প্রভাবশালী' ও 'ক্ষমতাশালী', উভয়কেই সেবা বা আনন্দ দিলেও *প্রভাব*-এর ক্ষেত্রে শাস্তি কম গুরুতর হয়ে থাকে।

গণমাধ্যম বা বাজার কর্তৃক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে সৃষ্ট বা আনীত পরিবর্তনকে সমাজবিজ্ঞানীরা *প্রভাব* বলতে অনীহ। তারা এ পরিভাষাটিকে 'ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপক নৈকট্যের' জন্য সংরক্ষিত রাখতে চান। যদিও এতে *প্রভাবিতের* রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও প্রশাসনিক আচরণে ব্যত্যয় ঘটে।

প্রভাব বলতে এ গবেষণায় **বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অথবা প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এ দেশের *আলিমদের* প্রভাব বিস্তার-উপযোগী যে কোনো ধরনের প্রবেশাধিকার বা গম্যতাকে বোঝানো হবে।**

ছয়. গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মের জন্য মূলত সার্ভে বা জরীপ পদ্ধতিকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতির আওতায় পারপাসিভ স্যাম্পলিং বা লক্ষ্যভিত্তিক নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নির্দিষ্ট প্রশ্নমালার জবাব সংগ্রহ করা হয়েছে এবং পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলসমূহের দলিলাদি থেকে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে। এ গবেষণাকর্মে প্রাথমিক সূত্র হিসেবে বাংলাদেশের কয়েকজন *উলামা*-রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ও বেশ ক'জন *আলিমের* সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। ব্যক্তি-*আলিম*দের সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে প্রধানত ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্য। এর বাইরেও প্রচুর সংখ্যক *আলিম* ও এ বিষয়ে সচেতন ব্যক্তির সাথে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ধারণা ও তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
রাজনীতিতে আলিমসমাজঃ বাংলাদেশ-পূর্ব উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপট

'বাংলাদেশ অঞ্চলে' মুসলিম রাজনৈতিক শাসনের যাত্রা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে (বখ্‌তিয়ার খলজী, ১২০১) হলেও এখানে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা তখনো ছিলো না। এ অবস্থাটি উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটেও একই রকম ছিলো। এখানে ব্যাপক হিন্দু সংখ্যাগুরুর মাঝে সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠী বিদ্যমান ছিলো। মুসলিম শাসক ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝখানে *আলিমগণ* ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতেন। ড. কোরেশীর ভাষায়: 'তারা (*উলামা*) অব্যাহতভাবে ইসলামের শিক্ষার শুদ্ধতা রক্ষা করা, মুসলিম জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সংরক্ষণ করা এবং মুসলিম সাম্রাজ্যকে শক্তিমান করার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত তিনটি লক্ষ্যে কাজ করেছেন'।[১]

মুসলিম সাম্রাজ্য শক্তিমান করার লক্ষ্যে কাজ করলেও *উলামা* মুসলিম শাসকদের অন্ধ সমর্থক ও সাহায্যকারী ছিলেন না। শরীয়াহ[২]-র যে কোনো সুস্পষ্ট লংঘনের ক্ষেত্রে তারা মুসলিম শাসকদের হুঁশিয়ার করতেন এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেন। সুলতান সিকান্দার লোদীর গল্পটি এ ক্ষেত্রে ভালো দৃষ্টান্ত হতে পারে। একদা তিনি *কুরুক্ষেত্রের* একটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও একটি পুকুরে তাদের পূণ্যস্নান বন্ধের সিদ্ধান্ত নেন। ঘটনা শুনে তৎকালীন 'মালিক-উল-উলামা' আব্দুল্লাহ্ আযোধানি ঘোষণা করেন, আইনানুযায়ী সুলতান এ কাজ করতে পারেন না। *আলিম নেতৃত্বের* এ ঘোষণায় সুলতান অসন্তুষ্ট হলেও তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকেন।[৩]

সুলতান ফিরোজ শাহ-র শাসনামলে *আলিম নেতৃত্ব* আরো বেশি কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু ইতোমধ্যে সুফীবাদের[৪] বিকৃত প্রয়োগ ও অনুশীলন দ্বারা মুসলিম সমাজের একটি অংশে 'বামমার্গী দর্শনের' যৌন অর্চনার রেওয়াজ প্রচলন লাভ করে। অন্যদিকে জৈনপুরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও *আলিম* সাইয়্যিদ মুহাম্মদ এ সময়ে নিজেকে 'মাহ্‌দী'[৫] বলে দাবি করেন। চারপাশে তিনি সরল প্রাণ বেশ কিছু অনুসারীও লাভ করেন। কার্যত: 'মাহ্‌দী' দাবির বাইরে তার আর সকল ধারণা ও কার্যক্রম শরীয়াহ-র অনুকূলেই পরিচালিত হচ্ছিলো। বিকৃত সুফীবাদের বিপরীতে তিনি আরো ঘনিষ্ঠভাবে ইসলামী

---

১ Ishtiaq Husain Qureshi, *Ulema in Politics* (reprint) (Delhi : Renaissance Publishing House, 1985), p. 24.

২ ইসলামী আইন ও বিধিমালার মিলিতরূপকে শরীয়াহ বলে।

৩ Qureshi, Ibid., p. 25.

৪ আধ্যাত্মবাদের ইসলামী রূপ।

৫ ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী কিয়ামতের ঠিক পূর্বকালে বিশ্বে আগমন করে বিশ্বব্যাপী পুনরায় ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবেন।

জীবন বিধান মান্য করার তাগিদ দেন। তৎকালীন *আলিম নেতৃত্ব* সাইয়্যিদ মুহাম্মদের মাহ্দী দাবিকে বিপজ্জনক গণ্য করে তার প্রতিরোধে অবস্থান গ্রহণ করে। মাহ্দী দাবিকে *উলামা* ইসলামে 'নব্যতন্ত্র'[৬] হিসেবে চিহ্নিত করে এর ঘোর বিরোধিতা কর্তব্য মনে করেন। 'মাহ্দীবাদ' বিরোধী কার্যক্রম ইসলাম শাহ্ শুর-এর শাসনামলে সঙ্কটে রূপ নেয়। যদিও ১৫০৫ সালে ফাররা[৭]য় মৃত্যুকালে সাইয়্যিদ মুহাম্মদ তার 'মাহ্দী' দাবির ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং অনুসারীদের এ বিশ্বাস থেকে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন বলে দাবি করা হয়।[৮] কিন্তু 'মাহ্দী বিরোধী' কার্যক্রমের ফলে যারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন, পরবর্তীতে তারা ইসলাম ও *উলামার* বিরুদ্ধে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এমন নির্যাতিতদের মধ্যে শাইখ মুবারক ও তার পরিবারের সদস্যরা উল্লেখযোগ্য। শাইখ মুবারক ও তার দুই পুত্র আবুল ফজল ও ফাইজি সুযোগ বুঝে সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫)কে ইসলাম ও নিষ্ঠাবান *আলিমদের* বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করেন।[৯]

আবদুল্লাহ্ আনসারী (মৃ. ১৫৮২) এবং শেখ আবদুন্নবী (মৃ. ১৫৮২)-এ দুই মহান পণ্ডিত *আলিম* 'মাহ্দী বিরোধী' নিপীড়নমূলক রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে কার্যত দূরদৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং সম্রাট আকবরের পূর্ববর্তী দিল্লীর শাসক-সুলতানদের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে তারা শাসকদেরকে এ কার্যক্রমে উপযুক্ত কৌশলী পরামর্শ দিতেও শোচনীয় অযোগ্যতার পরিচয় দেন। আবদুল্লাহ্ আনসারী হলেন সেই সম্মানিত ইসলামী পণ্ডিত, যাকে শের শাহ্ 'শায়খুল ইসলাম' উপাধি প্রদান করেন [১০], ইসলাম শাহ্ যাকে ঈর্ষণীয় শ্রদ্ধা ও উচ্চাসন নিবেদন করেন এবং সম্রাট আকবর যাকে 'মাখদুম-উল-মুল্ক' উপাধি প্রদান করে বার্ষিক লক্ষ রূপীর জায়গীর দ্বারা সম্মানিত করেন।[১১] আর শাইখ আবদুন্নবী স্থানীয় সর্বোচ্চ ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের পর মক্কা-মদীনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস হিসেবে শাসকবৃন্দ ও জনগণের অপার শ্রদ্ধা অর্জন করেন। শাইখ আবদুন্নবীকে সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে সম্রাট আকবর সাম্রাজ্যের ধর্মীয় বিষয়াদির শীর্ষ নির্বাহী 'সদর-উস-সুদুর' হিসেবে নিযুক্ত করেন ১৫৬৫ সালে।

অর্বাচীনসুলভ প্রক্রিয়ায় সাইয়িদ মুহাম্মদের 'মাহ্দী আন্দোলন' দমন করতে গিয়ে *উলামা নেতৃত্ব* এবং নির্দিষ্টভাবে মাখদুম-উল-মুলক 'কোনোও বন্ধুর বদলে বহু শত্রু সৃষ্টি'[১২] করেছিলেন। এভাবে 'সৃষ্ট শত্রুরাই' (যেমন শাইখ মুবারক, তার দুই পুত্র আবুল ফজল ও

---

৬ নতুন বিধান। ইসলামী বিধানের পরিচয়ে অনুমোদনবিহীন বিষয়াদির প্রচলনকে বিদয়াত বা নব্যতন্ত্র বলা হয়।

৭ পাকিস্তান সীমান্তবর্তী আফগান জনপদ।

৮ Ishtiaq Husain Qureshi, *op.cit.*, p. 40.

৯ Ibid., pp. 35-84.

১০ Nawab Samsam ud Dawlah Shah Nawaz Khan, *Mathirul Umara*, Vol. 3, in English, Calcutta, 1894, p. 252.

১১ Ibid., p. 252.

১২ Ishtiaq Husain Qureshi, *op.cit.*, p. 41.

ফাইজি) প্রতিহিংসা পূরণের জন্য সম্রাট আকবরকে বিপথগামী করে নীতিনিষ্ঠ *উলামা* ও ইসলামের বিরুদ্ধে ন্যাক্কারজনকভাবে ব্যবহার করেছিলো। অন্যদিকে আকবর নিযুক্ত 'সদর-উস্-সুদুর' শাইখ আবদুন্নবী জ্ঞানের বিবেচনায় পণ্ডিত হলেও পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা ও বাহ্যিক আচার-আচরণে গুরুতরভাবে অকুশলী ছিলেন, অপ্রয়োজনীয়ভাবে উদ্ধত এবং রূঢ় ব্যবহার করতেন। তার এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণে এমনকি সম্রাট আকবরের বেলায়ও ব্যত্যয় ঘটতো না। যুবক সম্রাট আকবরকে 'জন্মদিনের চিহ্নযুক্ত পোশাকে' দেখে একদিন শাইখ আবদুন্নবী তাকে তিরস্কার করেছিলেন এবং কর্মচারীদের দিয়ে জামাটি ছিঁড়ে দিয়েছিলেন। যৌবনের প্রতিশোধ স্পৃহাকে সংযত করে আকবর কান্না বিজড়িত হয়ে তার ধার্মিক মাকে বলেছিলেন 'তিনি আমাকে একান্তে উপদেশ দিতে পারতেন' আর মা আকবরকে ধৈর্য ধারণের পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন 'পরকালে এর পুরস্কার পাবে'।[১৩] এহেন মন্দ আচরণের অধিকারী সদর-উস্-সুদুর শাইখ আবদুন্নবী রাসূল(সঃ)কে অবমাননাকারী হিসেবে অভিযুক্ত এক ব্রাহ্মণকে সম্রাট আকবরের 'প্রচ্ছন্ন অনীহা' সত্ত্বেও মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। ইসলামী শরীয়তের হানাফী ফিকাহ্-র আলোকে মুসলিম শাসনাধীন রাষ্ট্রে 'অমুসলিম জিম্মি' ইসলাম অবমাননার দায়ে মৃত্যুদণ্ডের বাইরে 'অন্যবিধ শাস্তি' পাবার যোগ্য। শাইখ আবদুন্নবী অভিযুক্ত ব্রাহ্মণকে আকবরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় গুরুতরভাবে সম্রাট আকবরের বিরাগভাজনে পরিণত হন।[১৪]

মাখদুম-উল-মুলক আবদুল্লাহ আনসারী কর্তৃক হয়রানির শিকার শাইখ মুবারক ও তার দুই পুত্র আবুল ফজল ও ফাইজি নিষ্ঠাবান *আলিমদের* বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য একটি উপযুক্ত প্রেক্ষাপটের প্রতীক্ষা করছিলেন। রসূল (স.) অবমাননার দায়ে ব্রাহ্মণকে সম্রাটের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে সদর-উস্-সুদুর শাইখ আবদুন্নবী কাঙ্খিত সেই অস্ত্রটি 'শাইখ মুবারক পরিবারের' হাতে তুলে দেন। ক্ষুব্ধ সম্রাটের অসন্তোষে ভয়ঙ্কর ইন্ধন যুগিয়ে *আলিমদের* বিরুদ্ধে 'শাইখ মুবারক পরিবার' সম্রাটকে প্রতিশোধের উন্মত্ততায় হিংস্র করে তোলেন। স্বার্থ উদ্ধারের কৌশলী প্রক্রিয়া হিসেবে শাইখ মুবারক সম্রাট আকবরকে উদ্দেশ্য করে একটি 'দলিল' (মাহ্যার)[১৫] তৈরী করেন, যাতে তাকে 'সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ, সর্বোচ্চ বিজ্ঞ ও সর্বোচ্চ জ্ঞানী' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ দলিলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর করেন (সেপ্টেম্বর ১৫৭৯) ও সীল যুক্ত করেন মাখদুম-উল-মুলক আবদুল্লাহ আনসারী, সদর-উস-সুদুর শেখ আবদুন্নবী, কাজী জালাল উদ্দীন মুলতানী ও সদর জাহান এবং স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেন শাইখ মুবারক নিজে। কাজী জালাল উদ্দীন মুলতানী ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রধান বিচারপতি এবং সদর জাহান ছিলেন সাম্রাজ্যের 'মুফ্তি-উল-কুল' বা 'জুরিস কনসাল্ট'। এ দলিলে স্বাক্ষরকারীদের প্রত্যেকেই সাম্রাজ্যের

---

১৩ Ishtiaq Husain Qureshi, *op.cit.*, p. 52.

১৪ Ibid., p. 56.

১৫ মাহ্যার-এর শাব্দিক অর্থ *ত্যাগেরপত্র*। শীর্ষস্থানীয় উলামা নেতৃত্ব তাদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব সম্রাট আকবরের নিকট ত্যাগ করে যে দলিল তৈরী করেন তা-ই ইতিহাসে মাহ্যার নামে খ্যাত।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। শাইখ মুবারক ছাড়া অন্যরা এ দলিলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাক্ষরের পূর্বে এমন দলিলের বিষয়ে ব্যাপক আপত্তিসূচক মতামত ব্যক্ত করলেও কেউ এতে স্বাক্ষর না করার স্পর্ধা দেখাতে পারেননি।

সাম্রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ-*উলামার* পক্ষ থেকে সম্রাট আকবর 'সর্বোচ্চ ন্যায়পরায়ণ, বিজ্ঞ ও জ্ঞানী' বা 'ইমাম-ই-আদিল' হবার স্বীকৃতি বা ফতওয়া লাভের পর তার কাছে 'সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে' মাখদুম-উল-মুল্‌ক বা সদর-উস্‌-সুদুর প্রমুখ ধর্মীয় নেতৃত্বকে বহাল রাখার আবশ্যকতা শেষ হয়ে যায় এবং অবিলম্বে আবদুল্লাহ্‌ আনসারী ও শাইখ আবদুন্নীকে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা হয়। পদচ্যুত হয়ে তারা চাপের মুখে ফতওয়ায় স্বাক্ষর প্রদানের কথা প্রচার ও সেটিকে অবৈধ হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকলে আকবর ১৫৮০ সালের প্রথম দিকে আবদুল্লাহ্‌ আনসারী ও শাইখ আবদুন্নবীকে মক্কায় নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। এ পর্যায়ে আকবরের ধর্ম বিরোধী কার্যক্রমের প্রতিবাদে বাংলা প্রদেশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং কাবুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শাসক, আকবরের এক সৎ ভাই, মির্জা মুহাম্মদ হাকিম রীতিমতো বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লী অভিমুখে ১৫৮১-র জানুয়ারীতে যাত্রা করেন।[১৬] উভয় ক্ষেত্রেই আকবর কার্যকর দমনমূলক অভিযান চালিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। সম্ভবত আকবর-বিরোধী দু'টি বিদ্রোহের অতিরঞ্জিত সংবাদে উৎসাহিত হয়ে আবদুল্লাহ্‌ আনসারী ও শাইখ আবদুন্নবী দু'জনই মক্কা থেকে দেশে ফিরে আসেন [১৭]। আকবরের বিরুদ্ধে তারা প্রকাশ্যে জন-অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকলে সম্রাট আবদুল্লাহ্‌ আনসারীকে বিষপানে হত্যার ব্যবস্থা করিয়ে সুলতানপুরে তার নিজ শহরে চুপিসারে দাফন করান।[১৮] দিল্লীতে সম্রাট আকবরের সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাতে শেখ আবদুন্নবী তাকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন। জবাবে আকবর তার সাবেক শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়কের মুখে এক কঠিন ঘুঁষি মারেন এবং কারারুদ্ধ করার নির্দেশ দেন। কারাগারে কিছু লোক তাকে হত্যা করে তার লাশ কুতুব মিনার স্কোয়ারে কয়েক ঘন্টা ফেলে রাখে।[১৯]

ঐতিহাসিকগণ মখদুম-উল-মুলক আবদুল্লাহ্‌ আনসারী এবং পদচ্যুত সদর-উস-সুদুর শাইখ আবদুন্নবীর বিষয়ে ব্যাখ্যা করেননি।[২০] তাদের মর্যাদা, গুরুত্ব ও মূল্য যদি খুব কমই হবে, তাহলে সব ধরনের প্রতিবাদী কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যাবার পরও তাদেরকে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দিতে আকবর সাহসী হননি কেনো, তা বিবেচনার দাবি রাখে। অন্যদিকে, এ দুই মহান ব্যক্তিত্বের মুখ থেকে আকবরের ধর্মদ্রোহী আচরণ ও কার্যক্রমের প্রতি সম্মতিসূচক বা আকবরের জন্য তুষ্টিবাচক একটি শব্দও ঐতিহাসিকগণ তাদের রেকর্ডে দেখাতে পারেননি। 'মাহযার' বা আলোচিত সেই ঘৃণ্য দলিলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাক্ষর

---

১৬ Abul Fadl, *Akbarnamah*, Vol. 3, in English, Calcutta : 1986, p. 345.

17 Ishtiaq Husain Qureshi, *op.cit.*, p. 66.

১৮ Abdul Qadir Badauni, *Muntakhabut Tawarikh*, Vol. 2, in English, Calcutta : 1884, p. 311.

১৯ Ibid., p. 312.

২০ Ishtiaq Husain Qureshi, *op.cit.*, p. 67.

প্রদান করার পর তারা সর্বোচ্চ অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন এবং তারা অপ্রিয় সত্য প্রকাশের সর্বোচ্চ ধরনটির প্রয়োগ করে জেনে বুঝেই নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। অন্যতম বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ ইবনে মা-যায় রাসূলুল্লাহ(সঃ)-র ঘোষণাটি এমন: 'স্বৈরাচারী শাসকের সামনে সত্য প্রকাশ করা সেরা জিহাদ'। ড. কোরেশীর ভাষায়: 'যখন পরিবেশ দাসসুলভ অধীনতা, চাটুকারিতা এবং নতজানু অনুচরবৃত্তি দ্বারা ভারী হয়ে ওঠে, তখন সত্য প্রকাশের গুণটি আরো প্রখরতর, উজ্জ্বলতর কিরণ দিয়ে থাকে'।[২১]

এ দুই মহান *আলিমকে* দৃশ্যপট থেকে সরিয়ে দেয়ার পর আকবর ক্রমশ সকল নীতিনিষ্ঠ *আলিমকে* বিভিন্ন মাত্রার শাস্তি দিয়েছেন। একশ' বিঘা, পাঁচশ বিঘা, ও তদূর্ধ পরিমাণের অনুদানপ্রাপ্ত *উলামার* অনুদান আকবর বন্ধ করেছেন এবং সুলতান খাজা, আকবরের দ্বীন-ই-ইলাহীর এক সদস্য, কর্তৃক নিযুক্ত বিচারকদের পূর্ববর্তী সকল বিচারককে বরখাস্ত করেছেন। আকবর অসংখ্য *আলিমকে* নির্বাসন দিয়েছেন, হত্যা করেছেন। তার প্রবর্তিত দ্বীন-ই-ইলাহীর সাথে ভিন্নমত পোষণকারী কোনো *আলিমকে* ভারতবর্ষে বা তার সাম্রাজ্যে আকবর থাকতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আর কোনো নীতিনিষ্ঠ *আলিমের* পক্ষেও দ্বীন-ই-ইলাহীর সাথে যুক্ত হবার সুযোগ ছিলো না, যেখানে একজনকে ঘোষণা দিতে হতো: 'আমি অমুকের পুত্র অমুক, সাগ্রহে ও আনন্দের সাথে ইসলামকে- যা আমার পূর্ব পুরুষদের জীবনে দেখেছি, এর সকল পর্যায়ে, নিচু অথবা উঁচু, অস্বীকার করছি ও প্রত্যাখ্যান করছি এবং শাহ্ আকবরের স্বর্গীয় বিশ্বাসে যোগদান করছি এবং আমার সম্পদ, জীবন, সম্মান ও ধর্ম তার জন্য ত্যাগ করতে আমার নিজের ইচ্ছার কথা ঘোষণা করছি'[২২] (থাট্টার[২৩] শাসক জানি বেগ দ্বীন-ই- ইলাহীতে যোগদানের সময় এ ঘোষণা প্রদান করেন)। এর বিপরীতে কেবল কোনো *আলিম* নয়, যে কোনো মুসলিমকেই ঘোষণা করতে হয়: 'নিশ্চয়ই আমার নামাজ, কুরবানী, জীবন ও মরণ বিশ্বসমূহের প্রভু আল্লাহর জন্য'।[২৪]

১৬০৫ সালে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীর (১৫৬৯-১৬২৭) সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়ে মুজাদ্দিদ-ই-আলফি সানিনামে খ্যাত শাইখ আহমদ সরহিন্দী (১৫৬০-১৬২৬) তার সংস্কার কার্যক্রমের (তাজদীদ) শীর্ষে অবস্থান করছিলেন। বহুমাত্রিক বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে সুফীবাদকে উদ্ধার করা, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে-আচরণে খাঁটি ইসলামী নীতিমালা অনুশীলন এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি জীবনে ব্যাপকভাবে অনুশীলিত বিচিত্রসব শরীয়াহ বিরোধী আচরণ ও প্রথার বিলোপ সাধনের সংগ্রামে নিজের চারপাশে তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুগামী ও সমর্থক সংগ্রহে সক্ষম হয়েছিলেন। শাইখ আহমদ সরহিন্দীর বিপুল সংখ্যক সংস্কার কার্যক্রমের একটি বহুল আলোচিত

---

২১ Ishtiaq Husain Qureshi, *op.cit.*, p. 67.

২২ Abdul Qadir Badauni, *op.cit.*, p. 304.

২৩ বর্তমান সিন্ধু (পাকিস্তান) প্রদেশের একটি জেলা।

২৪ আল কুরআন, সুরা-আনয়াম, আয়াত-১৬২।

সংস্কার হলো সম্রাটের সম্মানে *ষাষ্ঠাঙ্গ*[২৫] প্রণত হওয়া বন্ধ করা। দীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত এই শরীয়াহ পরিপন্থী আচরণ ধর্মীয় বিভিন্ন নেতৃত্বের পক্ষ থেকেও অনুমোদন লাভ করেছিলো। কিন্তু এই মহান সংস্কারক সম্রাটের সম্মানে ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণত হওয়াকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে সিজদা করার সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং তাই এ আচরণকে তিনি নিষিদ্ধ হিসেবে ঘোষণা করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরকে জানানো হয়, 'শাইখ আহমদ সরহিন্দী সম্রাটের জন্য 'সম্মানের সিজদাকে' নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং তিনি একজন অহঙ্কারী মানুষ যিনি আপনার বেলায়ও এমন অহঙ্কার প্রদর্শন করবেন'। সম্রাট শাইখ আহমদকে দরবারে আমন্ত্রণ জানান। তিনি দরবারে আসেন এবং যথারীতি সম্রাটের উদ্দেশ্যে সিজদা করা থেকে বিরত থাকেন। ইতোমধ্যে শাইখ আহমদের প্রচুর সংখ্যক অনুগামী-অনুসারীর বিষয়টি সম্রাট জাহাঙ্গীরের মনে একটি সম্ভাব্য রাজনৈতিক হুমকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিলো। সম্মানের সিজদা দানে অস্বীকৃতির কারণে দরবারী *আলিমগণ* তাকে হত্যা করার জন্য সম্রাটকে পরামর্শ দেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর শাইখ আহমদকে জেলবন্দী করার নির্দেশ দেন। এ সময় এ মহান সংস্কারকের সহায়-সম্পত্তিও লুট করা হয়।

এক অথবা দু'বছরের কারাবাসের পর শাইখ আহমদকে মুক্তি দেয়া হয়। রাজপুত্র শাহজাহান অবশ্য এই সংস্কারকের গভীর অনুরাগী ছিলেন। কারামুক্তির পর জাহাঙ্গীরের সাথে এক বৈঠকে শাইখ আহমদ সম্রাটকে ধর্মতত্ত্বের কিছু বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা প্রদান করেন এবং বোঝাতে সক্ষম হন যে, তিনি সম্রাটের সিংহাসনচ্যুতি ও নিজে তা গ্রহণের পরিকল্পনা করছেন না, বরং তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও আচরণসহ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন বিভ্রান্তি ও শরীয়াহ পরিপন্থী আচরণ শুদ্ধ ও সংশোধিত করাই পছন্দ করেন।

শাইখ আহমদ সরহিন্দীর সুব্যবস্থিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সংস্কার কার্যক্রমের ফলে এ সময়ে সম্রাট আকবরের সময়কালের *উলামা* বিরোধী রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের অবসান ঘটে, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় *আলিমগণের* অংশীদারীত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্যক্তি-সমাজ-রাষ্ট্রপর্যায়ে বিদ্যমান বিভ্রান্তিকর সুফিবাদী অনুশীলন ও প্রকাশ্য শরীয়াহ বিরোধী কার্যক্রমের ক্রমশ অবসান ঘটতে থাকে।

শাইখ আহমদের এমন সংস্কার কার্যক্রম ও তার সুদূর প্রসারী প্রভাবের প্রেক্ষাপটেই তাকে 'দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সংস্কারক' (মুজাদ্দিদ-ই-আলফি সানি) অভিধায় সম্মানিত করা হয়।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বেই শাইখ আহমদ ১৬২৬ সালে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তার সংস্কার কার্যক্রমের ধারাটি ভারতীয় উপমহাদেশে দীর্ঘদিন সক্রিয় ছিলো। সম্রাট আকবরের শির্কপূর্ণ নব্যতন্ত্র (দ্বীন-ই-ইলাহী) থেকে অনেকাংশে মুক্ত ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। শাইখ আহমদের সংস্কার কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় জাহাঙ্গীর ক্রমশ: ধর্মীয় শুদ্ধতা অর্জনে সক্ষম হন, সম্রাট শাহজাহান (১৫৯১-১৬৫৮) আরো অগ্রসর

---

২৫ *ষাষ্ঠাঙ্গ* এর শাব্দিক অর্থ ছয় অঙ্গ। দুই পা, দুই হাত, বুক ও কপাল মাটিতে ঠেকিয়ে কাউকে সম্মান দেখাবার রীতিকে ষাষ্ঠাঙ্গ প্রণাম বলে।

হন এবং সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭) বাস্তবে নিখাদ শরীয়তী শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ করেন। এ জন্য তাকে *মুহিউদ্দীন*[২৬] *আলমগীর* অভিধায় সম্মানিত করা হয়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুর্বল উত্তরসুরীগণ সাম্রাজ্যের সংহতি ও কার্যকারিতা রক্ষায় ব্যর্থ হন। মারাঠা ও জাঠ সমরনেতারা মোঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ ক্রমশ দখল করতে থাকে এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদহানি ঘটাতে থাকে। এমনি বাস্তবতায় শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (১৭০৩-১৭৬২) ইসলামী জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে সুসজ্জিত হয়ে মোঘল সাম্রাজ্য ও মুসলিম সমাজকে রক্ষায় এগিয়ে আসেন। তৎকালীন মোঘল সম্রাট আহমদ শাহ্কে সাহায্যের জন্য তিনি আফগানিস্তানের 'সমরনেতা' আহমদ শাহ্ আবদালি ও আওনিয়ার শাসক নাজিব-উদ্-দৌলাকে অনুরোধ করে পত্র পাঠান। ১৭৫৩ সালে নাজিব-উদ্-দৌলা মোঘল সম্রাট আহমদ শাহ্কে সফদর জং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করেন। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে ১৭৬১ সালে আহমদ শাহ্ আবদালি মারাঠাদের বিরুদ্ধে পানিপথের ঐতিহাসিক তৃতীয় ও সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের ফলে উপমহাদেশে সম্ভাব্য মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ নষ্ট হয়। মৃত্যুর পূর্বে এমন একটি মুসলিম বিজয় শাহ্ ওয়ালিউল্লাহকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট ও আশান্বিত করেছিলো।

খালিক আহমদ নিযামী সংকলিত *শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর রাজনৈতিক পত্রাবলী* (বাংলা অনুবাদ) শীর্ষক গ্রন্থে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার বিষয়ে শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ-র গুরুত্বারোপ ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা যায়। পরিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনের অনুপস্থিতির কারণেই মোঘল সাম্রাজ্য ও মুসলিম সমাজের অধঃপতন ঘটে বলে তিনি দাবি করেন।[২৭]

ইতোমধ্যে বাংলার স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৭ সালে পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতামূলক যুদ্ধে পরাজিত হলে উপমহাদেশের পরাধীনতার অধ্যায় শুরু হয়। ১৮৫৭ সালে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী-বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহ নামে যে মহা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তার সংগঠক ছিলেন উপমহাদেশের *আলিম নেতৃত্ব*। এটিই ছিলো স্বাধীনতাকামী উপমহাদেশবাসির সম্মিলিত প্রথম বিদ্রোহ। এর আগে ১৮৩১ সালের নভেম্বরে নারকেলবাড়িয়ার বাঁশের কেল্লার যুদ্ধে মীর নিসার আলী তিতুর বাহিনী পরাজিত হয় এবং ১৮৩১ সালের মে মাসে বালাকোটের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন ও পরাজিত হন *আলিম নেতৃত্ব* সাইয়িদ আহমদ বেরলবী শহীদ (১৭৮৬-১৮৩১) ও তার সহযোদ্ধারা। ১৮৫৭ সালের উপমহাদেশব্যাপী বিদ্রোহ পর্যাপ্ত পরিকল্পিত, সুব্যবস্থিত ও সুসমন্বিত না হওয়ায় ব্যর্থ হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কঠোর ও নির্দয় হাতে বিপ্লবসংশ্লিষ্টদের নির্মূল করে। দিল্লীর মাদ্রাসা-ই-রহীমিয়াসহ বিপ্লবের সূতিকাগার হাজার হাজার মাদ্রাসা ধ্বংস করা হয় এবং লক্ষ লক্ষ *আলিমকে* হয় ফাঁসী দেয়া হয় অথবা আন্দামানসহ বিভিন্ন গহীন দ্বীপে নির্বাসন দেয়া হয়। এভাবে রাজনৈতিকসহ প্রকাশ্য সকল কার্যক্রমে *আলিমদের* অংশগ্রহণ অসম্ভব করে তোলা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে তুরস্কের উসমানীয়া খেলাফত খণ্ডিত করার বৃটিশ উদ্যোগের প্রতিবাদে পুনরায় উপমহাদেশের *আলিম সমাজ* ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত হন এবং 'মুসলিম খেলাফত' রক্ষার দাবিতে 'খেলাফত আন্দোলন' (১৯১৯-১৯২২) গড়ে তোলেন। এ

---

২৬ *মুহিউদ্দীন* এর শাব্দিক অর্থ দীন বা ধর্মের জীবনদাতা।

২৭ Ishtiaq Husain Qureshi, *op.cit.*, p. 114.

আন্দোলন লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। তবে এর মাধ্যমে উপমহাদেশের *আলিমগণ* রাজনীতিতে সক্রিয়, সংগঠিত ও সোচ্চার হয়ে ওঠেন। এ সময় দেওবন্দ মাদ্রাসার (দারুল উলুম দেওবন্দ) শিক্ষক মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানীর (১৮৭৯-১৯৫৭) নেতৃত্বে ১৯১৯ সালে *উলামা*-মঞ্চ হিসেবে জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ গঠিত হয়। এ সংগঠনটির সাথে সংশ্লিষ্ট *আলিমগণ* ক্রমশ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫)-এর রাজনৈতিক ধারার প্রতি ঝুঁকে পড়তে থাকেন। এ ক্ষেত্রে কংগ্রেস নেতা মাওলানা আবুল কালাম আজাদের কুশলী ও সক্ষম আকর্ষণী শক্তি প্রধান ভূমিকা পালন করতে থাকে। তবে রাজনৈতিক কর্মপ্রক্রিয়া ও কৌশলের ভিন্নতার প্রেক্ষাপটে এই *আলিমদের* একটি অংশ মাওলানা আশরাফ আলী থানবী ও মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর নেতৃত্বে ১৯৪৫ সালে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করেন। এই *উলামা* সংগঠনটি কংগ্রেসের তুলনায় মুসলিম লীগ (১৯০৬)কে ভারতের মুসলিমদের যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন[২৮] বলে স্বীকার করে এবং মুসলিম লীগের 'পাকিস্তান' দাবির প্রতি সমর্থন জানায়।[২৯] ১৯৪১ সালে (২৬ আগস্ট) সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদুদীর নেতৃত্বে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' প্রতিষ্ঠিত হয়। আধুনিক রাজনৈতিক কর্মকৌশলসহ প্রতিষ্ঠিত এ দলে ধর্মীয় শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের একটি সমন্বয় ঘটে, জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ বা জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-এ যা অনুপস্থিত থাকে। জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ অবিভক্ত স্বাধীন ভারত এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম মুসলিম আবাসভূমি স্বাধীন পাকিস্তানের জন্য সক্রিয় থাকে। বিপরীতে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ একটি আদর্শবাদী ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করে এবং অবিভক্ত ভারত অথবা মুসলিম আবাসভূমি পাকিস্তান বিষয়ে বাড়তি আগ্রহ প্রকাশ থেকে বিরত থাকে।

১৯৪৭ সালের মধ্য আগস্টে 'কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে' স্বাধীন পাকিস্তান ও ভারতের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

পাকিস্তানে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর নেতৃত্বে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম সংগঠিত হয়। 'জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান' নামে 'বেরলবী আলিমগণ'[৩০] ১৯৪৮ সালে সংগঠিত হলেও তারা রাজনীতিতে পর্যাপ্ত সক্রিয় হতে পারেননি।[৩১] জামায়াতে ইসলামী হিন্দ যথারীতি পাকিস্তান ভূ-খণ্ডে সংগঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান নামে।

---

২৮ Ishtiaq Husain Qureshi, *op.cit.*, pp. 358-359.

২৯ Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan*, Berkeley : University of California Press, 1963, p. 30.

৩০ বালাকোটের যুদ্ধে সাইয়েদ আহমদ শহীদ ও তার সহযোগীদের পরাজয়-বিপর্যয়ের পর তার 'জিহাদ আন্দোলনের' অনুসারীগণ মাওলানা কারামত আলীর (১৮২০-৭৩) নেতৃত্বে বৃটিশদের প্রতি নমনীয়/সহযোগী দৃষ্টিভঙ্গি (Aziz Ahmad, *Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964*, London: Oxford University Press, 1967, p. 21) এবং পীরের অলৌকিক ক্ষমতা, মাযার, তাবিজ ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে মনোযোগী হয়ে পড়েন। খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর তারা রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় হয়ে যান। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের জন্ম ভারতের এলাহাবাদের (ইউপি) রায় বেরেলীতে। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের জন্মস্থানের ভিত্তিতে সাইয়েদ আহমদের এই *আলিম* অনুসারীদের '*বেরলবী আলিম*' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৩১ হামযা আলাভী, "পাকিস্তান ও ইসলাম : জাতিসত্তা, মতাদর্শ ও রাষ্ট্র", অনু : ভালেম চন্দ্র বর্মণ, *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৮।

পাকিস্তানে *আলিম* নেতৃত্বের দলসমূহ দেশটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা করে। কার্যত কিছু নীতি প্রণয়ন ছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের আর কিছুই পাকিস্তানে বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের ২৩ বৎসরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে *আলিম* নেতৃত্বের দলসমূহ (জামায়াত, জমিয়ত, নেজাম প্রভৃতি) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৬.৯৩% ভোট পেয়ে ভোটের সংখ্যাগত দিক থেকে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।[৩২]

---

৩২ Talukder Maniruzzaman, *Radical Politics and Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Book International, 1972, p. 41 & Raunaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, Dhaka: Oxford University Press, 1973, pp. 190-191.

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও আলিমসমাজ

রাজনৈতিক ভাষ্যকারদের মতে, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন দুই অংশের মাঝে *নীতিগত বিভাজন রেখা* সৃষ্টি করে দেয়। *জাতীয় পরিষদের* (ন্যাশনাল এসেম্বলী) ৩০০ সাধারণ আসনের ১৩৮টি পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের ৪টি প্রদেশ (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও *'সীমান্ত'*) ও কেন্দ্রশাসিত উপজাতীয় অঞ্চলসমূহের জন্য এবং ১৬২টি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিলো। নির্বাচনে জাতীয়ভিত্তিক প্রায় সকল দলই অংশ নেয়।[১] ফলাফলে দেখা যায়, 'পশ্চিমাঞ্চলের' ১৩৮টি সাধারণ আসনের মধ্যে জুলফিকার আলী ভূট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি (পি পি পি) ৮২টি আসনে বিজয়ী হয়। কিন্তু এ দলটি পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসনে এমনকি 'নির্বাচনও' করেনি। পূর্ব পাকিস্তানের নির্ধারিত ১৬২টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসনে বিজয়ী হয়। এ দলটির কোনো প্রার্থী পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে কোনো আসনে 'বিজয়ী' হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের এ ফলাফল নির্দেশ করছে, 'পূর্ব পাকিস্তান' প্রদেশে আওয়ামী লীগ প্রশ্নাতীতভাবে জনপ্রিয় এবং সফল। পাকিস্তানের 'পশ্চিমাঞ্চলে' এ দলটির জনপ্রিয়তা নেই। অন্যদিকে পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে পি পি পি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় দল। পূর্ব পাকিস্তানে এ দলের কার্যত অস্তিত্বও নেই। 'পাকিস্তানী জনগণের' এহেন *ভোট আচরণ* দেশটির *সম্ভাব্য বিচ্ছিন্নতার* নির্দেশক ছিলো।

পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হবার আরো কার্যকর কিছু কারণ থাকা সত্ত্বেও দেশটিকে *বিচ্ছিন্ন করার আনুষ্ঠানিক দায়* কোনো বড় দল বহন করতে বাহ্যত প্রস্তুত ছিলো না। তাই পি পি পি-র ভূট্টো *দুই প্রধানমন্ত্রীর* এক বিস্ময়কর দাবি তুলেছেন এবং আওয়ামী লীগের শেখ মুজিব 'বাস্তবায়নে ব্যাপক জটিলতাপূর্ণ ছয় দফা'-র ম্যান্ডেটের কথা বলেছেন, কিন্তু কেউই প্রকাশ্যে পাকিস্তান বিভক্তির দাবি করেননি। অথচ পাকিস্তান কার্যতই বিভক্ত হলো এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলো।

এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ দেশের *আলিমদের* অবস্থান, দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা চিহ্নিত করা প্রায়শই একটি স্পর্শকাতর এবং জটিল প্রসঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এখানে এই স্পর্শকাতর ও জটিল প্রসঙ্গটির একটি সম্ভাব্য আবেগমুক্ত ও নিরাসক্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হবে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকালে বাংলাদেশের *উলামার* দৃষ্টিভঙ্গি ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করার জন্য তাদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত ও দলগত অবস্থান জানা দরকার হবে।

বাংলাদেশের উলামা: ১৯৭০-৭১

বাংলাদশের স্বাধীনতার ঘোষণা (২৬ মার্চ ১৯৭১) ও এর নিকট-পূর্ব সময়ে এ দেশের *আলিমদের* প্রধানত ছয়ভাগে (রেখাচিত্র-১ দ্র.) বিভক্ত করা যেতে পারে:

১. বিভিন্ন 'ইসলামী রাজনৈতিক' দলের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা,

---

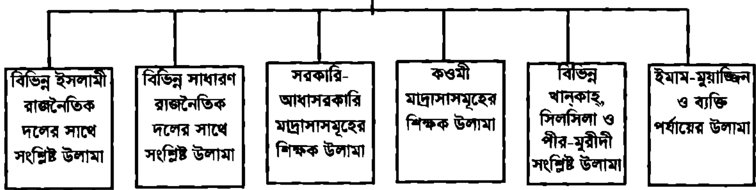
[১] এ নির্বাচনে অংশ না নেয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে ভাসানী নেতৃত্বের 'ন্যাপ' উল্লেখযোগ্য।

২. বিভিন্ন 'সাধারণ রাজনৈতিক' দলের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা,
৩. সরকারি-আধা সরকারি মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক উলামা,
৪. কওমী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক উলামা,
৫. বিভিন্ন খান্‌কাহ্‌, সিলসিলা ও পীর-মুরীদী সংশ্লিষ্ট উলামা ও
৬. ইমাম-মুয়াজ্জিন ও ব্যক্তি পর্যায়ের উলামা।

রেখা চিত্র : ১

১৯৭০-৭১ সালে বাংলাদেশের উলামার শ্রেণী-ভাগ

বালাদেশের উলামা



১. বিভিন্ন 'ইসলামী রাজনৈতিক দলের' সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা

ইসলামী রাজনৈতিক দল বলতে সেসব দলকে বোঝানো হচ্ছে যেসব দল ইসলামী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অবিভক্ত পাকিস্তানে আন্দোলন করছিলো। এ তালিকায় জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি প্রভৃতি দলের নাম করা যায়। 'রাজনীতি সচেতন' *উলামার* বেশিরভাগ এসব দলের সাথে যুক্ত ছিলেন।

২. বিভিন্ন 'সাধারণ রাজনৈতিক' দলের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা

'সাধারণ রাজনৈতিক দল' বলতে এখানে তৎকালীন সকল গণতন্ত্রপন্থী, সমাজতন্ত্রী ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকে বোঝানো হচ্ছে। এমন দলের মধ্যে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগের বিভিন্ন গ্রুপ, ন্যাপের দুই গ্রুপ, কমিউনিস্ট পার্টি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আওয়ামী লীগের সাথে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ হাতে গোণা কয়েকজন *আলিম* যুক্ত ছিলেন। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছাড়া ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টিসহ বাম ঘেঁষা দলসমূহে তেমন কোনো *আলিম* সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

৩. সরকারি-আধা-সরকারি মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক উলামা

রাষ্ট্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত মাদ্রাসাসমূহকে সাধারণত *'আলিয়া মাদ্রাসা'* বলা হয়ে থাকে। সারা দেশে ঢাকা আলিয়া মাদ্রাসাসহ বর্তমানে ৩টি 'পূর্ণ সরকারি' মাদ্রাসা রয়েছে। এর বাইরে অন্যসব 'আলিয়া মাদ্রাসা' কার্যত বেসরকারি মাদ্রাসা। এগুলো দেশের বেসরকারি স্কুল-কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেগুলোর শিক্ষক-কর্মচারীরা মূল বেতনের 'একটি অংশ' রাষ্ট্রীয়/রাজস্ব খাত থেকে পেয়ে থাকেন। সমগ্র দেশে এমন কয়েকশ' মাদ্রাসা তখন ছিলো। এসব মাদ্রাসার শহরাঞ্চলে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষক *উলামা* দেশের চলমান রাজনীতি বিষয়ে কম-বেশি সচেতন ছিলেন। গ্রামাঞ্চলের মাদ্রাসা শিক্ষকগণ দেশের রাজনীতি বিষয়ে প্রায়শই অসচেতন ও নিরাসক্ত ছিলেন।

৪. কওমী মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক উলামা

সরকারি আনুকূল্যপ্রাপ্ত 'আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের' সমসংখ্যক অথবা তার চাইতেও বেশি সংখ্যক মাদ্রাসা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ছিলো, যেগুলো কোনোভাবে রাষ্ট্রীয় রাজস্ব সুবিধা পেতো না অথবা চাইতো না। এসব মাদ্রাসা সাধারণত *'কওমী*[2] *মাদ্রাসা'* হিসেবে বেশি পরিচিত। এসব মাদ্রাসার শিক্ষক *উলামা* তুলনামূলকভাবে বেশি মাত্রায় দেশের রাজনীতি বিষয়ে অসচেতন ও নিরাসক্ত ছিলেন।

৫. বিভিন্ন খান্‌কাহ্, সিলসিলা ও পীর-মুরীদী সংশ্লিষ্ট উলামা

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বেশ কিছু সংখ্যক *খান্‌কাহ্*[3] ছিলো, *চিশ্‌তিয়া, কাদেরিয়া* প্রভৃতি কিছু *'সিলসিলা'*[4] সক্রিয় ছিলো এবং বেশ ক'জন উল্লেখযোগ্য *পীরের*[5] দেশব্যাপী ব্যাপক জালকর্ম (নেটওয়ার্ক) বিস্তৃত ছিলো। এ শ্রেণীতে প্রচুর সংখ্যক *আলিম* দেশে ছিলেন। বিভিন্ন খান্‌কাহ্ সংশ্লিষ্ট *উলামা* রাজনীতির সাথে সাধারণত যুক্ত হতেন না। বিভিন্ন *সিলসিলা*ভুক্ত *উলামা* সাধারণত দেশীয় রাজনীতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় আগ্রহী ছিলেন না।

তৎকালীন উল্লেখযোগ্য *পীর*দের মধ্যে শর্ষিনার *পীর* মাওলানা আবু জাফর সালেহ-র মতো কয়েকজন *পীর* সমকালীন রাজনৈতিক কার্যক্রম বিষয়ে কিছু মাত্রায় উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ *পীর* রাজনৈতিক কার্যক্রমে উৎসাহ প্রকাশ করতেন না।

৬. ইমাম-মুয়াজ্জিন ও ব্যক্তি পর্যায়ের উলামা

সারা দেশে লক্ষাধিক মসজিদ ছিলো। একজন মুয়াজ্জিনকেও *আলিম* হিসেবে গণ্য করলে প্রায় দু'লক্ষ *আলিম* মসজিদসমূহের সাথে যুক্ত ছিলেন। এসব ইমাম-মুয়াজ্জিনের প্রকাশ্যে রাজনীতির সাথে সক্রিয় হবার পর্যাপ্ত সুযোগ ছিলো না। তবে তাদের কেউ কেউ কম-বেশি রাজনীতি সচেতন ছিলেন। ব্যক্তি শ্রেণীর *উলামার* মধ্যে কেউ কেউ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন এবং অন্যরা স্বনিয়োজিত কর্মে যুক্ত ছিলেন।

---

২ শাব্দিক অর্থ জাতীয়।

৩ একজন ইসলাম ধর্মীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষকের নেতৃত্বে পরিচালিত এক ধরনের ধর্মীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

৪ *সিলসিলা* শব্দের অর্থ ধারা বা ধারাবাহিকতা। সাধারণত কোনো খ্যাতিমান প্রাচীন ইসলামী আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ইসলাম অনুশীলন ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতির ধারা বা ধারাবাহিকতাকে একটি *সিলসিলা* বলা হয়।

৫ পীর শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। ইসলামী জ্ঞানে সমৃদ্ধ ব্যক্তি তথা কোনো জ্ঞান-বৃদ্ধ ব্যক্তিকে মুসলিম সমাজে পীর বলা হয়। এমন স্বীকৃত ব্যক্তিদের অনেক অনুসারী থাকেন।

১৯৭০-৭১ সালে সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে বাংলাদেশের উলামার অবস্থান

রেখা চিত্র : ২

বাংলাদেশের উলামা ১৯৭০-৭১

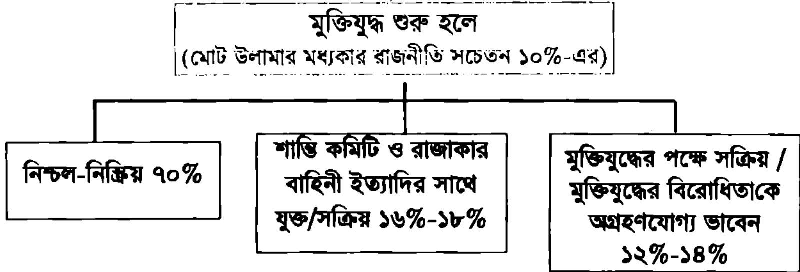
শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে একমত - ১০০%



মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধ (২৬ মার্চ - ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) প্রশ্নে বাংলাদেশের উলামার অবস্থান

রেখা চিত্র : ৩

বালাদেশের উলামা



বাংলাদেশের উলামা : ধারা-প্রবাহ ২০০১

২০০১ সালের বাস্তবতায় বাংলাদেশের *উলামার* বিভিন্ন ধারা ও প্রবাহকে চিহ্নিত করার (রেখাচিত্র-৪ দ্র.) চেষ্টা করা যেতে পারে। তবে *উলামার* এসব ধারা-প্রবাহ বা শ্রেণী-ভাগের যথেষ্ট সীমাবদ্ধতাও খুঁজে পাওয়া যাবে। কোনো শ্রেণী-ভাগকেই শতভাগ *অবিমিশ্র* এবং *যথার্থ* বলার পর্যাপ্ত সুযোগ নেই।

২০০১ সালের বাস্তবতায় বাংলাদেশের *উলামার* ধারা-প্রবাহকে ছয় ভাগে চিহ্নিত করা যায়:

১. 'দেওবন্দী' উলামা বা কওমী মাদ্রাসা ধারার উলামা,
২. আলিয়া মাদ্রাসা ধারার উলামা,
৩. পীর-মুরীদী ধারার উলামা,
৪. খান্‌কাহ-তরীকাহ-সিলসিলা ধারার উলামা,
৫. আহলে হাদীস উলামা ও
৬. তাবলীগ জামায়াত উলামা।

১. 'দেওবন্দী' উলামা বা কওমী মাদ্রাসা ধারার উলামা

বাংলাদেশের *উলামার* সর্ববৃহৎ ধারা এই 'দেওবন্দী' *উলামা*। বৃটিশ-ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ (ইউ পি) ক্ষুদ্র জনপদ দেওবন্দে ১৮৬৬ সালে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসন বিরোধী *উলামার* উত্তরাধিকারীরা একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন, নাম দেন '*দারুল উলুম*'। 'দেওবন্দ' নামের জনপদে অবস্থানের কারণে মাদ্রাসাটি '*দেওবন্দ মাদ্রাসা*' নামেই বেশি খ্যাতি পায়। ইসলাম শিক্ষার প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান থেকে 'ডিগ্রীপ্রাপ্ত' ('*দাউরায়ে হাদীস*' ইত্যাদি) *উলামা* 'সারা ভারতে' ছড়িয়ে পড়েন। এই 'দেওবন্দী' *উলামার* নেতৃত্বেই ১৯১৯ সালে 'জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ' নামের *উলামা* সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' দলের ঘনিষ্ঠ ছিলো, তৎকালীন 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের' নয়। ১৯৪৫ সালে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর অনুগামী 'দেওবন্দী *উলামার*' একটি অংশ মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী ও মাওলানা জাফর আহমদ উসমানীর নেতৃত্বে 'জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম' নামে বিকল্প *উলামা সংগঠন প্রতিষ্ঠা* করেন। দেওবন্দী *উলামার* এ দু'অংশই মূলত বর্তমান বাংলাদেশের দরসে নেজামী বা কওমী মাদ্রাসাসমূহ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছেন।

এ ধারার *উলামার* বৃহৎ অংশ কওমী মাদ্রাসাসমূহের পঠন-পাঠনে নিবেদিত। এ *উলামার* একটি অংশ আধ্যাত্মিক সাধনা এবং অন্য একটি অংশ প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট। বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতায় কওমী মাদ্রাসাভিত্তিক উল্লেখযোগ্য *উলামা* রাজনীতি বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এ ক্ষেত্রে 'হাফেয্জী হুজুর' নামে খ্যাত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ্‌র অবদান স্মরণযোগ্য। বাংলাদেশে বর্তমানে ১২ হাজার মাঝারী ও বড় আকারের এবং ৮০ হাজার ক্ষুদ্রাকারের কওমী মাদ্রাসা রয়েছে বলে দাবি করা হয়।[৬] অন্য একটি সূত্রমতে, 'দাওরায়ে হাদীস' ডিগ্রী প্রদানকারী কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা দেশে এক হাজার এবং ছোট-মাঝারী কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা সাত হাজারের কিছু বেশি। এ মাদ্রাসাগুলো নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রীয় কোনো কর্তৃপক্ষ না থাকায় প্রকৃত পরিসংখ্যান পাওয়া কষ্টসাধ্য। '*বেফাকুল মাদারিস*' নামে বেশ কিছু কওমী মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণকারী একটি কেন্দ্র সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি সারা দেশের সকল কওমী মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণ করে না। এ মাদ্রাসাগুলো মূলত বেসরকারি সাহায্য-সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে থাকে।

২. আলিয়া মাদ্রাসা ধারার উলামা

কলকাতায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় একটি মাদ্রাসা (১৭৮০) প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আলিয়া মাদ্রাসা ধারার সূচনা হয়। বাংলাদেশে এখন তিনটি পূর্ণ সরকারি (ঢাকা, সিলেট ও বগুড়া) আলিয়া মাদ্রাসা রয়েছে। অবশিষ্ট আলিয়া মাদ্রাসাসমূহ সরকারি সাহায্যপুষ্ট হয়ে বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। ইবতেদায়ী (৩৭১৯), দাখিল (৭০৯৬), আলিম (৯৮৩), ফাজিল (৯৫৫) ও কামিল (১১৫) স্তরের মাদ্রাসার মোট সংখ্যা

---

[৬] মুফতী ফজলুল হক আমিনীর ভাষণ, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৩০ জুলাই ২০০৩।

১২৮৫৯।[৭] বাংলাদেশে এ ধারাতেও বিপুল সংখ্যক *উলামার* অবস্থান। আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের নিয়ন্ত্রণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে *বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড* নামে একটি কর্তৃপক্ষ রয়েছে।

৩. পীর-মুরীদী ধারার উলামা

বাংলাদেশে পীর-মুরীদী ধারায়ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক *উলামাকে* পাওয়া যাবে। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ-র উত্তরসুরি সাইয়েদ আহমদ বেরলবীর *জিহাদ আন্দোলন* বালাকোটে বাহ্যত ব্যর্থ হবার পর তার অনুসারীদের বেশীরভাগ ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য পীর-মুরীদীর পথ বেছে নেন। মাওলানা কারামত আলী এ ধারার উল্লেখযোগ্য পীর। বাংলাদেশে এ ধারার (ফুরফুরা, জৈনপুর প্রভৃতি) বেশ ক'জন পীর ও তাদের খলিফা বা প্রতিনিধি রয়েছেন। শর্ষিনা, চরমোনাই, আটরশি, এনায়েতপুর, ফুলতলি প্রভৃতি স্থানকেন্দ্রিক প্রচুর সংখ্যক *আলিম* পীর প্রায় সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী পীর-মুরীদী ধারায় ইসলাম প্রচার-প্রসারে নিবেদিত রয়েছেন।

৪. তরীকাহ্-খান্কাহ্-সিলসিলা ধারার উলামা

ইসলাম প্রচার-প্রসারে বাংলাদেশে চার তরীকার (ক. মুজাদ্দেদিয়া, খ. কাদেরিয়া গ. চিশ্তিয়া ও ঘ. নখ্শ্বন্দিয়া) অনুসারী উল্লেখযোগ্য সংখ্যক *উলামা* রয়েছেন। বেশ কিছু খান্কাহ্-সিলসিলা কেন্দ্রিক কার্যক্রমেও সংশ্লিষ্ট রয়েছেন প্রচুর *আলিম*।

৫. আহলে হাদীস উলামা

শাহ্ উয়ালিউল্লাহ-র অনুসারীদের ধারাতেই বাংলাদেশে বিস্তৃত হয়েছে আহলে হাদীস *উলামার* একটি উল্লেখযোগ্য ধারা। দিনাজপুরের *আলিম*-রাজনীতিক 'বাকী-কাফী' ভ্রাতৃদ্বয় বাংলাদেশ অঞ্চলে আহলে হাদীস ধারার জনগোষ্ঠী ও *উলামাকে* সংগঠিত করেছেন। প্রফেসর ডক্টর আল্লামা আবদুল বারীর নেতৃত্বে আহলে হাদীস জনগোষ্ঠী ও *উলামা* সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায় ঐক্যবদ্ধ থেকেছেন দীর্ঘদিন। পরে ১৯৮৯ ও ২০০০ সালে এ ধারায় অবশ্য দু'টি বিভাজন সৃষ্টি হয়।

৬. তাবলীগ জামায়াত উলামা

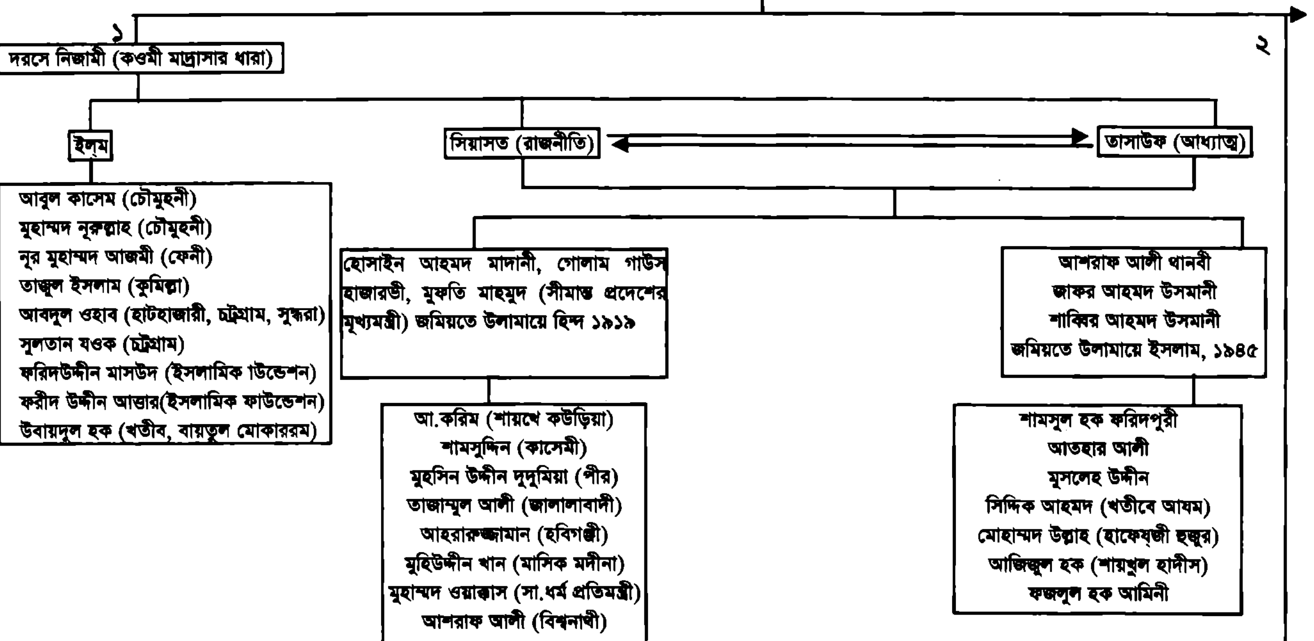
তাবলীগ জামায়াতের কার্যক্রমের (ইসলাম প্রচার ও প্রশিক্ষণ) সাথেও বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক *উলামা* সংশ্লিষ্ট রয়েছেন।

বাংলাদেশের *উলামাকে* খুঁজে পাবার জন্য উল্লিখিত ছয়টি প্রধান ধারার বাইরে আরো কিছু ক্ষুদ্র ধারা চিহ্নিত করা সম্ভব। আবার একজন ব্যক্তি *আলিমকে* একই সময়ে একাধিক ধারায় সক্রিয় দেখা যেতে পারে। যেমন: কওমী বা আলিয়া মাদ্রাসার একজন *আলিম* শিক্ষককে পীর-মুরীদী ধারায় দেখা যেতে পারে। একজন পীর একই সাথে একাধিক বা সবগুলো তরীকাহ্-র অনুসারী হতে পারেন। বাংলাদেশে ব্যক্তি *আলিমের* মোট সংখ্যা কখনো হিসেব করা হয়নি। এ সংখ্যাটি ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে।

---

৭ বেনবেইস, ঢাকা, ২০০২।

রেখাচিত্র ৪: বাংলাদেশের উলামার ধারা-প্রবাহ ২০০১



২

দরসে আলিয়া (আলিয়া মাদ্রাসার ধারা)
আ. জব্বার - বায়তুশ শরফ, চট্টগ্রাম
আ. রহীম - রাজনীতিক
মতিউর রহমান নিজামী - রাজনীতিক
আমীমুল ইহসান, ঢাকা আলীয়া
ড. মুস্তাফিজুর রহমান - ঢা.বি.
ড. হাবিবুর রহমান চৌধুরী, ঢা. বি.
এম.এ. মান্নান - রাজনীতিক, শিক্ষক নেতা

৩

খানকাহ-তরীকা
১. মুজাদ্দেদীয়া - (মুজাদ্দিদে আলফেসানী, সৈয়দ আহমদ সরহিন্দী)
২. চিশতিয়া - (মাইনুদ্দীন চিশতী)
৩. নখশবন্দীয়া- (বাহাউদ্দীন নখশবন্দীয়া)
৪. কাদেরিয়া - (বড়পীর, আ. কাদের জিলানি)

৪

পীর
১. ফুরফুরা (২৪ পরগনা, প.বঙ্গ)
২. জৈনপুরী (কুচবিহাচর, প.বঙ্গ)
৩. শর্ষীনা
৪. চরমোনাই
৫. বিশ্বজাকের মঞ্জিল, আটরশি
৬. এনায়েতপুরী
৭. মাইজভাণ্ডারী
৮. আব্দুল লতিফ চৌধুরী, ফুলতলী

৫

আহলে হাদীস উলামা

প্রফেসর ড. এম এ বারী
জমঈয়তে আহলে হাদীস

হাবিবুল্লাহ রহমানী
মুনতাসির আহমদ রহমানী
সহীফুল ইসলাম (বংশাল)
আহলে হাদীস তাবলীগে ইসলাম - ১৯৮৩

প্রফেসর ড. আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আহলে হাদীস আন্দোলন -১৯৯৭

আবদুস সামাদ (কুমিল্লা)
অধ্যাপক রেজাউল করিম (বগুড়া)
আহলে হাদীস আন্দোলন-২০০১

৬

তাবলীগ জামায়াত উলামা

বাংলাদেশের উলামা : মুক্তিযুদ্ধকালীন ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে *উলামার* ভূমিকা বোঝার জন্য ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত তাদের ভূমিকা জেনে নেয়া দরকার। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন *উলামার* সর্বাধিক সংগঠিত রাজনৈতিক দল পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম ১৭ মার্চ ১৯৭১ এক বিবৃতিতে বলেন:

> 'আমি পরিস্থিতি অনুধাবন করা এবং যে দলের প্রতি জনগণ পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছে, সে দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করার জন্যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। কোন শাসনতান্ত্রিক সমস্যাই ক্ষমতা হস্তান্তরকে বিলম্বিত করতে পারবে না। জনগণের সরকারের চাইতে কেউই জাতির উত্তম সেবা করতে পারে না। ... জনাব ভূট্টোর অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রয়াসের প্রতি প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি'।[৮]

২৫ মার্চ-পূর্ব জামায়াতের ভূমিকা বিষয়ে একজন ভাষ্যকারের মূল্যায়ন:

> 'জামায়াতে ইসলামী সর্বাবস্থায় আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছে। অসহযোগ আন্দোলনের গোটা সময়ে জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে তাদের যে নীতি পরিস্কার হয়ে যায় তা হল: (ক) তারা পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও সংহতির পক্ষে, (খ) জনগণের রায় আওয়ামী লীগের পক্ষে গেছে, সুতরাং সরকার গঠন করা তার অধিকার, (গ) বিনা শর্তে তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া উচিত। ... আওয়ামী লীগের ভারত-নীতি, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক আদর্শ এবং একনায়কসুলভ তার স্বার্থপরতা সম্পর্কে প্রবল বিরোধী মনোভাব পোষণ করা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক বিধির কারণেই জামায়াত আওয়ামী লীগের হাতে বিনা শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর সমর্থন করেছে'।[৯]

সচেতন *উলামা*সমৃদ্ধ এবং ইসলামী আদর্শভিত্তিক শক্তিমান দলীয় জালকর্মের অধিকারী জামায়াতে ইসলামী আওয়ামী লীগ ও এর নেতা শেখ মুজিবের হাতে নিঃশর্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে প্রকাশ্য অবস্থান নিয়েছিলো। এ অঞ্চলের *আলিম* নেতৃত্বের অন্য দল-গোষ্ঠীসমূহও এ বিষয়ে এ অবস্থানের পক্ষে ছিলো। অন্তত এ বিষয়ে তাদের প্রকাশ্য বিরোধিতার কথা প্রমাণিত হয়নি। একে *'মৌনতা সম্মতির লক্ষণ'* নীতির আওতায় ফেলা চলে। এর বাইরের 'অরাজনৈতিক *উলামা*'-র বক্তব্য 'সাধারণ সময়কালের' মতোই প্রকাশ্যে জানা যায়নি।

কিন্তু যখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, বাংলাদেশের *উলামার* ভূমিকা (রেখাচিত্র-২ ও ৩ দ্র.) কম-বেশী 'প্রকাশ্য' হলো। এ 'প্রকাশ্য' ভূমিকার কিছুটা সক্রিয় এবং কিছুটা নিষ্ক্রিয়।

---

৮ *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা, ১৮মার্চ ১৯৭১।

৯ আবুল আসাদ, *কালো পঁচিশের আগে ও পরে*, ঢাকা: ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯০, পৃ. ২০৮।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পর ক্রমশ সকল 'শ্রেণী-ভাগের' *উলামা* 'অখণ্ড পাকিস্তানের' পক্ষ সমর্থন করতে থাকেন। সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগভুক্ত *উলামা* প্রধানত নিস্ক্রিয় প্রক্রিয়ায় 'অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষ' সমর্থন করতে থাকেন। অবশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সংখ্যার *উলামা* 'পাকিস্তান রক্ষার' কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টিসহ বিভিন্ন ইসলামী ও সাধারণ রাজনৈতিক দলভুক্ত 'রাজনীতি সচেতন *উলামার*' একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পাকিস্তান রক্ষার কার্যক্রমে বিভিন্ন মাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

অখণ্ড পাকিস্তান টিকিয়ে রাখা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তি, শক্তি, গোষ্ঠী ও সংগঠনসমূহের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী ও শাসকদের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সাহায্য-সমর্থন বিষয়ে এ পর্যায়ে প্রথমে জামায়াত ও এর কয়েকজন নেতা এবং জামায়াতের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত দৈনিক সংগ্রামের বক্তব্য ও কার্যক্রম উপস্থাপন করা হবে।

পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম এক বিবৃতিতে বলেন,

> "পূর্ব পাকিস্তানীরা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে ছিনিমিনি খেলতে দেবে না। ... পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি ভারতের তথাকথিত সহানুভূতির মধ্যে ব্রাহ্মণ্য সাম্রাজ্যবাদের দূরভিসন্ধির গন্ধ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। ... পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের শত্রুর কাছ থেকে সহানুভূতি কামনা করে না। জনগণ তাদের অধিকার চায় এবং কিভাবে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে সেটা হল সম্পূর্ণরূপে তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার"।[১০]

রাজাকার-আলবদর প্রভৃতি বাহিনীতে *উলামা* ও মাদ্রাসা সংশ্লিষ্টদের অংশগ্রহণ, মুক্তিযোদ্ধা ও বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রতি মনোভাব এবং পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীকে সহায়তা দানে জামায়াতের অবস্থান নির্দেশক অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তৃতার কয়েকটি অংশ এখানে উল্লেখ করা যায়।

> **এক.** 'এই দিন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার ইসলামিক একাডেমী হলের সভায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ বাঙ্গালীদের দ্বারা শাসিত হবে এই মতবাদ শেখ মুজিব বা শ্রী তাজুদ্দিনের। এ জন্যেই তথাকথিত বাঙ্গালী বীরেরা পশ্চিম বঙ্গে গিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করেছে। কিন্তু মুসলমান আল্লাহর হুকুম পালন করার সুযোগ লাভকেই সত্যিকারের আজাদী মনে করে। এ ভিত্তিতে শাসক নিজের দেশের হোক বা বিদেশী হোক তা মোটেও লক্ষ্যনীয় নয়'।[১১]
>
> '১৭ সেপ্টেম্বর গোলাম আজম জামাতের শ্রম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শফিকুল্লাহ্ ও তেজগাঁও থানা শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিসার মাহবুবুর রহমান গুরহা এবং রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার ইন-চীফ মোহাম্মদ ইউনুসসহ ঢাকার মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেইনিং কলেজে আলবদর হেড কোয়ার্টার এবং রাজাকার বাহিনীর

---

১০ *দৈনিক সংগ্রাম*, ঢাকা ৮ এপ্রিল ১৯৭১।

১১ *তদেব*, ১৫ আগস্ট ১৯৭১।

প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণরত রাজাকার এবং আলবদরদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনরা আলেম ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, এসব লোককে খতম করলেই পাকিস্তানকে ধ্বংস করা যাবে। আলেম ও দীনদারদের ওপর এই হামলা আল্লাহ্রই রহমত, কারণ এই হামলা না হলে তারা আত্মরক্ষা ও পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য রাজাকার, আলবদর, আলশামস, মুজাহিদ ও পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি হবার প্রয়োজন বোধ করত না।...
প্রশিক্ষণরত রাজাকারদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, রাজাকার বাহিনী কোন দলের নয়, তারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলের সম্পদ। কোন দলের লোক কম বা কোন দলের বেশি লোক রাজাকার বাহিনীতে থাকতে পারে, কিন্তু তোমরা দল মতের উর্দ্ধে উঠে পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলকে আপন মনে করবে। ইসলামী দলসমূহের মধ্যে যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে তা'ও আল্লাহ্রই রহমত। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামাতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেনি, বরং তারা ঢালাও ভাবে আলেম ও ইসলামী দলের লোকদের খতম করেছে। সুতরাং আমরা নিজেরা চেষ্টা করে এক না হলেও দুশমনরা সমানভাবে আঘাত হেনে আমাদের এক হতে বাধ্য করেছে। এর পরও যদি কেউ বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টির পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ না করে তবে আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের 'মেরামত' করবেন, তোমরা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না'।[১২]

দুই. '২৩ আগস্ট লাহোরে জামাতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় গোলাম আজম বলেন, 'জামায়াতে ইসলামীকে যারা অদেশপ্রেমিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করেন, তারা হয় এ সত্য জানেন না বা স্বীকার করার মত সৎ সাহস নেই যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিষদাঁত ও নখ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান জামাতের বহু সংখ্যক কর্মী দুষ্কৃতকারীদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন'।[১৩]
'জামাতের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে প্রশ্নকর্তাকে তিনি বলেন, 'বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামাতকে মনে করত পহেলা নম্বরের দুশমন। তারা তালিকা তৈরী করেছে এবং জামাতের লোকদের বেছে বেছে হত্যা করেছে। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। এতদসত্ত্বেও জামাত কর্মীরা রাজাকারে দলে দলে ভর্তি হয়ে দেশের প্রতিরক্ষায় বাধ্য, কারণ তারা জানে 'বাংলাদেশে' ইসলাম ও মুসলমানের কোন জায়গা হতে পারে না। জামাত কর্মীরা শহীদ হতে পারে, কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে না। আপনি জেনে বিস্মিত হবেন, শান্তি কমিটিসমূহে যোগদানকারী অন্যান্য দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় লোকদেরই শুধু হত্যার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু জামাতের সাধারণ কর্মীদেরও ক্ষমা করা হয় না।...
আমি চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে সফর করেছি। আল্লাহর অপার মহিমায় জামাত কর্মীদের মনোবল অটুট রয়েছে। দুষ্কৃতিকারীদের তৎপরতাও অব্যাহত রয়েছে'।[১৪]

---

১২ *তদেব,* ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

১৩ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়* (২য় সংস্করণ), ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭, পৃ. ৫২।

১৪ *দৈনিক সংগ্রাম,* ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

তিন. '১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কার্জন হলে ইসলামী ছাত্র সংঘের স্মৃতি প্রদর্শনীতে ইসলামী ছাত্রসংঘকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ের মত আজকে আবার পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য নতুন বাহিনীর প্রয়োজন। ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী বাহিনীই কায়েদে আজমের মহাদান পাকিস্তানকে চিরস্থায়ী করতে সক্ষম হবে'।[১৫]

'তিনি আরও বলেন, 'জনগণ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা দানে ইচ্ছুক, কিন্তু জীবন নাশের জন্য দুষ্কৃতকারীরা হুমকী দেওয়ায় তারা এ ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য দান করতে পারছে না। প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে পারলেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা সম্ভব হত।'

ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাতের পর ২০ জুন লাহোরে জামাতে ইসলামীর অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'দুষ্কৃতকারীরা এখনো পূর্ব পাকিস্তানে তৎপর রয়েছে এবং তাদের মোকাবিলা করার জন্য জনগণকে অস্ত্র দেওয়া উচিত।'

সাংবাদিক সম্মেলনের আগে জামাত কর্মীদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেশকে খণ্ড বিখণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না'।[১৬]

'১৪ আগস্ট 'আজাদী দিবস' উপলক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে গোলাম আজম বলেন, 'আমাদের আদর্শের প্রতি অপরাধী মূলক চরম বিশ্বাসঘাতকতাই আজকের জাতীয় সংকটাবস্থার আসল কারণ। পাকিস্তানকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে এই বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব এবং যতদিন আমরা বাঁচব, পঙ্গু জাতি হিসেবে বেঁচে থাকব।'

ওই দিন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি আয়োজিত কার্জন হলের সভায় গোলাম আজমের বক্তব্য ছিল, 'আল্লাহ না করুন, যদি পাকিস্তান না থাকে, তা হলে বাঙ্গালী মুসলমানদের অপমানের মৃত্যু বরণ করতে হবে।' এই সভায় তিনি, 'পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায় মহল্লায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের শান্তি কমিটির সাথে সহায়তা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান' জানান। সবশেষে তিনি, 'শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ ক্রমেই সরকারের দেশের সংহতির খাতিরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত' বলে বক্তৃতা শেষ করেন'।[১৭]

এখানে দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক গোলাম আযম মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সমাবেশে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে বক্তৃতা করছেন এবং 'বিদেশী শাসকের' বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।

তিনি ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে স্থাপিত আলবদর হেডকোয়ার্টার ও রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবিরে দেয়া ভাষণে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বাহিনীসমূহে *উলামার* অংশগ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এবং বলেছেন, শুধু জামায়াত নয় - নেজামে ইসলাম পার্টিসহ সকল ইসলামী দলের নেতা-কর্মীসহ *উলামা* পাক-বাহিনীর পক্ষে সক্রিয়

---

১৫ *তদেব*, ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

১৬ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

১৭ *তদেব*, পৃ. ৫১-৫২।

হয়েছেন। কারণ, অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষায়, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা 'ঢালাওভাবে আলেম ও ইসলামী দলের লোকদের খতম করছে।' অধ্যাপক আযম এক পর্যায়ে দাবি করেছেন 'মাদ্রাসা শিক্ষিতদের একশ' ভাগ পাকিস্তানী'।[১৮]

অধ্যাপক আযম ঢাকা, করাচী, লাহোর, ইসলামাবাদসহ সমগ্র পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে সংবর্ধনা-ভাষণ-বক্তৃতায় দাবি করেছেন, জামায়াতের নেতা-কর্মীরা পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি কমিটি-বাহিনীতে ব্যাপকভাবে সক্রিয় হয়েছে এবং তাতে জামায়াতের 'বহুসংখ্যক কর্মী দুস্কৃতকারীদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।'

২ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখের এক বক্তৃতায় অধ্যাপক আযম দাবি করেছিলেন:

> 'খোদা নাখাস্তা, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে আমরা যদি ব্যর্থ হই, তবে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের আদর্শকেও রক্ষা করতে পারবো না'।[১৯]

এ সময়ে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার 'যুদ্ধকে' জামায়াত (এবং সম্ভবত অন্য দল-গোষ্ঠী-বাহিনীগুলোও-গবেষক) 'ইসলামের' তথা 'ইসলাম রক্ষার' যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। 'আলবদরের এক সমাবেশে জনৈক জামাত নেতা বলেন, আপনারা পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার জন্যই কেবল যুদ্ধ করছেন না, এ যুদ্ধ ইসলামের। নমরুদদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের আমীরের (গোলাম আজমের) নির্দেশ পালন করুন'।[২০]

'সামরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া দেশকে রক্ষা করার বিকল্প ছিল না' বলে অধ্যাপক গোলাম আযম দাবি করেন।[২১] এর আগেও তিনি বলেছেন: 'দেশপ্রেমিক জনগণ যদি ১লা মার্চ থেকে দুস্কৃতকারীদের মুকাবিলায় এগিয়ে আসত তবে দেশে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। আল্লাহ তাঁর প্রিয়ভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ঈমানদার মুসলমানদের ওপর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমানরা যখন ব্যর্থ হল তখন আল্লাহ্ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে দেশকে রক্ষা করেছেন'।[২২]

'পাকিস্তান যদি না থাকে জামায়াত কর্মীরা পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সার্থকতা মনে করে না' শিরোনামে অধ্যাপক গোলাম আযমের বক্তব্য প্রকাশ করে *দৈনিক সংগ্রাম* ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে।

তিনি ১৮ আগস্ট ১৯৭১ তারিখে *দৈনিক সংগ্রামে* 'ইতিহাসের দৃষ্টিতে পাকিস্তান' শীর্ষক এক নিবন্ধে লিখেন: 'দুনিয়ার প্রত্যেক রাষ্ট্রের নামই স্থান, ভাষা, জাতি বা ঐতিহাসিক কোন নাম থেকে নেয়া হয়। কিন্তু পাকিস্তানের নাম এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম। এ নাম যা বিশেষ একটি উদ্দেশ্যের প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দান করে। এ নামের অর্থ হলো পবিত্র স্থান।'

---

১৮ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৩ আগস্ট ১৯৭১।

১৯ *তদেব*।

২০ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৭।

২১ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২২ জুন ১৯৭১।

২২ *তদেব*, ৬ মে ১৯৭১।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক অধ্যাপক গোলাম আযম এ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন এবং কেউ কেউ এটিকে ইচ্ছাকৃত মিথ্যাচারও বলতে পারেন। লন্ডনে আইনশাস্ত্রের শিক্ষার্থী চৌধুরী রহমত আলী ১৯৩৩ সালে তৎকালীন বৃটিশ-ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় মুসলিম অধ্যুষিত কয়েকটি এলাকার নামের 'আদ্যক্ষর ও শেষাক্ষরের মিলিতরূপ' হিসেবে একটি মুসলিম রাষ্ট্র 'পাকিস্তান' প্রস্তাবের কথা ব্যারিস্টার মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নিকট প্রকাশ করেছিলেন। পাঞ্জাবের *পি*, 'আফগানিস্তানের' (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ 'আফগানিস্তানের' অংশ হিসেবে) *এ*, কাশ্মীরের *কে*, ইন্ডাস বা সিন্ধুর *আই* এবং বেলুচিস্তানের শেষ 'চার বর্ণ' *এসটিএএন* মিলিয়ে পাকিস্তান (PAKISTAN) এর কল্পনা করেছিলেন রহমত আলী।

জামায়াতের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত *দৈনিক সংগ্রামের* ১১ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখে 'গৌরবের মৃত্যু' শীর্ষক এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় 'রেজাকাররা নিঃস্বার্থভাবেই দেশসেবার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।'

৮ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখের *দৈনিক সংগ্রামের* 'হিন্দু ইহুদী পরিকল্পিত বাংলাদেশ' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে 'জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষায় সেনা বাহিনীর পরেই রেজাকারের স্থান' দাবি করে বলা হয়: 'রেজাকার বাহিনী এবং এর শাখাদ্বয় আল বদর এবং আল শাম্‌স-এর উপরই এ দেশের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে।'

২৫ মার্চের (১৯৭১) গণহত্যা সমর্থন করে *দৈনিক সংগ্রামের* 'পাকিস্তানের আইন শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও রিলিফ পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় সেনাবাহিনী' শিরোনামে সম্পাদকীয়তে উল্লেখ করা হয়:

> '২৬শে মার্চ মধ্যরাতের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সেনাবাহিনী ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। বিদ্রোহীরা শহরের উল্লেখযোগ্য সকল রাস্তায় বড় বড় গাছের শাখা, পুরনো গাড়ী, রোড রোলার দিয়ে ব্যারিকেড তৈরী করে। এমনকি সেনাবাহিনীর চলাফেরা রোধ করার জন্য ইট দিয়ে দেয়ালও গেঁথে তোলা হয়। সেনাবাহিনী চরমপন্থীদের ঘাঁটি বলে পরিচিত নির্দিষ্ট ও বিশেষ বিশেষ জায়গা, বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম ইপিআর ও পুলিশ বাহিনীর দিকে অগ্রসর হন। চরমপন্থী ছাত্রদের সদর দফতর জগন্নাথ হল ও ইকবাল হলে সেনাবাহিনী মর্টার ও মেশিনগানের গুলির সম্মুখীন হন। ইপিআর হেড কোয়ার্টার ও কয়েকটি পুলিশ ষ্টেশনে তীব্র প্রতিরোধ সৃষ্টি করা হয় কিন্তু দ্রুত কর্মতৎপরতা দিনের সূর্যোদয়ের আগেই দুস্কৃতিকারীদের সকল ঘাঁটি নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং পরদিন সকালেই ঢাকা শহর শান্ত আকার ধারণ করে'।[২৩]

দৈনিক সংগ্রাম ১২ নভেম্বর ১৯৭১-এ লিখে:

> 'বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর থেকে যারা এ দুষ্কর্মকে সহায়তা করছে তাদেরকে যদি খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় তবে সেটাই সঠিক পদক্ষেপ হবে বলে আমরা মনে করি। আর এর দ্বারাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে দুস্কৃতিকারীদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা থেকে মুক্ত করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস থেকেও সকল ছদ্মবেশী দুষ্কৃতিকারীদের উৎখাত করতে হবে। আমরা বহুবার একথা বলেছি যে, আমাদের অভ্যন্তর থেকে ছদ্মবেশী দুষ্কৃতিকারীদের উচ্ছেদ করার মাধ্যমেই শুধু আমরা হিন্দুস্তানী চরদের সকল চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিতে পারি। সন্দেহ নেই এ

---

[২৩] *তদেব*, ৬ জুন ১৯৭১।

> প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে আমরা যতই বিলম্ব করব আমাদের ক্ষতির পরিমাণ ও নিরাপত্তাহীনতার পরিধি ততই বাড়বে'।

দৈনিক সংগ্রামের এ সম্পাদকীয় বক্তব্যকে পরবর্তী ডিসেম্বরের ৪ তারিখ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত সংঘটিত ব্যাপক মাত্রার বুদ্ধিজীবী 'হত্যার পরামর্শ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[২৪]

নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মৌলবী ফরিদ আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন,

> 'পাকিস্তানকে খণ্ডিত করা এবং মুসলমানদের হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ফ্যাসিবাদীদের ক্রীতদাসে পরিণত করার ভারতীয় চক্রান্ত বর্তমানে নিরপেক্ষ বিশ্ববাসীর কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। ... একমাত্র ইসলামের নামেই এ দেশের সৃষ্টি হয়েছিল'।[২৫]

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক *আলিম* এ সময় এক যৌথ বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিদাতা *আলিম*গণ হলেন: মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফেয্জী হুজুর, মাওলানা মুফতী দ্বীন মোহাম্মদ খান (সেক্রেটারী, জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, ঢাকা), মাওলানা সিদ্দীক আহমদ (সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান), মাওলানা মোহাম্মদ ইউনুস (প্রিন্সিপাল, কাসেমুল উলুম, পটিয়া, চট্টগ্রাম), মাওলানা মোস্তফা আল মাদানী (সহ-সভাপতি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান), মাওলানা আজিজুল হক (মোহাদ্দেস, লালবাগ জামিয়া কোরআনিয়া আরাবিয়া, ঢাকা), মাওলানা নূর আহমদ (সেক্রেটারী, দাওয়াতুল হক)। এ বিবৃতিতে তারা বলেন:

> 'লক্ষ প্রাণ, অমানুষিক কষ্ট ও বিরাট আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবং মুসলমানদের অক্লান্ত ও অতুলনীয় প্রচেষ্টার ফলে পাকিস্তান একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক স্বত্বা হিসাবে মাথা উঁচু করতে পেরেছে। কিন্তু মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলো তাদের ষড়যন্ত্র ত্যাগ করেনি। ... গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী অভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানকে ধ্বংস করার একটি ভারতীয় চক্রান্ত। ... যাতে ভারতীয় হামলা মোকাবিলা করা যায়, সেজন্যে সরকারের উচিত তার অনুগত নাগরিকদের মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা'।[২৬]

পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি অনুদানপুষ্ট মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়তুল মোদাররেসীন-এর সভাপতি মাওলানা এম. এ. মান্নান এক বিবৃতিতে বলেন, 'সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ আজ জেহাদের জোশে আগাইয়া আসিয়াছে'।[২৭]

এসব বিবৃতির মাধ্যমে হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী এবং মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগী ভারত বিষয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সক্রিয় ও সচেতন বেশিরভাগ *উলামার* দৃষ্টিভঙ্গি ও তাদের প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছে। এখানে লক্ষণীয়, দল, মত ও অবস্থান নির্বিশেষে

---

২৪ আলী আকবর টাবী, *মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা*, ঢাকা: হালিমুল্লাহ খন্দর, ১৯৯২, পৃ. ১১৫।

২৫ *দৈনিক পাকিস্তান*, ঢাকা, ১৬ আগস্ট ১৯৭১।

২৬ *তদেব*, ৪ জুন ১৯৭১।

২৭ আবুল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭।

এ অঞ্চলের প্রায় সকল *উলামা* মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তান সরকারের পক্ষ সমর্থন করেছেন, যা প্রকারান্তরে হানাদার পাকিস্তানী সামরিক জান্তার নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের সমর্থন হিসেবে গণ্য হবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। এখানে এটাও দেখা যাচ্ছে, বিবৃতিদাতারা সকলেই মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা ও সমর্থনদানকারী ভারতীয় পক্ষকে সমানভাবে গভীর সন্দেহের চোখে দেখছেন এবং ভারতীয় এ সমর্থনকে 'জাতির জন্য' ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করছেন। এবং বাহ্যত এ প্রেক্ষাপটেই এই বিবৃতিদাতারা 'ভারতীয় সাহায্যপুষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ' প্রতিহত করার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের 'অনুগত নাগরিকদের' সম্পৃক্ত করার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিচ্ছেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সাহায্যকারী দুটি গোষ্ঠী বা সংগঠন সমগ্র দেশব্যাপী সক্রিয় ছিলো। এগুলো হলো: (ক) শান্তি কমিটি ও (খ) রাজাকার বাহিনী।

শান্তি কমিটি

৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি) প্রধান নূরুল আমিনের নেতৃত্বে কয়েকটি ডানপন্থী দলের নেতা সমন্বয়ে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল তৎকালীন সামরিক শাসনাধীন পাকিস্তানের 'খ' অঞ্চল তথা পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক (আর এম এল এ) লে. জে. টিক্কা খানের, যিনি *বেলুচিস্তানের কসাই* নামে খ্যাতি পান, সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম, মৌলবী ফরিদ আহমদ, খাজা খয়েরুদ্দীন, এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, মাওলানা নূরুজ্জামান প্রমুখ। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ জেনারেল টিক্কা খানকে 'অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামরিক আইন প্রশাসনকে সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন'।[২৮] টিক্কা খান এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানান, 'দুস্কৃতকারী ও সমাজ বিরোধীদের আশ্রয় না দেওয়া এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নিকট এদের সম্পর্কে সংবাদ পৌছে দেওয়ার জন্য' উপদেশ দেন এবং নেতৃবৃন্দকে 'শুধু বক্তৃতা-বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় ফলপ্রসূ কাজ করতে নির্দেশ দেন' (প্রাগুক্ত)। বৈঠক শেষে নেতৃবৃন্দ রেডিওতে ভাষণ দিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তার প্রতিজ্ঞা করেন (প্রাগুক্ত)।

'সুসংগঠিত ও সুশৃঙ্খল দল' হিসেবে পরিচিত জামায়াতের নেতৃত্বে কাজ করতে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির দুই নেতা 'উচ্চ শিক্ষিত ও অতি উচ্চাভিলাষী' মৌলবী ফরিদ আহমদ ও মাওলানা নূরুজ্জামানের অস্বীকৃতির কারণে প্রস্তাবিত *নাগরিক কমিটি* গঠনের কাজ বিলম্বিত হয়। ৬ এপ্রিল প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরীসহ অধ্যাপক গোলাম আযমের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল জেনারেল টিক্কা

---

২৮ *দৈনিক পূর্বদেশ*, ঢাকা, ৫ এপ্রিল ১৯৭১।

খানের সাথে সাক্ষাৎ করে সমমনা ডানপন্থী দলগুলোর মাঝে সমঝোতা সৃষ্টিতে অগ্রগতি অর্জন করেন। ৯ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট *ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি গঠিত হয়*।

নেতৃত্বের কোন্দলের বাস্তবতায় মৌলবী ফরিদ আহমদ ও মাওলানা নূরুজ্জামানের অনুসারীরা উক্ত কমিটি থেকে আলাদা হয়ে ১০ এপ্রিল গঠন করেন *পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল*, যা 'প্রতিটি জেলায়' এর শাখা প্রতিষ্ঠা করবে, সংশ্লিষ্ট এলাকার শান্তি রক্ষা, জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, ভারতীয় বেতারের মিথ্যা প্রচারণার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকরীভাবে মোকাবেলা করতে জনগণকে প্রস্তুত করতে' কাজ করবে বলে দাবি করা হয়।[২৯]

১৪ এপ্রিল এক বৈঠকে *কেন্দ্রীয় নাগরিক শান্তি কমিটির* নাম বদলিয়ে *পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি* রাখা হয়, যাতে এটি 'সারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যেতে' পারবে বলে দাবি করা হয়।[৩০]

শান্তি কমিটি প্রায় সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী গঠিত হয়েছিলো। এই শান্তি কমিটি বিষয়ে জামায়াত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে:

> ভারত বিরোধী ও ইসলামপন্থীরা উভয় সংকটে পড়ে গেল। যদিও তারা ইয়াহইয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমননীতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতেন, তবু এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কোন সাধ্য তাদের ছিলনা। বিরোধিতা করতে হলে তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকেও অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো- যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল। তারা একদিকে দেখতে পেল যে, মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা আক্রমণ করে ইয়াহইয়া সরকারকে বিব্রত করার জন্য কোন গ্রামে রাতে আশ্রয় নিয়ে কোন পুল বা থানায় বোমা ফেলেছে, আর সকালে পাক বাহিনী যেয়ে ঐ গ্রামটাই জ্বালিয়ে দিয়েছে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা রাতে কোন বাড়িতে উঠলে পরদিন ঐ বাড়িতেই সেনাবাহিনীর হামলা হয়ে যায়। এভাবে জনগণ এক চরম অসহায় অবস্থায় পড়ে গেলো। ভারত বিরোধী ও ইসলামপন্থীরা শান্তি কমিটি কায়েম করে সামরিক সরকার ও অসহায় জনগণের মধ্যে যোগসূত্র কায়েম করার চেষ্টা করলেন, যাতে জনগণকে রক্ষা করা যায় এবং সামরিক সরকারকে যুলুম করা থেকে যথাসাধ্য ফিরিয়ে রাখা যায়। শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে সামরিক শাসকদেরকে তাদের ভ্রান্তনীতি ও অন্যায় বাড়াবাড়ি থেকে ফিরাবার যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে। একথা ঠিক যে, শান্তি কমিটিতে যারা ছিলেন, তাদের সবার চারিত্রিক মান এক ছিল না। তাদের মধ্যে এমন লোকও ছিল, যারা সুযোগ মতো অন্যায়ভাবে বিভিন্ন স্বার্থ আদায় করেছে।[৩১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করে অধ্যাপক গোলাম আযম লিখেছেন:

---

[২৯] *তদেব*, ১১ এপ্রিল ১৯৭১।

[৩০] *তদেব*, ১৫ এপ্রিল ১৯৭১।

[৩১] গোলাম আযম, *আমার বাংলাদেশ*, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ৩৯।

> 'স্বাধীন বাংলাদেশ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যদি শুধু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের শ্লোগান তুলতেন, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা যদি তারা না হতেন এবং ভারতের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া যদি আন্দোলন পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন, তাহলে ইসলামপন্থীদের পক্ষে ঐ আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করা খুবই স্বাভাবিক ও সহজ হতো।[৩২]

রাজাকার বাহিনী

জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা এ কে এম ইউসুফ ১৯৭১ সালের মে মাসের কোনো একদিন (নির্দিষ্ট তারিখ জানা সম্ভব হয়নি-গবেষক) খুলনার খান জাহান আলী রোডের একটি আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন জামায়াতকর্মী সমন্বয়ে রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলেন। এ বাহিনীর নামকরণ তিনিই করেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন গভর্নর *ডা. আবদুল মুত্তালিব মালিক* (নিয়োগ ১২-৮-১৯৭১, দায়িত্ব গ্রহণ ৩-৯-১৯৭১) *মন্ত্রিসভার* (১০ সদস্য, দায়িত্ব গ্রহণ ১৭-৯-১৯৭১) রাজস্বমন্ত্রী মাওলানা ইউসুফ ১২ অক্টোবর খুলনায় শান্তি কমিটি ও চাষী কল্যাণ সমিতির সংবর্ধনা সভায় বলেছিলেন, 'নদীপথে চলাচল করার জন্য রাজাকার নিয়োগের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে'।[৩৩] ২৮ নভেম্বর মাওলানা ইউসুফ করাচীতে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, 'রাজাকাররা আমাদের বীর সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয় হামলার মোকাবিলা করছেন'।[৩৪]

রাজাকার শব্দটির উৎপত্তি ফার্সী শব্দ 'রেজাকার' থেকে। 'রেজা' অর্থ স্বীয় ইচ্ছা, স্বেচ্ছা, তুষ্টি, সন্তুষ্টি। 'কার' অর্থ কর্মী, কাজ সম্পাদনকারী। শব্দটির পুরো অর্থ দাঁড়ায় স্বেচ্ছাকর্মী বা স্বেচ্ছাসেবী। বৃটিশ-ভারত বিভক্তির সময় ভারত ইউনিয়নের সাথে একীভূত হতে অনিচ্ছুক হিন্দুপ্রধান রাজ্য হায়দারাবাদের তৎকালীন শাসক (নিজাম) একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে নাম দেন 'রেজাকার'। *রাজাকার* শব্দটি বহুল ব্যবহৃত এবং আলোচিত হলেও ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *'বেঙ্গলি-ইংলিশ ডিকশনারী'* (১৯৯৪), কলকাতার *'সংসদ বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান'* (১৯৯২) এবং ঢাকার বাংলা একাডেমী প্রকাশিত *'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান'* (১৯৯২)-এ এ শব্দটি পাওয়া যায়নি। তবে আলোচিত 'রাজাকার বাহিনী' কোনো অর্থেই 'স্বেচ্ছাসেবক' ছিলো না, ছিলো পুরোপুরি বেতনভোগী।

রাজাকার বাহিনীর সদস্যদের তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছে *মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র*:

> প্রথমত: যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙ্গালী হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল,... দ্বিতীয়ত: যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিল ... এবং তৃতীয়ত: গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয় এ ধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্ত

---

[৩২] গোলাম আযম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮।

[৩৩] মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র: ১৯৮৭, দ্বিতীয় সংস্করণ, ৬২।

[৩৪] *তদেব*।

ভুক্ত করা হয়। এদের অনেকেই যুদ্ধ চলাকালে স্বপক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়।[৩৫]

রাজাকার বাহিনী সাধারণভাবে শান্তি কমিটির (*পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি*) নেতৃত্বাধীন ছিলো। প্রতিটি রাজাকার ব্যাচ প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর শান্তি কমিটির স্থানীয় প্রধান তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। ১০/১২ দিনের প্রশিক্ষণ শেষে এ বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যেতো। জুন ১৯৭১ মাস নাগাদ সারা পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকার বাহিনী গঠনের পর শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এ বাহিনীকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানান। শীর্ষস্থানীয় *উলামা*ও এ সময় সরকারের নিকট *সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী* গঠনের দাবি জানিয়ে বিবৃতি দেন। ইতোমধ্যে আনসার বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য আনসার বাহিনী ছাড়েন। এ বাস্তবতায় জেনারেল টিক্কা খান আনসার বাহিনীকে রাজাকারে পরিণত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং জুন মাসে 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ১৯৭১' জারী করেন। আনসার বিলুপ্ত করে রাজাকার বাহিনী গঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো, যে কারো এ বাহিনীতে যোগদানের সুযোগ সৃষ্টি করা। আনসার বাহিনীতে যোগদানে কিছু নির্দিষ্ট বাধা-নিষেধ ছিলো।

ইসলামী ছাত্রসংঘ নেতা মোহাম্মদ ইউনুস এ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন এবং ছাত্রসংঘের সকল জেলা প্রধানকে স্ব স্ব জেলার রাজাকার প্রধান করা হতো বলে দাবি করা হয়।[৩৬] ১৭ অক্টোবর ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত এ বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ৫৫ হাজার ছিলো এবং এ সংখ্যা এক লক্ষে উন্নীত করার পরিকল্পনা ছিলো।[৩৭] ১ ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে রাজাকার সদস্যদের মাসিক বেতন ১২০ টাকা করা হয়। এর কোম্পানী কমান্ডার ও প্লাটুন কমান্ডারদের বেতন ছিলো যথাক্রমে ৩৫৫ টাকা ও ১৮০ টাকা। ১২০ টাকায় তখন ৪ মণ চাল পাওয়া যেতো।[৩৮]

পূর্ব পাকিস্তানে রাজাকার, আলবদর ও আলশাম্‌স বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, পিপিপি-র মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, মাওলানা কাওসার নিয়াজী, মুফতী মাহমুদ প্রমুখ, এক বিবৃতিতে এসব বাহিনীকে অবিলম্বে বিলুপ্ত করার দাবি জানান।[৩৯] 'পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য বামপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন না করে বরং তারই বিরুদ্ধে আলবদর সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ায়' অধ্যাপক গোলাম আযম ১২ নভেম্বর এক বিবৃতিতে মাহমুদ আলী কাসুরীর সমালোচনা করেন।[৪০]

'রেজাকারদের বিরুদ্ধে বিষোদগার' শীর্ষক এক সম্পাদকীয়তে *দৈনিক সংগ্রাম* ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখে লিখেছিলো :

> ঠিক এ কারণেই পাকিস্তানী বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ ও আল বদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন

---

৩৫ *তদেব*, ১০০-১০১।

৩৬ *তদেব*, ১০২।

৩৭ *তদেব*, ১০৩।

৩৮ *তদেব*।

৩৯ *তদেব*, ৫৫।

৪০ *তদেব*।

করছে। পাক সেনানায়করা আর সরকার রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত। ... পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল পিপল্‌স পার্টি ও তার মুখপত্র মুসাওয়াত সম্প্রতি ঠিক পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল নিষিদ্ধ আওয়ামী বিদ্রোহীদের সুরে সুর মিলিয়ে রেজাকারদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছে। এমনকি সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সংগৃহীত রেজাকারদের দল বিশেষের নামে চালিয়ে এ আধা সামরিক সরকারি বাহিনীতে রাজনীতি ঢুকাবার অবৈধ প্রয়াসের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের অখণ্ডত্বের জন্য আত্মোৎসর্গী একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থানীয় বাহিনীর বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। ... যে রেজাকারদের সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সামরিক সরকারই বাছাই করছেন এবং ট্রেনিং দিয়ে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগিয়েছেন তারা কি করে দল বিশেষের পক্ষ হয়ে অন্যান্য দলের কর্মীদের খতম করছে ভাবতে অবাক লাগে। অপবাদ মূলতঃ সামরিক সরকারকে কি দেওয়া হচ্ছে না? ... সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রেজাকাররা যখন শুধু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দালালদের খতম করছে, তখন তা যদি অন্য কোন দলের কর্মী নিপাত করা হয়ে থাকে তো মানতে হবে, সে দলের কর্মীরা নিঃসন্দেহে ভারতীয় দালালী করছে।

এ বাহিনীর গঠন-কাঠামো বিষয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে মনে করা হয়, মূলতঃ জামায়াতের ছাত্র-যুব নেতা-কর্মীদের সমবায়েই এই প্যারা-মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হয়। বাস্তবে এ ধারণাটি পর্যাপ্ত সঠিক নয়। রাজাকার বাহিনীর গঠন কাঠামো ও এর সদস্যদের বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা পাবার জন্য এখানে দু'জন লেখকের বই থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে ধরা হচ্ছে:

এক. ভাষা আন্দোলন খ্যাত কমরুদ্দীন আহমদ লিখেছেন,

বাঙ্গালীদের রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার কতকগুলো কারণ ছিল। তা হলো, (ক) দেশে তখন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। সরকার সে দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ঘোষণা করলো, যারা রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেবে, তাদের দৈনিক নগদ তিন টাকা ও তিন সের চাউল দেওয়া হবে। এর ফলে বেশ কিছু সংখ্যক লোক, যারা এতদিন পশ্চিমা সেনার ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত দিন কাটাচ্ছিল, তাদের এক অংশ ঐ বাহিনীতে যোগদান করলো। (খ) এতদিন পাক সেনার ভয়ে গ্রাম-গ্রামান্তরে যারা পালিয়ে বেড়াচ্ছিল, আত্মরক্ষার একটি মোক্ষম সুযোগ হিসেবে তারা রাজাকারের দলে যোগ দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। (গ) এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী জোর করে মানুষের সম্পত্তি দখল করা এবং পৈতৃক আমলের শত্রুতার প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ গ্রহণের জন্যেও এ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। রাজাকারদের দায়িত্ব ছিল মুক্তি বাহিনীর লোক খোঁজ করা এবং লোকের দেহ ও মালামাল অনুসন্ধান বা সার্চ করে দেখা যে কেউ কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করছে কিনা? তারা মেয়ে-পুরুষ সবাইকে সার্চ করার নামে তাদের টাকা-পয়সা, অলঙ্কার ছিনিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেল। কিন্তু রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি হবার পরে তাদের বুঝানো হলো যে, যুদ্ধে পাক সেনারা হারলে, পাক সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার অপরাধে মুক্তিবাহিনী তাদের সকলকে হত্যা করবে। সুতরাং জীবন রক্ষা করার

> জন্য মুক্তিবাহিনীর গুপ্ত আশ্রয়স্থলের সংবাদ তারা পাক সেনাদের জানিয়ে দিতে শুরু করল।[৪১]

দুই. মুক্তিযুদ্ধকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাই শেখ নাসের ৩৫দিন লুকিয়ে ছিলেন। অনেক ন্যাপ ও আওয়ামী লীগ নেতা আশ্রয় নিয়েছিলেন জামায়াত নেতা ও লেখক খন্দকার আবুল খায়েরের যশোরের বাড়ীতে। তিনি লিখছেন:

> আমি যে জেলার লোক সেই জেলার ৩৭টি ইউনিয়ন থেকে জামায়াত আর মুসলিম লীগ মিলে ৭০-এর নির্বাচনে ভোট পেয়েছিল দেড়শতের কাছাকাছি আর সেখানে রাজাকারের সংখ্যা ১১ হাজার, যার মাত্র ৩৫টি ছেলে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগারদের। ... আমার কিছু গ্রামের কথা জানা আছে, যেখানে ৭১-এর ত্রিমুখী বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচার জন্যে গ্রামে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেন যে, দুই দিকেই ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত মুতাবিক যে গ্রামের শতকরা ১০০ জন লোকই ছিলো নৌকার ভোটার, তাদেরই বেশ কিছু সংখ্যক ছেলেদের দেয় রাজাকারে। যেমন কলাইভাঙ্গা গ্রামের একই মায়ের দুই ছেলের সাদেক আহমদ যায় রাজাকারে, আর তার ছোট ভাই ইজহার যায় মুক্তিফৌজে। ... এটাই ছিল অধিকাংশ অবস্থা। ... যারা ছিল সুযোগ সন্ধানী, তারা সুযোগ পেয়েছে, ব্যস রাজাকার হয়ে পড়েছে। ... এরপর এগার হাজার রাজাকার যারা নৌকা (আওয়ামী লীগ-বর্তমান গবেষক) থেকে নেমে এসেছিল, তাদের সব দোষ গিয়ে আমাদের (ইসলামপন্থীদের-গবেষক) ঘাড়ে চাপল।[৪২]

কমরুদ্দীন আহমদ রাজাকার বাহিনীতে যোগদানকারীদের তিনভাগে বিভক্ত করেছেন:

ক. যুদ্ধাবস্থার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া জনগোষ্ঠী,
খ. যুদ্ধাবস্থার কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং
গ. সুবিধাবাদী, সুযোগ সন্ধানী এবং প্রতিহিংসা-প্রতিশোধ পূরণেচ্ছু ব্যক্তিবর্গ।

রাজাকার বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী আবু সাইয়িদের মূল্যায়ন প্রায় এমনই:

> বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রমাণাদি হতে একথা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, রাজারকার- রাজাকারই; তবে সব রাজাকার এক মাপের ছিলো না। প্রাথমিকভাবে রাজাকার বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের যুবক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনটি ক্যাটাগরীতে ভাগ করা যায়-
>
> যারা নিজেদের ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষা করার লক্ষ্যে পাক সামরিক বাহিনীকে সহায়তা, বাঙালী হত্যা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিলো। যারা পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলো; যারা হিন্দু সম্পত্তি দখল, লুটপাট, ব্যক্তিগত গ্রামীণ রেষারেষিতে প্রধান্য বিস্তার ও প্রতিশোধ গ্রহণ এবং নানান অপকর্ম করার সুযোগ গ্রহণ করেছিলো, এবং

---

৪১ কমরুদ্দীন আহমদ, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮২, পৃ. ১২৫।

৪২ খন্দকার আবুল খায়ের, *১৯৭১-এ কি ঘটেছিল রাজাকার কারা ছিল*, যশোর : তৌহিদ প্রকাশনী (৩য় সংস্করণ), ১৯৯২, পৃ. ৪৪-৪৫, ৬২।

গ্রামের হাজার হাজার বেকার অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত যুবক যাদের পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের জন্য দেশ ছেড়ে যাওয়া সম্ভব ছিলো না তাদের বেশিরভাগ পেটের তাড়নায় কর্মসংস্থানের জন্য এবং একই সাথে ভয় ভীতি এবং প্রলুব্ধ হয়ে রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখাতে বাধ্য হয়।

রাজাকার বাহিনী সুশৃংখল বাহিনী ছিলো না। বরং এদেরকে পাক বাহিনী দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছে। অধিকাংশই হয়েছে বলির পাঁঠা। তাদেরকে সামনে রেখেই পাকবাহিনী সর্বত্র অগ্রসর হয়েছে'।[৪৩]

অন্যদিকে খন্দকার আবুল খায়ের প্রধানত যুদ্ধাবস্থার কারণে সৃষ্ট ভীতি-বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় সক্ষম যুবকদের একটি অংশকে রাজাকার বাহিনীতে 'প্রেরণের' বিষয়টি প্রাধান্যে এনেছেন। তিনি অবশ্য রাজাকার বাহিনীতে একটি সুবিধাভোগী গোষ্ঠীর যুক্ত হবার কথাও বলেছেন। শান্তি কমিটির সাথে যুক্ত একটি অংশ নিজেদের অন্যায় স্বার্থ উদ্ধার করেছে বলে অধ্যাপক গোলাম আযম স্বীকার করেছেন। তবে তিনি রাজাকার বাহিনী ও এর গঠন-কাঠামো এবং আলশামস ও আলবদর বাহিনী বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেননি। সামগ্রিক বিবেচনায় রাজাকার বাহিনীর গঠন-কাঠামো বিষয়ে কমরুদ্দীন আহমদের ব্যাখ্যা অধিকতর উপযোগী বলে অনুমিত হয়। তবে দেশের সকল স্থানের রাজাকার বাহিনীর গঠন-কাঠামোতে কম-বেশী ভিন্নতা থাকা অস্বাভাবিক নয়।

গবেষক-সাংবাদিক আবুল আসাদ লিখেছেন:

জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা-উত্তরকালে সবচেয়ে বিতর্কের শিকার। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ: স্বাধীনতা সংগ্রামের তারা বিরোধিতা করেছে এবং পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতিকে সমর্থন করেছে। ১৯৭১ সালে এই ভূমিকা পালন করেছে মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম পার্টি, পিডিপি, কে এস পি, জমিয়তে ওলামায়ে পাকিস্তানসহ ইসলামপন্থী সকল সংস্থা ও সংগঠনও। এদেরকেও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধী বলে গাল দেয়া হয়, কিন্তু অভিযোগ ও আক্রমণের প্রবল ঝড় জামায়াতে ইসলামীকেই আহত করেছে সবচেয়ে বেশি। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান তাঁর শাসন আমলের শেষ দিকে এসে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী হবার অভিযোগ এনে মুক্তিযোদ্ধাদের দিয়ে প্রবল এক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। অথচ তাঁর ক্যাবিনেটে তখন শাহ আজিজ, আবদুল আলিম, মাওলানা আবদুল মান্নানের (জিয়া মন্ত্রিসভা নয়, মাওলানা আবদুল মান্নান বিচারপতি সাত্তার মন্ত্রিসভায় উপমন্ত্রি ছিলেন- বর্তমান লেখক) মত স্বাধীনতা বিরোধীদের শক্তিশালী অবস্থান। এরশাদ সরকারের আমলেও এই ঘটনাই ঘটল। তাঁর ক্যাবিনেটেও স্বাধীনতা বিরোধীদের শক্ত অবস্থান আমরা দেখি। অথচ তিনি জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যায়িত করে তাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের লাগান। আর আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী দলগুলোতো পারলে জামায়াতে ইসলামীকে উৎখাত করেই ছাড়ে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার, যারা তখন

---

[৪৩] অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম*, ঢাকা: মুক্তি প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৭৫।

> রাজাকার সেজে পাকিস্তান বাহিনীর সহযোগিতা করেছে, তাদের মধ্যে সবদলের লোকই ছিল। তাদের কথা চেপে যাওয়া হচ্ছে'।[৪৪]

উদ্ধৃত ভাষ্য-বর্ণনা-বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধকালে হত্যা, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতনের মতো অনৈতিক, অপরাধমূলক ও যুদ্ধাপরাধমূলক কার্যক্রমের জন্য ব্যাপকভাবে দায়ী ও অভিযুক্ত রাজাকার বাহিনীর একটি বিরাট অংশই এসেছিলো ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে থেকে। এই বিরাট অংশের রাজাকার সদস্যের কেউ এসেছে আওয়ামী লীগ, মুসলিম লীগ, পিডিপি, কেএসপি-র মতো দল থেকে এবং বাকীরা এসেছে রাজনৈতিক পরিচয়মুক্ত সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে। অন্যদিকে যে সংখ্যক রাজাকার সদস্য জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি প্রভৃতি ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের পরিচয়সহ এ বাহিনীতে যুক্ত হয়েছিলেন, তাদের অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক ছিলেন *আলিম*। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব *আলিম* অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে সচেতনভাবে নিজেদের বিরত রাখতে সক্ষম হন। তবে হাতে গোণা সম্ভব এমন কয়েকজন ব্যক্তি *আলিমের* বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অপরাধমূলক আচরণ ও কার্যক্রমের প্রমাণযোগ্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ১৯ অক্টোবর কুষ্টিয়ার মীরপুরের আব্দুল গফুরকে হত্যা করে তার কন্যা দুলালী বেগমকে অপহরণ ও ধর্ষণের অভিযোগে স্থানীয় রাজাকার চিকন আলীকে ১০ জুন ১৯৭২ তারিখে ফাঁসীর আদেশ দেয়া হয়।

আলবদর বাহিনী

আলবদর বাহিনী পূর্ণত জামায়াতের নিয়ন্ত্রণাধীন ইসলামী ছাত্রসংঘের বাছাইকৃত নেতা-কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিলো। এ বাহিনী ২২ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে জামালপুরে গঠন করেছিলেন ইসলামী ছাত্রসংঘের ময়মনসিংহ জেলা সভাপতি মুহম্মদ আশরাফ হোসাইন। এরপর এ বাহিনীটি কেন্দ্রীয়ভাবে জামায়াতের নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম পরিচালনা করে। আলবদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠা ও এর প্রাথমিক অগ্রগতি জানার জন্য *দৈনিক সংগ্রামের* ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ তারিখের 'আল বদর' শীর্ষক একটি ফিচার পড়া যেতে পারে:

> আল বদর একটি নাম! একটি বিস্ময়! আল বদর একটি প্রতিজ্ঞা! যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী আল বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আল বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।
>
> ২২শে এপ্রিল জামালপুরে পাকবাহিনীর পদার্পণের পর পরই মোমেনশাহী জেলা ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মুহম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে আল বদর বাহিনী গঠিত হয়। আল বদর সম্পূর্ণ রূপে একটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। আল কোরআনের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত পাকিস্তানবাদী এসব তরুণরা ভারতীয় চর, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়।
>
> সরলপ্রাণ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভাবনার চরম মুহূর্তে আল বদর বিশেষ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও

---

[৪৪] আবুল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫-১৯৬।

ইসলামের হেফাজতে আল বদরের বলিষ্ঠ ভূমিকায় ভারতীয় চর অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের সমূলে উৎখাত করে জনজীবনে শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার কার্যকরী ও ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ জনসাধারণকে শুধু মুগ্ধই করেনি, বরং তাদেরকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। জনজীবনে আল বদর তাই সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতীক।

জামালপুর মহকুমায় এ' পর্যন্ত আল বদর সাতটিরও অধিক ক্যাম্প স্থাপন করেছে। বিভিন্ন সময় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের সাথে প্রত্যেকটি মোকাবিলায় প্রচুর সংখ্যক দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারী হত্যাই করেনি বরং তাদের অনেককে আটক করেছে, তাদের কাছ থেকে এত বেশি পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে যা ভাবাই যায় না।

দেওয়ানগঞ্জে আল বদর মুজিব বাহিনীর দুষ্কৃতকারীদের শুধু প্রতিহতই করেনি, পরাস্ত ও করেছে। আল বদর নওজোয়ানদের হাতে বহু দুষ্কৃতকারী নিহত হয় এবং তারা ১১টা রকেট বোমা, একটি রাইফেল ও মেশিনগানের প্রচুর গুলি রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

ইসলামপুরে আল বদর তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর এক হামলার মোকাবিলায় ৬ জন শত্রুকে হত্যা করে এবং ৬টা হাত বোমা, ১টা রাইফেল, ৮৪ রাউন্ড গুলি, ৬ বাক্স বিস্ফোরক দ্রব্য ও জি, এ, ও রাইফেলসহ মেগ্জিন, স্টেনগান, মর্টার উদ্ধার করে। এখানে জনৈক মোজাহিদ কমান্ডার ও ইসলামপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ও তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার নিহত হয়। ইসলামপুরে আল বদর ভারতীয় দালাল ভারু দেওয়ানীর কাছ থেকে ৩ শত ৫০ মন পাট উদ্ধার করে। এ পাট নৌকাযোগে ভারতে পাচার হচ্ছিল।

সরিষাবাড়িতে আল বদর দুষ্কৃতকারীদের মোকাবিলায় ১০ জনকে হত্যা করে ও অসংখ্য আহতকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এখানে একজন দুষ্কৃতকারীকে একটি রাইফেল ও একটি মর্টার শেলসহ গ্রেফতার করা হয়।

কালীবাড়ী এলাকায় আল বদর একটি রাইফেল, ৭টি ৬ ইঞ্চি মর্টার, ৬টা হাতবোমা ও প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

নান্দিনা ও মেলান্দহ এলাকায় আল বদর তথাকথিত মুক্তিবাহিনীকে হটে যেতে বাধ্য করে।

জামালপুর শহরে তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর ৭ জন সদস্য আল বদরের কাছে অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে, এবং আল বদর তিনজন ভারতীয় চরকে এখানে গ্রেফতার করে।

নখলা এলাকায় পাক ফৌজের সহায়তায় আল বদর ২ শোরও বেশি অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা করে। এবং ধানুয়া কমলাপুরে ৩ শোর অধিক অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা ও ১ শো ১৩ জনকে গ্রেফতার করে। এখানে মর্টার মেশিনগানসহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। শত্রু মোকাবিলা ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক কল্যাণমূলক কাজেও আল বদর পিছপা নয়। স্থানীয় আল বদরের কাছ থেকে বিশেষ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা পাওয়ায় সম্প্রতি জামালপুর মহকুমার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এস,এস,সি, এইচ,এস,সি, প্রাইমারী টিচার্স ও দাখেল পরীক্ষা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়। সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিরুদ্বেগে ও প্রফুল্লচিত্তে এসব পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এ'সমস্ত পরীক্ষার্থীর অধিকাংশই পরীক্ষা চলাকালে পাকিস্ত

> ানের অখন্ডতা রক্ষা ও দুষ্কৃতকারীদের সম্ভাব্য সবরকম হুমকীর মোকাবিলায় আল বদর ট্রেনিং নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তারা বদর বাহিনীতে যোগ দেয়।
>
> স্থানীয় প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে ১৯৭১-৭২ সালের কোর্সে ভর্তির জন্য এবার এত বেশি ভীড় হয় যে ১ শো ৫০ টি সিটের জন্য তিন শত আবেদনকারীকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।
>
> আল বদর বা বদরবাহিনী তাই আজ জামালপুরবাসীর কাছে শুধু মুখেই উচ্চারিত নয় -আশির্বাদপুষ্টও। জামালপুর মহকুমার যে কোন হাট, বাজার, গঞ্জ, স্কুল, কলেজ আজ কলমুখর-আগের মতই প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর। দুষ্কৃতকারী, অনুপ্রবেশকারী কিংবা ভারতীয় চর সম্পর্কে গ্রামবাসী পর্যন্ত সর্বদা সজাগ। রেল লাইন, স্থল, নদীপথ প্রভৃতি স্থানে আজ তাদের দুর্বার প্রতিরোধ। ভারতীয় অপপ্রচারের জবাবে আজ তাদের কণ্ঠ মুখর, জেহাদী প্রেরণায় তারা উদ্দীপ্ত।
>
> জামালপুরবাসী তাই আজ আল বদর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। শুধু জামালপুর নয়, মোমেনশাহীও নয়, সমস্ত প্রদেশেই আল বদর আজ প্রশংসিত।

১৪ নভেম্বর ১৯৭১ তারিখে দৈনিক *সংগ্রামে* মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী 'বদর দিবস, পাকিস্তান ও আলবদর' শীর্ষক এক উপসম্পাদকীয়তে লিখেন:

> আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকসেনার সহযোগিতায় এ দেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্রসমাজ বদরযুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তারাও তিন শত তের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের যেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল বদরের তরুণ মর্দে মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্ সেই সব গুণাবলী আমরা দেখতে পাব।
>
> পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে গঠিত আল বদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। আমাদের বিশ্বাস সেদিন আর খুব দূরে নয় যেদিন আল বদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।

এসব উদ্ধৃতি থেকে নিশ্চিত হওয়া যায়, জামায়াত রাজাকার বাহিনীর চেয়েও সরাসরি ও নিশ্চিত প্রক্রিয়ায় আলবদর বাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিলো। মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদর বাহিনীর প্রধান নেতা। আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, মীর কাসিম আলী, মুহাম্মদ কামারুজ্জামান প্রমুখ বর্তমান জামায়াতের (২০০৩) কেন্দ্রীয় নেতা আলবদর বাহিনী কমান্ড করতেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিনগুলোয় এ আলবদর বাহিনী বাংলাভাষী বুদ্ধিজীবীদের হত্যার সংগঠক ছিলো বলে দাবি করা হয়।[৪৫] অবশ্য জামায়াতের

---

[৪৫] মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭।

পক্ষ থেকে এ দাবি অস্বীকার করা হয়েছে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড বিষয়ে অভিযোগকারীদের একটি বিশ্লেষণ এমন:

> সারাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে খুব বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায় বুদ্ধিজীবী হত্যা ঘটেছে তিন ধরনের। প্রথমত: এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোসহ দেশের নানা স্থানের যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে তাঁরা নিহত হয়েছেন পাকবাহিনীর সাধারণ নির্বিচার গণহত্যা বিশেষত: স্বাধীনতাপন্থী ছাত্র শিক্ষক হত্যার শিকার হয়ে; পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড তখনো শুরু হয়নি। দ্বিতীয়ত: জামাতে ইসলামী তাদের দলীয় নীতির অংশ হিসেবেই গোঁড়া ধর্মোন্মাদ ছাড়া অন্য সমস্ত বুদ্ধিজীবীকেই হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। একাত্তরে জামাত ও ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিবৃতি, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি, ছাত্র সংঘের টিক্কা খানের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উগ্র সাম্প্রদায়িক সুপারিশ পেশ এবং এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাংলাদেশমনা বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি আলামত থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। জামাত ও ছাত্র সংঘের নেতারা তাদের এই অপপ্রয়াসের দোসর করে নেয় এক শ্রেণীর লোভী, নীতিজ্ঞানবর্জিত ও উগ্র সাম্প্রদায়িক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং শান্তি কমিটির কিছু অতি গোঁড়া সদস্যকে। এধরনের বুদ্ধিজীবী হত্যা জামাতে ইসলামী করেছে এপ্রিল থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। তৃতীয়ত: নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন, তাঁরা সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে হানাদার পাকিস্তানী জেনারেলদের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছেন। শেষোক্ত শ্রেণীর শহীদদের কেউ কেউ ছিলেন শুধুমাত্র জামাতের টার্গেট, কেউ কেউ আন্ত র্জাতিক চক্রান্তের টার্গেট, কেউ কেউ ছিলেন উভয় পক্ষেরই টার্গেট। একারণেই দেখা যায় সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনের মত পাকিস্তানপন্থী লোকও তাদের হাতে নিহত হয়েছেন, অথবা যে কবীর চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের সিরাত সম্মেলন, আজাদী দিবস পালন ইত্যাদি সভায় অভ্যাগত করে বক্তৃতা করতে দিয়েছে তা তিনিও রাও ফরমান আলীর হত্যা তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।[৪৬]

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য জামায়াত নিয়ন্ত্রিত আলবদর বাহিনী ছাড়াও পাকিস্তানী সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং 'আন্তর্জাতিক চক্রান্ত'ও দায়ী ছিলো।

আলশাম্‌স বাহিনী

'আলশাম্‌স' বাহিনীর গঠন-কাঠামো বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। *মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র* দাবি করেছে:

> তবু এতটুকু বোঝা যায় যে, জামাতে ইসলামের ছাত্রফ্রন্ট ইসলামী ছাত্র সংঘকে আল বদর বাহিনীতে রূপান্তরিত করার পর অন্যান্য দলের ছাত্র সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে আল-শাম্‌স গঠন করে। এই দলে মুসলিম লীগপন্থী ছাত্র সংগঠনসমূহ এবং জামাতসহ মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার প্রাধান্য ছিল। এদের

---

৪৬ *তদেব*, পৃ. ১২৭-১২৮।

> কার্যক্রম মোটামুটিভাবে আল বদরের অনুরূপ ছিল। বুদ্ধিজীবী হত্যায়ও এদেরকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।[৪৭]

অন্যান্য বাহিনী

> মুজাহিদ বাহিনী ছিল একটি নিয়মিত আধা সামরিক বাহিনী। বাঙ্গালী নিধনের ক্ষেত্রে আল বদর ও আল শাম্‌স বাহিনীর পর এই বাহিনীই সর্বাধিক নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল। ... সংখ্যায় এরা প্রায় রাজাকার ও আল বদর বাহিনীর সমান ছিল। ... ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স সংক্ষেপে 'ইপকাফ', ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, রেঞ্জার ইত্যাদি দল ছিল নিয়মিত আধা সামরিক বাহিনী। ... অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলির মধ্যে পাইওনিয়ার ফোর্স, লাকসাম শান্তি কমিটির শক্তিবাহিনী, রেলওয়ে ভলান্টিয়ার ফোর্স, 'আজাদ বাহিনী' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।[৪৮]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে যেসব বাহিনী ও গোষ্ঠী মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষ নির্বিশেষে নারী-শিশু-বৃদ্ধ মানুষদের ওপর নানা মাত্রার নির্যাতন চালিয়েছে ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা পালন করেছে, সেগুলোর একটি তালিকা করা যেতে পারে:

- ক. পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি,
- খ. পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল,
- গ. রাজাকার বাহিনী,
- ঘ. আলবদর বাহিনী,
- ঙ. আলশাম্‌স বাহিনী,
- চ. মুজাহিদ বাহিনী,
- ছ. ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স-ইপকাফ,
- জ. ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স,
- ঝ. রেঞ্জার,
- ঞ. পাইওনিয়ার ফোর্স,
- ট. লাকসাম শান্তি কমিটির *শক্তিবাহিনী*,
- ঠ. রেলওয়ে ভলান্টিয়ার ফোর্স ও
- ড. আজাদ বাহিনী।

মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বাহিনীগুলোর এ তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ নয় এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে নিবেদিত প্রতিষ্ঠান *মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র*ও এ বাহিনীগুলোর পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নে অক্ষমতার কথা স্বীকার করেছে। একই সাথে এ বাহিনীগুলো বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমান গবেষণাকর্মে এ পর্যায়ের মূল মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে মুক্তিযুদ্ধে *উলামার* অবস্থান নির্দেশ করার প্রতি। ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট *পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির*

---

৪৭ *তদেব*, পৃ. ১০৬।

৪৮ *তদেব*, পৃ. ১০৭।

ক'জন সদস্য *আলিম* ছিলেন, সে তথ্য সহজলভ্য নয়। *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়* (ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৯) শীর্ষক গ্রন্থের পরিশিষ্টে এ কমিটির ৩৪ সদস্যের যে তালিকা দেয়া হয়েছে, তাতে *আলিম* হিসেবে ৪ জনকে শনাক্ত করা গেছে।

পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের যে ১৩ জন নেতার তালিকা উক্ত বইটিতে পাওয়া যায় তাতে দু'জন, ব্যারিস্টার মাওলানা কোরবান আলী ও মাওলানা এম এ মান্নান, *আলিম* ছিলেন।

গভর্নর এ এম মালিক মন্ত্রিসভার ১৩ জন সদস্যের মধ্যে দু'জন, মাওলানা এ কে এম ইউসুফ ও মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, *আলিম* ছিলেন।

উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্টে *প্রথম পর্যায়ের*[৪৯] *রাজাকার* হাইকমান্ডের পাঁচ নেতার যে তালিকা দেয়া হয়, তাতে কোনো *আলিম* ছিলেন না।

বইটিতে ২০ সদস্যের *আলবদর* হাইকমান্ডের যে তালিকা[৫০] দেয়া হয়, তাতে *আলিম* রয়েছেন দু'জন (মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও মাওলানা আবদুল হাই ফারুকী)।

দালালীর অভিযোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ২৫ জন শিক্ষককে[৫১] বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়েছিলো, তাদের মধ্যে *আলিম* রয়েছেন ৩ জন।

এ পরিসংখ্যান থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যক্রমের নেতৃপর্যায়ে রাজনীতি সচেতন *উলামার* বিষয়ে একটি অসম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়। এ পরিসংখ্যান সম্পূর্ণ নয়, কারণ এ সব তালিকা পূর্ণাঙ্গ নয় এবং এসব তালিকা সংশ্লিষ্ট বাহিনী বা কর্তৃপক্ষসমূহে *উলামার* সঠিক সংখ্যা ও সাধারণ শিক্ষিতদের বিপরীতে *উলামার* অনুপাত নির্দেশ করতে পারছে না। তবুও এসব তালিকা থেকে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যক্রমে *উলামার* অংশগ্রহণ বিষয়ে আংশিক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমান গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ছয়টি প্রশ্ন সংবলিত একটি প্রশ্নমালা কয়েকজন *আলিম* রাজনীতিক ও *উলামা* রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও লেখকের নিকট লিখিত জবাবের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট *আলিম*-রাজনীতিক, লেখক-সম্পাদক ও ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান মাওলানা মুহিউদ্দিন খান এবং নেজামে ইসলাম পার্টির কার্যকরী সভাপতি মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী প্রশ্নমালার লিখিত জবাবের বদলে আংশিক মৌখিক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। লিখিত জবাব দিতে প্রাথমিক সম্মতি জানিয়েও অবশেষে জবাব দানে অপারগতা প্রকাশ করেন জামায়াতে ইসলামীর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নমালাটির লিখিত জবাব প্রদান করেন *উলামা*-রাজনীতির বিশেষজ্ঞ ও প্রবীণ সাংবাদিক

---

৪৯ *তদেব*, পৃ. ১৮৫।
৫০ *তদেব*, পৃ. ১৮৬।
৫১ প্রাগুক্ত, ১৮৮-১৯০।

অধ্যাপক আব্দুল গফুর, জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা আবু তাহের, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর ও *উলামা-*রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও লেখক অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ্, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া ও সাংবাদিক-গবেষক জনাব নূর হোসেন মজিদী। এসব লিখিত জবাব বর্তমান গবেষণাকর্মের শেষে সংযোজিত হবে।

সংশ্লিষ্ট প্রশ্নমালার প্রথম প্রশ্নটি ছিলো: *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে সাধারণভাবে এ দেশের আলিমদের ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠী-দলগত অবস্থান ও ভূমিকা বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কি?* এ প্রশ্নটির জবাবে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য পর্যবেক্ষণ এমন:

অধ্যাপক আবদুল গফুর লিখেছেন:

'একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে আলেম সমাজের একটি বৃহত্তর অংশ পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশে যে হত্যা ও ধ্বংস অভিযান চালায় তার সঙ্গে তাদের খুব কমই সংশ্লিষ্টতা ছিল। আলেমদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন, তাদের মধ্যে এই ভীতি কাজ করেছিল যে, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রভাব থাকা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে ভারতের প্রভাব পড়বে। ফলে বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে পূর্ণ-স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে পারবেনা এবং এ রাষ্ট্রে ইসলামের প্রভাব খর্ব হবে।

অবশ্য আওয়ামী লীগ সমর্থক মওলানা অলিয়র রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ওলামা পার্টির সংশ্লিষ্ট লোকেরা এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অত্যাচারে ত্যক্ত বিরক্ত বহু গ্রাম্য আলেম, ইমাম, মুয়াজ্জেন ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তারা মুক্তিযুদ্ধে গোপনে সহায়তাও দান করেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী জনগণের প্রতি অন্যায় নির্যাতনের জন্য যারা কুখ্যাতি অর্জন করে, সেই রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স প্রভৃতি সংস্থার সাথে আলেম বা মাদ্রাসা ছাত্রদের খুব কম সংখ্যকেরই সম্পর্ক ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আলেম সমাজ প্রধানত: তিনটি সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এগুলি হচ্ছে, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী। এছাড়া বিভিন্নভাবেও ছিলেন বহু আলেম, পীর, মাশায়েখ ইত্যাদি। এরা অধিকাংশই বাংলাদেশ হলে ইসলামের ক্ষতি হবে বলে মনে করতেন। কাশ্‌ফের অধিকারী বুযুর্গদের প্রতি এ দেশের মানুষদের দুর্বলতার কারণে একাত্তরের রক্তঝরা দিনগুলিতে অনেকেই কাশ্‌ফের অধিকারী বুযুর্গদের কাছে ছুটে যেতেন, পাকিস্তান থাকবে, না বাংলাদেশ হবে এটা জানতে। আমি নিজেও ঐ সময়ে দেখা করেছিলাম এক বুযুর্গের সাথে একই প্রশ্নের উত্তর পেতে। তিনি বললেন, বাংলাদেশ হবে, তবে বাংলাদেশে ইসলামের চেতনা ও

প্রভাব বর্তমানের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী ইতিহাস তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী সত্য প্রমাণ করেছে।'[৫২]

অধ্যাপক মাওলানা মো. আবু তাহের লিখেছেন:

'দেশ ভেঙ্গে গেলে মুসলমানদের ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে পাকিস্তানের এই অঞ্চল ভারতীয় আধিপত্যবাদের কবলে নিপতিত হবে এই আশঙ্কা ছিল প্রবল। তাই এ দেশের আলেম সমাজ তথা বৃহত্তর ইসলামী জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেনি।'[৫৩]

অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের লিখেছেন:

'ভারতভীতি, পাকিস্তান মিথ ও আলেম বিরোধী প্রচারণার কারণে সাধারণভাবে আলেম সমাজ মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা অনুধাবন ও কাম্য ভূমিকা পালন করতে পারেননি। তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক আলেম মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন।'[৫৪]

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ লিখেছেন:

'ইসলামের নামে অর্জিত দেশটিকে দ্বি-খণ্ডিত করার সংগ্রাম শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আলিমগণ সাধারণভাবে পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করার ব্যাপারে একমত হতে পারেননি। পাকিস্তানকে রেখেই সমস্যা সমাধানের পক্ষে ছিলেন অধিকাংশ আলিম। দলগতভাবেও আলিমগণের অবস্থান অনুরূপ ছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু *আলিম* মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ভূমিকা এবং সেনাবাহিনীর নির্বিচার নির্যাতনের বিপক্ষে তারা অবস্থান গ্রহণ করেন।'[৫৫]

মাওলানা সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া লিখেছেন:

'জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ এবং নিজামে ইসলামীর কতিপয় নেতা ক্ষমতার ভাগী হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে দেশ ভারত হয়ে যাবে তাই পাকিস্তান রক্ষা করা সকলের ঈমানী দায়িত্ব বলে তারা অনেক আলিম-ওলামাদের বুঝাতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানী সৈন্যদের সহযোগিতা করার জন্য তৈরী করে রাজাকার, আল বদর ও আল শাম্‌স্ বাহিনী। প্রতিটি থানা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক গঠন করে পিস কমিটি। রাজাকার, আল বদর ও আল শাম্‌স বাহিনীতে অংশ নেয় জামাত সমর্থিত ছাত্র সংঘ ও অন্যান্য কিছু যুবকরা। বদর ও শাম্‌স বাহিনীতে নেয়া হয় মাদ্রাসায় পাঠরত কিছু যুবক ও ছাত্র সংঘের ছাত্রদের। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের সময় অধিকাংশ ইসলাম মনা লোকেরা পক্ষ নেয় পাকিস্তান রক্ষা কারীদের।

---

৫২ পরিশিষ্ট-১।

৫৩ *তদেব।*

৫৪ *তদেব।*

৫৫ *তদেব।*

অন্যদিকে আওয়ামী লীগ ও বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসীরা পক্ষ নেয় স্বাধীনতাকামীদের। কিন্তু দেশের ৯০% আলেম-ওলামা সে সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন।'[৫৬]

নূর হোসেন মজিদী লিখেছেন:

'মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরামের বেশিরভাগই ছিলেন অরাজনৈতিক; মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁদের কোন স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। অবশ্য পরিস্থিতির চাপে এদের একটি অংশ বিশেষত: যুবক মাদ্রসা-ছাত্রদের একাংশ পাক বাহিনীর তৈরী করা আধা-সামরিক বাহিনীগুলোতে যোগদান করতে বাধ্য হন। একই ভাবে এদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিভিন্ন রাজনৈতিক বৈঠকে অংশ গ্রহণে বাধ্য হন। অবশ্য সেক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়া-মুনাজাত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। ব্যতিক্রম হলেও সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের দৃষ্টান্তও রয়েছে।

ওলামায়ে কেরাম ও পীর মাশায়েখের এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যকার একটি সংখ্যালঘ অংশ পাকিস্তান আমলের শেষ দিন পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। এদের মধ্যে যারা আলীয়া নেছাবের আলেম ছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই জামাআতে ইসলামীর সাথে জড়িত ছিলেন। এদের সকলেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দলীয় ভূমিকার অনুসরণ করেন অর্থাৎ বিভিন্ন পর্যায়ে শান্তি কমিটিতে সদস্যপদ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যকার তরুণ আলেমগণের অংশবিশেষ আধাসামরিক বাহিনীতেও অংশ গ্রহণ করেন। আলীয়া নেছাবের মাদ্রাসা-ছাত্রদের মধ্যে বলা যায়, একমাত্র ছাত্র সংগঠন ছিল জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া। এটি ছিল আধা রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠন। বাইরে এটি শুধু 'মাদ্রাসাহ-ছাত্রদের সংগঠন' হিসেবে পরিচিত ছিল (অর্থাৎ অরাজনৈতিক ও দলীয় সম্পর্কবিহীন)। কিন্তু পর্দার আড়ালে এটি জামাআতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও অগ্রসর কর্মীগণ সাধারণত: ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য ও সাথী ছিলেন এবং ইসলামী ছাত্রসংঘের মজলিসে শূরাই প্রতি বছর নির্বাচনকালে পর্দান্তরাল থেকে এর সভাপতি-সম্পাদক ও সম্ভব হলে আরো কিছু পদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিত। কিন্তু সারা দেশের আলীয়া নেছাবের মাদ্রসাহ-ছাত্রদের একটা ক্ষুদ্র অংশই জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সদস্য ছিল। কোন কোন জিলায় আদৌ শাখা ও সদস্য ছিল না। এ সংগঠনটি ছিল প্রধানত: ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায়। এর সদস্যদের সকলে সংগঠনটির জামাআতের সাথে সম্পর্কের কথা জানত না। যারা জানত কেবল তারাই মুক্তিযুদ্ধকালে জামাআতের ভূমিকার অনুগমন করে এবং তাদের একাংশ আধা-সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে। বাকীরা তাদের জ্যেষ্ঠদের অনুসরণে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার জন্যে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে যা ছিল প্রধানত: নৈতিক সমর্থনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কওমী ধারার আলেমগণের একটি বিরাট অংশ ছিলেন অরাজনৈতিক। যারা রাজনীতি করতেন তাঁরা প্রধানত: জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি এবং

---

৫৬ তদেব।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (মাহমুদ-হাজারভী গ্রুপ) এর সাথে জড়িত ছিলেন। প্রথম দলটি ছিল পাকিস্তানের ঐক্যের সমর্থক। তাই স্বভাবত:ই দলটির আলেম নেতা-কর্মীগণ শান্তি কমিটির সদস্য হয়ে অথবা না হয়েও পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কওমী মাদ্রাসাহসমূহের ছাত্রদের মধ্যেও এ দলের সমর্থক ছিল। কিন্তু দলটির তরুণ আলেমগণ বা ছাত্র-সদস্যগণ আধা-সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আমার কাছে কোন নিশ্চিত তথ্য নেই। পাকিস্তান আমলে মাহ্‌মুদ-হাজারভী গ্রুপকে ভারতপন্থী হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখা হত। কারণ এরা ছিলেন মওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর সমর্থক এবং তাঁদের অনেকে এক সময় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তাই স্বভাবত:ই তাঁরা পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে কোন ভূমিকা পালন করেননি। তবে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বলেও জানা যায়নি। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের নীরব সমর্থন ছিল।

কওমী ধারার তৎকালীন অরাজনৈতিক অংশটি সম্পর্কে বলতে হয়, সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁরা উদাসীনও ছিলেন না। ভারতে অবস্থিত দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে আত্মিক সম্পর্কের কারণে তাঁরা ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে ব্যথিত ছিলেন যদিও পাকিস্তান-বিরোধী ছিলেন না। তাই মুক্তিযুদ্ধকালে এদের নিষ্ক্রিয় নৈতিক সহানুভূতির পাল্লা কিছুটা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ভারী ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এমন কি কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে থাকতে পারেন। বেগম জিয়ার পূর্ববর্তী শাসনামলের শেষ দিকে শায়খুল হাদীস মওলানা আজিজুল হকের ওপর হামলা হলে তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি এর নিন্দায় প্রদত্ত বিবৃতিতে তাঁকে 'মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের আলেম' বলে অভিহিত করেছিলেন। এটা কি কেবল রাজনৈতিক ছিল, নাকি এর পিছনে কোন সারবত্তা ছিল তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ বিষয়।[৫৭]

বাহাদুরপুরের মরহুম পীর হযরত মওলানা মোহ্‌সেনুদ্দিন দুদু মিয়া 'ফারায়েযী জামাআত'-এর নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু এটি ছিল খুবই ছোট একটি দল এবং এতে আলেমের সংখ্যা কত ছিল তা জানা নেই। অবশ্য পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে দুদু মিয়া ছিলেন শীর্ষ নেতাদের অন্যতম। তিনি নূরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন এনডিএফ-এ যোগ দিয়েছিলেন। পরে পিডিপি গঠন হলে এনডিএফ তাতে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু দুদু মিয়া তাতে ছিলেন কিনা স্মরণ করতে পারছি না। তবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কোন পক্ষেই তাঁর কোন ভূমিকার কথা শোনা যায়নি।

আলীয়া নেছাবের আলেম ও মাদ্রাসাহ্‌ ছাত্রদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের সমর্থক অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রুপ ছিল। এদের মধ্যে কতক মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় রাজনৈতিক ও সামরিক ভূমিকা নিয়েছে সন্দেহ নেই। তবে সংখ্যা শক্তির ক্ষুদ্রতার কারণে তাঁদের ভূমিকার গুরুত্ব অনুল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে কোন উল্লেখ করার মত বড় আলেম না থাকায়।

---

৫৭ *দৈনিক পাকিস্তান*, ৪ জুন ১৯৭১ সংখ্যায় পাকিস্তানী শাসকদের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী কার্যক্রম সমর্থন করে যে ৭ জন আলিম বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাদের একজন শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক। এ তথ্য জানার পর নূর হোসেন মজিদী তার ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের কথা এ গবেষককে জানিয়েছেন।

সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষ সম্পর্কের কারণে কতক নির্দলীয় আলেম ও পীর পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন। জমিয়তুল মোদাররেসীনের সভাপতি মওলানা এম এ মান্নান-যিনি এক সময় মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন-পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। তবে তিনি জমিয়তভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষকগণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করানোর চেষ্টা করেছিলেন কিনা বা তাঁরা কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কিনা জানা নেই।

যতদূর জানা যায়, শর্ষীনার মরহুম পীর আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ্ শর্ষীনা মাদ্রাসাহ্র ছাত্রদের সমবায়ে পাকিস্তানের সমর্থনে একটি আধা-সামরিক *মুজাহিদ বাহিনী* গঠন করেছিলেন। এ কারণে স্বাধীনতার পর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

জামাআতে ইসলামীর তৎকালীন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর হযরত মওলানা আবদুর রহীম (র.) জনমতের প্রতিকূলে পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণকে ভুল বলে মনে করতেন। একারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামাআতে ইসলামী ও পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘকে এরূপ ভূমিকা গ্রহণ না করার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন যা শোনা হয়নি। তবে তাঁর এ ভূমিকা দলীয় চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে তাঁর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার আগে তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের (অর্থাৎ আওয়ামী লীগের) কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। অবশ্য ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ইসলামপন্থী ও মুসলিমপন্থী সকল দলই আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাচ্ছিল এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম পরিষদে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছিল। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর আওয়ামী লীগ নেতারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে এবং একাংশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও একাংশ পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে ইসলাম ও মুসলিমপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।'[৫৮]

হাতে গোণা কিছু *আলিম* সরাসরি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন। অধ্যাপক আবদুল গফুরের মতে, এই শ্রেণীর *আলিমদের* মধ্যে অবশ্য উল্লেখযোগ্য ও শীর্ষস্থানীয় কোনো *আলিম* ছিলেন না। আবার দলীয়ভাবে জামায়াতের সাথে যুক্ত থাকলেও মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এবং আরো কেউ কেউ ইসলামপন্থী ও *আলিমদের* মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকাকে সমর্থন করেননি। তবে একই সাথে তারা এজন্য প্রকাশ্য কোনো কার্যক্রমও গ্রহণ করেননি।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তৎকালীন জামায়াত নেতা মাওলানা আবদুর রহীমের অবস্থান ব্যাখ্যা করেছেন নূর হোসেন মজিদী:

> এমতাবস্থায় তিনি জাতির পথ প্রদর্শক হিসেবে স্বীয় নৈতিক দায়িত্ব পালনের জন্য এগিয়ে এলেন। মওলানা সাহেব সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বিনাশর্তে জন প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে অনিবার্য রক্তপাত এড়ানোর জন্য ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি হুঁশিয়ার করে দেন

---

[৫৮] পরিশিষ্ট-১।

যে,অন্যথায় পাকিস্তানকে যে কোন ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে এবং এ জন্য ইয়াহিয়া খানকেই দায়ী হতে হবে।

জাতীয় সংবাদপত্রসমূহে মওলানা সাহেবের এ বিবৃতি প্রকাশিত হল। কিন্তু ইয়াহিয়া খান তাতে কর্ণপাত করলেন না। বরং দেশকে এক ভয়াবহ রক্তপাতের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন।...

এ আকস্মিক পরিস্থিতিতেও জাতির পথ প্রদর্শক মওলানা আবদুর রহীম(রঃ) দেশের ইসলামী শক্তিকে বিভ্রান্তির শিকার হওয়া থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি জামাআতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমীর মওলানা মওদূদী (র.)কে চিঠি লিখে পূর্ব পাকিস্তানে পাক-বাহিনী যে পদক্ষেপ নিয়েছে তার জুলুম ও অন্যায় দিকটি তুলে ধরেন এবং এর সমর্থন না করে বরং বিরোধিতা করার ও তা বন্ধের লক্ষ্যে চাপ সৃষ্টির জন্য তাঁকে অনুরোধ জানান। কিন্তু বিস্ময়ের সাথে দেখা গেল মওলানা মওদূদী(রঃ) পূর্ব পাকিস্তানে পাক-বাহিনীর পদক্ষেপকে সমর্থন করেছেন এবং পাক-বাহিনী পাকিস্ত ানকে বাঁচিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। মওলানা আবদুর রহীম (রঃ) এতে খুবই মর্মাহত হলেন। বিশেষ করে মওলানা মওদূদী(রঃ)-এর নিকট থেকে তিনি কখনো এটা আশা করেননি।

পরবর্তীকালে মওলানা আবদুর রহীম(রঃ) মওলানা মওদূদী(রঃ)-এর নিকট বিষয়টি উত্থাপন করলে মওলানা মওদূদী(রঃ) বিস্মিত হন। তিনি জানান যে, তাঁকে এরূপ কোন চিঠি কেউ দেননি। তিনি আরো জানান যে, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে তাঁর নামে যে বিবৃতি দেয়া হয়েছে তা দেয়ার আগে তাঁকে দেখানো হয়নি। যেহেতু তিনি অসুস্থ ছিলেন সেহেতু এ জাতীয় ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় দফতরের অন্যান্য নেতাদের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হচ্ছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে গোলমাল চলছে, তাই একটা বিবৃতি দেয়া দরকার; তিনি মামুলী ধরনের বিবৃতি দেয়া হবে মনে করে সম্মতি দেন। কিন্তু কি ধরনের 'গোলমাল' চলছিল তা তাঁকে বলা হয়নি। পরবর্তীতে যখন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারেন তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। পাকিস্তান জামাআতের কেন্দ্রীয় দফতরের দায়িত্বশীল নেতারা মওলানা আবদুর রহীম সাহেবের চিঠি পাবার কথাও স্বীকার করেন এবং বলেন যে, মওলানা মওদূদী (রঃ) অসুস্থ ছিলেন বিধায় চিঠিটি তাঁকে দেয়া হয়নি। তাছাড়া তাঁরা পাক-বাহিনীর পদক্ষেপকে সমর্থনযোগ্য মনে করছিলেন।

যা-ই হোক, হযরত মওলানা আবদুর রহীম (রঃ) মওলানা মওদূদী (রঃ)-কে লেখা তাঁর পত্রে কোন ফল হয়নি দেখতে পেয়ে পূর্ব পাকিস্তান জামাআতের পাক-বাহিনীর কার্যকলাপকে সমর্থন না করার এবং তার সাথে সহযোগিতা না করার পরামর্শ দেন। কিন্তু প্রাদেশিক জামাআত-নেতা দৃশ্যত: এ পরামর্শ মেনে নিলেও এবং জামাআতের প্রাদেশিক মজলিসে শূরার বৈঠকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও প্রাদেশিক আমীর খুব শীঘ্রই প্রকাশ্যেই পাক-বাহিনীর কার্যকলাপকে সমর্থন করেন ও তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। তিনি স্বয়ং 'কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি' নামক সরকার-সমর্থক কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন এবং জামাআতের নেতা-কর্মীদের স্থানীয় পর্যায়ের শান্তি কমিটিতে অংশগ্রহণ ও পাক-বাহিনীকে সমর্থনের নির্দেশ দেন।

শুধু তা-ই নয়, অচিরেই সামরিকভাবে পাক-বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য 'আল-বদর বাহিনী' গঠন করা হয়। যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতৃবৃন্দ

পাকিস্তানকে ভাঙ্গার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানে 'পাকিস্তান রক্ষা'র নাটক মঞ্চস্থ করছিলেন এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার দায়-দায়িত্ব পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের ঘাড়ে চাপাবার লক্ষ্যে রক্তপাতের আশ্রয় নিয়ে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধে নামতে বাধ্য করছিলেন সেই পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান জামাআত এ দু'টি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যদিও পাকিস্তান রক্ষা বা ভাঙ্গার ক্ষেত্রে জামাআত কোন গুরুত্বপূর্ণ উপাদানই ছিল না। এমতাবস্থায় এ ধরনের পদক্ষেপ ছিল চরম অদূরদর্শিতার পরিচায়ক যার পরিণতিতে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনকে মারাত্মকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছিল এবং এখনো হচ্ছে।

মওলানা আবদুর রহীম (রঃ) জামাআতের প্রাদেশিক আমীরসহ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কোন কোন সদস্যকে ও জামাআতের অন্যান্য নেতাদেরকে প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝাবার চেষ্টা করলেন এবং এ ধরনের অদূরদর্শিতামূলক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য পরামর্শ দিলেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন যে, পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবেই। এমতাবস্থায় জনগণের বিপক্ষে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু তাঁরা পাকিস্তান রক্ষা পেয়ে গেছে বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করতে লাগলেন। অনেকে মওলানাকে অদূরদর্শী এবং বাস্তবতার সাথে সম্পর্করহিত দার্শনিক বলে কটাক্ষ করতেও দ্বিধা করতেন না।

যেহেতু মওলানা সাহেব ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের হাতে-গণা শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে একজন সেহেতু তাঁর শান্তি কমিটির সদস্য না হওয়াটা অনেকেই সুনজরে দেখেনি। তাই অনেকে তাঁকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। এ কারণেই সেনাবাহিনীর সদস্যরা 'মুক্তি' খোঁজার নামে কয়েক দফা তাঁর বাসভবনে তল্লাশী চালায়। এছাড়াও বিভিন্নভাবে তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয় এবং তাঁকে পাক-বাহিনীর সাথে সহযোগিতায় বাধ্য করার চেষ্টা চালানো হয়। তবে এসব চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর বিনা অনুমতিতে তাঁর নাম পাকিস্তান সমর্থক হিসেবে ব্যবহারের জন্যেও চেষ্টা করা হয়।

ইতিমধ্যে পাকিস্তানের সামরিক সরকার আওয়ামী লীগকে বেআইনী ঘোষণা করে এবং আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের একাংশকে মোটামুটি আপোষে আনতে সক্ষম হয় ও অবশিষ্ট সদস্যদের সদস্যপদ বাতিল করে দিয়ে শূন্য আসনে উপনির্বাচন ঘোষণা করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্র তখন মুক্তিযোদ্ধারা ঘুরে বেড়াচ্ছে। জনসাধারণ তাদেরকে সমর্থন করছে। এমতাবস্থায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব ছিল না। তাই সামরিক কর্তৃপক্ষ পাকিস্তান-সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদের সাথে বৈঠকে বসে প্রতিটি আসনের জন্যে একজন করে প্রার্থী বেছে নেয় এবং তাঁদেরকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। জামাআতে ইসলামীর কোটায় যেসব আসন বরাদ্দ করা হয় তা পূরণের জন্য প্রাদেশিক জামাআতের দেয়া তালিকায় মওলানা আবদুর রহীম (রঃ)-এর নামও দেয়া হয় এবং তাঁকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য (এমএনএ) হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এ ব্যাপারে তাঁর পূর্বানুমতি নেয়ার কোন প্রয়োজনও প্রাদেশিক জামাআত-নেতা অনুভব করেননি।[৫৯]

---

৫৯ নূর হোসেন মজিদী, *মওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৪০-১৪৩।

গবেষক-সাংবাদিক নূর হোসেন মজিদী মুক্তিযুদ্ধকালে মাওলানা আবদুর রহীমের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে যেসব তথ্য, বক্তব্য ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেছেন, সে বিষয়ে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি হতে পারে। কারণ, মজিদীর উপস্থাপনায় সেসব প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব নেই। মজিদীর *সাক্ষাৎকারের* (পরিশিষ্ট-১) বক্তব্য ও সংশ্লিষ্ট জীবনীগ্রন্থে (*মওলানা আবদুর রহীম (রঃ): একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩) উপস্থাপিত তথ্য ও বিশ্লেষণ থেকে জানা যায়: ক. মুক্তিযুদ্ধকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জনমতের প্রতিকূলে পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণকে মাওলানা আবদুর রহীম ভুল বলে মনে করতেন, খ. পাকিস্তানী ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে তিনি জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রসংঘ নেতৃত্বকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, গ. এ জন্য তিনি জামায়াতের কেন্দ্রীয় আমীর মাওলানা মওদুদীকে নিজস্ব পরামর্শসহ চিঠি পাঠিয়েছিলেন, ঘ. পাকিস্তানী আর্মির কার্যকলাপকে সমর্থন না করার জন্য তার পরামর্শ 'প্রাদেশিক জামায়াত-নেতা' (অধ্যাপক গোলাম আযম?-গবেষক) 'দৃশ্যত:' মেনে নেন এবং জামায়াতের প্রাদেশিক মজলিসে শুরার বৈঠকে অনুরূপ সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু অধ্যাপক গোলাম আযম 'খুব শীঘ্রই প্রকাশ্যেই পাক-বাহিনীর কার্যকলাপকে সমর্থন করেন ও তার প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন', ঙ. তিনি 'সুস্পষ্ট ভাষায়' জামায়াত ও শান্তি কমিটি নেতৃত্বকে বলেছিলেন 'পাকিস্তান ভেঙ্গে যাবেই', চ. তিনি শান্তি কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করেননি, ছ. তার বিনা অনুমতিতে তার নাম 'পাকিস্তান সমর্থক' হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হয় এবং তার পূর্বানুমতি ছাড়াই তাকে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে 'জামায়াতের কোটায়' বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সদস্য (এম এন এ) নির্বাচিত করা হয়।

মজিদীর দেয়া এসব তথ্যের সূত্র উল্লেখ করা হয়নি এবং সময়-দিন-তারিখ নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধকালে মাওলানা আব্দুর রহীমের এমন দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যক্রম বিষয়ে নিচে উদ্ধৃত তার বক্তব্য ও কার্যক্রম প্রশ্ন সৃষ্টি করতে পারে:

> '১৮ আগস্ট লাহোরে জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ছয়দিন ব্যাপী বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে মওলানা রহিম বলেন, 'দলের (জামাতের) একজন সদস্যও পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে নিজেকে কোনক্রমেই জড়িত করেনি। এর ফলে এটাই প্রমাণিত হয়েছে, সকল প্রকার তুচ্ছ মতবিরোধ বর্জিত আদর্শিক আন্দোলনের সাথেই জামায়াত জড়িত।'
>
> ১৯ আগস্ট মওলানা রহিমের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার প্রস্তাবে 'ভারতীয় যুদ্ধবাজ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে লুটতরাজ, ধ্বংস সাধন, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা ও দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে বিশ্ব শান্তির চরম লংঘনের দায়ে নিন্দা করা হয়।' প্রস্তাবে পাকিস্তানের জনগণকে বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এবং যুগে যুগে মুসলমানেরা যে কোরবানীর নমুনা দেখিয়েছেন তা পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান' জানান হয়।
>
> ২০ আগস্ট মওলানা রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মওলানা মওদুদী, গোলাম আজম, আব্দুল খালেক প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এই অধিবেশনের প্রস্তাবে বলা হয়, 'ভারতীয় যুদ্ধবাজ ও তাদের চরদের যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার

> ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের দমন করার কাজে সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, মজলিশে শুরা তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।'
>
> ২১ আগস্টের প্রস্তাবে সামরিক বিধিসমূহ কঠোরভাবে জারী করার জন্য সরকারের আইন প্রয়োগকারী সকল এজেন্সীকে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, 'আইন ও শৃংখলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ৬০ ও ৭৮ নং বিধি জারী করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধিগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে না পারায় সেগুলো অকার্যকরী হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তা জনগণকে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিরাশ করবে এবং দেশের সংকট তাতে অব্যাহত থাকবে'।[৬০]

তবে মুক্তিযুদ্ধকালে জামায়াতের সামগ্রিক ভূমিকা ও কার্যক্রমকে অধ্যাপক গোলাম আযমসহ জামায়াতের প্রায় সকল নেতা-কর্মী যেখানে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করেন এবং দাবি করেন *একাত্তরে আমরা ভুল করিনি*,[৬১] সেখানে মাওলানা আবদুর রহীমের একটি সাক্ষাৎকারের নিম্নোক্ত বক্তব্য মজিদীর দেয়া তথ্য-বক্তব্য-বিশ্লেষণের সত্যতা ঘোষণা করছে বলে অনুমিত হতে পারে। ১৯৮০-র দশকের মাঝামাঝি দেয়া তার একটি সাক্ষাৎকারের অংশ বিশেষঃ

> মওলানা আবদুর রহীম বর্তমান ইসলামী ঐক্য আন্দোলনের চেয়ারম্যান। তিনি সাবেক আইডিএল-এরও প্রধান ছিলেন। তিনি বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির একজন প্রবক্তা এবং পূর্ব বাংলায় জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা।
>
> ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর আবার এ দেশে ধর্মীয় রাজনীতির গোড়াপত্তন হলো। যেহেতু জামাতে ইসলামী '৭১এ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস রচনা করেছে তাই মওলানা রহীম জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ নাম পরিবর্তন করে কলংকিত ইতিহাস মুছে ফেলে নতুন নামে পার্টি গঠনের পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে গোলাম আযমসহ অন্যান্য জামাত নেতাদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দেয় যা পরে আদর্শগত দ্বন্দ্বে গিয়ে পৌঁছে এবং এজন্যেই তিনি ইসলামী আন্দোলনের জন্য নতুন দল গঠন করেছেন বলে আমাদের জানিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে এই মওলানা রহীম সমগ্র পাকিস্তান জামাতের জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন।
>
> প্রশ্নঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করেন? দর্শনগত অবস্থানের প্রেক্ষিতে ১৯৭১ থেকে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত আপনার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
>
> উত্তরঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অনিবার্য ছিল এবং তা হয়েছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ফলাফলই ইঙ্গিত দিয়েছিল যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী। আর স্বাধীনতা লাভের ফলে বিশ্বের মানচিত্রে একটি নতুন দেশের সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বের দরবারে

---

[৬০] মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৪।

[৬১] ৮০'র দশকে *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* প্রকাশিত ও *বহুল আলোচিত* অধ্যাপক গোলাম আযমের সাক্ষাৎকারের শিরোনাম।

একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে আমাদের সম্মানও বেড়েছে যথেষ্ট। এই চৌদ্দ বছরে আমার দর্শনগত অবস্থানের কোনই পরিবর্তন হয়নি, হওয়ার প্রশ্ন আসে না। কারণ গোড়া থেকেই আমি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলাম।[৬২]

উলামার মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা: প্রেক্ষাপট ও কারণ

বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালে এ দেশের *উলামার* অতি ক্ষুদ্র অংশের প্রকাশ্য বিরোধী ভূমিকার কারণ চিহ্নিত করার জন্য এ দেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকার কারণ জানা দরকার হবে। মুক্তিযুদ্ধকালে সক্রিয় ইসলামপন্থী দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আর কোনো দলের ভূমিকা বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। জামায়াতের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা বিষয়ে দলটির তৎকালীন প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম লিখেন:

> জামায়াতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমানের ভূমিকা থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, আদর্শ ও নীতির প্রশ্নে জামায়াত আপোষহীন। দুনিয়ার কোন স্বার্থে জামায়াত কখনও আদর্শ বা নীতি সামান্যও বিসর্জন দেয়নি। এটুকু মূলকথা যারা উপলব্ধি করে, তাদের পক্ষে '৭১-এ জামায়াতের ভূমিকা বুঝতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।
>
> **প্রথমত,** আদর্শগত কারণেই জামায়াতের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহকগণের সহযোগী হওয়া সম্ভব ছিল না। যারা ইসলামকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে সচেতনভাবে বিশ্বাস করে, তারা এ দু'টো মতবাদকে তাদের ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী মনে করতে বাধ্য। অবিভক্ত ভারতে কংগ্রেস দলের আদর্শ ছিল ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। জামায়াতে ইসলামী তখন থেকেই এ মতবাদের অসারতা বলিষ্ঠ যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করেছে। আর সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই হলো ধর্মহীনতা।
>
> **দ্বিতীয়ত,** পাকিস্তানের প্রতি ভারত সরকারের অতীত আচরণ থেকে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ইন্দিরা গান্ধীকে এ দেশের এবং মুসলিম জনগণের বন্ধু মনে করাও কঠিন ছিল। ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সংগত কারণেই তাদের যে আধিপত্য সৃষ্টি হবে এর পরিণাম মঙ্গলজনক হতে পারে না বলেই জামায়াতের প্রবল আশংকা ছিল।
>
> **তৃতীয়ত,** জামায়াত একথা বিশ্বাস করত যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বেশি হওয়ার কারণে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে গোটা পাকিস্তানে এ অঞ্চলের প্রাধান্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভব হবে। তাই জনগণের হাতে ক্ষমতা বহাল করার আন্দোলনের মাধ্যমেই জামায়াত এ অঞ্চলের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার অর্জন করতে চেয়েছিল।
>
> **চতুর্থত,** জামায়াত বিশ্বাস করত যে, প্রতিবেশী সম্প্রসারণবাদী দেশটির বাড়াবাড়ি থেকে বাঁচতে হলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে এক রাষ্ট্রভুক্ত থাকাই সুবিধাজনক। আলাদা হয়ে গেলে ভারত সরকারের আধিপত্য রোধ করা পূর্বাঞ্চলের একার পক্ষে বেশি কঠিন হবে। মুসলিম বিশ্ব থেকে ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন এবং ভারত দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় এ অঞ্চলের নিরাপত্তার প্রশ্নটি জামায়াতের নিকট উদ্বেগের বিষয় ছিল।

---

[৬২] মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮।

পঞ্চমত, পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক পলিসির কারণে এ অঞ্চলে স্থানীয় পুঁজির বিকাশ আশানুরূপ হতে পারেনি। এ অবস্থায় এ দেশটি ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খপ্পরে পড়লে আমরা অধিকতর শোষণ ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হব বলে জামায়াত আশংকা পোষণ করত।

জামায়াত একথা মনে করত যে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপারে ভারতের সাথে সমমর্যাদায় লেনদেন সম্ভব হবে না। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেসব জিনিস এখানে আমদানী করা হতো, আলাদা হবার পর সে সব ভারত থেকে নিতে হবে। কিন্তু এর বদলে ভারত আমাদের জিনিস সমপরিমাণে নিতে পারবে না। কারণ, রফতানীর ক্ষেত্রে ভারত আমাদের প্রতিযোগী দেশ হওয়ায় আমরা যা রফতানী করতে পারি, তা ভারতের প্রয়োজন নেই। ফলে আমরা অসম বাণিজ্যের সমস্যায় পড়ব এবং এদেশ কার্যত ভারতের বাজারে পরিণত হবে।

ষষ্ঠত, জামায়াত পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ কায়েমের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সৃষ্ট সমস্যা এবং সকল বৈষম্যের অবসান করতে চেয়েছিল। জামায়াতের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম হলে বে-ইনসাফী, যুলুম ও বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং অসহায় বঞ্চিত মানুষের সত্যিকার মুক্তি আসবে।

এসব কারণে জামায়াতে ইসলামী তখন আলাদা হবার পক্ষে ছিল না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে এ দেশে যারাই জামায়াতের সাথে জড়িত ছিল, তারা বাস্তব সত্য হিসেবে বাংলাদেশকে একটি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নিয়েছে। আজ পর্যন্ত জামায়াতের লোকেরা এমন কোন আন্দোলন বা প্রচেষ্টার সাথে শরীক হয়নি যা বাংলাদেশের আনুগত্যের সামান্য বিরোধী বলেও বিবেচিত হতে পারে। বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তারা বাস্তব কারণেই যোগ্য ভূমিকা পালন করছে। তাঁরা কোন প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় পাবে না। তাই এ দেশকে বাঁচাবার জন্য জীবন দেয়া ছাড়া তাদের কোন বিকল্প পথ নেই।[৬৩]

অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রদর্শিত কারণসমূহের মধ্যে বাস্তবতার চাইতে বাহ্যত তাত্ত্বিকতার প্রতিফলন বেশি ঘটেছে বলে মনে হতে পারে। তিনি এ বক্তব্য ও কারণগুলো মুক্তিযুদ্ধকালে উপস্থাপন করেননি। তৎকালীন বাস্তবতার আলোকে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের গৃহিত নীতি প্রণয়নে যে কারণগুলো নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে বলে গবেষক ও ভাষ্যকারগণ মনে করেন, সেগুলো হলো:

ক. আওয়ামী লীগ ও ভারতভীতি,
খ. ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি,
গ. সব দলকে সাথে রাখতে আওয়ামী লীগের অনীহা,
ঘ. জনগণের করণীয় ও স্বাধীনতা বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা,
ঙ. স্বাধীনতা ঘোষণায় সমাজতন্ত্রীদের অতি উৎসাহ,
চ. যুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থতা ও

---

৬৩ গোলাম আযম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪২।

ছ. পাকিস্তান প্রীতি।

আওয়ামী লীগ ও ভারতভীতি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত অন্য কয়েকটি সাধারণ রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলাম পার্টির মতো ইসলামপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিঃশর্ত দাবি জানিয়েছে এবং 'অসহযোগের দিনগুলোতে' আওয়ামী লীগের সাথে মিলে 'সংগ্রাম পরিষদভিত্তিক' নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন চালিয়েছে। যদিও ইতঃপূর্বে আওয়ামী লীগ ঊনসত্তরের সর্বদলীয় গণঅভ্যুত্থানের ফসলকে 'কুটিল চাতুর্যের' সাথে অথবা 'দক্ষ ও কুশলী প্রক্রিয়ায়' এককভাবে কুক্ষিগত করেছিলো এবং বিশেষত ইসলামপন্থী দলসমূহকে রাজনীতির দৃশ্যপট থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করেছিলো। এসব আচরণের ফলে আওয়ামী লীগের প্রতি ইসলামপন্থী দলসমূহের একটি গভীর অনাস্থা ও ভীতির অনুভূতি সৃষ্টি হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর কিছু পূর্ব থেকেই আওয়ামী লীগের কিছু বাহ্যিক আচরণগত পরিবর্তন দলটির প্রতি অন্যদের এবং বিশেষত ইসলামপন্থী রাজনীতিকদের সন্দেহপ্রবণ করে তোলে। আওয়ামী লীগের পরিবর্তিত আচরণসমূহের একটি ছিলো 'জিন্দাবাদ' শ্লোগানের বদলে 'জয় বাংলা' শ্লোগানের প্রচলন। 'জয়বাংলা' শ্লোগানটি ভারতীয় 'জয় হিন্দ' শ্লোগানের 'আওয়ামী সংস্করণ' হিসেবে বিবেচিত হতো। এছাড়া ২৫ মার্চের আগে ও পরে আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পক্ষে ও পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতীয় গণমাধ্যমসমূহে ব্যাপক প্রচারণা দলটি সম্পর্কে ইসলামপন্থী দলসমূহের মাঝে সন্দেহ ও শঙ্কা গভীরতর করে। ফলে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি উত্থাপনকারী ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ পরবর্তী দিনগুলোতে 'স্বাধীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে' আওয়ামী লীগের সহযোগী ও সহযোদ্ধা হতে পারেনি।

ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা গ্রহণের ক্ষেত্রে এ দেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের জন্য আরেকটি পরিপার্শ্বগত বাস্তব কারণ ছিলো এসব দলের নেতা-কর্মীদের ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি। গবেষক-সাংবাদিক আবুল আসাদের ভাষায়ঃ

> ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপের প্রতি ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ক্ষমতাসীন হিন্দু কংগ্রেসের ঐতিহাসিক বৈরিতার কারণে ইসলামপন্থীদের ভারত গমন সম্ভব ছিল না। এ কারণের শিকার হয়ে তাঁদের অনেককে মুক্তিযুদ্ধকালে দেশের অভ্যন্তরে উভয় সংকটের মোকাবিলায় এক বিদঘুটে ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।[৬৪]

এ পর্যায়ে অধ্যাপক গোলাম আযমকে পুনরায় উদ্ধৃত করা যায়ঃ

> ভারত বিরোধী ও ইসলামপন্থীরা উভয় সংকটে পড়ে গেল। যদিও তারা ইয়াহইয়া সরকারের সন্ত্রাসবাদী দমননীতিকে দেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করতেন, তবু এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কোন সাধ্য তাদের ছিলনা। বিরোধিতা করতে হলে

---

৬৪ আবুল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৫।

তাদের নেতৃস্থানীয়দেরকেও অন্যদের মতো ভারতে চলে যেতে হতো- যা তাদের পক্ষে চিন্তা করাও অসম্ভব ছিল।[৬৫]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে হবে, ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তার বিরোধিতা ও প্রতিরোধ করতে হবে আবার প্রয়োজনে অথবা বাধ্য হলে আশ্রয় পেতে ভারতে যাবার 'চিন্তাও' করা যাবে না- এমনি এক 'মিল অযোগ্য সমীকরণের ক্রান্তি *দশার*' শিকার হয়েই ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলো বলে বাহ্যত প্রতীয়মান হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের স্বার্থে ও প্রয়োজনে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের 'ভারতে যাওয়ার চিন্তা করাও অসম্ভব' ছিলো বলে অধ্যাপক গোলাম আযম যে ব্যাখ্যা অথবা কৈফিয়ত দিয়েছেন, তৎকালীন বাস্তবতার আলোকে তা কিঞ্চিৎ পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এজন্য এখানে কয়েকটি খণ্ডচিত্র উপস্থাপিত হলো:

খণ্ডচিত্র-১: ন্যাপ নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুক্তিযুদ্ধকালে আসাম সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের আগে তাঁর কয়েকজন সাথী সীমান্ত পার হয়েছিলেন অবস্থা যাচাইয়ের জন্য। অবস্থা যাচাইকারীদেরকে মাওলানা ভাসানীর এক অসমীয় মুসলিম মুরিদ একজন পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে নিয়ে যায়। তারপরের ঘটনা: বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে পঞ্চায়েত প্রধান বললেন, আপনারা কি আওয়ামী লীগের লোক?

- না।
- আওয়ামী লীগের লোক ছাড়া বর্ডার পার হবার অর্ডার নাই।
- যারা রাজনীতি করেন না, তাদেরও?
- তারা বর্ডার পেরুবেন কেন?
- জান বাঁচানোর দায়ে।
- পঞ্চায়েত প্রধান কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, ভোট দিয়েছেন কোন্ দলকে?
- আমরা 'ন্যাপের' লোক।
- আবার কিছুক্ষণ দম ধরে থেকে তিনি বললেন, আপনারা বরং ফিরে যান। জানাজানি হলে অসুবিধা হতে পারে।

অবস্থা আঁচ করে মাওলানা সাহেবের কথা পঞ্চায়েত প্রধানের কানে তুললাম না। নানা দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়েই সামাদ সাহেবের (মওলানার অসমীয় মুরিদ) বাড়ীতে বসলাম। মন জুড়ে একটা প্রশ্ন চেপে বসল, পাকিস্তান দল মত নির্বিশেষে সব বাঙ্গালীকে মারছে। এমনকি সেমসাইড করে দু'চারজন পাকিস্তানপন্থীও মেরেছে। অথচ ভারত কেবল আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগপন্থীদের আশ্রয় দিচ্ছে। তাহলে বাকি বাঙ্গালীরা যাবে কোথায়?[৬৬]

খণ্ড চিত্র-২: সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ জুন জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটির ঘোষণার কপিসহ আমি, রাশেদ খান মেনন এবং হায়দার আকবর খান রনো কলকাতার অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সাথে সাক্ষাৎ করে স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের অংশ গ্রহণের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করি। ধৈর্য ও সহানুভূতির সাথে

---

৬৫ গোলাম আযম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

৬৬ সাইফুল ইসলাম, *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*, ঢাকা: বস্ত্র প্রকাশন, ১৯৯৩, পৃ. ৮।

বক্তব্য শুনলেও তিনি আমাদের উপর বিশ্বাস রাখতে অস্বীকৃতি জানান এবং সরকারের মুক্তি বাহিনীতে আমাদের কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করতে অস্বীকার করেন। আমি বলি যে, ... আপনি কেবল আওয়ামী লীগের সম্পাদকই নন, দেশেরও প্রধানমন্ত্রী এবং এজন্যই জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে যে কেউকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া আপনার কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে জনাব তাজউদ্দীন জানান যে, তাকে সিদ্ধান্তের আগে গোয়েন্দা রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং আমাদের গোয়েন্দা সংস্থার অনুপস্থিতিতে নির্ভর করতে হবে ভারত সরকারের গোয়েন্দা রিপোর্টের উপর। ... আমরা মর্মাহত হয়ে ফিরে আসি। দেশে ফেরার পথে জুনের মাঝামাঝি আগরতলায় আমাকে ভারতের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' আটক করে নিয়ে যায় শিলং-এর এক ডাক বাংলায়। সেখানে আমাকে সাতদিন রাখা হয়। ... সাত দিনব্যাপী অবিরাম প্রশ্নের মাধ্যমে আমাকে ব্যতিব্যস্ত রাখা হয়।[৬৭]

খণ্ডচিত্র-৩: পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে 'মস্কোপন্থী' নেতারা প্রথম সুযোগেই কলকাতা মুজিবনগরে সমবেত হয়েছিলেন। ১৭ই এপ্রিল গঠিত অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থন ঘোষণার মধ্য দিয়ে তারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের দলীয় সংকীর্ণতার কারণে মস্কোপন্থীদের সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত থাকতে হয়, তারা 'কিস্তর দেন দরবার' চালাতে থাকেন। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নিস্ফল দেন দরবার অব্যাহত থাকে। সে পরিস্থিতিতে পরিবর্তনের কারণ ঘটিয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথম থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে বর্ণনা করে আসছিল। পরিস্থিতির চাপে ভারত শেষ পর্যন্ত '৭১ সালের ৯ই আগস্ট ২৫ বছর মেয়াদী 'ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তি' স্বাক্ষর করার পর ক্রেমলিনের নায়করা প্রথমবারের মত বাংলাদেশের পরিস্থিতির মধ্যে 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের উপাদান' খুঁজে পান এবং ২৮-২৯ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফরকালে ব্রেজনেভ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করেন। সোভিয়েত মনোভাবের এই পরিবর্তন সার্বিকভাবে ভারত সরকারের অভ্যন্তরেও তাৎক্ষণিক প্রভাব ফেলেছিল। ক্ষমতায় ডানপন্থীরা এর ফলে কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেন এবং মস্কোপন্থী কূটনীতিক ডি পি ধর বাংলাদেশ সরকারের উপর 'মস্কোপন্থীদের' সুযোগ দানের জন্যে প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন এবং সে কারণেই মূলতঃ ন্যাপ, কম্যুনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা অক্টোবর থেকে অস্ত্র এবং যুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছিল (এই সময়েই সিপিবি 'পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি' নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি' নাম গ্রহণ করে)।[৬৮]

খণ্ডচিত্র-৪: আগরতলার বাস ধরার জন্য মোস্তফাসহ বেরিয়ে পড়লাম। বাসে উঠে খানিকটা আসতেই হঠাৎ রাস্তার পাশে এক জায়গায় বেশ কিছু লোকের একটা জটলা চোখে পড়ল, দেখলাম কিছু লোক লম্বা একটি দাঁড়িওয়ালা লোককে মারধর করছে এবং লোকটি দু'হাতে মার *ঠেকিয়ে* আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করছে। লোকটিকে দেখে

---

৬৭ *সাবেক প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদের সাক্ষাৎকার*, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, খণ্ড ২, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫, খণ্ড ১৫, পৃ. ২০১-২০২।

৬৮ 'ন্যাপের ৩০ বছর', *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৯৮৭।

> আমি চমকে উঠলাম, এ যে শেখ নুরুল্লাহ, একজন মুসলিম লীগ নেতা। একে আমি বহু দিন ধরে চিনতাম। ... ঘটনাটি দেখে আমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়লাম।[৬৯]

উপস্থাপিত চারটি খণ্ডচিত্রকে তৎকালীন বাস্তবতা অনুধাবনের সুবিধার্থে 'সমস্যার গভীরতা' অনুযায়ী সাজানোর চেষ্ট করা হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'অংশ গ্রহণের স্বার্থে' যদি প্রতিবেশী (এবং প্রায় একমাত্র প্রতিবেশী) ভারতের 'আশ্রয়-প্রশ্রয়' লাভের জন্য 'ভারত গমন' ন্যায্য অথবা প্রয়োজনীয় বিবেচিত হয়, তবে তা কাদের জন্য উপযোগী, যাচিত ও সম্ভাব্য ছিলো, তা বোঝার জন্য উপস্থাপিত খণ্ডচিত্রগুলো সাহায্য করতে পারে।

প্রথম খণ্ডচিত্রে দেখা যাচ্ছে, তৎকালীন বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় সাধারণ জনগণও জেনে গিয়েছিলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারতে আশ্রয় লাভের অধিকার, অনুমতি অথবা সুযোগ ছিলো কেবল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থকদের। মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর মতো 'স্বাধীন বাংলাদেশ ধারণার' সর্বজন পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেও ভারতে প্রবেশের আগে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিতে হয়েছিলো। মাওলানা ভাসানীর শিষ্য তৎকালীন ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মঈনুল ইসলামের সুপারিশ ও অনুরোধে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টিই ভারতে প্রায় বন্দীদশায় কাটাতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর অন্য শীর্ষ সহকর্মী মশিয়ুর রহমান (যাদু মিয়া), কাজী জাফর আহমদ প্রমুখকে বাংলাদেশে ফিরে আসতে হয়। এমনকি জাতীয় নেতা অলি আহাদের মতো রাজনীতিকদেরও গ্রেফতার এড়ানোর জন্য ভারত থেকে পালিয়ে[৭০] আসতে হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডচিত্রে কাজী জাফর আহমদের অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডচিত্রে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম' হিসেবে দলীয়ভাবে স্বীকার করার পরও চীনপন্থী ন্যাপ ও এর নেতা-কর্মীদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে রাজী হয়নি 'তাজউদ্দীন আহমদদের' অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার 'গোয়েন্দা ছাড়পত্র' লাভের অপমানজনক শর্ত ন্যাপ নেতা কাজী জাফর আহমদকে 'মর্মাহত' করেছিলো বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

তৃতীয় খণ্ডচিত্রে দেখা যাচ্ছে, আওয়ামী লীগ রাজনীতির সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ সহযোগী শক্তি মস্কোপন্থী ন্যাপ ও কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা ভারতে 'অনুমোদিত অবস্থানের' সুযোগ পেলেও মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের প্রথম ছয় মাস 'যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও অস্ত্র ধারণের' অনুমতি

---

৬৯ এম.এ. মোহাইমেন, *ঢাকা-আগরতলা-মুজিব-নগর*, ঢাকা, পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৮৪, পৃ. ৪২।

৭০ অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫*, ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (২য় সংস্করণ), ১৯৮৯, পৃ. ৫০৭।

পায়নি। স্পষ্টতই সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের মতো একটি বিদেশী শক্তির সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতায় অক্টোবর ১৯৭১ থেকেই কেবল বামপন্থী রাজনীতির 'মস্কোপন্থী' অংশটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ লাভ করে।

চতুর্থ খণ্ডচিত্রে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের টিকিটে নির্বাচিত প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য এম এ মোহাইমেন লিখেছেন, একজন মুসলিম লীগ নেতা মুক্তিযুদ্ধকালে আগরতলায় গিয়ে নির্যাতনের (এবং সম্ভবত হত্যাকাণ্ডের) শিকার হয়েছেন।

উদ্ধৃত চারটি খণ্ডচিত্রকে সংক্ষিপ্তসারে এভাবে উপস্থাপন করা যায়:

এক. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে 'ভারত গমন' অনুমোদিত ছিলো মূলত আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক-ভোটারদের জন্য এবং অংশত মস্কোপন্থী ন্যাপ, সিপিবি-র লোকদের জন্য। অন্য কোনো দল-মত-আদর্শের অথবা 'নির্দলীয়' লোকদের জন্য ভারত গমন অনুমোদিত ছিলো না এবং নিরাপদও ছিলো না। এ ক্ষেত্রে চূড়ান্তভাবে প্রাণহানির সম্ভাবনাও ছিলো।

দুই. বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ভারত কেবল 'আওয়ামী লীগারদেরই' সাহায্য-সমর্থন সরবরাহ করেছে।

তিন. মুক্তিযুদ্ধকালীন ভারত প্রবাসী অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য কেবল আওয়ামী লীগারদেরই অনুমতি দিতো। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধ শুরুর সাতমাস পর অক্টোবর মাস থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপে অস্থায়ী সরকার মস্কোপন্থী ন্যাপ-সিপিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য অনুমতি ও সমর্থন প্রদান করে। অন্য কথায়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ 'এ ভূ-খণ্ডের' সকল নাগরিকের জন্য অবাধ ও অবারিত রাখা হয়নি।

ভারত গমনে যেখানে আওয়ামী লীগের 'সাধারণ রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী' তথা চীনপন্থী ও মুসলিম লীগপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদেরই সামগ্রিক বাধা ও জীবনহানির আশঙ্কা ছিলো, সেখানে আওয়ামী লীগের 'রাজনৈতিক ও আদর্শিক উভয় বিবেচনায় প্রতিদ্বন্দ্বী' ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের জন্য ভারত গমন একটি 'চিন্তার অসম্ভব বিষয়' হিসেবে গণ্য হতেই পারে। এ বিবেচনায় অধ্যাপক গোলাম আযমের এ বিষয়ক পর্যবেক্ষণকে ন্যায্য বলে স্বীকার করার সুযোগ আছে।

মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের স্বার্থে ও অনিবার্য শর্ত হিসেবে ভারত গমন ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের জন্য যতোখানি ও যে মাত্রায় বাধা ও আশঙ্কার বিষয় ছিলো, এ দেশের *উলামার* জন্য সেটি সম্ভবত ততোধিক বাধা ও আশঙ্কার বিষয় ছিলো। তাই বাংলাদেশের *উলামার* পক্ষে এ দেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ সাধারণভাবে সম্ভব হয়নি বলে স্বীকার করার সুযোগ রয়েছে।

সব দলকে সাথে রাখতে আওয়ামী লীগের অনীহা

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের অসহযোগ আন্দোলন এবং এর পূর্ব ও পরবর্তী কোনো সময়েই এ অঞ্চলের প্রধান দল আওয়ামী লীগ ও এর নেতা শেখ মুজিবর রহমান 'বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে' অন্যসব ছোটো-বড়ো দলকে 'আন্দোলনের সহযোগী' শক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে চাননি অথবা প্রস্তুত ছিলেন না এবং গ্রহণ করেননি। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের *ফল* 'একা ভোগ' করার জন্য আওয়ামী লীগ অন্য দলগুলোকে অভিযুক্ত করেছে ও তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। অসহযোগ আন্দোলনকালে ও তার আগে থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সবগুলো দলের নেতৃস্থানীয়রা জনসভা অথবা বিবৃতির মাধ্যমে পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি করেছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিব সেসব রাজনীতিককে এমনকি মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের সময়েও নিজের আস্থায় নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি ঘোষিত হবার পর হোটেল পূর্বাণীতে আহুত সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিব বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে মাওলানা ভাসানী, নূরুল আমীন, আতাউর রহমান খানসহ প্রদেশের অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ আলোচনা করার স্বীয় সিদ্ধান্তের কথা জানান।[৭১] কিন্তু বাস্তবে তিনি ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের অন্য কোনো দলের নেতৃবৃন্দের সাথেই আলোচনা করেছিলেন বলে তথ্য-প্রমাণ পাওয়া যায়নি।[৭২] মূল রাজনৈতিক নেতৃত্বের পাশাপাশি ছাত্র আন্দোলনেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' বাতিল করে আন্দোলনের এক পর্যায়ে কেবল আওয়ামী লীগের অনুগত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নিয়ে 'স্বাধীন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়।[৭৩] এ অবস্থাটি ছিলো গবেষক আবুল আসাদের ভাষায়ঃ

> ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফল একা কুক্ষিগত করে সবকে বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ যেমন একাই এগিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে অসহযোগ আন্দোলনের ফল ভোগে সে কাউকেই শরিক করতে চাইল না। যেন সে নিশ্চিত ছিল ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাচ্ছে। আসন্ন স্বাধীনতা সংগ্রাম বা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্যে আওয়ামী লীগের এ মানসিকতা ছিল অযৌক্তিক, অনুপযুক্ত এবং ক্ষতিকর। আওয়ামী লীগের উচিত ছিল সব দলকে কাছে ডাকা এবং তাদের আস্থা অর্জন করতে চেষ্টা করা যাতে ভুল বুঝাবুঝি দূর হয় এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে তাদেরও পাওয়া যায়। কিন্তু আওয়ামী লীগ এটা করেনি। আন্দোলনের নেতা হিসেবে আওয়ামী লীগের এটা একটা বড় ব্যর্থতা।[৭৪]

আওয়ামী লীগ এবং এর নেতা শেখ মুজিব বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পূর্বে যেমন এ অঞ্চলের অন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে কাছে ডাকেননি এবং সহযোগী করেননি, মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পরও দলটি আগ্রহী দলগুলোকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ

---

৭১ *দৈনিক সংগ্রাম*, ২ মার্চ ১৯৭১।
৭২ আবুল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬।
৭৩ অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪।
৭৪ আবুল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬।

দেয়নি অথবা স্বাগত জানায়নি। অন্যান্য সাধারণ রাজনৈতিক দল ও ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মতো এ দেশের *উলামাও* আওয়ামী লীগের এ অনীহ মনোভাবের কারণে অংশত মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণের সুযোগ নিতে পারেনি অথবা অংশ নেয়নি বলে মেনে নেয়ার সুযোগ রয়েছে।

জনগণের করণীয় ও স্বাধীনতা বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা

জনগণের করণীয় এবং স্বাধীনতা বিষয়ে আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকার কারণেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিলো। সে সময়ে শেখ মুজিবের আচরণ বিশ্লেষণ করলে সৃষ্ট বিভ্রান্তির প্রকৃতি বোঝা যাবে এবং এর পর দেখা যাবে সেই বিভ্রান্তির ফলে কী ঘটেছিলো।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের পর আইনসভার অধিবেশন আহ্বান ও শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে জেনারেল ইয়াহিয়া গং-এর টালবাহানার এক পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণার প্রেক্ষাপটে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন, রাজনীতিক, জনগণ শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলেছে। অনেকে আশা করেছিলেন, ৭ মার্চের রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ঘোষণা দেবেন। ৭ মার্চে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলে 'অনেক কম মূল্যেই' এ দেশের স্বাধীনতা 'অর্জিত ও প্রতিষ্ঠিত' হতে পারতো বলে অনেকে বিশ্বাস করতেন। যেমন মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল বলছেন:

> ৭ই মার্চের মাত্র আর একদিন বাকী। বাংলার সাড়ে সাত কোটি নিপীড়িত মানুষের মুক্তির জন্য এই দিন হয়তো কোন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। অনুমান করা হয়েছিল যে, ৭ই মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হবে। ...শুধু শেখ সাহেব বললেন, 'এবারের সংগ্রাম-মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম-স্বাধীনতার সংগ্রাম' ... ২৫শে মার্চ। নিরীহ মানুষের সস্তা রক্তে সারা বাংলাদেশ লালে লাল। এত রক্ত খরচ না করে, এত বড় ধবংস যজ্ঞের সম্মুখীন না হয়েও ৭ই মার্চকে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হতো।[৭৫]

শেখ মুজিব ৭ মার্চে স্বাধীনতার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত থাকলেন। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ (১৬ মার্চ) থেকে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সাথে তিনি বৈঠক শুরু করেন। কখনো একক শীর্ষ বৈঠক এবং কখনো শীর্ষ উপদেষ্টাদের সমন্বয়ে বৈঠক। এভাবে ২৫ মার্চ এলো। বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি থেকে জনগণ জানলো, সমঝোতা-আলোচনা অগ্রসর হচ্ছে এবং একটি সমাধান আসন্ন। কিন্তু ২৫ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় সাক্ষাৎ করতে গেলে প্রফেসর রেহমান সোবহানকে শেখ মুজিব সুস্পষ্ট উচ্চারণে বলেন 'সেনাবাহিনী সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে'।[৭৬] সেনাবাহিনীর আসন্ন সামরিক অভিযানের সুস্পষ্ট তথ্য জানার পরও শেখ মুজিব ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০টায় তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ড. কামাল

---

৭৫ মেজর এম এ জলিল, *মেজর জলিল রচনাবলী*, ঢাকা: মেজর জলিল পরিষদ, ১৯৯৭, পৃ. ২১৭-২১৮।

৭৬ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯০।

হোসেনের কাছে জেনারেল ইয়াহিয়ার প্রধান আলোচক জেনারেল পীরজাদার পক্ষ থেকে 'সমঝোতা বিষয়ে সম্ভাব্য টেলিফোন বার্তা' সম্পর্কে জানতে চান। ড. কামাল জানান, তিনি জেনারেল পীরজাদার সেই কাঙ্খিত 'ফোন বার্তা' পাননি।[৭৭] শেখ মুজিব সেই সন্ধ্যায় 'প্রদেশের' বিভিন্ন স্থানে আর্মির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরবর্তী কর্মসূচি হিসেবে ২৭ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেছিলেন এবং পাট ও পাটজাত পণ্য রফতানী এবং টেলিযোগাযোগের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন।[৭৮] এ সন্ধ্যায়ই শেখ মুজিবের বার্তাবাহক সংবাদপত্রের অফিসে তার স্বাক্ষরিত একটি ইশতেহার বিলি করেছিলো, যাতে বলা হয়:

> প্রেসিডেন্টের সহিত আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। ক্ষমতা হস্তান্তর ব্যাপারে আমরা ঐকমত্যে পৌছেছি। আশা করি প্রেসিডেন্ট এবার তাঁর ঘোষণা করবেন।[৭৯]

এমনি আরো বেশ কিছু প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয়, আসন্ন সামরিক অভিযানের নিশ্চিত তথ্য জানার পরও শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেননি। অনেকের মতে,

i. শেখ মুজিব 'স্বাধীনতার' জন্য প্রস্তুত ছিলেন না[৮০]
ii. তাই তিনি ভারতের সাথে এ জন্য যোগাযোগ করতে যেয়েও করেননি[৮১]
iii. তাজউদ্দীনসহ দলীয় শীর্ষ নেতাদের ঢাকার আশে পাশেই আত্মগোপনের নির্দেশ দেন[৮২]
iv. কাউকেই ভারতে যাবার নির্দেশ দেননি-যা ভারতের বিষয়ে তার অনাস্থার পরিচায়ক[৮৩] এবং
v. মুক্তিযুদ্ধকে আপন শ্রেণী স্বার্থের বিরোধী বিবেচনা করে শেখ মুজিব 'অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ যুদ্ধের' কথা জেনেও 'অপ্রস্তুত জাতিকে প্লাবনে ডুবিয়ে' 'মধ্যযুগীয় নাইটের মতো বীরত্ব সহকারে' আত্মসমর্পণ করেন।[৮৪]

শেখ মুজিব বাংলাদেশবাসীকে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা না দিয়ে ২৫ মার্চ রাত ১টা থেকে দেড়টার মধ্যে[৮৫] গ্রেফতার হন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত দেশবাসী পাকিস্তানী বাহিনীর সর্বগ্রাসী আক্রমনের মুখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। অন্যান্য রাজনীতিকদের মতো

---

৭৭ *তদেব*, পৃ. ২৭৮।
৭৮ *তদেব*, খণ্ড ০২, পৃ. ৭৮৭।
৭৯ মাহবুবুল আলম, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত*, ঢাকা: ১৯৮২, পৃ. ৪০।
৮০ *তদেব*।
৮১ মঈদুল হাসান, *মূলধারা '৭১*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৮৬, পৃ. ১০।
৮২ *তদেব*, পৃ. ৮-৯।
৮৩ মতিউর রহমান চৌধুরী, "শেখ মুজিব চুক্তিটি অগ্রাহ্য করলেন", *সাপ্তাহিক খবরের কাগজ*, ঢাকা, ১ জানুয়ারী ১৯৯০।
৮৪ আলী রীয়াজ, *শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: আনন্দধারা, ১৯৮২, পৃ. ২৬।
৮৫ মওদুদ আহমদ, *বাংলাদেশ: কন্সটিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৮৬, পৃ. ২৪৯।

ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এবং *উলামা* অংশত এ জন্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় হওয়া থেকে বিরত থাকেন বলে প্রতীয়মান হয়।

স্বাধীনতা ঘোষণায় সমাজতন্ত্রীদের অতি উৎসাহ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণায় কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের অতি উৎসাহ 'ইসলামপন্থী রাজনীতিক ও *উলামার* মাঝে' গভীর সন্দেহ ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য ছিলো নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে নিঃশর্তভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে সামরিক জান্তাকে বাধ্য করা। এতে করে নির্বাচনী ঘোষণা অনুযায়ী আওয়ামী লীগ তার 'ছয় দফাভিত্তিক' শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে পাকিস্তান শাসনের সুযোগ পেতো।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন এ অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে বামপন্থী এবং প্রধানত মস্কোপন্থী কিছু দল ও গ্রুপ স্বাধীনতার ডাক দিয়ে 'রীতিমতো' স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিলো। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নমুনা:

এক. ১৯৭১ সালের ২ মার্চ 'পূর্ব বাংলা শ্রমিক আন্দোলনের বিপ্লবী পরিষদ' শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্যে এক খোলা চিঠিতে বলে:

> পূর্ব বাংলার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে স্বাধীন গণতান্ত্রিক, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ, প্রগতিশীল পূর্ব বাংলার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করুন। পূর্ব বাংলার জাতীয় মুক্তি বাহিনী গঠন এবং শহর ও গ্রামে জাতীয় শত্রু খতমের ও তাদের প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের আহবান জানান।[৮৬]

দুই. ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ 'কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের পূর্ব বাংলা সমন্বয় কমিটি' স্বাধীন বাংলাদেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে গেরিলা যুদ্ধের আহ্বান জানিয়ে এক ইশতেহারে বলে:

> পূর্ব বাংলার মাটি আজ রক্ত চায়। ... আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, নির্বাচনের মাধ্যমে আপোষে বাংলার স্বাধীনতা আসিবেনা-আসিবেনা পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত তথা সমগ্র জনতার মুক্তি। ... তাই পূর্ব বাংলার কৃষক গ্রামে গেরিলা যুদ্ধ শুরু কর। শাসক গোষ্ঠীর হাত হইতে ক্ষমতা ছিনাইয়া লও। গ্রামে বাংলার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দাও।[৮৭]

তিন. পূর্ব পাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি ১৯৭১ সালের ৯ মার্চ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানায়। তাদের প্রচারপত্রে বলা হয় :

> বাংলাদেশের জনগণ আজ গণতন্ত্র ও নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে এখানে পৃথক ও স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কায়েম করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।[৮৮]

চার. ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানের জনসভায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আহবান সংবলিত এক প্রস্তাবে বলে:

---

৮৬ হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *প্রাগুক্ত*, খণ্ড ২, পৃ. ৬৬৩।

৮৭ *তদেব*, পৃ. ৬৯৬।

৮৮ *তদেব*, পৃ. ৭০৯।

এই সভা পাকিস্তানী ঔপনিবেশিকদের কবল হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা কায়েমের জন্যে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন বাংলাদেশে কৃষক শ্রমিক রাজ কায়েমের শপথ গ্রহণ করিতেছে।[৮৯]

পাঁচ. ১৯৭১ সালের ১১ মার্চ এক প্রচারপত্রে ছাত্র ইউনিয়ন বলেঃ

সকল প্রকার শোষণমুক্ত বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় গণতান্ত্রিক স্বাধীন বাংলা কায়েমের লক্ষ্য সামনে রাখিয়া বর্তমান সংগ্রামকে অগ্রসর করিয়া লইবার আশ্বাস আমরা জানাইতেছি।[৯০]

উদ্ধৃত নমুনাগুলো থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায়, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিঃশর্ত ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে অসহযোগ আন্দোলন চালালেও এর সমান্তরালে কম্যুনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও বামপন্থী বলে পরিচিত দল ও গ্রুপগুলো 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত রাখে। 'বামপন্থী পরিচয়হীন' ছাত্রলীগও এর 'স্বাধীন বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার ইশতেহারে 'সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার' কথা বলে। ইসলামপন্থী দল ও গ্রুপগুলো এসব দল ও গ্রুপের দাবি ও আন্দোলনের সাথে সঙ্গতকারণেই একমত হতে পারছিলো না। কারণ 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' ইসলামপন্থীদের কোনোভাবেই কাম্য ছিলো না। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের 'অহিংস ও অসহযোগ'[৯১] আন্দোলন ও এসব বামপন্থী কম্যুনিস্ট-সমাজতন্ত্রীদের আন্দোলনের মধ্যকার পার্থক্য ও বিভ্রান্তি নিরসনে আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব উদ্যোগী হননি। আন্দোলনের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের 'এটা ছিল সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা'।[৯২] আন্দোলনের প্রকৃতি ও লক্ষ্য বিষয়ক এই অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও সন্দেহই এতে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীসহ *উলামাকে* সংশ্লিষ্ট হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে অথবা সংশ্লিষ্ট হতে বাধা সৃষ্টি করে বলে দাবি করার সুযোগ আছে।

যুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থতা

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করতে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীগণ এবং এ দেশের *উলামা* ব্যর্থ হয়েছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কম্যুনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' আন্দোলনের ব্যাপকতায় ইসলামপন্থী দল-গোষ্ঠী- ব্যক্তিগণ চিন্তিত ও শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। প্রধানত ইসলাম বিরোধী সেই আন্দোলন বিষয়ে শেখ মুজিবের অস্পষ্ট অবস্থানের কারণে তারা অধিকতর বিভ্রান্তিতে পড়েন। এমনি প্রেক্ষাপটে যখন ২৬ মার্চ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলো, ইসলামপন্থী দল-গোষ্ঠী-ব্যক্তিগণ ধারণা ও বিশ্বাস করতে শুরু করলেন এ সেই কম্যুনিস্ট-সমাজতন্ত্রীদেরই আন্দোলনের ধারাবাহিকতা। বাস্তবে এ ধারণা ও বিশ্বাস যথার্থ ছিলো না।

---

৮৯ *তদেব*, পৃ. ৬৬৬।

৯০ *তদেব*, পৃ. ৭৩৪।

৯১ কমরুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮।

৯২ আবুল আসাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী পরিচালিত *অপারেশন সার্চ লাইট* নামের গণহত্যাযজ্ঞের পর যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তাতে প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ প্রভৃতি তত্ত্বকথার আগ্রাসী প্রবক্তাদের অংশ গ্রহণ দৃষ্টিগ্রাহ্য ছিলো না। এতে কাদের অংশ গ্রহণ ছিলো?

> মূলতঃ নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী বাহিনীর আকস্মিক হামলা, নির্বিচার হত্যা, তুলনাহীন বর্বরতার প্রতিক্রিয়া হিসাবে স্বাধীনতার দাবি রাতারাতি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।[৯৩]

বাংলাদেশের এ মুক্তিযুদ্ধে একদিকে ছিলেন 'বিভিন্ন সংগঠিত বাহিনীভুক্ত' দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী সদস্যগণ অর্থাৎ সশস্ত্র বাহিনী, ই পি আর, পুলিশ, আনসারের বিদ্রোহী বাঙ্গালী সদস্যগণ এবং অন্যদিকে ছিলেন দল-মত নির্বিশেষে দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী তরুণ-যুবকগণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটিও আসে একটি নিরুপায় পরিস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্বানুভূতি থেকেই।

> ২৭শে মার্চ সন্ধ্যায় ৮-ইবি'র বিদ্রোহী নেতা মেজর জিয়াউর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেন। মেজর জিয়া তাঁর প্রথম বেতার বক্তৃতায় নিজেকে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে ঘোষণা করলেও পরদিন স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা প্রকাশ করেন। এইসব ঘোষণায় বিদ্যুতের মত লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে শেখ মুজিবের নির্দেশে সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালীরা স্বাধীনতার পক্ষে লড়াই শুরু করেছে। কিন্তু চট্টগ্রাম বেতারের এইসব ঘোষণার পিছনে না ছিল রাজনৈতিক অনুমোদন, না ছিল কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি।[৯৪]

মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী 'নিরুপায় বিভিন্ন বাহিনীভুক্ত সদস্যদের' 'নিরুপায় অবস্থাটি' কেমন ছিলো?

> সামরিক আক্রমণের অবর্ণনীয় ভয়াবহতার ফলে সাধারণ মানুষের চোখে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত অস্তিত্বের অবশিষ্ট যুক্তি রাতারাতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ... যারা আক্রান্ত অথবা বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্যে পরিণত হয়, তারা অচিরে জড়িয়ে পড়ে প্রতিরোধ লড়াইয়ে। ... মেজর জিয়ার ঘোষণা এবং বিদ্রোহী ইউনিটগুলোর মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হবার ফলে এই স্থানীয় ও খণ্ড বিদ্রোহ দ্রুত সংহত হতে শুরু করে। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িত হবার বিষয়টি এদের জন্যে মূলতঃ ছিল অপরিকল্পিত, স্বতঃস্ফূর্ত এবং উপস্থিত সিদ্ধান্তের ব্যাপার। ... বিদ্রোহ ঘোষণার সাথে সাথে পাকিস্তানী বাহিনী সীমান্ত পর্যন্ত এমনভাবে এদের তাড়া করে নিয়ে যায় যে, এদের জন্যে পাকিস্তানে ফিরে আসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়। 'কোর্ট মার্শাল' নতুবা স্বাধীনতা- এই দু'টি ছাড়া অপর সকল পথই তাদের জন্য বন্ধ হয়ে পড়ে।[৯৫]

---

[৯৩] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।

[৯৪] *তদেব*, পৃ. ৫১।

[৯৫] *তদেব*, পৃ. ৬-৭।

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার মেজর এম এ জলিল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সামরিক-বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধাদের এভাবে মূল্যায়ন করেছেন:

> এর[৯৬] বাইরে যে ছাত্র সমাজ বা রাজনৈতিক সংগঠন ছিল তাদের জন্য মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ছিল গতানুগতিক দেশ প্রেমিকদের দায়িত্বস্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধের উপরোক্ত নির্দিষ্ট চেতনায়[৯৭] উদ্বুদ্ধ হয়ে নয়। মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী, পুলিশ, ইপিআর, আনসার, অন্যান্য চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি মহলের ক্ষেত্রে এ কথাই প্রযোজ্য। এদের মধ্যে আবার অনেকেই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে নিতান্তই বাধ্য হয়ে-প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে, কেউ কেউ করেছে সুবিধা অর্জনের লোভ-লালসায়, কেউ করেছে পদ-যশ অর্জনের সুযোগ হিসেবে, কেউ করেছে তারুণ্যের অন্ধ আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে এবং কতিপয় লোক অংশ গ্রহণ করেছে 'এডভেঞ্চার ইজম' এর বশে। এ সকল ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, নিষ্ঠা এবং সততারও তীব্র তারতম্য ছিল।[৯৮]

ভারতীয় লেখক অশোকা রায়না তার *'ইনসাইড র'-দি হিস্ট্রী অব ইন্ডিয়াস সিক্রেট সার্ভিস'* গ্রন্থে মুক্তিযোদ্ধাদের চার ভাগে ভাগ করেছেন:

১. ১৫-২০ বছর বয়স্ক সর্বস্তরের তরুণ যুবক,
২. আওয়ামী লীগের উগ্রবাদী তরুণ যুবক সমন্বয়ে একদল,
৩. আধা সামরিক বাহিনী (ইপিআর, আনসার, মুজাহিদ, পুলিশ ও ফ্রন্টিয়ার গার্ডস),
৪. নিয়মিত বাহিনীর সৈনিকবৃন্দ বিশেষ করে 'ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট'।[৯৯]

মঈদুল হাসান তার 'মূলধারা' ৭১' শীর্ষক গ্রন্থে মুক্তিযোদ্ধাদের ৩টি 'স্বতন্ত্র ধারার' কথা বলেছেন:

১. ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ইপিআর-এর সেনা ও অফিসারবৃন্দ,
২. 'মুজিব বাহিনী' গঠনকারী শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ চার যুবনেতার অনুগত তরুণ-যুবকবৃন্দ ও
৩. আওয়ামী লীগের সমগ্র নেতা-কর্মীবৃন্দ।[১০০] এই তৃতীয় ধারাটিকে মঈদুল হাসান মুক্তিযুদ্ধের *'মূলধারা'* হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

অশোকা রায়নার তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগের মুক্তিযোদ্ধাদেরকে মঈদুল হাসান তার 'তিন ধারার' প্রথম ধারায় চিহ্নিত করেছেন। অশোকা রায়নার '১৫-২০ বছর বয়স্ক সর্বস্তরের তরুণ-যুবক' ও মঈদুল হাসানের 'আওয়ামী লীগের সমগ্র নেতা কর্মীদের' 'এক করে' দেখার যথেষ্ট সুযোগ নেই। কারণ মঈদুল হাসান কেবল আওয়ামী লীগ দলীয় নেতা-কর্মীদেরই চিহ্নিত করেছেন এখানে আর অশোকা রায়না 'সর্বস্তরের তরুণ-যুবকদের' কথা উল্লেখ করেছেন। বাস্তবে 'সর্বস্তরের' ও 'সর্বদলীয়' সাধারণ মানুষই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

---

[৯৬] ছাত্রলীগের ক্ষুদ্র অংশ ও কম্যুনিস্টদের-বর্তমান গবেষক।

[৯৭] *'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ রাষ্ট্র'*-বর্তমান গবেষক।

[৯৮] মেজর এম এ জলিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯।

[৯৯] অশোকা রায়না, *ইনসাইড র' : দি ইন্ডিয়াস সিক্রেট সার্ভিস*, ঢাকা: মিলারস প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ৬৭।

[১০০] মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮।

অশোকা রায়না যাদের 'আওয়ামী লীগের উগ্রপন্থী তরুণ-যুবক' বলেছেন, মঈদুল হাসানের উপস্থাপনায় তারাই 'মুজিব বাহিনী গঠনকারী শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ চার যুবনেতার[১০১] অনুগত তরুণ-যুবকবৃন্দ।

এই যুব নেতাদের নেতৃত্বেই ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশের' দাবি উত্থাপিত হয় অসহযোগ আন্দোলনের সময়। এদের গঠিত 'মুজিব বাহিনী' ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'গেরিলা যুদ্ধের' এবং 'সমাজতন্ত্রের' প্রশিক্ষণ লাভ করে।

কিন্তু সমাজতন্ত্রপন্থী এই *মুজিব বাহিনী* তাদের 'যুদ্ধের প্রশিক্ষণ কাজে লাগাবার' আগেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রায় সমাপ্ত হয়ে যায়। মুজিব বাহিনীর নেতা আবদুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে বলেনঃ

> আমরা কমিউনিস্টদের হত্যা করার নির্দেশ দেইনি। আমাদের চারজনের বৈঠকে এ ধরনের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। কোন সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্ন আসলে আমাদের চারজনের বৈঠক হতো। হাঁ, আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যদি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বাহিনী[১০২] আমাদের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো। এড়াতে না পারলে প্রতিরোধ করবো। কিন্তু কমিউনিস্ট বাহিনীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষ হয়নি। আর কমিউনিস্ট বাহিনী তো ভেতরে ঢুকতেই পারেনি। তখন তো তারা ট্রেনিং নিচ্ছে। কমিউনিস্ট বাহিনী আসলে যুদ্ধে যেতেই পারেনি। আমাদের বাহিনী ট্রেনিং নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। কাজ কেবল শুরু করেছি। আমরা তো সর্বাত্মক যুদ্ধ করতে পারিনি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল-মুজিব বাহিনী প্রথমে ভেতরে ঢুকবে। তারপর অস্ত্রশালা তৈরী করবে। এরপর আশ্রয়স্থল গড়ে তুলবে। তারপর সংগঠন গড়ে তুলবে, -মুজিব বাহিনীর সংগঠন। এরপর থানা কমান্ড করবে। থানা কমান্ড করার পর প্রথম কার্যক্রমটা হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী অর্থাৎ রাজাকারদের ওপর হামলা চালাবে, তাদের সরবরাহ লাইনের ওপর হামলা চালাবে। গেরিলা কৌশলে ওদের দুর্বল করে দেবে। সর্বশেষ হলো, ওরা যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন পাক বাহিনীর ওপর আঘাত হানো। আমরা তখন এ কাজই করছি। প্রাথমিক কাজ আমাদের মোটামুটি হয়ে গিয়েছিল। সংগঠন আমাদের গড়ে উঠেছিল। আমাদের রিক্রুটমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ট্রেনিং প্রাপ্ত সদস্যরা যেখানে যেতে পেরেছে, সেখানেই থানা কমান্ড হয়ে গেছে। আমরা জনগণের সাথে মিলে যুদ্ধ করছি। কিছু কিছু রাজাকারও খতম হচ্ছে। কিন্তু মূল জায়গাটা মানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামনে না পড়লে, যুদ্ধ করিনি। দু'চার জায়গায় সামনে পড়ে গেছি, লড়াই হয়েছে। আমরা তো যুদ্ধ শুরুই করিনি। আমাদের তো পাঁচ বছরের পরিকল্পনা। প্রথম বছরে কী করবো, তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে কী করবো। তারপর সরকার গঠন করবো। এই ছিল আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমরা যদি সফল হতাম তাহলে কোন ঘাস থাকতো না, আগাছা থাকতো না। সমাজদেহ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতাম। প্রতিবিপ্লবীদের থাকতে হতো না। হয় মটিভেট হয়ে এদিকে আসতে হতো। নইলে নিশ্চিহ্ন হতে হতো।[১০৩]

---

১০১ সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ-বর্তমান গবেষক।

১০২ অর্থাৎ *মুক্তিবাহিনী*-বর্তমান গবেষক।

১০৩ মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ*, ঢাকাঃ প্রকাশক-মাহমুদ কলি, ১৯৯১, পৃ. ১৩৫-১৩৫।

আরেক সাক্ষাৎকারে হাসানুল হক ইনু জানান,

> ১৯৭১ সালের ২০ নভেম্বর তাদের তানদুয়া প্রশিক্ষণ ক্যাম্প কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই বন্ধ করে দেয়া হয় এবং পরবর্তী ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা সবাই তানদুয়া ক্যাম্পে 'আটকাবস্থার' মধ্যে ছিলেন।[১০৪]

উদ্ধৃত প্রথম সাক্ষাৎকারে আবদুর রাজ্জাক বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের 'মূল স্রোত' মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে এবং চীনপন্থী কম্যুনিস্ট মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে 'অস্ত্র ধারণের' আনুষ্ঠানিক কোনো 'সিদ্ধান্তের' কথা অস্বীকার করেছেন এবং একটি কার্যকর ৫ বছরব্যাপী গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে 'আগাছা' ও 'প্রতিবিপ্লবীমুক্ত' সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। আবদুর রাজ্জাক স্পষ্ট করেই উচ্চারণ করছেন: *আমরাতো যুদ্ধ শুরুই করিনি*। অন্যদিকে হাসানুল হক ইনু জানাচ্ছেন, ২০ নভেম্বর (১৯৭১) নাগাদ প্রশিক্ষণ শিবিরের 'কাজ' বন্ধ ঘোষণা করা হলেও তাদেরকে 'যুদ্ধক্ষেত্র' বাংলাদেশে আসতেই দেয়া হয়নি।

উপস্থাপিত তথ্য, প্রমাণ ও সাক্ষাৎকারসমূহ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়, 'স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠাকামী দল ও গোষ্ঠীগুলো কার্যত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশই নেয়নি। তাহলে কারা মুক্তিযুদ্ধ করেছেন? মুক্তিযুদ্ধ করেছে প্রধান দু'টি ধারার মুক্তিযোদ্ধাগণ। এক ধারায় ছিলেন সশস্ত্র বাহিনী ও ইপিআর, পুলিশ, আনসার প্রভৃতি সংগঠিত বাহিনীর দেশপ্রেমিক বাঙ্গালী কর্মকর্তা ও সদস্যবৃন্দ এবং অন্য ধারায় ছিলেন আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন মুক্তিযুদ্ধপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী ও অগণিত অরাজনৈতিক তরুণ-যুবকবৃন্দ, যারা সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন না। এ দুই ধারার মুক্তিযোদ্ধার বাইরে যশোরাঞ্চলে আবদুল হক, নোয়াখালী অঞ্চলে মোহাম্মদ তোয়াহা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে সিরাজ শিকদার ও নরসিংদীর শিবপুরে আবদুল মান্নান ভূঁইয়ার মতো দেশের কয়েকটি অঞ্চলে চীনপন্থী বাম রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা কম বেশি সংগঠিত হয়ে দেশের ভেতরে থেকেই মুক্তিযুদ্ধ চালিয়ে গেছেন।

একজন বিশ্লেষক লিখছেন:

> ... ২৫শে মার্চের রাতে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ সাড়ে চার শতাধিক এম এন এ-এম পি এ এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও শ্রমিক লীগের নেতৃবৃন্দ ঢাকায়ই ছিলেন। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করাই যদি ভূট্টো-টিক্কা গং এর লক্ষ্য থাকত, তাহলে তা তারা অনায়াসেই করতে পারতেন। কিন্তু তাদের মধ্যে থেকে একজনও মারা পড়লেন না বা গ্রেফতারও হলেন না। অথচ নিরীহ মানুষের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালানো হল। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে, পাকিস্তানের হেফাজত করা পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিল না, বরং উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ পন্থার পরিবর্তে রক্তাক্ত পন্থায় পাকিস্ত ানের দু'টি অংশকে বিছিন্ন করে দেয়া। এই বিচ্ছিন্নতার জন্য পাকিস্তানের ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিব যতটুকু ধৈর্য ধারণের পক্ষপাতী ছিলেন ক্ষমতা লোলুপ ভূট্টো

---

[১০৪] *তদেব*, পৃ. ১৫০।

> পাকিস্তানের অপরাংশের প্রধানমন্ত্রীত্বের জন্য অতটুকু অপেক্ষা করতেও রাজী ছিলেন না। তাই জনযুদ্ধের সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাকে ত্বরান্বিত করাই ছিল ভূট্টো এবং তাঁর অনুগত সামরিক অফিসারদের উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকে এই পরিস্থিতি অধ্যয়নে ভুল করলেন, পাক বাহিনীর এ অভিযানকে পাকিস্তান রক্ষার অভিযান বলে মনে করলেন।[১০৫]

বস্তুত দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল দুই স্রোতের উপস্থিতি ও সক্রিয়তা বিষয়ে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ ও এ দেশের *উলামা* যথার্থ মূল্যায়ন করতে সক্ষম হননি। তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো মূলত রাজনৈতিক নেতৃত্বদানকারী ভারতভিত্তিক আওয়ামী লীগের 'প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার', ভারত ও সমাজতন্ত্রপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলোর প্রতি। বস্তুত পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর *অপারেশন সার্চ লাইট* অধ্যয়নে যারা ভুল করেছিলেন, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো এবং রাজনীতিতে সক্রিয় *উলামার* বেশির ভাগ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধিতে ব্যর্থতাই বাংলাদেশের *উলামাকে* মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় হওয়া থেকে বিরত রাখে।

পাকিস্তান প্রীতি

বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলোর পাকিস্তান প্রীতির প্রেক্ষাপটে তাদের মধ্যকার ভারতভীতির প্রসঙ্গটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলো। অবিভক্ত বৃটিশ-ভারতে 'বিভিন্ন পর্যায়ের মুসলিম স্বার্থের' প্রতি 'হিন্দু প্রাধান্যের' কংগ্রেসের বৈরী আচরণ ইসলামপন্থী দল ও গোষ্ঠীগুলোর মাঝে ভারতভীতি সৃষ্টি করেছিলো। দারুল উলুম দেওবন্দের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ-এর ধারা থেকে মাওলানা আশরাফ আলী থানবীর অনুগামী মাওলানা জাফর আহমদ উসমানী ও মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর নেতৃত্বে ঐতিহ্যবাদী *উলামার* একটি অংশ 'পাকিস্তান আন্দোলনের' পক্ষে বেরিয়ে আসেন। তারা গঠন করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। *উলামার* এ ধারাটি বাংলাদেশ অঞ্চলে ব্যাপক প্রভাব সৃষ্টি করে। এই *উলামার* সমর্থন-সক্রিয়তায় পাকিস্তান আন্দোলন বেগবান ও ত্বরান্বিত হয়। অবশেষে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় এ অঞ্চলের *উলামার* শ্রম-ঘাম-মূল্যের কারণে তাদের মাঝে রাষ্ট্রটির প্রতি এক গভীর মমত্ববোধেরও সৃষ্টি হয়েছিলো। তাই ১৯৭১ সালে যখন দেশটির সামরিক জান্তা এ অঞ্চলের গণমানুষের ওপর গণহত্যাসহ যাবতীয় জুলুম নির্যাতন চাপিয়ে দেয়, তখন এই *উলামা* এক ধরনের উভয় সংকটে পড়ে যান। একদিকে তাদের শ্রম-ঘাম-মূল্যের প্রিয় সৃষ্টি পাকিস্তানের অস্তিত্ব এবং অন্যদিকে তাদের প্রিয় জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়া হত্যা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জনগণকে মুক্ত করার অনিবার্য 'যুগের নির্দেশ'। এ দেশের *উলামা* 'প্রিয় সৃষ্টি' পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে বা বিভক্ত করতে স্পষ্টতই ইতস্তত ছিলেন। কিন্তু জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত নির্যাতনযজ্ঞের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা ইতস্তত

---

[১০৫] মুহাম্মদ নূর হুসাইন শওকত, *আইডিএল : একটি বিপ্লবী চেতনা*, ঢাকা: দীয়া প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃ. ১৩।

ছিলেন না। তারা শান্তি কমিটির মাধ্যমে জনগণ ও সামরিক জান্তার মধ্যবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে অত্যাচার-জুলুম প্রতিহত করা অথবা ন্যূনতম করার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য এই *উলামার* একটি ক্ষুদ্র অংশ প্যারা মিলিশিয়া এবং অন্য কয়েকটি রাজাকার এবং অন্য কয়েকটি বাহিনীতেও যুক্ত হয়েছিলেন এবং তারও একটি অতি ক্ষুদ্র অংশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার-নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এ অঞ্চলের *উলামা* প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ব্যর্থ হলেও জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয়ও হননি। তবুও এ পর্যায়ে শেষ কথাটি এমনঃ পাকিস্তানের প্রতি এক ধরনের অন্ধ প্রীতির কারণেই এ অঞ্চলের *উলামা* প্রত্যক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করা অথবা কিছু ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত সাতটি কারণ বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয় *উলামার* সবার ক্ষেত্রে অথবা সকল ক্ষেত্রে যৌথভাবে একই সময়ে কার্যকর ছিলো, তেমন দাবি করার সুযোগ কম। তবে উল্লিখিত কারণগুলো মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা অথবা কিছু ক্ষেত্রে বিরোধিতা করার জন্য *উলামাকে* বিভিন্নভাবে ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী পর্যায়ে উৎসাহিত করেছে অথবা বাধ্য করেছে।

আগেও যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের মোট *উলামার* একটি বিরাট ও উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনীতি বিষয়ে অসচেতন এবং রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ ছিলেন। এ অবস্থাটি বাংলাদেশের ২০০১-পরবর্তী বাস্তবতায় যতটুকু বিদ্যমান, ১৯৭১ সালের বাস্তবতায় তা আরো অনেক বেশি মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। ১৯৭১ সালের বাস্তবতায় যে ক্ষুদ্র সংখ্যক *উলামা* ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগতভাবে রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন, তার একটি বড়ো অংশ 'মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে' নিষ্ক্রিয় ও নিরব ছিলেন। অবশিষ্ট আরো স্বল্প সংখ্যার *উলামার* একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করা থেকে বিরত থাকেন এবং অন্য একটি অংশ মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা করেন। মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতাকারী *উলামার* হাতে গোণা কয়েকজন *আলিমের* বিরুদ্ধে নানা মাত্রার নির্যাতনসহ অপরাধমূলক কার্যক্রমের প্রমাণযোগ্য অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিলো। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের মতো জনযুদ্ধে বাংলাদেশের *উলামার* প্রকাশ্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ না থাকা এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশ সরকারের সাধারণভাবে *উলামা* বিরোধী অথবা *উলামার* মর্যাদার পরিপন্থী নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের *উলামার* 'মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট' ভাবমূর্তি সাধারণভাবে নেতিবাচক হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। একইসাথে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের রাতের *অপারেশন সার্চ লাইট* ও পরবর্তী দিনগুলোয় পাকিস্তানী সামরিক জান্তার নৃশংস ও যুদ্ধাপরাধমূলক কার্যক্রমের সমর্থক ও সহায়ক স্বল্প সংখ্যক *উলামার* অবস্থানকে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে, তা একটি গুরুতর প্রশ্ন বটে।

চতুর্থ অধ্যায়
বাংলাদেশে আলিম নেতৃত্বের দল

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব থেকে এ অঞ্চলে *উলামা* নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (মাহমুদ-হাজারভী) সক্রিয় ছিলো। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর সাংবিধানিক মূলনীতি[১] ও বিধানের[২] আওতায় 'ধর্মসংশ্লিষ্ট ও ধর্মভিত্তিক সকল রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী নিষিদ্ধ হওয়ায়' *উলামা* নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলগুলো অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদটি ছিলো এমন:

'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য

(ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
(খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,
(গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার,
(ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন বিলোপ করা হইবে।'

এ অনুচ্ছেদটির নাম দেয়া হয় *ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা*।[৩]

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়:

'জন শৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে;
তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না'।[৪]

অবশ্য বর্তমান বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম (মাহমুদ-হাজারভী) ছাড়া সকল ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বরই নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, যা ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাস্তবে কার্যকর হয়।[৫]

---

১ ধর্মনিরপেক্ষতা।

২ সংবিধানের বিলুপ্ত অনুচ্ছেদ নং-১২ ও ৩৮ অনুচ্ছেদের *শর্তাংশ*।

৩ ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যার প্রথম খণ্ড ১২।

৪ ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যার প্রথম খণ্ড ১৪।

৫ মুহাম্মদ নূর হুসাইন শওকত, *আইডিএল : একটি বিপ্লবী চেতনা*, ঢাকা: দীয়া প্রকাশনী, ১৯৮০, পৃ. ১৪।

১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই সরকার *রাজনৈতিক দল বিধি* (পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন্স-*পিপিআর*) ঘোষণা করে।

এই রাজনৈতিক দল বিধিতে ছিলো:

১. বিদেশী সাহায্য ও সহযোগিতায় কোন দল গঠন, সংগঠন বা আহ্বান করা যাবে না; এমনকি কোন ব্যক্তি এ ধরনের দলের সঙ্গে কোনরূপ সম্পর্কও রাখতে পারবে না।

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কোনরূপ প্রচারণা ও আপত্তিকর কার্যকলাপে লিপ্ত কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না।

৩. প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে দলীয় তৎপরতা শুরু করার পূর্বে এই দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, গঠনতন্ত্র, কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, দলীয় তহবিলের উৎস, জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানকল্পে দলের পরিকল্পনা সম্বলিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী পেশ করতে হবে।

৪. সকল প্রকার গোপন কার্যকলাপ ও সশস্ত্র সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দলের কোন সশস্ত্র বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বা অনুরূপ কোন সংগঠন থাকতে পারবে না।

৫. সকল রাজনৈতিক দলকে আদায়কৃত চাঁদা, প্রাপ্ত সাহায্য ও দানের রসিদ প্রদান করতে হবে এবং দলীয় তহবিল সরকার অনুমোদিত ব্যাংকের মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে।

৬. কোন জীবিত বা মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কোনরূপ ব্যক্তি-পূজার উদ্রেক বা ব্যক্তিত্বের মাহাত্ম্য প্রচার বা বিকাশ নিষিদ্ধ করা হয়।

৭. নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রেও কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে পূর্বাহ্নে কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় পেশ না করে কোন রাজনৈতিক দল কোন প্রকার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না।

৮. রাজনৈতিক দলবিধি অমান্যকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং এই শাস্তি সম্পত্তি ও তহবিল বাজেয়াপ্তসহ দলটিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাসপেন্ড হতে শুরু করে সম্পূর্ণ বিলোপ করা যাবে।

৯. সরকার ইচ্ছেমত সময় সময় নির্দেশ জারী করে যে কোন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন।

১০. সাময়িকভাবে বলবৎ অপরাপর আইনসমূহে যা-ই থাকুক না কেন তা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলবিধির কার্যকারিতা ঠিক থাকবে।[৬]

রাজনৈতিক দলবিধি (পিপিআর) ঘোষণা করার পর রাষ্ট্রপতি সায়েম অপর এক ঘোষণায় বলেন, ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ১৯৭৬ সালের ১৫ আগস্ট থেকে পুনরায় দলীয় কর্মকাণ্ড শুরু হবে।

---

৬ এম এ ওদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা: রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৯-১৪০।

ঘোষিত রাজনৈতিক দল বিধিতে ধর্মভিত্তিক বা ইসলামপন্থী দল গঠনে কোনো বাধা না রাখা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো। রাজনৈতিক দল বিধি জারির পর ইতঃপূর্বে নিষিদ্ধ ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দ একটি দলের আওতায় ঐক্যবদ্ধ হবার বিষয়ে সমঝোতায় উপনীত হন। নিষিদ্ধ দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী সর্বাধিক সংগঠিত দল ছিলো। দলটির জেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ঢাকায় ১৯৭৬ সালের ৫ ও ৬ আগস্ট একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলটির শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত হয়েছিলেন এবং ৯৩জন প্রতিনিধি দলীয় কার্যক্রম বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। তাদের মধ্যে ৬জন 'জামায়াতে ইসলামী'র নামে কার্যক্রম পরিচালনার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন এবং অবশিষ্ট ৮৭জন অন্যসব নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামী দল গঠনের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। তাতে একটি ঐক্যবদ্ধ ইসলামী দল গঠনের পক্ষে কনভেনশনে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সমঝোতার ভিত্তিতে ঢাকায় এডভোকেট শফিকুর রহমানের বাড়ীতে সাতটি ইসলামপন্থী দলের ঐক্যের সনদ স্বাক্ষরিত হয়। সনদটিতে বলা হয়:

> আমরা অধুনালুপ্ত কতিপয় ইসলামী দলের নেতৃবৃন্দ আল্লাহ্‌কে হাযির নাযির জেনে অঙ্গীকার করছি যে, আমরা অতীতের পরিচিতি ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ নতুন নামে একটিমাত্র ইসলামী দল গঠন করব।[৭]

সনদে জামায়াতের পক্ষে স্বাক্ষর করেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম ও মাওলানা এ কে এম ইউসুফ। এরপর ১৯৭৬ সালের ২৪ আগস্ট ঢাকায় এডভোকেট আবদুল জলিলের ঝিকাতলাস্থ বাসভবনে ইসলামপন্থী দলসমূহের নেতা-কর্মীদের সম্মিলিত কনভেনশনে সর্বসম্মতভাবে ঐক্যবদ্ধ ইসলামী দলটির নাম রাখা হয় ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল)। আইডিএল-এ যুক্ত হওয়া অন্য দলগুলো ছিলো: নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি), বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি (বিডিপি) ও ইমারত পার্টি। আইডিএল-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন *খতীবে আযম* নামে খ্যাত নেজামে ইসলাম পার্টির নেতা মাওলানা সিদ্দিক আহমদ, সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পান মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম এবং এডভোকেট শফিকুর রহমান সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত হন। আইডিএল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশে কার্যত *উলামা* নেতৃত্বের রাজনৈতিক দলের যাত্রা শুরু হয়।

এরপর বিভিন্ন ঘটনা পরম্পরার এক পর্যায়ে আইডিএল থেকে সাবেক জামায়াতের অধিকাংশ নেতা-কর্মী বেবিয়ে গিয়ে ১৯৭৯ সালের ২৫মে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ' নামে সংগঠিত দলে যোগদান করেন। ইতোমধ্যে আইডিএল-এর কাউন্সিল আহ্বান বিষয়ক জটিলতায় দলটির চেয়ারম্যান মাওলানা সিদ্দিক আহমদ ও সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট শফিকুর রহমান ১৯৭৭ সালের ২৩-অক্টোবর অনুষ্ঠিত দলটির

---

৭ নূর হোসেন মজিদী, *মওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৬৩।

রিকুইজিশন কাউন্সিলে বহিস্কৃত হবার পর মাওলানা সিদ্দিক আহমদ কিছুদিন আইডিএল নামে পৃথকভাবে কাজ করে পুনরায় 'নেজামে ইসলাম পার্টি' নামে কার্যক্রম শুরু করেন। উক্ত রিকুইজিশন কাউন্সিলে মাওলানা আবদুর রহীমকে আইডিএল-এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। ১৯৮৪ সালের ৩০ নভেম্বর আইডিএল-এর নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' রাখা হয়।

১৯৮২-র ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনা প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশে সামরিক আইন জারী করেন। ১৯৮৩-র ১ এপ্রিল থেকে দেশে 'ঘরোয়া রাজনীতির' অনুমতি দেয়া হয়। স্মরণ করা যেতে পারে, ১৯৮১-র ১৫ নভেম্বর অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হাফেয্জী হুজুর একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং রাজনীতিতে হঠাৎ আগমন করেও সোয়া চার লাখ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থান লাভ করেন। এ পর্যায়ে ১৯৮১-র ২৯ নভেম্বর তিনি খেলাফত আন্দোলন নামে দল গঠন করেন। ১৯৮৪ সালে হাফেয্জী হুজুরের নেতৃত্বে ১১ দলের সমন্বয়ে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' ('মুশতারেকা মজলিসে আমল') নামে একটি জোট গঠিত হয়। এ জোট থেকে তিন দফা কর্মসূচি ঘোষিত হয়:

> গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের অপসারণ, একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ ও গণভোটের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত ইসলামী সংবিধান অনুমোদন।[৮]

১৯৮৬ সালে সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের অধীনে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ বিষয়ক বিতর্কে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ভেঙ্গে যায়। খেলাফত আন্দোলনের ব্যানারে হাফেয্জী হুজুর এ নির্বাচনে অংশ নেন।

১৯৮৭-র ৩ মার্চ মাওলানা আবদুর রহীম ও *চরমোনাইর পীর* নামে খ্যাত মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীমের নেতৃত্বে কয়েকটি ইসলামী দলের সমন্বয়ে 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে একটি জোট গঠিত হয়। ইসলামী গণবিপ্লব সৃষ্টির লক্ষ্যে এ জোট স্বল্পস্থায়ী কিন্তু ব্যাপক মাত্রার আন্দোলন পরিচালনা করে। দাবি করা হয়, মাওলানা আবদুর রহীমের ইন্তেকালের (১ অক্টোবর ১৯৮৭) ফলে এ জোট অচিরেই স্তিমিত হয়ে আসে।[৯] অবশ্য বাস্তবে ১৯৯১-র পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকালে চরমোনাই-র পীর ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনকে একটি দলে পরিণত করে উক্ত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৮৬ সালে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ বিষয়ক ভিন্নমতের প্রেক্ষাপটে হাফেয্জী হুজুরের দল খেলাফত আন্দোলন থেকে তার দীর্ঘ দিনের সহচর ও সহকর্মী শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ও মাওলানা আবদুল গাফ্ফারের নেতৃত্বে নেতা-কর্মীদের একটি অংশ খেলাফত আন্দোলন নামে পৃথকভাবে কার্যক্রম চালাতে থাকেন। শায়খুল হাদীসের নেতৃত্বের খেলাফত আন্দোলন ১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর ইসলামী

---

৮ নূর হোসেন মজিদী, *মওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ২২২।

৯ তদেব, পৃ. ২২৩।

যুবশিবিরের সাথে যুক্ত হয়ে 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস' নামে এক দল হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে। স্মরণ করা যেতে পারে, জামায়াতে ইসলামীর সাথে আন্দোলন ও কর্মপদ্ধতির বিষয়ে কিছু নীতিগত ভিন্নতার কারণে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কিছু সাবেক নেতা-কর্মী মিলিত হয়ে ১৯৮২ সালে ইসলামী যুবশিবির নামে একটি ইসলামী যুব আন্দোলন শুরু করেছিলো।

নেতৃত্বে উলামা: চার দলের ঘটনা সমীক্ষা

বাহ্যত যেসব ইসলামী রাজনৈতিক দলকে *উলামা* নেতৃত্বের দল বলে মনে করা হয়, তেমন সব ক'টি দলের নেতৃত্বে তথা সে সব দলের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কমিটিসমূহে পর্যাপ্ত অথবা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক *আলিম* নেতা বাস্তবে নেই। বর্তমান বিশ্লেষণে **একটি রাজনৈতিক দলকে *উলামা* নেতৃত্বের দল** বলা হবে, **যদি দলটির নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ/কমিটিসমূহে শতকরা ৫০ ভাগের বেশি (৫০%+) পদে *আলিম* নেতা দায়িত্ব পালন করেন।** বর্তমান সমীক্ষায় নেজামে ইসলাম পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে *উলামার* অবস্থান ও অনুপাত ব্যাখ্যা করা হবে। বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট *উলামা* নেতৃত্বের দলগুলোর[১০] মধ্য থেকে এ চারটি দল বাছাই করার ক্ষেত্রে দলগুলোর বাহ্যিক সাংগঠনিক সামর্থ্য, জনসমর্থনের ব্যাপ্তি ও প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থানকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। দলগুলোর নেতৃত্বে একাধিক মেয়াদের কমিটির তুলনামূলক আলোচনায় *উলামার* অবস্থানের উত্থান-পতনও পরীক্ষা করে দেখা হবে।

নেজামে ইসলাম পার্টি

বর্তমান গবেষক চলতি গবেষণাকর্মের প্রস্তাব তৈরীর সময়ে *উলামা* নেতৃত্বের অন্যতম প্রাচীন দল জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টির (নেজামে ইসলাম পার্টি) নেতৃত্ব বিষয়ে সমীক্ষা পরিচালনার পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তা পর্যাপ্ত যৌক্তিকও ছিলো। এ লক্ষ্যে বর্তমান গবেষক নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি (১৯৯২) মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামীসহ কয়েকজন কেন্দ্রীয় নেতার সাথে শারীরিক উপস্থিতি, ডাক ও টেলিফোন মাধ্যমে কয়েক দফা যোগাযোগ করেন। কিছু মৌখিক বক্তব্য সংগ্রহ করতে পারলেও দলটির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট থেকে এ দলটির কেন্দ্রীয় কমিটিসমূহের দলিল সংগ্রহ করতে এ গবেষক ব্যর্থ হন। উল্লেখ করা যেতে পারে, প্রায় একই মাত্রার চেষ্টায় অন্য দলগুলোর 'নেতৃত্বের' দলিলসমূহ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৪৫ সালে কলকাতার মোহাম্মদ আলী পার্কে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানীর আহ্বানে এক *উলামা* সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। *শায়খুল হিন্দ* নামে খ্যাত মাওলানা মাহমুদুল হাসানের নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সমর্থক *উলামা* সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের বিপরীতে মাওলানা আশরাফ

---

[১০] ইত:পূর্বে দশটি ইসলামী রাজনৈতিক দলের একটি তালিকা দেয়া হয়েছে- বর্তমান লেখক।

আলী থানবীর অনুগামী-সহযোগী *উলামা* উক্ত সম্মেলনে গঠন করেন সর্বভারতীয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। সঙ্গত কারণেই এই *উলামা* সংগঠন মুসলিম লীগ রাজনীতির সহগামী হয়। তাতে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান দাবির' পক্ষে ব্যাপক মুসলিম সাড়া অর্জন করে। *দেওবন্দ আন্দোলন: ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান* শীর্ষক গ্রন্থের সৌজন্যে পাকিস্তান আমল থেকে দলটির শীর্ষ নেতৃত্বের একটি বর্ণনা এখানে উপস্থাপিত হলো:

> 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি শায়খুল ইসলাম মাওঃ হোসাইন আহমদ মদনী পাকিস্তানে বসবাসকারী তাঁর অনুসারীদের পাকিস্তানের উন্নতি, স্থায়িত্ব ও কুরআন-সুন্নাহর আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে নির্দেশ দেন। অপর দিকে জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওঃ শাব্বীর আহমদ উসমানী ও পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা আতহার আলী জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের পাকিস্তানে বসবাসকারী নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামী শাসন কায়েমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কিন্তু মুসলিম লীগ সরকারের তালবাহানা ও গড়িমশির কারণে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়নি। অবশেষে মাওঃ শাব্বীর আহমদ উসমানীর অনেক প্রচেষ্টার ফলে ১৯৪৯ সালে জাতীয় পরিষদে শাসনতন্ত্রের আদর্শ প্রস্তাব (কারারদাদে মাকাছেদ) পাশ হয়। যাকে মাওঃ শাব্বীর আহমদ উসমানী নিজেই ঢিলা-ঢালা প্রস্তাব বলে আখ্যায়িত করেন।
>
> ১৯৫০ সালের ১৮-২০শে ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মাছিহাতায় অনুষ্ঠিত জমিয়ত উলামায়ে ইসলামের এক সম্মেলনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি নির্বাচিত হন শর্ষীনার পীর মাওঃ নেছার উদ্দীন। তার বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে মাওলানা আতহার আলী প্রথমে কার্যকরী সভাপতি হিসাবে ও পরে সভাপতি হিসাবে জমিয়তের নেতৃত্ব দেন। ... ১৯৫২ সালের ১৮,১৯,২০শে মার্চ কিশোরগঞ্জের হায়বত নগরে জমিয়তের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এসম্মেলনে দেশবরেণ্য উলামায়ে কিরাম উপস্থিত ছিলেন। এ সম্মেলনে এ মর্মে সিদ্ধান্ত হয় যে সরকার সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিলে জমিয়তে উলামা সে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে, এবং রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড আঞ্জাম দেওয়ার জন্য জমিয়তের একটি পৃথক রাজনৈতিক সেল থাকবে, আর যেহেতু জমিয়তে উলামার রাজনৈতিক তৎপরতার মূল উদ্দেশ্য হবে *নেযামে ইসলাম* তথা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, অতএব এই সেলের নাম হবে " নেযামে ইসলাম পার্টি।" মাওঃ আতহার আলীকে উক্ত নেযামে ইসলাম পার্টির সভাপতি; মাওঃ মুসলেহ উদ্দীনকে সাধারণ সম্পাদক ও মাওঃ আশরাফ আলী (ধর্মমন্ডলী)কে সহ-সম্পাদক মনোনীত করা হয়।
>
> মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর ইন্তেকালের পর ডিসেম্বর ১৯৫২ সালে মুলতানে জমিয়তের কনভেনশনে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সভাপতি ও মাওলানা এহতেশামুল হক থানভী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।
>
> ১৯৫৪ সালে জমিয়তের নির্বাহী কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। মাওলানা মুফতী মুহম্মদ হাসান সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি অসুস্থ থাকায় মুফতি মুহম্মদ শফীকে ভারপ্রাপ্ত

সভাপতি মনোনীত করা হয়। অতঃপর ১৯৫৬ সালে জমিয়তের কনভেনশনে মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী সভাপতি ও মাওলানা গোলাম গাউছ হাজারভী সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে আইউব খাঁন সামরিক আইন তুলে নিলে জমিয়ত পুনরায় তৎপরতা শুরু করে এবং মাওঃ আব্দুল্লাহ দরখাস্তীকে সভাপতি ও মাওঃ গোলাম গাউছ হাজারভীকে সাধারণ সম্পাদক করে জমিয়তের নুতন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৬৩ সালে নেযামে ইসলামের যে দলীয় নির্বাচন হয় তাতে চৌধুরী মুহাম্মদ আলী সভাপতি ও এডভোকেট ফরীদ আহমদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এতে নেযামে ইসলামে উলামায়ে কিরামের নেতৃত্ব বলতে গেলে অবশিষ্ট থাকেনি। ১৯৬৭ ইং সালে করাচীতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে পার্টির উভয় পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সম্মতিতে নামের ক্ষেত্রে ভিন্নতা সৃষ্টির প্রয়োজনে নিজেদের দলের নাম মারকাযী জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও নেযামে ইসলাম ও 'নেযামে ইসলাম পার্টি' রাখার সিদ্ধান্ত হয় এবং এও সিদ্ধান্ত হয় যে সংক্ষেপে এ দলকে 'নেযামে ইসলাম পার্টি' নামেও অভিহিত করা যাবে। ১৯৬৯ সালে নেযামে ইসলাম পার্টির যে নির্বাচন হয় তাতে মাওঃ মুফতী শফীকে প্রধান উপদেষ্টা মাওঃ জাফর আহমদ উসমানীকে সভাপতি মাওঃ আতহার আলীকে কার্যকরী সভাপতি মনোনীত করা হয়। ফলে উলামায়ে দেওবন্দ নেযামে ইসলাম ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এই দুই নামে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। দু'দলই নিজেদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। ১৯৬৮/১৯৬৯ সালের দিকে এসে দুটি দলই উভয় পাকিস্তানে নিজেদের রাজনৈতিক অবস্থান যথেষ্ট সুদৃঢ় করে ফেলে এবং ১৯৭০ এর নির্বাচনে দু'দলই অত্যন্ত তৎপরতার সাথে অংশ গ্রহণ করে। সুতরাং বলা যায় যে ১৯৬৭ সালেই উলামায়ে দেওবন্দ বিভক্ত হয়ে পড়েন।...

১৯৬৯ সালে নেযামে ইসলামের কেন্দ্রীয় নির্বাচন অুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে মুফতী মুহাঃ শফীকে প্রধান উপদেষ্টা, মাওঃ জাফর আহমদ উসমানীকে সভাপতি, মাওঃ মুস্তফা আল্ মাদানীকে সহ-সভাপতি, মাওঃ এহ্তেশামুল হক থানভীকে প্রধান কায়েদ বা নেতা ও খতীবে আযম মাওঃ সিদ্দিক আহমদকে সেক্রেটারী জেনারেল নিযুক্ত করা হয়।...

১৯৮১ সালে খতীবে আযম হযরত মাওঃ ছিদ্দিক আহমদ সাহেবের আহ্বানে এ দলটি আবার সংগঠিত হয়। মাওঃ ছিদ্দিক আহমদকে সভাপতি, এডভোকেট মঞ্জুরুল আহ্সানকে সেক্রেটারী ও মাওঃ আশরাফ আলীকে সহকারী সেক্রেটারী এবং মাওঃ সরওয়ার কামাল আজিজীকে প্রচার ও জনকল্যাণ সম্পাদক করে দলের নতুন অবকাঠামো ঘোষণা করা হয়।

১৯৮৪ সালে দলের কেন্দ্রীয় নির্বাচনে মাওঃ সিদ্দিক আহমদকে উপদেষ্টা, মাওঃ আব্দুল মালেক হালিমকে সভাপতি, মাওঃ আতাউর রহমান ও মাওঃ সরওয়ার কালামকে সহসভাপতি মাওঃ আশরাফ আলীকে সাধারণ সম্পাদক ও মাওঃ নূরুল হক আরমানকে সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। ... ১৯৮৮ সালের দলীয় নির্বাচনে মাওঃ আশরাফ আলীকে সভাপতি ও এডভোকেট আব্দুর রকীবকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৮৯ সালে মাওঃ আশরাফ আলী সভাপতি ও মাওঃ নূরুল হক আরমান সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। ১৯৯৩ সালে দলীয় নির্বাচনে মাওঃ আশরাফ আলী পূনঃসভাপতি মনোনীত হন, এবং এড্ভোকেট আব্দুর রকীবকে

পুনরায় সাধারণ সম্পাদক পদে মনোনীত করা হয়। ১৯৯৭ এর নির্বাচনে এডভোকেট আব্দুর রকীবকে সভাপতি ও সাংবাদিক জনাব আব্দুল লতীফকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়'।[১১]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

অবিভক্ত ভারতে ১৯৪১ সালের ২৬ আগস্ট জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটির প্রতিষ্ঠাতা আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক সাইয়েদ আবুল 'আলা মওদুদী। বাংলাদেশে ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণায় নিষিদ্ধ হবার পর ১৯৭৯ সালের ২৫মে দলটি নেতা-কর্মীদের এক সম্মেলনের মাধ্যমে পুনরায় প্রকাশ্য ও ঘোষিত কার্যক্রম শুরু করে।

তৎকালীন অবিভক্ত ভারত ও অবিভক্ত পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশেও দলটি আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দৃঢ়তায় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাংলাদেশে এ দলটি সাংগঠনিক দৃঢ়তার বিবেচনায় শীর্ষস্থানের দাবি করতে পারে। তবে নির্বাচনী জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে দলটি সর্বশেষ হিসাব ও তথ্য (২০০১) অনুযায়ী দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে বিদ্যমান।

দলটির কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণ ও নীতি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে রয়েছে তিনটি কমিটি: ক. নির্বাহী পরিষদ, খ. কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ ও গ. কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা। প্রতিটি কমিটি ৩ বৎসরের জন্য গঠিত হয়।

দলটির কেন্দ্রীয় অফিস সূত্র মতে, ২০০১-২০০৩ মেয়াদের জন্য গঠিত ৩টি কমিটিতে পূর্ববর্তী ১৯৯৮-২০০০ মেয়াদের জন্য গঠিত কমিটির 'প্রায় সকল সদস্যই' অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এসব কমিটির নগণ্য সংখ্যক সদস্যপদে পরিবর্তনের প্রধান কারণ সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী সদস্যের মৃত্যু।

দলীয় দলিল অনুযায়ী ২০০১-২০০৩ মেয়াদে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের (জামায়াত) ১৫ সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদে *আলিম* সদস্যের সংখ্যা ৪ (২৬.৬৬%)। দলটির ৪৮সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদে ১২জন (২৫%) *আলিম* সদস্য রয়েছেন। আর ১৬৯সদস্যের মজলিসে শুরায় ৫৩জন (৩১.৩৬%) *আলিম* সদস্যের নাম রয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে, জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে (নির্বাহী পরিষদ, কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায়) গড়ে শতকরা ৩০ভাগেরও কিছু কম (২৭.৬৭%, সারণি-১ দ্রষ্টব্য) সংখ্যক *আলিম* নেতৃত্ব বিদ্যমান রয়েছেন। '৫০%+' (নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষে ৫০% এর বেশি *উলামা* প্রতিনিধিত্ব)কে মানদণ্ড করা হলে জামায়াতকে *উলামা* নেতৃত্বের দল বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য হচ্ছে, জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট *উলামার* বেশিরভাগই দেশের আলিয়া নেসাব বা কম-বেশী রাষ্ট্রীয় বৈষয়িক সমর্থনপ্রাপ্ত মাদ্রাসায় পড়াশুনা করেছেন এবং খুবই নগণ্য সংখ্যক কওমী (বা খারেজী) নেছাবের (বা রাষ্ট্রীয় সমর্থনবিহীন) মাদ্রাসায় শিক্ষিত *উলামা* দলটির সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন। তবে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন যদি *আলিম*-এর মূল শর্ত হয়, তবে এ দলের নেতৃত্বের প্রায় শতভাগ সদস্যকেই *আলিম* বলার সুযোগ রয়েছে।

---

[১১] আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান* (২য় সংস্করণ), ঢাকা: কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০০, পৃ. ২০৮-২১৬।

সারণি ১: জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহে *উলামার* অবস্থান

কর্তৃপক্ষের নাম	মেয়াদ	মোট সদস্য	*আলিম* সদস্য	আলিম সদস্যের %
নির্বাহী পরিষদ	২০০১-২০০৩	১৫	৪	২৬.৬৬
কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ	২০০১-২০০৩	৪৮	১২	২৫.০০
কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা	২০০১-২০০৩	১৬৯	৫৩	৩১.৩৬
আলিম সদস্যের গড় শতকরা হার	২০০১-২০০৩	২৩৪	৬৯	২৭.৬৭

সূত্র: কেন্দ্রীয় অফিস, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রণীত।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

১৯৮৯-র ৮ ডিসেম্বরে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস প্রতিষ্ঠিত হবার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের গঠন-প্রকৃতি বা গঠন-বৈশিষ্ট্যে একটি গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়। *হাফেয্জী হুজুরের* প্রতিষ্ঠিত খেলাফত আন্দোলন নামের দলটি প্রধানত কওমী নেছাবের মাদ্রাসা শিক্ষিত *উলামার* সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিলো। দলটি দু'ভাগে বিভক্ত হবার পরও এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক কর্মকৌশলের সাথে নীতির ভিন্নতার প্রেক্ষাপটে একটি যুব আন্দোলন হিসেবে ইসলামী যুবশিবিরের প্রতিষ্ঠা ঘটলেও এতে বাস্তবে নেতৃপর্যায়ে জামায়াতের নেতৃত্ব কাঠামোর মতোই 'সাধারণ শিক্ষিত ও *উলামার*' একটি সমন্বয় অব্যাহত থাকে। কিন্তু ১৯৮৯-র ৮ ডিসেম্বরে *শায়খুল হাদীস* আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বের খেলাফত আন্দোলন ও ইসলামী যুবশিবির মিলিত হয়ে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস গঠিত হবার ফলে 'ইসলামী রাজনীতিতে' আপাত দৃষ্টিগ্রাহ্য 'দু'টি ধারার' সমন্বয় সাধিত হয়। এ দু'ধারার এক দিকে ছিলেন ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত *উলামা* এবং অন্যদিকে ছিলেন সাধারণ বা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষিত ও রাষ্ট্রীয় সমর্থনপুষ্ট আলিয়া ধারার মাদ্রাসায় শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ। ঐতিহ্যবাহী কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষিত *উলামা* দীর্ঘদিন সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বাস্তবে *হাফেয্জী হুজুরের* ঘোষিত *তওবার রাজনীতির* পথ ধরে বাংলাদেশের কওমী ধারার ঐতিহ্যবাদী *উলামা* ক্রমশ সক্রিয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হতে থাকেন।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের (মজলিস) কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ৩টি কমিটি কাজ করে: ক. অভিভাবক পরিষদ, খ. কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ ও গ. কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা। এ কমিটিগুলো দু'বৎসর মেয়াদী। ২০০১-২০০২ মেয়াদের জন্য গঠিত ১১সদস্যের অভিভাবক পরিষদের প্রত্যেকেই *আলিম* সদস্য। এর আগের ১৯৯৬-৯৮ মেয়াদের জন্য গঠিত মজলিসের ১১ সদস্যের অভিভাবক পরিষদেও প্রত্যেককেই *আলিম* সদস্য হিসেবে দেখা যায়।

মজলিসের ২০০১-২০০২ মেয়াদের ২৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে ১৫জন (৬২.৫%) *আলিম*। এর পূর্ববর্তী ১৯৯৪-৯৫ মেয়াদের নির্বাহী পরিষদে ২৩জনের মধ্যে ১২জনকে (৫২.১৭%) *আলিম* সদস্য হিসেবে দেখা যায়।

মজলিসের ১৮৩ সদস্যের ২০০১-২০০২ মেয়াদের কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় *আলিম* সদস্য ১২৯ জন (৭০.৪৯%)। দলটির কেন্দ্রীয় অফিস সূত্রে জানানো হয়, দলটির পূর্ববর্তী কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরাতেও প্রায় সম সংখ্যক *আলিম* সদস্য ছিলেন। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মজলিসের ৩টি কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী

কর্তৃপক্ষে শতকরা ৫২ ভাগ থেকে একশত ভাগ (অভিভাবক পরিষদে ১০০%, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে ৫২.১৭% ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরায় ৭০.৪৯%, সারণি-২ দ্রষ্টব্য) *আলিম* সদস্য বিদ্যমান রয়েছেন। কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদে দলটির *আলিম* সদস্যের অনুপাত সর্বশেষ মেয়াদে {(২০০১-২০০২), ২৪ জনে ১৫জন (৬২.৫০%), পূর্ববর্তী ১৯৯৩-৯৫ মেয়াদে, ২৩ জনে ১২জন (৫২.১৭%)} কিছুটা বাড়তে দেখা যাচ্ছে। '৫০%+ মানদণ্ডে' তাই বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসকে একটি *'উলামা নেতৃত্বের দল* হিসেবে দাবি করা চলে।

সারণি ২: বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস-এর নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহে *উলামার* অবস্থান

কর্তৃপক্ষের নাম	মেয়াদ	মোট সদস্য	*আলিম* সদস্য	মোট সদস্যের %
অভিভাবক পরিষদ	২০০১-২০০২	১১	১১	১০০.০০
অভিভাবক পরিষদ	১৯৯৬-১৯৯৮	১১	১১	১০০.০০
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ	২০০১-২০০২	২৪	১৫	৬২.৫০
কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ	১৯৯৩-১৯৯৫	২৩	১২	৫২.১৭
কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরা	২০০১-২০০২	১৮৩	১২৯	৭০.৪৯
আলিম সদস্যের গড় শতকরা হার	১৯৯৩-২০০২	২৬২	১৭৮	৭৭.০৩

সূত্র: কেন্দ্রীয় অফিস, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ঢাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রণীত।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

১৯৮৭-র ৩ মার্চ *চরমোনাই-র পীর* হিসেবে খ্যাত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীমকে 'মুখপাত্র' ঘোষণা করে কয়েকটি ইসলামী দল 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে একটি জোট গঠন করে। জোটটি দীর্ঘ সময় সক্রিয় থাকতে ব্যর্থ হয়। এক পর্যায়ে এ জোটটি 'কার্যত' মুখপাত্র *চরমোনাই-র পীর* এর নেতৃত্বে একক দলে পরিণত হয়। ১৯৯১-র ফেব্রুয়ারীর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় 'ইসলামী ঐক্যজোট' নামের অপর একটি জোটের '**শরীকদল**' হিসেবে যুক্ত হবার মধ্যদিয়ে 'বাস্তবেও' এটি একটি 'দলে' পরিণত হয়।[১২] ১৯৯২-র শেষার্ধে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মুখপাত্র মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম মজলিসে শুরার এক বৈঠকে গঠনতন্ত্র সংশোধন করে 'মুখপাত্রের' হাতে 'আন্দোলনের' সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করেন। ফলে জোট হিসাবে 'মুখপাত্রের' যে মর্যাদা তা পরিবর্তিত হয় এবং 'মুখপাত্র' শব্দ আরো 'কিছুসময়' (১৯৯৭ পর্যন্ত) অব্যাহত থাকলেও মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম 'কার্যত' 'একক নেতায়' পরিণত হন। এ ভাবে দল হিসেবে তাৎক্ষণিকভাবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিলেও ১৯৯২-র শেষার্ধ থেকে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন একটি দলে পরিণত হয়। অবশ্য দলটির *নীতিমালা* শীর্ষক 'গঠনতন্ত্রে' দাবি করা হয়েছে: 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রচলিত দল কেন্দ্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়। ...এ আন্দোলন ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে

---

১২ নূর হোসেন মজিদী, *মওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ২২৩।

একটি প্রক্রিয়া'।[১৩] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দলটির *নীতিমালা* শীর্ষক 'প্রকাশনায়' ক. একটি মজলিসে সাদারাত (প্রেসিডিয়াম), খ. একটি মজলিসে শুরা (পরামর্শ পরিষদ) ও গ. একটি মজলিসে আমেলা (নির্বাহী পরিষদ) থাকার কথা বলা হয়েছে (ধারা-৯, পৃ-১১)। *নীতিমালার* ধারা-১৪তে বলা হয়েছে: 'শুরার সদস্যদের গুণাবলীসম্পন্ন সক্রিয় জেলাসমূহের সভাপতি ও প্রত্যেক **শরীকদল** থেকে তাদের প্রস্তাবিত ৩ জন প্রতিনিধির সমন্বয়ে মজলিসে শুরা গঠিত হবে।' এ ধারা বা বিধানটিকে স্বব্যাখ্যাত (সেল্‌ফ্ এক্সপ্লানেটরী) বলে মনে না-ও হতে পারে। 'শুরার সদস্যদের গুণাবলী সম্পন্ন সক্রিয় জেলাসমূহের সভাপতি' এবং 'শরীকদল' বিষয়ক ব্যাখ্যা ১৯৯৯ সালে মুদ্রিত এ *'নীতিমালায়'* দেয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলটির কর্মকর্তাদের নিকট তাদের 'কেন্দ্রীয় কমিটিসমূহের' তালিকা সরবরাহের অনুরোধ করা হলে বর্তমান গবেষককে দলটির মজলিসে সাদারাত (প্রেসিডিয়াম) ও মজলিসে আমেলা (নির্বাহী পরিষদ)-এর তালিকা দেয়া হয়। দলটির মজলিসে শুরার কোনো তালিকা পাওয়া যায়নি।

দলটির ২০০১-২০০৩ মেয়াদের ১১সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে সাদারাতে ১০জন *আলিম* সদস্য রয়েছেন। দলটির এই 'প্রেসিডিয়ামের' পূর্ববর্তী ১৯৯৯-২০০১ ও ১৯৯৭-১৯৯৯ মেয়াদের তালিকাতে ১১জন সদস্যের মধ্যে ব্যক্তি *আলিমের* পরিবর্তন দেখা গেলেও সেগুলোতে *আলিম* সদস্যের সংখ্যা ১০ (৯০%) জন অব্যাহত থেকেছে।

দলটির 'নীতিমালা'-র ধারা-১৬তে ৩৫সদস্যবিশিষ্ট মজলিসে আমেলা (নির্বাহী পরিষদ) থাকার কথা[১৪] বলা হলেও তালিকায় দেখা যায় ২০০১-২০০৩ মেয়াদের এ কমিটিতে ৩৯জন 'কর্মকর্তা' ও 'সদস্য' রয়েছেন। এ ৩৯জনের মধ্যে *আলিম* সদস্য ২২জন। ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে দলটির এ কমিটিতে ৩৫জন কর্মকর্তা-সদস্যের মধ্যে *আলিম* সদস্য ১৯জন (৪৮.৭১%)। এ কমিটির পূর্ববর্তী দুই মেয়াদের (১৯৯৭-১৯৯৯ ও ১৯৯৫-১৯৯৭) তালিকায় কর্মকর্তা-সদস্যের সংখ্যা, যথাক্রমে, ৩৩জন ও ২৯জন দেখা যায়, যাদের মধ্যে *আলিম* সদস্য, যথাক্রমে, ২০জন (৬০.৬০%) ও ১৮জন (৬২.০৬%)। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহে শতকরা ৫৪ভাগ (মজলিসে আমেলা: ২০০১-২০০৩ মেয়াদে ৫৬.৪১%, ১৯৯৯-২০০১ মেয়াদে ৫৪.২৮%, ১৯৯৭-১৯৯৯ মেয়াদে ৬০.৬০% ও ১৯৯৫-১৯৯৭ মেয়াদে ৬২.০৬%) থেকে ৯০ভাগ (মজলিসে সাদারাত ১১জনে ১০জন) পর্যন্ত *আলিম* নেতৃত্ব বিদ্যমান রয়েছে (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)। '৫০%+ মানদণ্ড' অনুযায়ী তাই এ দলটিকে '*উলামা* নেতৃত্বের দল' বলা যেতে পারে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যায়, দলটির মজলিসে আমেলা বা নির্বাহী পরিষদেও মোট *সদস্য সংখ্যা* পরপর চার মেয়াদে (১৯৯৫-১৯৯৭ এ ২৯জন, ১৯৯৭-১৯৯৯-এ ৩৩জন,

---

[১৩] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, *নীতিমালা*, ৫ম সংস্করণ ঢাকা, ১৯৯৯: ৭।

[১৪] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, *নীতিমালা*, ৫ম সংস্করণ ঢাকা, ১৯৯৯: ১৩-১৪।

১৯৯৯-২০০১-এ ৩৫জন এবং ২০০১-২০০৩-এ ৩৯জন) ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও দলটির *'নীতিমালা'*-য় *নির্দিষ্ট সংখ্যার* (৩৫জন) কথা বলা হয়েছে। প্রাপ্ত তালিকায় দেখানো হয়েছে, দলটির শীর্ষপদের নাম ১৯৯৫-১৯৯৭ মেয়াদে ছিলো *'মুখপাত্র'* এবং ১৯৯৭-১৯৯৯ মেয়াদ থেকে শীর্ষপদের নাম হয়েছে *'আমীর'*। অবশ্য দলটির *শীর্ষ কর্মকর্তা* অপরিবর্তিত রয়েছেন, তিনি *চরমোনাই-র পীর* হিসেবে খ্যাত মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করীম।

সারণি ৩: ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন-এর নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষসমূহে *উলামা*র অবস্থান

কর্তৃপক্ষের নাম	মেয়াদ	মোট সদস্য	*আলিম* সদস্য	আলিম সদস্যের %
মজলিসে সাদারাত	২০০১-২০০৩	১১	১০	৯০.৯০
মজলিসে সাদারাত	১৯৯৯-২০০১	১১	১০	৯০.৯০
মজলিসে সাদারাত	১৯৯৭-১৯৯৯	১১	১০	৯০.৯০
মজলিসে আমেলা	২০০১-২০০৩	৩৯	২২	৫৬.৯০
মজলিসে আমেলা	১৯৯৯-২০০১	৩৫	১৯	৫৪.২৮
মজলিসে আমেলা	১৯৯৭-১৯৯৯	৩৩	২০	৬০.৬০
মজলিসে আমেলা	১৯৯৫-১৯৯৭	২৯	১৮	৬২.০৬
আলিম সদস্যের গড় শতকরা হার	১৯৯৫-২০০৩	১৬৯	১০৯	৭২.০০

সূত্র: কেন্দ্রীয় অফিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ঢাকা থেকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রণীত।

বিভিন্ন সরকার, জাতীয় সংসদ ও প্রধান দলে উলামা

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত গঠিত বিভিন্ন সরকারে কয়েকজন আলিম সদস্য দেখা গেছে।

১৯৮১-র বিচারপতি আবদুস সাত্তারের সরকারে মাদ্রাসা শিক্ষক-নেতা মাওলানা এম এ মান্নান শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

জেনারেল এরশাদের 'সরকারে' মাওলানা এম এ মান্নান বিভিন্ন সময়ে ধর্ম ও ত্রাণমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস কিছুদিন ধর্ম প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

১৯৯৬-এ শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভায় মাওলানা নূরুল ইসলাম ধর্ম প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন।

২০০১-এ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে 'চারদলীয় জোটের সরকারে' জামায়াতের আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী কৃষিমন্ত্রী (পরে শিল্পমন্ত্রী)-র দায়িত্ব পেয়েছেন।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় সংসদে অল্প সংখ্যক (সারণি-৪, ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য) *আলিম* নির্বাচিত হয়েছেন। 'ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর' বাইরে সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রধান তিন দল, আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি, থেকেও নির্বাচিত আলিম সংসদ সদস্য দেখা যায়।

আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের *আলিম* সদস্যরা হলেন: ১. মাওলানা মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ (১ম জাতীয় সংসদ, মাধবপুর, হবিগঞ্জ), ২. মাওলানা সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী (৫ম জাতীয় সংসদ, চট্টগ্রাম, পরে বিএনপিতে যোগ দেন),

৩. মাওলানা রুহুল আমিন মাদানী (৭ম জাতীয় সংসদ, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ) ও ৪. মাওলানা নূরুল ইসলাম (৭ম জাতীয় সংসদ, ময়মনসিংহ)।

বিএনপি থেকে ২য় জাতীয় সংসদে মাওলানা এম.এ. মান্নান (ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর), পঞ্চম জাতীয় সংসদে মাওলানা আতাউর রহমান খান (কিশোরগঞ্জ) এবং ৬ষ্ঠ জাতীয় সংসদে মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন (কেশবপুর, যশোর) নির্বাচিত হন।

জেনারেল এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি থেকে মাওলানা এম এ মান্নান (৩য় ও ৪র্থ জাতীয় সংসদ, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর), মুফতী মুহাম্মদ ওয়াক্কাস (৩য় ও ৪র্থ জাতীয় সংসদ, মনিরামপুর, যশোর) ও মাওলানা মতিউর রহমান (৮ম জাতীয় সংসদ, উলিপুর, কুড়িগ্রাম) জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হন।

ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে জাতীয় সংসদে প্রথমবার সদস্য নির্বাচিত হন দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) থেকে। আইডিএল থেকে নির্বাচিত ৬জন সংসদ সদস্যের মধ্যে ৩জন *আলিম* ছিলেন {ক. মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, (বরিশাল) খ. মাওলানা নূরুন্নবী সামদানী (ঝিনাইদহ) ও গ. মাওলানা মোজাম্মেল হক (কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ)}।

১৯৮৬-র তৃতীয় জাতীয় সংসদে জামায়াতের দশজন প্রার্থী নির্বাচিত হন, যাদের মধ্যে দু'জন *আলিম* ছিলেন {ক. মাওলানা মোজাম্মেল হক (কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ) ও খ. মাওলানা আবদুর রহমান ফকির (বগুড়া)}।

১৯৯১-র পঞ্চম জাতীয় সংসদে জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত ১৮জনের মধ্যে *আলিম* ছিলেন ১০জন: ক. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী (সাঁথিয়া, পাবনা), খ. মাওলানা আবদুস সোবহান (পাবনা), গ. মাওলানা শাদাত হোসাইন (বগুড়া), ঘ. মাওলানা আবু বকর শেরকুলী (সিংড়া, নাটোর), ঙ. মাওলানা নাসিরুদ্দীন (মান্দা, নওগাঁ), চ. মাওলানা রিয়াসত আলী (সাতক্ষীরা), ছ. মুফতি আবদুস সাত্তার আকন (বাগেরহাট), জ. মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী (দিনাজপুর), ঝ. মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন (যশোর, পরে বিএনপিতে যোগ দেন) ও ঞ. মাওলানা হাবিবুর রহমান (চুয়াডাঙ্গা)। এ সংসদে জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত হন হাফেজা আসমা খাতুন।

পঞ্চম সংসদে ইসলামী ঐক্যজোট থেকে নির্বাচিত একমাত্র সদস্য মাওলানা ওবায়দুল হক (জকিগঞ্জ, সিলেট) একজন *আলিম*। ১৯৯৬-র সপ্তম জাতীয় সংসদে (১২ জুন) জামায়াতের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত তিনজন সদস্যের একজন, মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, *আলিম*।

২০০১-র অষ্টম জাতীয় সংসদে জামায়াত থেকে নির্বাচিত ১৭জন সদস্যের ১১জন *আলিম*: ক. মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, খ. মাওলানা আব্দুস সোবহান, গ. মাওলানা আব্দুল খালেক (সাতক্ষীরা), ঘ. মাওলানা রিয়াসত আলী, ঙ. মাওলানা শাহাদাৎ

হুসাইন (যশোর), চ. মাওলানা ফরিদউদ্দিন চৌধুরী (সিলেট), ছ. মাওলানা আব্দুল্লাহ আল কাফী (দিনাজপুর), জ. মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী (দিনাজপুর), ঝ. মাওলানা আবদুল আজিজ (গাইবান্ধা), ঞ. মুফ্‌তী আবদুস সাত্তার আকন ও ট. মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন সাঈদী।

অষ্টম জাতীয় সংসদে ইসলামী ঐক্যজোট থেকে নির্বাচিত তিনজন সদস্যের প্রত্যেকেই *আলিম*: ক. মুফতি ফজলুল হক আমিনী (বি,বাড়িয়া), খ. মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস (যশোর) ও গ. মুফতি শহিদুল ইসলাম (নড়াইল)।

সারণি ৪: বাংলাদেশের আইনসভা 'জাতীয় সংসদে' *উলামার* অবস্থান

জাতীয় সংসদের নাম	মেয়াদ	মোট সদস্য	*আলিম* সদস্য	আলিম সদস্যের %
প্রথম জাতীয় সংসদ	১৯৭৩-১৯৭৫	৩১৫	১	০.৩১
দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ	১৯৭৯-১৯৮২	৩৩০	০৪	১.২১
তৃতীয় জাতীয় সংসদ	১৯৮৬-১৯৮৭	৩৩০	০৪	১.২১
চতুর্থ জাতীয় সংসদ	১৯৮৮-১৯৯০	৩০০	০২	০.৬৬
পঞ্চম জাতীয় সংসদ	১৯৯১-১৯৯৫	৩৩০	১৪	৪.২৪
ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ	১৯৯৬-১৯৯৬ (ফেব্রুয়ারী ১৫-২৮)	৩০০	০১	০.৩৩
সপ্তম জাতীয় সংসদ	১৯৯৬-২০০১	৩৩০	০৩	০.৯০
অষ্টম জাতীয় সংসদ	২০০১-অব্যাহত	৩০০	১৫	৫.০০
আলিম সদস্যের গড় হার	১৯৭৩-২০০১	২৫৩৫	৪২	১.৬৬

সারণি ৫: বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় সংসদে নির্বাচিত আলিম সদস্য

ক্র. নং	সংসদের নাম	নির্বাচিত সদস্য	নির্বাচনী এলাকা	মনোনয়নদাতা দল
১.	প্রথম জাতীয় সংসদ	মাওলানা মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ	মাধবপুর, হবিগঞ্জ	আওয়ামী লীগ
২.	দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ	মাওলানা এম এ মান্নান	ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর	বিএনপি
৩.	"	মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম	কাউখালী, বরিশাল	আইডিএল
৪.	"	মাওলানা নূরুন্নবী সামদানী	ঝিনাইদহ	"
৫.	"	মাওলানা মোজাম্মেল হক	কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ	"
৬.	তৃতীয় জাতীয় সংসদ	মাওলানা এম এ মান্নান	ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর	জাতীয় পার্টি
৭.	"	মাওলানা আ. রহমান ফকির	বগুড়া	জামায়াতে ইসলামী
৮.	"	মাওলানা মোজাম্মেল হক	কোটচাঁদপুর,ঝিনাইদহ	"
৯.	"	মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস	মনিরামপুর, যশোর	স্বতন্ত্র → জাতীয় পার্টি
১০.	চতুর্থ জাতীয় সংসদ	মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস	মনিরামপুর, যশোর	জাতীয় পার্টি

ক্র. নং	সংসদের নাম	নির্বাচিত সদস্য	নির্বাচনী এলাকা	মনোনয়নদাতা দল
১১.	"	মাওলানা এম এ মান্নান	ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর	"
১২.	পঞ্চম জাতীয় সংসদ	মাওলানা আতাউর রহমান খান	কিশোরগঞ্জ	বিএনপি
১৩.	"	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	সাঁথিয়া, পাবনা	জামায়াতে ইসলামী
১৪.	"	মাওলানা আবদুস সোবহান	পাবনা সদর	"
১৫.	"	মাওলানা হাবিবুর রহমান	চুয়াডাঙ্গা	"
১৬.	"	মাওলানা শাদাত হোসাইন	বগুড়া	"
১৭.	"	মাওলানা আবু বকর শেরকুলী	সিংড়া, নাটোর	"
১৮.	"	মাওলানা নাসিরুদ্দীন	মান্দা, নওগাঁ	"
১৯.	"	মাওলানা রিয়াসাত আলী বিশ্বাস	আশাশুনি, সাতক্ষীরা	"
২০.	"	মুফতি আব্দুস সাত্তার আকন	মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট	"
২১.	"	মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী	বিরামপুর, দিনাজপুর	"
২২.	"	মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন (ফ্লোর ক্রসিং-এ পদচ্যুত)	কেশবপুর, যশোর	"
২৩.	"	হাফেজা আসমা খাতুন	ঢাকা	"
২৪.	ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ	মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন	কেশবপুর, যশোর	বিএনপি
২৫.	"	মাওলানা ওবায়দুল হক	হবিগঞ্জ, সিলেট	ইসলামী ঐক্যজোট
২৬.	সপ্তম জাতীয় সংসদ	মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	পিরোজপুর সদর	জামায়াতে ইসলামী
২৭.	"	মাওলানা নূরুল ইসলাম	ময়মনসিংহ	আওয়ামী লীগ
২৮.	"	মাওলানা রুহুল আমিন মাদানী	ত্রিশাল,ময়মনসিংহ	"
২৯.	অষ্টম জাতীয় সংসদ	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	সাঁথিয়া, পাবনা	জামায়াতে ইসলামী
৩০.	"	মাওলানা আবদুস সোবহান	পাবনা সদর	"
৩১.	"	মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	পিরোজপুর সদর	"
৩২.	"	মাওলানা আবদুল খালেক মণ্ডল	সাতক্ষীরা	"
৩৩.	"	মাওলানা রিয়াসত আলী বিশ্বাস	আশাশুনি,সাতক্ষীরা	"
৩৪.	"	মাওলানা আবু সাঈদ মোঃ শাহাদাৎ হুসাইন	ঝিকরগাছা, যশোর	"
৩৫.	"	মাওলানা ফরীদ উদ্দীন চৌধুরী	কানাইঘাট, সিলেট	"
৩৬.	"	মাওলানা আব্দুল্লাহ আল কাফি	বীরগঞ্জ, দিনাজপুর	"
৩৭.	"	মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী	বিরামপুর, দিনাজপুর	"
৩৮.	"	মাওলানা আবদুল আজিজ	সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা	"
৩৯.	"	মুফতি আব্দুস সাত্তার আকন	মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট	"
৪০.	"	মুফতি ফজলুল হক আমিনী	সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইসলামী ঐক্যজোট
৪১.	"	মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস	মনিরামপুর, যশোর	"
৪২.	"	মুফতি শহিদুল ইসলাম	নড়াইল সদর	"

ক্র. নং	সংসদের নাম	নির্বাচিত সদস্য	নির্বাচনী এলাকা	মনোনয়নদাতা দল
		(শেখ হাসিনার ছেড়ে দেয়া আসনে উপনির্বাচনে জয়ী)		
৪৩.	"	মাওলানা মতিউর রহমান	উলিপুর, কুড়িগ্রাম	ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট (জাতীয় পার্টি)

সারণি ৬: একাধিকবার নির্বাচিত আলিম সংসদ সদস্য

ক্রমিক	নির্বাচিত আলিম	নির্বাচনী এলাকা	দল	সংসদসমূহ
১.	মাওলানা এম.এ. মান্নান	ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর	ক. বিএনপি খ. জাতীয় পার্টি	দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ
২.	মাওলানা মোজাম্মেল হক	কোটচাঁদপুর,ঝিনাইদহ	ক. আইডিএল খ. জামায়াতে ইসলামী	দ্বিতীয় তৃতীয়
৩.	মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস	মনিরামপুর, যশোর	ক. স্বতন্ত্র—>জাতীয় পার্টি খ. জাতীয় পার্টি গ. ইসলামী ঐক্যজোট	তৃতীয় চতুর্থ অষ্টম
৪.	মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী	সাঁথিয়া, পাবনা	জামায়াতে ইসলামী	পঞ্চম ও অষ্টম
৫.	মাওলানা আবদুস সোবহান	পাবনা সদর	জামায়াতে ইসলামী	পঞ্চম ও অষ্টম
৬.	মাওলানা রিয়াসাত আলী বিশ্বাস	আশাশুনি, সাতক্ষীরা	জামায়াতে ইসলামী	পঞ্চম ও অষ্টম
৭.	মুফতি আ. সাত্তার আকন	মোড়লগঞ্জ, বাগেরহাট	জামায়াতে ইসলামী	পঞ্চম ও অষ্টম
৮.	মাওলানা আজিজুর রহমান চৌধুরী	বিরামপুর, দিনাজপুর	জামায়াতে ইসলামী	পঞ্চম ও অষ্টম
৯.	মাওলানা দিলাওয়ার হোসাইন সাঈদী	পিরোজপুর সদর	জামায়াতে ইসলামী	পঞ্চম ও অষ্টম
১০.	মাওলানা সাখাওয়াত হোসেন	কেশবপুর, যশোর	ক.জামায়াতে ইসলামী খ. বিএনপি	পঞ্চম ও ষষ্ঠ

দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর সর্বশেষ (২০০১) নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নকারী কমিটিসমূহে *উলামার* সরাসরি কোনো অংশ গ্রহণ নেই। আওয়ামী লীগ (প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ, জাতীয় কাউন্সিল), বিএনপি (জাতীয় স্থায়ী কমিটি ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি) এবং জাতীয় পার্টির (প্রেসিডিয়াম ও কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি) কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষীয় সংস্থাসমূহে *উলামার* সরাসরি অংশগ্রহণ না থাকলেও প্রতিটি দলেরই একটি করে *উলামা* অঙ্গ সংগঠন (যথাক্রমে আওয়ামী উলামা লীগ, জাতীয়তাবাদী উলামা দল ও জাতীয় উলামা পার্টি) রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক ও *উলামা* রাজনীতি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক আবদুল গফুরের পর্যবেক্ষণ এমন:

'বর্তমানে দেশের সকল বড় রাজনৈতিক দলেই একটি করে আলেম ফ্রন্ট রয়েছে। এই আলেম ফ্রন্টের আলেমগণ মূল দলের নীতি নির্ধারণের পরিবর্তে অ-আলেম নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত প্রচার ও বাস্তবায়নেই অধিক ব্যবহৃত হন'।[১৫]

অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের বলেছেন:

'বাংলাদেশের সরকার গঠনকারী দলসমূহের নীতি নির্ধারণ ও নীতি সংশোধনের ক্ষেত্রে আলেম সমাজের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। প্রত্যেকটি দলকেই নীতি নির্ধারণে ইসলামকে বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। এর প্রধান কারণ আলেম সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ। প্রতিটি দলকেই *উলামা* ফ্রন্ট গঠন করতে হয়েছে। স্ব স্ব দলের উলামা ফ্রন্টের মাধ্যমে দেশের উলামা সমাজ ও জনগণের কাছে স্বীয় দলের নীতি ও কর্মসূচিকে ইসলাম সম্মত প্রমাণের চেষ্টা করতে হয়েছে। তদুপরি দলের ধর্মীয় নীতি নির্ধারণে প্রতিটি দলের উলামা ফ্রন্টের কিছু না কিছু চাপ/প্রভাব রয়েছে'।[১৬]

---

[১৫] অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

[১৬] অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ: বিভিন্ন শাসনামলে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

বাংলাদেশের রাজনীতিতে উলামা: বিভিন্ন শাসনামল

কার্যত জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, জামায়াতে ইসলামী হিন্দ এবং জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম-র ধারাবাহিকতাতেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে *উলামা* যুক্ত হয়েছেন। এর বাইরে অন্য সাধারণ রাজনৈতিক দল (প্রধানত মুসলিম লীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ বা আওয়ামী লীগ) পর্যায়েও কিছু সংখ্যক *উলামা* রাজনীতিতে সক্রিয় থেকেছেন।

১৯৭২ থেকে ২০০১ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে *উলামার ভূমিকা* ও *প্রভাব* চিহ্নিত ও ব্যাখ্যা করার জন্য এখানে এ দেশের উল্লেখযোগ্য শাসকদের সময়কালকে বিবেচনায় নেয়া হবে। এ বিবেচনায় শেখ মুজিব, জিয়া, এরশাদ, খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার শাসনামল হিসেবে ৩০ বৎসরের বাংলাদেশের ইতিহাসকে উপস্থাপন করা হবে। উল্লেখযোগ্য এ শাসকদের বাইরে খন্দকার মোশতাক আহমদ, বিচারপতি এ এস এম সায়েম, বিচারপতি আবদুস সাত্তার, বিচারপতি এ এফ এম আহসান উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখের শাসনের সময়কালকে পৃথকভাবে এখানে বিবেচনা করা হয়নি।

শেখ মুজিব শাসনামল (১৯৭২-৭৫)

হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী ছিলেন। ৮ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে কারামুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব লন্ডন ও নয়াদিল্লী হয়ে ১০ জানুয়ারী স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় পৌছেন। ১০ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ঘোষিত (এবং ১৭এপ্রিলে মেহেরপুরের বৈদ্যনাথ তলায়, পরবর্তীতে *মুজিবনগর*, শপথ গ্রহণকৃত) প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারে তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭২-র ১২ জানুয়ারী শেখ মুজিব *নির্বাহী ক্ষমতাহীন* রাষ্ট্রপ্রধানের (প্রেসিডেন্ট) পদ ছেড়ে 'সংসদীয়' ব্যবস্থার *প্রধান নির্বাহীর* তথা সরকার প্রধানের পদ প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন।

শেখ মুজিবের ৩ বৎসর ৭ মাস ৩ দিনের (প্রধানমন্ত্রিত্বের ক্ষমতা গ্রহণ থেকে) শাসনামলে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়, বাংলাদেশের আইনসভা 'জাতীয় সংসদের' প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ও সংবিধানের চারটি সংশোধনী গৃহিত হয়। শেখ মুজিব শাসনকালের *উলামা*সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এবং ঘটনার মধ্যে রয়েছে:

ক. ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে ধর্মভিত্তিক ও ধর্মসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক দল-সংগঠন-সমিতি গঠনের ও এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়াকে বেআইনী ও নিষিদ্ধকরণ,

খ. সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালের যুদ্ধাপরাধী ও তাদের সহযোগী বা দালালদের বিচার ও দণ্ডদানের বিধান প্রণয়ন,

গ. দাউদ হায়দার নামের এক কবির মহানবীর (স.) প্রতি অবমাননাসূচক কবিতা প্রকাশের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট বিক্ষোভ, প্রতিরোধ আন্দোলন ও সেই কবির নির্বাসন,

ঘ. মহানবীর (স.) জীবন ও আদর্শভিত্তিক আলোচনার সীরাতুন্নবী সমাবেশ (মাহফিল) ও সম্মেলন আয়োজন,

ঙ. দালাল আইন প্রত্যাহার,

চ. ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র সদস্যপদ গ্রহণ এবং এর শীর্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবের যোগদান ও

ছ. ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা।

রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ও এর প্রয়োগ

শেখ মুজিব শাসনামলে *উলামা*সংশ্লিষ্ট সর্বাধিক স্পর্শকাতর প্রসঙ্গটি ছিলো রাষ্ট্রীয়ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণ ও এর প্রকাশ্য কঠোর প্রয়োগ।

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়। এ সংবিধান প্রণয়নে অংশ নিয়েছিলেন ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত অবিভক্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল এসেমব্লী) ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে (প্রভিন্শিয়াল এসেমব্লী) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান অঞ্চল থেকে নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ, যাদের সমন্বয়ে একটি গণপরিষদ (কন্সটিট্যুয়েন্ট এসেমব্লী) গঠন[১] করা হয়েছিলো। এ গণপরিষদ ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন ও গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৮ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়:

> 'জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে'[২]।

সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পর এ অনুচ্ছেদটির বর্তমান পাঠ এমন:

> 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার-এই নীতিসমূহ এবং তৎসহ এই নীতিসমূহ হইতে উদ্ভূত এই ভাগে বর্ণিত অন্য সকল নীতি রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলিয়া পরিগণিত হইবে'।[৩]

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ১২ নম্বর অনুচ্ছেদটি ছিলো এমন:

> 'ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য
> (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা,
> (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান,
> (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার,
> (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাঁহার উপর নিপীড়ন
> বিলোপ করা হইবে।'[৪]

---

১ ২৩ মার্চ ১৯৭২ বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ জারি ও ২৬ মার্চ সে আদেশ কার্যকর হয়।

২ *বাংলাদেশের সংবিধান*, বাংলাদেশ গেজেট; অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৯৭২, ঢাকা, পৃ. ১২।

৩ *বাংলাদেশের সংবিধান*, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০০ ঢাকা, পৃ. ৪।

৪ *বাংলাদেশের সংবিধান*, বাংলাদেশ গেজেট; অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৯৭২, ঢাকা, পৃ. ১২।

পঞ্চম সংশোধনীর আওতায় সংবিধানের এ অনুচ্ছেদটি বিলুপ্ত করা হয়।

১৯৭২ সালের মূল সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়:

> 'জন শৃংখলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে;
> তবে শর্ত থাকে যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী কোন সাম্প্রদায়িক সমিতি বা সংঘ কিংবা অনুরূপ উদ্দেশ্য সম্পন্ন বা লক্ষ্যানুসারী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার বা তাহার সদস্য হইবার বা অন্য কোন প্রকারে তাহার তৎপরতায় অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার কোন ব্যক্তির থাকিবে না'।[৫]

পঞ্চম সংশোধনীর আওতায় সংবিধানের এ অনুচ্ছেদটির 'শর্তাংশটি' বিলুপ্ত করা হয়।

শেখ মুজিব শাসনামলে প্রণীত সংবিধানের এই ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় নীতি দেশের সচেতন ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি, শঙ্কা ও ভীতির সৃষ্টি করে। ধর্মনিরপেক্ষতার এ নীতিমালা ও এর প্রয়োগ দেশের *উলামাকে* বিশেষভাবে ভাবিত ও চিন্তিত করেছিলো বলে দাবি করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের বাণী বাদ দেয়া, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্রাবাস, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং কয়েকটি কলেজের নাম থেকে 'মুসলিম' ও 'ইসলাম' শব্দ বাদ দেয়া প্রভৃতি বাহ্যিক কার্যক্রমের ফলে প্রধানত ইসলাম ধর্মসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং নির্দিষ্টভাবে *উলামা* বা ইসলাম ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের মাঝে সরকারের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য বিষয়ে বিভ্রান্তি ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় বেতার ও টেলিভিশনে কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করে দেয়ায় *উলামার* মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এবং সেই ক্ষোভ বিভিন্ন পর্যায়ে, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে, প্রকাশিত হবার পর সরকার পুনরায় বেতার ও টেলিভিশনে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের পাঠসহ কুরআন তেলাওয়াত চালু করে।

রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির আওতায় সরকার মহররমের (আশুরা) ছুটিকে সরকারি ছুটির তালিকা থেকে বাদ দেয়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক *উলামার* পক্ষ থেকে ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশিত হতে থাকে। এ পর্যায়ে বর্ষিয়ান রাজনীতিক মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকারি নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে মাওলানা ভাসানী মহররমের সরকারি ছুটি বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। মাওলানা ভাসানী এ ইস্যুতে একটি পোস্টার ছাপেন, যাতে এক উর্দু কবিতার বহুল উচ্চারিত একটি লাইন বাংলায় লেখা হয়: *ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বাদ*[৬]। রাজনীতিক মাওলানা ভাসানীর এহেন কঠোর হুঁশিয়ারী ও প্রতিবাদী কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে সরকার 'মহররমের ছুটি' পুনরায় চালু করে।[৭]

---

৫ *বাংলাদেশের সংবিধান*, বাংলাদেশ গেজেট; অতিরিক্ত সংখ্যা, ১৯৭২, ঢাকা, পৃ. ১৪।

৬ বাংলায়: *ইসলাম প্রতিটি কারবালার পর জীবিত হয়*। ইরাকের কারবালা প্রান্তরে অস্বীকৃত-অবৈধ পন্থায় ক্ষমতাসীন ইয়াজিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে মহানবী মুহাম্মদ (দ.) এর দৌহিত্র হুসাইন ও তার বাহিনীর প্রায় সকল সদস্য মৃত্যু বরণ করেন এবং বাহ্যত পরাজিত হন। কিন্তু মুসলিম জনগোষ্ঠী এ ঘটনায় ইসলাম আরও বেশি প্রাণবান হয়েছিলো বলে বিশ্বাস করে থাকেন।

৭ অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

শেখ মুজিব শাসনামলের ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় নীতি বিষয়ে জনগণের মাঝে এবং নির্দিষ্টভাবে *উলামা*র মাঝে বিভ্রান্তি, শঙ্কা ও অসন্তোষ সৃষ্টি হলে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা দেয়া হতো: 'ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়, ধর্মীয় উদারতা এবং সকল ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন'।[৮]

যুদ্ধাপরাধী ও দালালদের বিচার

শেখ মুজিবের শাসনামলে ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই সংবিধানের প্রথম সংশোধনী সম্পন্ন হয়। এ সংশোধনীর মাধ্যমে মূল সংবিধানের ৪৭ নম্বর অনুচ্ছেদের শেষে একটি 'দফা' (৩ নং) এবং দু'টি 'দফা' সংবলিত '৪৭ক' সংখ্যক একটি পৃথক অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করা হয়। সংবিধানে প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে সংযুক্ত পাঠ এমন:

> অনুচ্ছেদ ৪৭(৩): 'এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দীকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করিবার বিধান-সংবলিত কোন আইন বা আইনের বিধান এই সংবিধানের কোন বিধানের সহিত অসমঞ্জস বা তাহার পরিপন্থী, এই কারণে বাতিল বা বে-আইনী বলিয়া গণ্য হইবে না'।
>
> ৪৭ক(১): 'যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদ, ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফা এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের অধীন নিশ্চয়কৃত অধিকারসমূহ প্রযোজ্য হইবে না।'
>
> ৪৭ক(২): 'এই সংবিধানে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সত্ত্বেও যে ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদের (৩) দফায় বর্ণিত কোন আইন প্রযোজ্য হয়, এই সংবিধানের অধীন কোন প্রতিকারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করিবার কোন অধিকার সেই ব্যক্তির থাকিবে না'।[৯]

উল্লেখ করা যায়, সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের নাগরিক ও এ দেশে বসবাসকারীদের *আইনের আশ্রয় লাভের অবিচ্ছেদ্য অধিকার*-এর কথা বলা হয়েছে। আর সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের (১) ও (৩) দফার পাঠ যথাক্রমে:

> '(১) অপরাধের দায়যুক্ত কার্য সংঘটনকালে বলবৎ ছিল, এইরূপ আইন ভঙ্গ করিবার অপরাধ ব্যতিত কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে না এবং অপরাধ সংঘটনকালে বলবৎ সেই আইন বলে যে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারিত, তাহাকে তাহার অধিক বা তাহা হইতে ভিন্ন দণ্ড দেওয়া যাইবে না।'
>
> '(৩) ফৌজদারী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্য বিচার লাভের অধিকারী হইবেন'।[১০]

---

৮ *তদেব*।

৯ *বাংলাদেশের সংবিধান*, ২০০০, পৃ. ১৪।

১০ *তদেব*, পৃ. ১৩।

সংবিধানের ৩৫(১) ও (৩) অনুচ্ছেদের বক্তব্য সংক্ষেপে এমন:

ক. ব্যক্তির কার্যক্রম ও আচরণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে, যদি সেই কার্যক্রম ও আচরণকালে বলবৎ বা ঘোষিত কোনো আইনে সেটিকে অপরাধমূলক কার্যক্রম ও আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

খ. চিহ্নিত অপরাধমূলক কার্যক্রম ও আচরণের জন্য ব্যক্তিকে কেবল বলবৎ বা ঘোষিত আইনে বর্ণিত দণ্ডই দেয়া যাবে, তার বেশি নয় অথবা ভিন্ন কোনো দণ্ড নয় অথবা পরবর্তীকালে বলবৎ করা আইনের দণ্ডও নয়।

গ. অপরাধমূলক কার্যক্রম ও আচরণের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কেবল আইনানুগ আদালত বা ট্রাইব্যুনালে দ্রুত ও প্রকাশ্যে বিচার করেই দণ্ড দেয়া যাবে, অঘোষিত অথবা বেআইনী প্রক্রিয়ায় গোপনে বিচার করে রাষ্ট্র দণ্ড দিতে পারবে না।

সংবিধানের প্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধাপরাধী, যুদ্ধবন্দী ও তাদের সহযোগী বা দালালদের (সাংবিধানিক ভাষায় 'সহায়ক বাহিনীসমূহ'-'অক্সিলিয়ারী ফোর্সেস') 'অসাধারণ বা অপ্রচলিত দণ্ড দান'-এর ব্যবস্থাকে 'আইনানুগ ও আদালতে প্রশ্ন অযোগ্য' করা হয়।

অবশ্য এই সাংবিধানিক আয়োজনের অনেক পূর্বে ১৯৭২-এর ২৪ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের 'পরামর্শে' প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ আদালত) আদেশ, ১৯৭২'[১১] জারি করেন।'এটি 'পি ও এইট' বা 'প্রেসিডেন্টের আট নম্বর আদেশ' এবং *দালাল আইন* হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় আত্মসমর্পণের দলিলে জেনারেল এএকে (আমীর আবদুল্লাহ খান) নিয়াজী স্বাক্ষর করার পর পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর কম-বেশী ৯৩ হাজার[১২] সদস্যকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক করা হয় এবং তাদের মধ্যে ১৯৫জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে *যুদ্ধাপরাধী* হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর বাইরে 'রাজাকার বাহিনীর' বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য ও 'শান্তি কমিটি'সহ অন্য কয়েকটি বাহিনীর সদস্যদেরকে আটক করা হয়। আটক এই রাজাকার বাহিনী, শান্তি কমিটি ও অন্য বাহিনীসমূহের সদস্যদেরই প্রধানত: সাংবিধানিক উচ্চারণে 'সহায়ক বাহিনী' এবং ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী ঘোষিত প্রেসিডেন্টের ৮নম্বর আদেশে 'দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অবশ্য 'পিও এইট' বা দালাল আইনে 'দালাল'-এর পরিধি ব্যাপক বিস্তৃত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে:

ক. বাংলাদেশে পাকিস্তানী আর্মির সাথে অংশ গ্রহণ অথবা সাহায্য প্রদান অথবা পাকিস্তানী আর্মির বেআইনী দখলদারিত্ব রক্ষা করা, টিকিয়ে রাখা, শক্তিশালী করা, সমর্থন করা বা এগিয়ে নেয়ায় উৎসাহ প্রদান,

---

[১১] ইংরেজী শিরোনামে 'দালাল'-এর প্রতিশব্দ 'কোলাবরেটর' এবং 'বিশেষ আদালত'-এর প্রতিশব্দ 'স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল' রয়েছে।

[১২] অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম*, ঢাকা: মুক্তি প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৬৮ (৯০ হাজার)।

খ. দখলদার আর্মিকে কোনো কার্যক্রম (শব্দ, ইঙ্গিত বা আচরণ) দ্বারা কোনোভাবে বৈষয়িক সাহায্য প্রদান,

গ. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হতে উৎসাহ প্রদান,

ঘ. দখলদার আর্মির বিরুদ্ধে জনগণের প্রচেষ্টা ও বাংলাদেশের 'মুক্তিকামী শক্তিসমূহের' (লিবারেশন ফোর্সেস) মুক্তি সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে প্রতিহত করা অথবা অন্তর্ঘাত করা ও

ঙ. বাংলাদেশে জোরপূর্বক দখলদারিত্ব সংঘটনের নকশায় দখলদার আর্মিকে বাংলাদেশের ভেতরে বা বাইরে জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রদত্ত বিবৃতি (পাবলিক স্টেটমেন্ট) অথবা প্রচারণায় স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ, সমিতি-প্রতিনিধি দল-কমিটি বা দাবিকৃত উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সাহায্যকারী ব্যক্তিকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।[১৩]

'দালাল আইনের' মাধ্যমে 'দালাল'-এর ব্যাপক-বিস্তৃত এ সংজ্ঞার[১৪] আওতায় রাজাকার বাহিনী, শান্তি কমিটি ও আলোচিত বাহিনীসমূহের বাইরেও বিপুল সংখ্যক মানুষকে 'দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করার 'আইনানুগ' ক্ষেত্র তৈরী হয় এবং বাস্তবে এর কিছু প্রয়োগও করা হয়। রাজাকার বাহিনী বা শান্তি কমিটির সাথে যুক্ত ছিলেন না এমন বেশ কিছু ব্যক্তিকেও এই দালাল আইনে আটক করা হয়। কারণ দালাল আইনের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে অনেককেই 'দালাল' হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ ছিলো।

এই দালাল আইনের ফলে সারা দেশের মাদ্রাসা ও মসজিদসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং নির্দিষ্টভাবে *উলামা* বিভ্রান্ত, শঙ্কিত ও ভীত হয়ে পড়েন। রাজনীতির সাথে সংশিষ্ট *উলামা*তো বটেই, রাজনীতির সংশ্রবহীন *উলামা*ও এ আইনের ফলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে নানাভাবে ও নানা মাত্রায় হয়রানির শিকার হয়েছিলেন।

ফলে এ আইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে ওঠে। ব্যাপক ক্ষোভ, জন অসন্তোষ ও আইনটির ব্যাপক অপব্যবহারের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব সরকার দালাল আইনটি প্রত্যাহার করেন। অধ্যাপক আবদুল গফুর লিখেছেন:

> 'ঢালাওভাবে তখন নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ ও পীর-মাশায়েখদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। অনেককে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। দাঁড়ী-টুপিধারী লোকদের প্রথম দিকে বহুদিন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কাটাতে হয়। অবশ্য বৃহত্তর জনসমাজে এর ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ায় আটক আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখদের এক বছর পর ছেড়ে দেয়ার পালা শুরু হয়। দালাল আইনে আটকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দীর্ঘ দিন মাদ্রাসা বন্ধ রাখা হয়। পরে মওলানা আবদুর

---

[১৩] দেখুন, 'দালাল আইন', পরিশিষ্ট-২।

[১৪] দেখুন, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম*, ঢাকাঃ মুক্তি প্রকাশনী, ১৯৯২, পৃ. ৫৩।

রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলেমদের চেষ্টায় মাদ্রাসাসমূহ পুনরায় খুলে দেয়া হয়'।[১৫]

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর সরকার সারা দেশে দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের প্রতি *সাধারণ ক্ষমা* ঘোষণা করে এবং দালাল আইন প্রত্যাহার করে নেয়।[১৬] এর আগে সরকার একটি আংশিক ক্ষমা ঘোষণা করে।[১৭] তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল সাংবাদিকদের জানান, দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের সংখ্যা ৩৭,৪৭১ জন। আবদুল মালেক উকিল জানান, এই *সাধারণ ক্ষমার* আওতায় সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ডা. এ এম মালিক ও তার মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দসহ আর যারা মুক্তি পাবেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ড. হাসান জামান, ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ড. মোহর আলী ও খান এ সবুর।[১৮] উল্লেখ্য, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার দিনই, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩, শুক্রবারে, পিডিপি নেতা শাহ আজিজুর রহমান ও শর্ষীনার পীর মাওলানা আবু জাফর সালেহকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হয়।[১৯]

এ *সাধারণ ক্ষমার* আওতায় হত্যা, হত্যার চেষ্টা, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের অভিযোগে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্তরা গণ্য হবে না এবং মুক্তি পাবে না বলে *সাধারণ ক্ষমার* ঘোষণায় বলা হয়। দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের সবাইকে ক্ষমা না করায় এ ঘোষণাটিকে কোনোভাবেই *সাধারণ ক্ষমা* নামে অভিহিত করা উচিত ছিলো না বলে এ গবেষক মনে করেন, যদিও সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত মিডিয়াসহ সাধারণ্যে এটি *সাধারণ ক্ষমা* হিসেবেই উচ্চারিত হয়ে চলেছে এবং কিছুমাত্রায় বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।

কথিত এ *সাধারণ ক্ষমায়* দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের শতকরা ৯০জন মুক্তি পাবেন বলে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মালেক উকিল জানান।[২০] এ পর্যায়ে *দৈনিক ইত্তেফাক* (০২ ডিসেম্বর ১৯৭৩) এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করে: 'সুতরাং মনে করা যাইতে পারে যে, শতকরা যে দশজন বাকী থাকিবেন, তাঁহাদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের ডেফিনিট চার্জ রহিয়াছে। সে ডেফিনিট চার্জ কতটা 'ডেফিনিট' সে ব্যাপারেও উদার দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি। কেননা, এই মর্মে অভিযোগ রহিয়াছে যে, চার্জ তৈয়ারীর ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই "বাঁধা" গৎ প্রয়োগ করা হইয়াছে।'

পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৯৩ হাজার সদস্য বাংলাদেশে যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক থাকে। যুদ্ধাপরাধের সুস্পষ্ট অভিযোগে অভিযুক্ত ১৯৫জন পাকিস্তানী সেনা ও কর্মকর্তাসহ

---

১৫ দেখুন, পরিশিষ্ট-১।

১৬ দেখুন, পরিশিষ্ট-৩ক।

১৭ পরিশিষ্ট-৩।

১৮ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা, ২ জানুয়ারী ১৯৭৩।

১৯ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০১ ডিসেম্বর ১৯৭৩।

২০ *দৈনিক ইত্তেফাক*, ০২ ডিসেম্বর ১৯৭৩।

অন্য কয়েকটি বিষয়ে ১৯৭৪ সালের ৫ থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে বার দফা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হয়। ভারতের বিদেশ মন্ত্রী শ্রী সরদার শরণ সিং, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ও পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ ৮ দফা বৈঠক করেন ও ৩ দেশের কর্মকর্তা পর্যায়ে ৪ দফা বৈঠক হয়। ১০ এপ্রিল রাতে বৈঠক শেষে ঢাকা, নয়াদিল্লী ও ইসলামাবাদ থেকে ৩ মন্ত্রী স্বাক্ষরিত যে চুক্তি প্রকাশ করা হয়, তাতে অন্যান্য পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের সাথে যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত ১৯৫জন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তা ও সদস্যকে ক্ষমা করে দিয়ে পাকিস্তানে ফেরত পাঠাবার কথা বলা হয়।[২১]

আওয়ামী লীগ সরকারের *সাধারণ ক্ষমা* ঘোষণার কারণ ও প্রেক্ষাপট বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতা ও শেখ হাসিনা সরকারের (১৯৯৬-২০০১) তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ একটি ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন উপস্থাপন করেছেন তার 'সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম'[২২] শীর্ষক গন্থে। সাইয়িদের এ সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যা ও মূল্যায়ন পরিশিষ্ট-৩ঘতে যুক্ত করা হলো।

দাউদ হায়দারের কবিতা ও গণ বিক্ষোভ

দাউদ হায়দার নামের এক কবি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও হযরত ঈসা (আ.) এর প্রতি অবমাননাকর *কালো জোছনার কালো বন্যায়* শিরোনামে একটি কবিতা ১৯৭৪ সালে *দৈনিক সংবাদে* প্রকাশ করেন। কবিতাটির প্রতিবাদে সচেতন *উলামার* নেতৃত্বে প্রচণ্ড গণবিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এ বিক্ষোভের নেতৃত্ব দানকারী *উলামার* দাবির প্রেক্ষাপটে সরকার কবিতাটি নিষিদ্ধ করে এবং লেখক দাউদ হায়দারকে দেশ থেকে বিদেশে যেতে সুযোগ দেয়। এতে বাহ্যত আন্দোলনকারী *উলামার* দাবি সরকার পূরণ করেছিলো।

সীরাতুন্নবী (স.) মাহফিল ও সম্মেলন

শেখ মুজিব শাসনামলে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক দল-সংগঠন প্রতিষ্ঠার সাংবিধানিক নিষেধাজ্ঞার বাস্তবতায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনচরিত ও জীবনাদর্শ আলোচনার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালে গঠিত হয় *সীরাত কমিটি*। পুরনো ঢাকার আরমানীটোলা মাঠে সীরাত কমিটির উদ্যোগে প্রথম সীরাতুন্নবী (স.) সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর কোমল ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় রাজনীতি সচেতন *উলামার* এ উদ্যোগ বাহ্যত ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। এর পরবর্তী সময়ে গঠিত হয় *জাতীয় সীরাত কমিটি*। মাওলানা মোহাম্মদ ইসহাক, চরমোনাইর তৎকালীন পীর, শাহতলীর পীর, ক্বারী মাওলানা মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান প্রমুখ *আলিম* এসব উদ্যোগ-আয়োজনের নেতৃত্ব প্রদান করেন। ক্রমশ এ ধরনের আয়োজন সারা দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে।

---

[২১] *দৈনিক বাংলা*, ঢাকা, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪। আলোচনা ও চুক্তির বিবরণ: পরিশিষ্ট-৩খ ও ৩গ।

[২২] অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮।

মহানবীর (স.) জীবন ও আদর্শভিত্তিক এসব উদ্যোগ-আয়োজনের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব শাসনামলে রাজনীতি সচেতন এবং রাজনীতি বিমুখ *উলামা* পুনরায় দেশব্যাপী সংগঠিত ও সক্রিয় হবার চেষ্টা করেন।

ওআইসি-র লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিবের যোগদান

রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অব্যাহত থাকায় 'মুসলিম সম্প্রদায়ভিত্তিক' আন্তর্জাতিক সংগঠন ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-র সদস্যপদ গ্রহণ করা এ দেশের জন্য স্বাভাবিক ছিলো না। বাংলাদেশ ওআইসি-র সদস্যপদ গ্রহণ করুক, সেটা বাংলাদেশের তৎকালীন ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাষ্ট্র ভারতেরও কাঙ্খিত ছিলো না বলে দাবি করা হয়। তথাপি শেখ মুজিব ওআইসি-র সদস্যপদ গ্রহণ ও সংস্থাটির দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে (লাহোর, ১১-২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪) যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। ওআইসিতে যোগদানের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়।[২৩]

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

শেখ মুজিবের শাসনামলে ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় নীতি বহাল থাকার কারণে ইসলাম ধর্মভিত্তিক কোনো রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সুযোগ ছিলো না। অবিভক্ত পাকিস্তান আমলে ঢাকায় 'ইসলামিক একাডেমী' নামের একটি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ছিলো। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর ইসলামিক একাডেমীর কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। শেখ মুজিবের শাসনকালের শেষদিকে তিনি ইসলামিক একাডেমীর কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করেন এবং অতঃপর এ ক্ষেত্রে আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে একটি ব্যাপক কর্মপরিধির প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' স্থাপন করেন (২১ এপ্রিল ১৯৭৫)। ১৯৭৫ সালের ২৮ মার্চ *গেজেটে* প্রকাশিত প্রেসিডেন্টের এ সংশ্লিষ্ট ২২ মার্চের অধ্যাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়:

> 'মসজিদসমূহ এবং ইসলামী কেন্দ্র, শিক্ষালয় ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা এবং সেগুলোকে সাহায্য করা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও সভ্যতাসমূহের প্রতি ইসলামের অবদানমালার বিষয়ে গবেষণা করা, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, সহনশীলতা ও ন্যায় বিচারের মৌলিক ইসলামী আদর্শের প্রচার, ইসলামী ইতিহাস, দর্শন, আইন ও আইনশাস্ত্রের পাঠ ও গবেষণা এগিয়ে নেয়া এবং এ সংশ্লিষ্ট বৈষয়িক সমর্থন প্রদান'।[২৪]

পাকিস্তান আমলের 'ইসলামিক একাডেমী' ও 'বায়তুল মোকাররম সোসাইটি'-র সমন্বয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় *আলিম* নেতা মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং মাওলানা ফজলুল করিম ও মাওলানা মুহিউদ্দিন শামীর পরামর্শ শেখ মুজিব গ্রহণ করেছিলেন বলে দাবি করা হয়।[২৫]

---

[২৩] অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

[২৪] *ডিএলআর ১৯৭৫*, বাংলাদেশ স্ট্যাটিউটস, পৃ. ১২০।

[২৫] অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

শেখ মুজিবের শাসনামল: সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ

শেখ মুজিবের শাসনামলের পর্যবেক্ষণে দ্বিধা সৃষ্টিকারী ভিন্নমুখী বহু উপাদান পাওয়া যায়, যা থেকে এ শাসনামল বিষয়ে প্রায়শই বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার কারণ ঘটতে পারে। স্বাধীন বাংলাদেশে পা রেখে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিব বলেছিলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের 'দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম' রাষ্ট্র। তিনিই আবার দেশটির সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গ্রহণের ব্যবস্থা করছেন, বেতার-টেলিভিশনে কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করছেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম ও মুসলিম ঐতিহ্য প্রকাশক শব্দ বা বৈশিষ্ট্য প্রত্যাহারের ব্যবস্থা করছেন, ইসলামিক একাডেমীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করছেন। এই শেখ মুজিবই আবার ইসলামিক একাডেমী ও বন্ধ হয়ে যাওয়া মাদ্রাসা খুলে দেয়া, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, মাদ্রাসা বোর্ড স্থাপন করা, ওআইসি-র সদস্যপদ গ্রহণ করা প্রভৃতি কাজে অনেক ঘনিষ্ঠজনকে মনঃক্ষুন্ন করেও নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, যদিও এ সময় সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অব্যাহত ছিলো। ঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির বিদ্যমানতায় 'ধর্মসাপেক্ষ' কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন বাহ্যত সাংঘর্ষিক আচরণ। শেখ মুজিবের শাসনামলে বাস্তবে তা-ই ঘটেছে। এ সময়ে 'ধর্মসাপেক্ষ' কার্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তার দল আওয়ামী লীগের কিছু শীর্ষ *আলিম* নেতার দ্বারা যেমন প্রভাবিত ও অনুরুদ্ধ হয়েছেন, তেমনি ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ প্রধান মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পরামর্শ, অনুরোধ ও হুমকির দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত হয়েছেন বলে দাবি করা হয়। আওয়ামী লীগের দলীয় শীর্ষ *আলিম* নেতাদের মধ্যে মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশের নাম এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

শাসক হিসেবে শেখ মুজিবের অস্থিরচিত্ততা এবং পরিণামে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের নিকটই অনাস্থাভাজন হবার বিষয়টিও কোনো কোনো গবেষক চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। গবেষক মাসুদুল হক লিখেছেন:

> 'শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেই নয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও শেখ মুজিবের দ্বৈত মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে - যা তাকে ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাছে বিরাগভাজন করে তোলে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্য সহযোগিতার কথা অস্বীকার করার উপায় ছিল না বলেই ১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে এলে শেখ মুজিব যে পঁচিশ বছর মেয়াদী বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী-সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন- যা ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত ভারত-সোভিয়েত চুক্তিরই অনুরূপ,-খুশী করে ভারতকে যেমন, রাশিয়াকেও তেমনি। কিন্তু এই চুক্তি শেখ মুজিবের স্ববিরোধী চরিত্রকে তুলে ধরে পশ্চিমা জগৎ বিশেষ করে মার্কিন প্রশাসনের কাছে। আবার মার্কিনীদের খুশী করার জন্য এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট (পরে প্রধানমন্ত্রী) জুলফিকার আলী ভূট্টোকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনের লক্ষ্যে লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশসমূহের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান করে বিরাগভাজন হয়ে ওঠেন ভারতের। ...এমন কী তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরী কিসিঞ্জারের কাছে নিজেকে অধিকতর পশ্চিমা

ঘেঁষা বলে তুলে ধরার জন্য তাকে (তাজউদ্দিন আহমদকে) অবমাননার চূড়ান্ত করলেন। ১৯৭৫ সালের গোড়ার দিকে উপমহাদেশ সফরে বেরিয়ে বাংলাদেশ আসেন হেনরি কিসিঞ্জার। তার সম্মানে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক ভোজসভার আয়োজন করে। তাজউদ্দীন আহমদকে ওই ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হলোনা এই কারণে যে, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ: তিনি অতিমাত্রায় ভারত ঘেঁষা। একই অভিযোগের কারণে মার্কিন চাপে মন্ত্রিসভা থেকে তিনি হন অপসারিত।

শেখ মুজিবের এই দ্বৈত মানসিকতা অর্থাৎ সব পক্ষকে খুশী রেখে চলার কৌশল,- এতে রাশিয়াও বিরক্ত হয়ে ওঠে। ...শেখ মুজিবের এই স্ববিরোধী চরিত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার সম্পর্কে কতটা আস্থাহীন করে তোলে, তা আমরা জানতে পাবো র'র পর্যবেক্ষণ থেকে। র'র সে পর্যবেক্ষণ কী ছিল? -'শেখ মুজিবর রহমান দুই পরাশক্তির আস্থা হারিয়েছেন (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) এবং ভারতেরও। তারা তাদের নিজস্ব লোক না পাওয়া পর্যন্ত তাকে ক্ষমতায় রাখছে। তার অস্থির নীতি তাকে বিশেষ কোন শক্তির প্রতি আসক্তিত না করায় তাকে ক্ষমতায় থাকতে সাহায্য করছে।' শেখ মুজিব র'-র এই পর্যবেক্ষণ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। ... শেখ মুজিবের এই স্ববিরোধী রাজনৈতিক চরিত্রের কারণেই সি আই এ তার পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে আরম্ভ করে'।[২৬]

সাংবিধানিক বাধা-নিষেধ থাকায় শেখ মুজিব শাসনামলে *উলামা* নেতৃত্বের কোনো 'ইসলামী রাজনৈতিক দলের' অস্তিত্বের সুযোগ ছিলো না, সুযোগ ছিলো না *উলামা* নেতৃত্বের কোনো চাপ গোষ্ঠী (প্রেশার গ্রুপ) গঠনেরও। তাই এ শাসনামলে *উলামা* নেতৃত্বের উল্লেখযোগ্য কোনো রাজনৈতিক ভূমিকাও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

পুনশ্চ: ১৯৭২ সালের ১৭জুনের সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট 'সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের' নাম 'সলিমুল্লাহ হল' রাখার প্রস্তাব করে এবং সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া শেষে হলটির নাম থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সেই প্রস্তাবের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে 'সলিমুল্লাহ হল এলুমনাই এসোসিয়েশন'-এর প্রথম মহাসচিব রকিবুদ্দিন আহমেদ হাইকোর্টে রীট পিটিশন দায়ের করলে বাদীপক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য শুনে বিচারপতি এম এ আজিজ ও বিচারপতি নজরুল ইসলাম চৌধুরী সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ মামলার বিবাদী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্ট্রার ও সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্টকে 'সলিমুল্লাহ হল' নামকরণের প্রস্তাবকে কেনো বে-আইনী ঘোষণা করা হবে না এবং হলটির পূর্বের নাম পুনর্বহালের নির্দেশ দেয়া হবে না, তার কারণ দর্শানোর জন্য রুলনিশি জারি করেছেন।[২৭]

---

[২৬] মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ*, ঢাকা: প্রকাশক-মাহমুদ কলি, ১৯৯১, পৃ. ১০১-১০২।

[২৭] *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৩।

জিয়াউর রহমান শাসনামল (১৯৭৫-১৯৮২)

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সশস্ত্র বাহিনীর এক ক্ষুদ্র অংশের *সফল সশস্ত্র অভ্যুত্থানে* বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হলে বাংলাদেশে শেখ মুজিব শাসনামলের অবসান ঘটে। কর্নেল ফারুক ও রশীদের নেতৃত্বের সেই সফল সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় সেনা প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল কে এম শফিউল্লাহ এবং উপ সেনা প্রধান ছিলেন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। শেখ মুজিবের পর তার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমদ প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পান অথবা গ্রহণ করেন। আগস্টের শেষ সপ্তাহে জেনারেল শফিউল্লাহ-র স্থলে সেনা প্রধান নিযুক্ত হন জেনারেল জিয়াউর রহমান। সফল অভ্যুত্থান শেষে প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক দেশে সামরিক আইন জারী করেন, যার ফলে কিছু নাগরিক-রাজনৈতিক অধিকার স্থগিত করা হয়। তবে তিনি জাতীয় সংসদ বাতিল করেননি এবং দেশে সামরিক শাসনের *প্রশাসনিক কাঠামো* প্রতিষ্ঠা করেননি। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর একটি *পাল্টা সশস্ত্র অভ্যুত্থানে* ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ (সেনা বাহিনীর তৎকালীন চীফ অব জেনারেল স্টাফ-সিজিএস) ও তার স্বল্প সংখ্যক অনুগামী বঙ্গভবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন, ১৫আগস্টের অভ্যুত্থানের নেতাদের প্রবাসে পাঠান এবং সেনা প্রধান জেনারেল জিয়াকে গৃহ অন্তরীণ করে ব্রিগেডিয়ার খালেদ নিজেকে সেনা প্রধান ঘোষণা করেন। খন্দকার মোশতাকের স্থলে খালেদ মোশাররফ ও তার শুভার্থীরা তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে ১৯৭৫-র ৬ নভেম্বর প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণে সম্মত করিয়ে বঙ্গভবনে অধিষ্ঠিত করেন। ৬ নভেম্বর দিবাগত মধ্যরাত থেকে *সিপাহী-জনতার অভ্যুত্থান* শুরু হয়। এতে অংশ নেন কর্নেল (অব.) আবু তাহের গঠিত 'বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার' সাথে সংশ্লিষ্ট সৈনিকেরা, জাসদ-সৃষ্ট 'বিপ্লবী গণবাহিনী'র সমাজতন্ত্রপন্থী বেসামরিক ব্যক্তিরা এবং ভারত বিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন ও জেনারেল জিয়ার প্রতি অনুরাগী সৈনিকেরা। উল্লিখিত চার ধারার 'সিপাহী ও জনতা' যেভাবেই হোক প্রায় একই রকম ভূমিকায় একই সময়ে অবতীর্ণ হন। 'বিপ্লবী' (সমাজতন্ত্রী?) সৈনিকদের মিছিলে বিভিন্ন শ্লোগানের দুটি ছিলো এমন: ক. 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই- সুবেদারের ওপর অফিসার নাই' ও খ. *'সিপাই সিপাই ভাই ভাই- অফিসারদের রক্ত চাই'*।[২৮] *'অফিসারদের রক্ত চাইবার'* ভয়ঙ্কর পরিণতিতে এ অভ্যুত্থানে সেনা বাহিনীর একজন লেডী মেডিক্যাল অফিসার ডা. চেরীসহ ১২জন আর্মি অফিসার নিহত হন।[২৯] এই অভ্যুত্থানের (বিপ্লবের?) নায়ক সিপাহীরা ৬ নভেম্বর মধ্যরাতের কিছু পরেই গৃহবন্দী অবস্থা থেকে জেনারেল জিয়াকে মুক্ত করেন[৩০] এবং জিয়ার হাতে তাদের নেতৃত্ব অর্পণ করেন। ৭ নভেম্বর সকালে ৩ নভেম্বর অভ্যুত্থানের নায়ক ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ 'বিপ্লবী সৈনিকদের' হাতে নিহত হন।[৩১] ৬ নভেম্বরে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণকারী বিচারপতি সায়েম ৭ নভেম্বর এক ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম *জাতীয় সংসদ বাতিল* করেন, *সামরিক শাসনের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন* করে নিজেকে *প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক-সিএমএলএ* ঘোষণা করেন। ৬ নভেম্বর রাতব্যাপী ও ৭ নভেম্বর

---

২৮ এন্থনী মাসকারেনহাস, *বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ* (*বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসী অব ব্লাড*-এর বাংলা অনুবাদ, মোহাম্মদ শাহজাহান, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৫, পৃ. ১১৯।

২৯ *তদেব*, পৃ. ১২৪।

৩০ *তদেব*, পৃ. ১২১।

৩১ *তদেব*, পৃ. ১২০।

সকাল পর্যন্ত ঘটে যাওয়া 'সিপাহী-জনতার বিপ্লবের' প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট ও সিএমএলএ বিচারপতি সায়েম জেনারেল জিয়াকে ৭ নভেম্বর *সেনা প্রধান* হিসেবে 'অন্যতম ডিসিএমএলএ'(উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক) নিয়োগ করেন।[৩২] এভাবেই জেনারেল জিয়া বাংলাদেশের 'ক্ষমতা-কেন্দ্রের' নিকটবর্তী অবস্থান 'লাভ' করেন। অতঃপর সময়ের ব্যবধানে তিনি সিএমএলএ (২৯ নভেম্বর ১৯৭৬) ও প্রেসিডেন্ট (২১ এপ্রিল ১৯৭৭, সামরিক এবং অতঃপর রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত)-এর দায়িত্ব 'গ্রহণ' করেন। এ পর্যায়ে কয়েকটি অনুসিদ্ধান্তে আসা যায়:

জেনারেল জিয়া

ক. পনের আগস্ট সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাথে যুক্ত ছিলেন না,
খ. বাংলাদেশে সামরিক আইন জারী করেননি,
গ. সামরিক শাসনের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেননি,
ঘ. জাতীয় সংসদ বাতিল করেননি,
ঙ. ৩ ও ৭ নভেম্বর অভ্যুত্থানের সাথে যুক্ত ছিলেন না[৩৩] এবং
চ. অতঃপর তিনি ক্রমশ এক দলীয় ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে বহুদলীয় ব্যবস্থার দ্বার উন্মোচন করেন, সংবাদপত্রের অবাধ প্রকাশ অবারিত করেন, বিচার ব্যবস্থায় স্বাধীনতা নিশ্চিত করেন এবং দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাক জারিকৃত সামরিক শাসনের অবসান ঘটান।

১৯৮১-র ৩০মে এক *ব্যর্থ সশস্ত্র অভ্যুত্থানে* প্রেসিডেন্ট জিয়া নিহত হন। তৎকালীন ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় প্রেসিডেন্টের অস্থায়ী দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নির্বাচনের মাধ্যমে বিচারপতি আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৫ নভেম্বর ১৯৮১)। ৪মাসের ব্যবধানে তৎকালীন সেনা প্রধান লে. জে. এইচ এম এরশাদ এক *সফল সামরিক অভ্যুত্থানের* মাধ্যমে দেশে সামরিক শাসন জারি করে বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন এবং এই সাথে জিয়াউর রহমান শাসনামলের অবসান ঘটে। বর্তমান গবেষণাকর্মে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ থেকে ২৪ মার্চ ১৯৮২ পর্যন্ত সময়কালকে 'জিয়াউর রহমান শাসনামল' হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

জিয়াউর রহমান শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: ক. পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের তিনটির ক্ষেত্রে পরিবর্তন সাধন, খ. সংবিধানের প্রস্তাবনায় *বিসমিল্লাহ* সংযোজন ও *আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা* ঘোষণা করে সংবিধানের আরো কয়েকটি অনুচ্ছেদের *অনুকূল সংশোধন*, গ. বহুদলীয় রাষ্ট্রপতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি। আর এ সময়ে *উলামা*সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রম ও ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

ক. রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সংশোধন,

---

৩২ *তদেব*, পৃ. ১২৪।

৩৩ ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সাথে যুক্ত না থাকায় প্রাণহানির আশঙ্কাসহ গৃহবন্দী হন এবং ৭ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকালে একই রকম প্রাণহানির আশঙ্কা নিয়ে তিনি গৃহবন্দী অবস্থায় ছিলেন।

খ. রাজনৈতিক দলবিধি জারি,
গ. সংবিধান সংশোধন বিষয়ক গণভোট অনুষ্ঠান,
ঘ. মূর্তি বিরোধী আন্দোলন,
ঙ. প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়ার প্রতি উলামার সমর্থন,
চ. দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন,
ছ. সংসদীয় রীতির পরিবর্তন ও
জ. মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রভৃতি।

সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সংশোধন

জিয়াউর রহমান শাসনামলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে ১৯৭২-এর সংবিধানে বর্ণিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সংশোধনকে অনেকে বিবেচনা করে থাকেন। কারণ এ সংশোধনীর মাধ্যমেই প্রধানত পূর্ববর্তী শেখ মুজিব শাসনামলের সাথে জিয়াউর রহমান শাসনামলের পার্থক্য ও ভিন্নতা চিহ্নিত করা হয়। এ সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে 'আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের ঘোষণা', সমাজতন্ত্রকে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' অর্থে গ্রহণ করা এবং 'বাঙ্গালীর' স্থলে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করা হয়। পরিবর্তিত ৩টি মূলনীতির মধ্যে প্রথম দু'টির পরিবর্তন বিষয়ে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (১৯১৮-১৯৮৭) তৎকালীন 'রাষ্ট্রীয়' নেতৃত্বকে *প্রভাবিত* করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। একজন গবেষক লিখছেন:

> 'প্রেসিডেন্ট সায়েম দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার জন্য বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে নির্দেশ দেন। এর ভিত্তিতে বিচারপতি সাত্তার ১৯৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর বঙ্গভবনে হযরত মাওলানা আবদুর রহীম (র.)সহ পাঁচজন জাতীয় নেতার সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে দেশের ভবিষ্যত রাজনীতি ও গণতন্ত্রে উত্তরণের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিচারপতি সাত্তার ব্যক্তিগতভাবে নেতৃবৃন্দের মতামত নোট করে নেন।
>
> এ বৈঠকে মওলানা সাহেব সংবিধানের ইসলাম-বিরোধী মূলনীতির পরিবর্তনের পক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে, দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে এবং জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে শাসনব্যবস্থার ভিত্তিকে ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
>
> এরপর যতবারই প্রেসিডেন্ট সায়েম, বিচারপতি সাত্তার ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের সাথে মওলানা সাহেবের সাক্ষাত হয়েছে ততবারই তিনি তাঁদেরকে সংবিধান থেকে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ পরিত্যাগের এবং ইসলামী মূলনীতি সংযোজনের পরামর্শ দেন।
>
> প্রধানতঃ হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (র.)-এর উপর্যুপরি পরামর্শ ও চাপের ফলেই ১৯৭৬ সালে জারীকৃত রাজনৈতিক দলবিধিতে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ইসলামের জন্য দল গঠনের সুযোগ দেয়া হয় এবং ১৯৭৭সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সংযোজন করেন এবং সংবিধানের চার মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' স্থলে

> "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপরে ঈমান ও আস্থাই হবে আমাদের সকল কাজের ভিত্তি" যোগ করেন। এ ছাড়া তিনি "সমাজতন্ত্র"কে "ন্যায় বিচারের অর্থে সমাজতন্ত্র" করে এর ক্ষতিকারকতা ও ইসলাম-বিরোধী বৈশিষ্ট্য দূর করার চেষ্টা করেন'।[৩৪]

তিনটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একজন *আলিম* রাজনীতিকের (মাওলানা আবদুর রহীম) নাম এখানে নির্দিষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে।

রাজনৈতিক দলবিধি জারি

খন্দকার মোশতাক আহমদ জারিকৃত সামরিক আইন এবং বিচারপতি সায়েম ঘোষিত ও বাস্তবায়িত সামরিক শাসনের প্রশাসনিক কাঠামোর ফলে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিলো না। অবশ্য ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর আওতায় একদলীয় বাকশাল প্রতিষ্ঠিত হবার পর দেশে আর কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের সুযোগও ছিলো না। মূল সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নীতির কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক দল গঠনের সুযোগ ছিলো না। এমনি এক 'দলবিহীন' বাস্তবতার বাংলাদেশে জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই রাজনৈতিক দল বিধি (পলিটিক্যাল পার্টিজ রেগুলেশন্স -পিপিআর) ঘোষণা করেন। এই পিপিআর-এ গঠিতব্য রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য দশটি শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের[৩৫] কথা বলা হয়। সে সব শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো:

১. বিদেশী সাহায্য ও সহযোগিতায় কোনো দল গঠন, সংগঠন বা আহ্‌বান করা যাবে না; এমনকি কোনো ব্যক্তি এ ধরনের দলের সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্কও রাখতে পারবে না,

২. বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে ক্ষতিকর কোনোরূপ প্রচারণা ও আপত্তিকর কার্যকলাপে লিপ্ত কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করা যাবে না,

৩. প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের দলীয় তৎপরতা শুরু করার পূর্বে দলটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, গঠনতন্ত্র, কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্বাচন পদ্ধতি, দলীয় তহবিলের উৎস, জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানকল্পে দলের পরিকল্পনা সংবলিত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পেশ করতে হবে।

ঘোষিত পিপিআর-এ রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষেত্রে চাঁদা, নির্বাচন ও কাযক্রম বিষয়ক আরো কিছু বিধি-নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণের কথা ছাড়া তেমন কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি।

---

৩৪ নূর হোসেন মজিদী, *মওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৬১-১৬২।

৩৫ এম এ ওদুদ ভূঁইয়া, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা: রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮৯, পৃ. ১৩৯-১৪০।

এর ফলে আওয়ামী লীগ[৩৬], জাসদের মতো দল যেমন গঠিত হয়, তেমনি *মুসলিম জনগোষ্ঠীভিত্তিক* মুসলিম লীগ এবং ইসলামী আদর্শভিত্তিক ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ-আইডিএল প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজনৈতিক দল গঠন বিষয়ক রাষ্ট্রীয় এই নীতি-পিপিআর-প্রণয়নে কার্যকর *প্রভাব* বিস্তারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক *উলামার* মধ্যে মাওলানা আবদুর রহীমের নাম পূর্ববর্তী উদ্ধৃতিতে[৩৭] দেখা গেছে। এই পি পি আর-এ রাজনৈতিক দল গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক বিধি-নিষেধ না থাকার বিষয়টি বাস্তবে ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিত্যাগেরই একটি ধারাবাহিকতা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সংবিধান সংশোধন বিষয়ক গণভোট

জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্রমশ তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সংহত করেছেন। ১৯৭৫-এর ৭ নভেম্বর অন্যতম ডিসিএমএলএ নিযুক্ত হবার পর তিনি ১৯৭৬-এর ২৯ নভেম্বর সি এম এল এ-র দায়িত্ব এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে তিনি 'প্রেসিডেন্ট-সিএমএলএ' এবং অতঃপর প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সায়েমের *হাত দিয়ে* চারটির মধ্যে তিনটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসহ সংবিধানের তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধন সম্পন্ন করিয়ে নেন অথবা করতে সক্ষম হন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরদিন ১৯৭৭-এর ২২ এপ্রিল জেনারেল জিয়া ১৯দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ ১৯ দফার ১, ২ ও ১৬ নম্বর দফা ছিলো এমন:

'দফা-১: সর্বতোভাবে দেশের স্বাধীনতা, অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা,

দফা-২: সংবিধানের চারটি মূলনীতি অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র প্রতি সর্বাত্মক বিশ্বাস ও আস্থা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচারের সমাজতন্ত্র জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে প্রতিফলন করা,

দফা-১৬: সকল বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত সমতার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা এবং মুসলিম দেশগুলোর সহিত সম্পর্ক বিশেষ জোরদার করা'।[৩৮]

প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়া ঘোষিত ১৯দফার অন্য কর্মসূচিগুলোর অধিকাংশকেই অনেকে *গতানুগতিক কর্মসূচি* হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন। উল্লিখিত তিনটি কর্মসূচীর মধ্যে জেনারেল জিয়ার অনুসৃত নীতির তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় নীতি এবং 'সমাজতন্ত্রের' সংজ্ঞা বদলে দেয়ার যে পদক্ষেপ জেনারেল জিয়া গ্রহণ করেছিলেন, তৎকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় সেগুলো অব্যাহত রাখা রাজনৈতিক *উলামার* নিকট বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। আর যে পি পি আর-এর আওতায় মুসলিম লীগ ও আইডিএল-র মতো ধর্ম ও আদর্শভিত্তিক দল প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছিলো, সেসব দলের জন্য জেনারেল জিয়ার অনুসৃত নীতি ও কার্যক্রম

---

৩৬ চতুর্থ সংশোধনীর *জাতীয় দল* বিষয়ক নীতিমালার আওতায় রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের *বিলুপ্তি* ঘটেছিলো এবং *বাকশাল* নামের একটি 'জাতীয় দল' গঠিত হয়েছিলো।

৩৭ নূর হোসেন মজিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১-১৬২।

৩৮ এম এ ওদুদ ভূঁইয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯-১৪৩।

অব্যাহত রাখার বিষয়টি আরো বেশি অনিবার্য বিষয় ছিলো। এমনি বাস্তবতায় জেনারেল জিয়া ১৯৭৭ সালের ৩০মে তার 'অনুসৃত নীতি, কর্মপন্থা এবং তাঁর প্রতি দেশবাসীর আস্থা যাচাইয়ের জন্য'[৩৯] গণভোট অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিলে বাকশাল ও ভারত বিরোধী এবং ইসলামী নীতিমালার প্রতি আগ্রহী রাজনৈতিক-সামাজিক দল ও গোষ্ঠীসমূহ ব্যাপকভাবে জেনারেল জিয়ার পক্ষে *হাঁ ভোট* দিয়ে আস্থা প্রকাশের দায়িত্ব অনুভব করে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক *উলামা* কেবল 'ভোট দেয়ার' মধ্যেই দায়িত্ব সীমাবদ্ধ রাখেননি, বরং গণভোটকে 'অনুকূল অর্থে' সফল করার জন্য প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমেও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন। গবেষক নূর হোসেন মজিদী লিখেন:

> '১৯৭৭ সালের শুরুতে এতদসহ সংবিধানের সংশোধনীর ওপর গণভোটের আয়োজন করা হয়। সংবিধানের এ সংশোধনী গৃহীত হওয়া-না হওয়ার সাথে বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের ভবিষ্যত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কেননা রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও এ সংশোধনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারী ধর্মসম্পর্কহীন (সেক্যুলার) ও বামপন্থী দলগুলো এ সংশোধনীর বিরুদ্ধে ছিল। তাই আই ডি এল সারা দেশে সংবিধান সংশোধনীর পক্ষে জনমত গঠনের অভিযান চালায়। এতে মওলানা আবদুর রহীম সাহেব সর্বাধিক ভূমিকা পালন করেন'।[৪০]

বাস্তবে জেনারেল জিয়া ঘোষিত সংবিধান সংশোধন বিষয়ক গণভোটের আবেদন বাংলাদেশের সচেতন রাজনৈতিক *উলামার* কাছে ছিলো ব্যাপক ও গভীর এবং সেজন্য তারা সম্ভাব্য সকল উপায়ে এ গণভোট সফল করার চেষ্টা চালান।

মূর্তি বিরোধী আন্দোলন

জিয়াউর রহমান শাসনামলে *উলামা*সংশ্লিষ্ট রাজনীতির ক্ষেত্রে মূর্তি বিরোধী আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ। ১৯৭৭ সালের শুরুতে ঢাকা জিপিও-র দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের গোলচত্বরে[৪১] একটি 'মনুষ্যমূর্তির' ভাস্কর্য নির্মাণ কাজ চলতে থাকে। এক পর্যায়ে ভাস্কর্যটির নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে উপনীত হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক *উলামা* এর প্রতিবাদে সোচ্চার হন এবং অবিলম্বে 'মূর্তিটি' অপসারণের দাবি জানান। ইসলামী নীতিমালায় মনুষ্যমূর্তিসহ প্রাণীর ভাস্কর্য নির্মাণ নিষিদ্ধ হওয়ায় ঢাকাসহ সারাদেশের সচেতন *উলামা* মূর্তিবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। এর পরের ঘটনা প্রবাহ গবেষক নূর হোসেন মজিদী থেকে শোনা যেতে পারে:

> 'ক্রমে মূর্তি নির্মাণের খবর জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাছে পৌঁছল। এ খবর পৌঁছল বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলনের স্থপতি এবং আইডিএল-এর তদানীন্তন সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান হযরত মওলানা আবদুর রহীম (রঃ)-এর নিকট। বাংলাদেশের মুসলিম জনগণের বিরুদ্ধে এ সাংস্কৃতিক ষড়যন্ত্রে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হলেন। তাই তিনি সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে দেশের বৃহত্তর জনগণের ধর্মীয় অনুভূতি ও ঈমানী

---

[৩৯] *তদেব*, পৃ. ১৩৯-১৪৪।

[৪০] নূর হোসেন মজিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৫।

[৪১] পরবর্তীতে নাম হয় 'জিরো পয়েন্ট' এবং 'শহীদ নূর হোসেন চত্বর'।

চেতনায় আঘাতকারী এহেন কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানালেন এবং মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য জোর দাবি জানালেন।

মওলানা সাহেব ছাড়াও আরো অনেক ইসলামী ও মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতা এবং সমাজের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও বিবৃতি দিয়ে মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার দাবি জানালেন। কিন্তু সরকার এসব বিবৃতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেনি বলে মনে হল। কারণ এসব বিবৃতি প্রকাশিত হবার পরও মূর্তিটির ফিনিশিং টাচের কাজ এগিয়ে চলল। ফলে তওহীদী জনতার মধ্যে ক্রমেই ক্ষোভ ও অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠতে লাগল। এ ক্ষোভ সশব্দ বিক্ষোভ আকারে ফেটে পড়ার উপক্রম হল।

অন্যদিকে মূর্তি ভাঙ্গার দাবি সম্বলিত জাতীয় নেতৃবৃন্দের বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর বুদ্ধিজীবী নামধারী কতক ব্যক্তিসহ মূর্তির সমর্থকদের পক্ষ থেকেও মূর্তিটি না ভাঙ্গার দাবি জানিয়ে পাল্টা বিবৃতি দেয়া হতে লাগল। ফলে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির উপক্রম হল।

এটা ছিল এ দেশের কোটি কোটি মুসলমানের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার সময়। তাদের দ্বীন, ঈমান ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে এভাবে যে ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছিল তার বিরুদ্ধে কার্যকরভাবে রুখে দাঁড়াতে কেউ এগিয়ে এলেন না। অবশ্য তা সহজ কাজ ছিল না। কারণ দেশে তখন কড়া সামরিক শাসন চলছিল। রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা চার দেয়ালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষ করে একদলীয় বাকশালী স্বৈরশাসনের পরে ঐ সময় ক্ষমতাসীন সামরিক সরকারের অনুগ্রহেই বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এসব রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল। দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী দণ্ডমুণ্ডের মালিক তখন প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান; তাঁর সামনে কেউ রক্তচক্ষু প্রদর্শন বা কঠোর ভাষা উচ্চারণ করবেন এটা ছিল অকল্পনীয়।

কিন্তু সময়টা ছিল ঈমানী পরীক্ষার সময়। কেননা মূর্তি সরানো ও না-সরানোর দাবি-পাল্টা দাবির মুখে শেষ পর্যন্ত মূর্তিটি থেকে গেলে তার দ্বারা মূর্তিসমর্থকদের বিজয় প্রমাণিত হত। ফলে তাদের পক্ষে এ দেশে মূর্তিসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ঘটানো সহজ হত। তাই আপোষহীন সংগ্রামী জননেতা হযরত মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রঃ) এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি সরকারের একজন উর্ধতন কর্মকর্তাকে টেলিফোন করলেন এবং মূর্তি না ভাঙ্গার পরিণতি সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করলেন। তিনি বললেন, "আমি জানতে চাই মুর্তি সরানো হবে কি-না। কাল বিলম্ব না করে মূর্তি সরিয়ে ফেলুন, নইলে দেশে আগুন জ্বলে উঠবে।"

উক্ত কর্মকর্তা সাথে সাথেই মওলানা সাহেবের চরমপত্রের বিষয়টি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে জানালেন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বুঝতে পারলেন এবার পরিস্থিতি কোন দিকে গড়াতে যাচ্ছে। তাই তিনি মূর্তিটি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। ঐ দিন রাতেই মূর্তিটি সরিয়ে ফেলা হল। পরদিন সকালে দেখা গেল শুধু পাকা চত্বরের সাথে মূর্তির পায়ের সংযোগকারী রডগুলোর অংশবিশেষ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু মূর্তিটি উধাও হয়ে গেছে। দেশের তওহীদী জনতার ঈমানী চেতনা ও তওহীদী সংস্কৃতির বিজয় হল।

> ঘটনাক্রমে ঐ দিন ছিল ২৪শে আগষ্ট-আইডিএল-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। মওলানার সাহসিকতার কারণে তওহীদী জনতা যে বিজয়ের অধিকারী হল সেজন্য সকলে আল্লাহ্‌র নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করল'।[৪২]

বাস্তবে ঢাকার 'জিরো পয়েন্টের' মূর্তি বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক *উলামার* সাফল্য এক তাৎপর্যপূর্ণ অর্জন হলেও অতঃপর দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক সংখ্যক 'প্রাণী মূর্তির' ভাস্কর্য নির্মাণের বিপরীতে বাংলাদেশের *উলামা* কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জিয়ার প্রতি সমর্থন

জেনারেল জিয়া ১৯৭৮ সালের ৩ জুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন এবং নিজে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা জানান। ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের' প্রার্থী হিসেবে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেন। তার বিপরীতে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আওয়ামী লীগসহ ৫টি সেক্যুলার ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত জোট 'গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট' প্রার্থী জেনারেল (অবঃ) এমএজি ওসমানী। বাংলাদেশের রাজনৈতিক *উলামা* প্রধানত আইডিএল-এর ব্যানারে জেনারেল জিয়াকে সমর্থন করে এবং তার বিজয়ের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। গবেষক নূর হোসেন মজিদী লিখেছেন:

> 'বলা বাহুল্য যে, জেনারেল ওসমানী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে তাঁর প্রভাবে পার্লামেন্ট নির্বাচনেও গণতান্ত্রিক ঐক্যজোট বিজয়ী হত ও সরকার গঠন করত। এভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে পারলে নিঃসন্দেহে ১৯৭২-এর সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করত এবং ইসলামী আন্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করত। এ কারণে ঐ মুহূর্তে আইডিএল-এর জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সমর্থন দেয়াই ছিল সময়ের দাবি।
>
> এছাড়া প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ইসলামের প্রতি আগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং মওলানা আবদুর রহীম (রঃ)-এর পরামর্শ মোতাবেক সংবিধান সংশোধন করে তাতে ইসলামী মূলনীতি সংযোজন করেন। অধিকন্তু তিনি বার বার ঘোষণা করেন যে, বাংলাদেশ হবে একটি ইসলামী রাষ্ট্র। এমতাবস্থায় তাঁকে সমর্থন করার পথে তেমন কোন বাধা ছিল না। অন্যদিকে আইডিএল-এর পক্ষ থেকে প্রার্থী দেয়া হলে ভোট ভাগাভাগি হয়ে জেনারেল ওসমানীই জয়লাভ করতেন। তাই বাস্তবতার আলোকে মওলানা সাহেবের নেতৃত্বে আইডিএল জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সমর্থন প্রদান করে এবং তাঁকে বিজয়ী করার জন্যে দেশব্যাপী প্রচার তৎপরতা চালায়'।[৪৩]

স্মরণ করা যেতে পারে, এ সময়ে আইডিএল ছিলো বাংলাদেশে *উলামা* নেতৃত্বের *একমাত্র* রাজনৈতিক দল।

---

৪২ নূর হোসেন মজিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

৪৩ *তদেব*, পৃ. ১৭০-১৭১।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

জিয়াউর রহমান শাসনামলে বাংলাদেশের *উলামা* সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রমের মধ্যে ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে *উলামা*র অংশগ্রহণ ছিলো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত এ নির্বাচনে জেনারেল জিয়া প্রতিষ্ঠিত (১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং আওয়ামী লীগসহ অধিকাংশ দল এককভাবে অংশ নেয়। *উলামা* নেতৃত্বের ইসলামী দল আইডিএল এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাথে জোট গঠন করে 'গণতান্ত্রিক ইসলামী ফ্রন্ট ' নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ ফ্রন্ট নির্বাচনে ২০টি আসন লাভ করে যার ৬টিতে আইডিএল প্রার্থীরা বিজয়ী হন। এ ৬ জনের মধ্যে ৩জন ছিলেন *আলিম*।

সংসদীয় রীতির পরিবর্তন

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে নির্বাচিত তিন *আলিম* সদস্য হলেন মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (বরিশাল), মাওলানা মোজাম্মেল হক (কোটচাঁদপুর, ঝিনাইদহ) ও মাওলানা নূরুন্নবী সামদানী (ঝিনাইদহ)।

সংসদে প্রচলিত রীতি-নীতিসমূহ প্রধানত 'উত্তরাধিকার সূত্রে' বৃটিশদের নিকট থেকে পাওয়া। বাংলাদেশের সংসদীয় রীতিসমূহের অনেকগুলো তাই ইসলামী রীতির সাথে মানানসই ছিলো না। মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে নির্বাচিত *উলামা* সেসব 'অগ্রহণযোগ্য' রীতি পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। তেমন একটি রীতি হলো, সংসদের মূল অধিবেশন কক্ষে প্রবেশের সময় এবং তা থেকে বেরিয়ে আসার সময় স্পীকারের উদ্দেশ্যে মাথা ঝুঁকিয়ে বা নত করে স্পীকারকে সম্মান প্রদর্শন। মাথা ঝুঁকিয়ে স্পীকারকে সম্মান প্রদর্শনের এ রীতির সাথে নামাজে রুকু[৪৪] করার বাহ্যিক মিল রয়েছে। রুকুর মাধ্যমে মুমিন তার স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি বিনয়, আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। মাওলানা আবদুর রহীমের নেতৃত্বে *আলিম* সদস্যগণ ঘোষণা দিয়েই জানালেন, তারা সংসদের অধিবেশন কক্ষে মাথা উঁচু রেখেই প্রবেশ করবেন। বিকল্প হিসেবে তাঁরা ইসলামী রীতির অনুকূলে স্পীকারের উদ্দেশ্যে হাতের ইশারায় সালাম জানাবার রীতি প্রয়োগ করেন। এতে স্পীকারের প্রকাশ্য আপত্তি জানাবার সুযোগ ছিলো না। এভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক *উলামা* সংসদের ভেতর একটি ইসলামী রীতির প্রয়োগে সফল হলেন।[৪৫]

জাতীয় সংসদের আরেকটি রীতি হলো, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং নির্দিষ্টভাবে আইনসভার সদস্যবৃন্দের কেউ ইন্তেকাল করলে সংসদে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা ও শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে এক মৃতের জন্য সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালনকালে মাওলানা

---

[৪৪] ইসলামী বিধান মতে, নামাজে কোমর বরাবর মাথা সম্মুখে ঝুঁকানোকে রুকু বলে এবং এটি একটি আবশ্যিক করণীয়।

[৪৫] নূর হোসেন মজিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৩-১৭৪।

আবদুর রহীম মৃতের রুহের মাগফিরাত কামনা করে হাত তুলে মুনাজাত শুরু করেন। তাকে অনুসরণ করে আইডিএল-এর অন্য সদস্যগণও মুনাজাতের জন্য হাত তোলেন। তাদের দেখে ক্রমশ মুনাজাতে অংশীদারের সংখ্যা বাড়ে এবং এক পর্যায়ে সকল মুসলিম সদস্য মুনাজাতে যোগ দেন। এভাবেই জাতীয় সংসদে একটি ইসলামী রীতির সংযোজন ঘটে, যা ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। এবং এটি সংযোজিত হয় একজন *আলিম* রাজনীতিতের উদ্যোগ ও নেতৃত্বে।[৪৬]

জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে আগে নামাজের জন্য বিরতি দেয়া হতো না। মাওলানা আবদুর রহীমের দাবি ও চাপের মুখে নামাজের জন্য অধিবেশনে বিরতি দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। মওলানা আবদুর রহীমের প্রভাবেই জাতীয় সংসদে আজান দিয়ে জামায়াতে নামাজের ব্যবস্থা হয়। আগে ব্যক্তি সদস্যরা যার যার মতো এককভাবে নামাজ আদায় করতেন।[৪৭]

জাতীয় সংসদের প্রতিদিনের অধিবেশন শুরু করতে কুরআন তেলাওয়াতের রীতি ছিলো। কিন্তু সে তেলাওয়াত পর্যাপ্ত শুদ্ধ হবার নিশ্চয়তা ছিলো না। কারণ সংসদের উপস্থিত সদস্যদের কাউকে কুরআন তেলাওয়াতের জন্য আহ্বান করা হতো। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে আইডিএল-এর ৬জন সদস্যের বাইরে মুসলিম লীগ ও বিএনপি-র হাতে গোণা কয়েকজন সদস্যই কেবল শুদ্ধ করে কুরআন তেলাওয়াতে সক্ষম ছিলেন। তাই আইডিএল-এর সদস্যবৃন্দ অধিবেশনে উপস্থিত না থাকলে কুরআন তেলাওয়াতের বিষয়টি কিঞ্চিৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়তো। নির্ধারিত ও তালিকাভুক্ত দক্ষ ক্বারীর ব্যবস্থা না থাকায় এ সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছিলো। মাওলানা আবদুর রহীমের দাবির প্রেক্ষাপটে অধিবেশনের শুরুতে নির্ধারিত ক্বারীর মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান করা হয়।[৪৮]

মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন

জিয়াউর রহমান শাসনামলে *উলামা*সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রমের একটি ছিলো মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়ন। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'আলিয়া ধারার' মাদ্রাসাসমূহে সাধারণ বা আধুনিক পাঠ্য বিষয়সমূহ (বাংলা, ইংরেজী, গণিত, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি) পড়ানো হতো। কিন্তু 'আরবী, উর্দু বা ধর্মীয় বিষয়াদির' *শিক্ষা বর্ষের* সাথে সাধারণ পাঠ্য বিষয়সমূহের *শিক্ষা বর্ষের* ব্যাপক অসামঞ্জস্য বিদ্যমান ছিলো। শিক্ষা বর্ষের 'সমমান' (ইকুইভ্যালেন্স) প্রতিষ্ঠার বিষয়টি একটি গুরুতর সমস্যা ছিলো। 'চৌদ্দটি শিক্ষা বর্ষের' (*ফাজিল*) আরবী-ধর্মীয় পাঠ্য বিষয়াদির পাঠ শেষে মাদ্রাসাসমূহে 'দশ শিক্ষা বর্ষের' (*এসএসসি*, পূর্ববর্তী *ম্যাট্রিকুলেশন-এনট্রান্স*) সাধারণ শিক্ষার সমমানের স্বীকৃতি দেয়া হতো। মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন বাংলাদেশ জমিয়তুল মোদাররেসীন-এর সভাপতি মাওলানা এমএ মান্নান জিয়াউর রহমান শাসনামলে বিএনপির দলীয় রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দাবি করা হয়, জেনারেল জিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে মাওলানা এম

---

৪৬ *তদেব*।

৪৭ *তদেব*।

৪৮ *তদেব*।

এ মান্নান আলিয়া মাদ্রাসার বারো শিক্ষা বর্ষের (*আলিম*) জন্য এসএসসি-র রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হন। এর পরে অবশ্য এরশাদ শাসনামলে এই মাদ্রাসাসমূহের দশ শিক্ষা বর্ষের (*দাখিল*) জন্য এসএসসি-র স্বীকৃতি এবং বারো শিক্ষা বর্ষের (*আলিম*) জন্য এইচএসসি-র (পূর্ববর্তী *ইন্টারমিডিয়েট*) স্বীকৃতি অর্জনে এই *আলিম* রাজনীতিক মাওলানা এমএ মান্নান *প্রভাবকের* ভূমিকা পালন করেন বলে মনে করা হয়।[৪৯] সম্প্রতি মাওলানা এমএ মান্নান জানিয়েছেন, জিয়াউর রহমানের শাসনামলে আলিয়া মাদ্রাসাসমূহের জন্য বার্ষিক রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ ১৫০কোটির স্থলে ৫০০কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছিলো।[৫০] তিনি বলেন, '*সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলেই এবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার আমলেই মাদ্রাসা শিক্ষায় নতুন প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল*'।[৫১] বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা বিষয়ক রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মাওলানা এমএ মান্নান বাস্তবে প্রধান নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করেন।

এরশাদ শাসনামল

১৯৮২-র ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনা প্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ এক সফল সামরিক অভ্যুত্থানে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর ব্যাপক গণআন্দোলনের মুখে এরশাদ বিরোধী দলসমূহের মনোনীত তৎকালীন প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন।

এরশাদ শাসনামলের উল্লেখযোগ্য ঘটনা-কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: ক. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের আওতায় উপজেলা ব্যবস্থা চালু, খ. সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে *রাষ্ট্রধর্ম* হিসেবে ঘোষণা করা, গ. হাইকোর্ট ডিভিশনের ৬টি বিকেন্দ্রায়িত বেঞ্চ বিষয়ক অষ্টম সংশোধনীর বিধান আপীল বিভাগের ফুল কোর্টে বাতিল ঘোষণা এবং ঘ. ব্যাপক গণআন্দোলনের মাধ্যমে এরশাদ শাসনের অবসান। এ সময়ে *উলামাসংশ্লিষ্ট* রাজনৈতিক কার্যক্রম ও ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো ১. ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা ও ২. শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণার বিষয়টি।

১৯৮৮ সালের ৯ জুন সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর (১৯৮৮ সালের ৩০নম্বর আইন) মাধ্যমে '২ক সংখ্যক' একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয়। এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: '*প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।*' এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবদুল গফুর বলেন:

> '১৯৮২ সালে নির্বাচিত সাত্তার সরকারকে সরিয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন তদানীন্তন সেনা প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি মুসলিম বৈশিষ্ট্যভিত্তিক তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন- যেমন (ক) সংবিধান সংশোধন করে

---

৪৯ অধ্যাপক আবদুল গফুর, সাক্ষাৎকার,পরিশিষ্ট-১।

৫০ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৩।

৫১ *তদেব*।

ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, (খ) শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা, (গ) রেড ক্রস সোসাইটিকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে রূপান্তর। এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য জমিয়তুল মোদারেসীনের সভাপতি মওলানা এম এ মান্নান ও শর্ষীনার পীর মরহুম মওলানা আবু জাফর সালেহ (রঃ)-এর প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে এসবের পাশাপাশি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারীর ধর্মের অপব্যবহারের মারফৎ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের ইচ্ছাও ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়'।[৫২]

এরশাদ শাসনামলে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ও শুক্রবারে সরকারি সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণার মতো দু'টি রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে দু'জন *আলিম* মাওলানা এম এ মান্নান ও মাওলানা আবু জাফর সালেহ *প্রভাবকের* ভূমিকা পালন করেছেন বলে দাবি করা হয়। *আলিম* রাজনীতিকদের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য অর্জন বটে। তবে এ নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে 'নীতিগত অবস্থানের' চাইতে বৈধতার সংকটগ্রস্ত তৎকালীন শাসকের সস্তা 'জনসমর্থনের' ভিত্তিতে রাজনৈতিক বৈধতা অর্জনের 'কৌশলগত অবস্থান'কেই অনেকে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিলো বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

খালেদা জিয়া শাসনামল

১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকার[৫৩] ১৯৯১-র ২৭ ফেব্রুয়ারী পঞ্চম জাতীয় সংসদের নির্বাচন আয়োজনে তৎকালীন প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে ন্যায্যতার সাথে সহযোগিতা প্রদান করেন। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি পর্যাপ্ত উঁচু মাত্রার স্বচ্ছ ও অবাধ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয় এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (জামায়াত)-এর নিঃশর্ত সমর্থনে দলটি সরকার গঠন করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ ১৯৯৪ সালের এক পর্যায়ে 'গণ পদত্যাগ' করার ফলে এবং *একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অধিবেশনে অনুপস্থিত* থাকার প্রেক্ষাপটে সংসদে বিরোধী দলীয় আসনসমূহ শূন্য ঘোষিত হয়। বিরোধী সদস্যবৃন্দ বাস্তবে হেবরনের এক মসজিদে ফিলিস্তিনীদের ওপর ইসরাইলী নৃশংসতার প্রতিবাদে সংসদে মূলতবী আলোচনার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন এবং অতঃপর অভিযুক্ত মাগুড়া-২ উপনির্বাচনের প্রেক্ষাপটে *নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের*

---

৫২ সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

৫৩ *নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার* বলা হলেও অথবা তেমন দাবী করা হলেও সাংবিধানিকভাবে *তত্ত্বাবধায়ক সরকার* তখনো স্বীকৃত ছিলো না। তাই বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের সেই সরকার *তত্ত্বাবধায়ক সরকার* ছিলো না। একই সাথে রাজনীতি সচেতন ব্যক্তিবর্গ *নিরপেক্ষ* হতে পারেন না বলে সেই সরকার *নিরপেক্ষ সরকার*ও ছিলো না। তবে সেই সরকারটি *নির্দলীয়* ব্যক্তিবর্গ নিয়ে গঠিত হওয়ায় সেটি *নির্দলীয় সরকার* ছিলো। তাই সেই সরকারটিকে যথার্থভাবে *অন্তর্বর্তীকালীন সরকার* বলা উচিৎ।

সাংবিধানিক ব্যবস্থার দাবিতে অব্যাহতভাবে সংসদ অধিবেশন বর্জন করতে থাকেন। অব্যাহতভাবে সংসদ অধিবেশন বর্জনের প্রেক্ষাপটেই বিরোধী দলীয় সদস্যবৃন্দের আসনসমূহ শূন্য ঘোষিত হয়। প্রধানত বিপুল সংখ্যক শূন্য আসনের উপনির্বাচন এড়াবার জন্য বেগম খালেদা জিয়া পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯৫সালের ২৪ নভেম্বর ভেঙ্গে দেন। ১৯৯৬-র ১৫ ফেব্রুয়ারী জাতীয় সংসদের ষষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতসহ প্রধান বিরোধী দলসমূহ অংশ গ্রহণে বিরত থাকে এবং সে নির্বাচনে ভোট না দেয়ার আহ্বান জানিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনের দিন ১৫ ফেব্রুয়ারী তারিখের জন্য *গণকারফিউ* ঘোষণা করে জনগণকে হুঁশিয়ার করে দেন *ভোট দিতে গিয়ে কেউ আক্রান্ত হলে আওয়ামী লীগ দায়ী থাকবে না।* প্রধান বিরোধী দলগুলোর নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করা এবং ভোট দিতে গেলে 'আক্রান্ত হবার' শেখ হাসিনার হুঁশিয়ারীর প্রেক্ষাপটে এ নির্বাচনে গড়ে ১৫% ভোটার উপস্থিতি ঘটেছিলো বলে পর্যবেক্ষক মহল দাবি করেন। তবে নির্বাচনী ফলাফলে ৫০% এর বেশি ভোট প্রদানের কথা বলা হয়। অন্য বড় দলগুলোর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার প্রেক্ষাপটে বিএনপি সহজেই ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয়। ১৯ মার্চ ১৯৯৬ তারিখে ষষ্ঠ সংসদের প্রথম ও একমাত্র অধিবেশনটি শুরু হয়, ২৬ মার্চ দিবাগত রাতে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী গৃহিত হয়, ২৮ মার্চ প্রেসিডেন্ট আবদুর রহমান বিশ্বাস *'নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার'* বিলে সম্মতি প্রদান করেন এবং ২৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অনুরোধে প্রেসিডেন্ট ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। পরদিন ৩০ মার্চ ১৯৯৬ বাংলাদেশের প্রথম সাংবিধানিক নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বেগম খালেদা জিয়া শাসনামলের অবসান ঘটে।

খালেদা জিয়া শাসনামলের আরেকটি রাজনৈতিক অগ্রগতি ছিলো 'রাষ্ট্রপতিক সরকার ব্যবস্থা' (প্রেসিডেন্সিয়াল ফর্ম অব গভর্নমেন্ট) থেকে 'প্রধানমন্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায়' (প্রাইম মিনিস্টারিয়াল ফর্ম অব গভর্নমেন্ট) উত্তরণ। সাধারণভাবে যেটিকে 'সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা' বলা হয়, বর্তমান গবেষক সেটিকে 'প্রধানমন্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা' বলাই বেশি সঙ্গত বিবেচনা করেন। কারণ, সরকার পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্টের কর্তৃত্বের মাত্রার নিরিখে যদি পূর্ববর্তী ব্যবস্থাটিকে 'প্রেসিডেন্সিয়াল' বলা হয়, তবে একই কারণে (এবং বাস্তবেও তা-ই) পরবর্তী ব্যবস্থাটিকে 'প্রাইম মিনিস্টারিয়াল' সরকার ব্যবস্থা বলাই সঙ্গত ও ন্যায্য। 'প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা'য় প্রেসিডেন্ট যেসব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ভোগ করেন, কথিত 'সংসদীয় ব্যবস্থা'য় প্রাইম মিনিস্টার কার্যত সেসব কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাই ভোগ করে থাকেন।

খালেদা জিয়া শাসনামলে *উলামাসংশ্লিষ্ট* রাজনৈতিক ঘটনা ও কার্যক্রমের মধ্যে দুটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ ছিলো: ক. ভারতে বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে আয়োজিত বাবরী মসজিদ লংমার্চ ও খ. রাষ্ট্রদ্রোহী-ধর্মদ্রোহী বিরোধী আন্দোলন।

বাবরী মসজিদ লংমার্চ

সম্রাট বাবর প্রতিষ্ঠিত (১৫২৮) অযোধ্যার ঐতিহাসিক মসজিদটি 'বাবরী মসজিদ' নামে পরিচিত ছিলো। একটি মন্দির ভেঙ্গে মসজিদটিকে নির্মাণ করা হয়েছিলো বলে এক বৃটিশ আমলা, ফয়জাবাদের তৎকালীন জেলা প্রশাসক এইচ আর নেভিল, *ফয়জাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটে* লিখেন। নেভিল তার দাবির সমর্থনে গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। কিন্তু কালক্রমে ভারতের হিন্দু জনগোষ্ঠীর মাঝে এ বিশ্বাসটি জনপ্রিয়তা ও দৃঢ়তা লাভ করে। অযোধ্যাকে রামের জন্মভূমি চিহ্নিত করে বাবরী মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণের দাবি ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে এবং ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দু মৌলবাদীরা বাবরী মসজিদটি পুরোপুরি ধ্বংস করে ফেলে।

বাবরী মসজিদ ধ্বংস করায় বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠী হৃদয়ে গভীর ব্যথা অনুভব করেন। ব্যাপকভাবে সভা-সমাবেশ-বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে তারা তাদের ক্ষোভ ও কষ্টের কথা প্রকাশ করেন। এসময় বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'বাবরী মসজিদ লংমার্চ বাস্তবায়ন কমিটি, ঢাকা' নামের একটি ইস্যুভিত্তিক সংগঠন। এ কমিটিতে খেলাফত মজলিসের বাইরে কিছু *উলামা* নেতৃত্বের সংগঠন ও ব্যক্তি *আলিম* যুক্ত হন। সংগঠনটির মূল দাবি ছিলো অবিলম্বে মূল স্থানে বাবরী মসজিদ নির্মাণ। দেশব্যাপী এ কমিটি ব্যাপক জনমত সৃষ্টি করে ১৯৯৩ সালের ২ জানুয়ারী ভারতের অযোধ্যার উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে এক বিশাল লংমার্চ শুরু করে। ঢাকার দৈনিকগুলোর ৩ জানুয়ারী সংখ্যায় জানানো হয়, এই লংমার্চে চার লক্ষাধিক মানুষ অংশ নেয়। এই লংমার্চ আয়োজন ও শৃঙ্খলা বিধানে সাংগঠনিকভাবে প্রধান ভূমিকা পালন করে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস এবং এর সহযোগী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র মজলিস। লংমার্চ ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের দক্ষিণ গেট থেকে শুরু হয়ে কল্যাণপুর, গাবতলী, সাভার, আরিচা, ফরিদপুর, মধুখালী হয়ে ৪ জানুয়ারী যশোর পৌঁছে এক সমাবেশে মিলিত হয়। সেখান থেকে বেনাপোল সীমান্তের উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান লাখো মানুষের লংমার্চে যশোরের ধোপাখোলার কাছে পুলিশ ও বিডিআর গুলী চালালে ৫জন নিহত হয়।[৫৪] এরপর লংমার্চ আর অগ্রসর হতে পারেনি। শেষ হয় লংমার্চ। শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের আহ্বানে ও নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই লংমার্চ বাংলাদেশসহ সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি ও সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। তবে এর মূল 'লক্ষ্য' (বাবরী মসজিদ পুনঃনির্মাণ) অর্জিত হয়নি।

রাষ্ট্রদ্রোহী-ধর্মদ্রোহী বিরোধী আন্দোলন

তসলিমা নাসরিন (তসলিমা) নামের এক কলামিস্ট, কবি ও ঔপন্যাসিকের ধর্ম, নৈতিকতা, সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধী লেখার প্রতিবাদে অন্য সব শ্রেণী-পেশা-সংগঠনের চাইতে বাংলাদেশের সচেতন ও রাজনৈতিক *উলামা* অগ্রণী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। কোর্টে একাধিক মামলা ছাড়াও তসলিমার বিরুদ্ধে রাজধানী ঢাকা, জেলা শহর সিলেটসহ দেশের

---

৫৪ ৫ জানুয়ারী ১৯৯৩-র দৈনিকসমূহ।

বিভিন্ন স্থানে এতো ব্যাপক বিক্ষোভ ও সমাবেশ হয়েছিলো যে, প্রথমত তসলিমাকে তার ঢাকার শান্তিনগরস্থ বাসভবনে পুলিশ প্রহরায় থাকতে হয়েছে এবং অতঃপর এক পর্যায়ে তাকে দেশের বাইরে চলে যাবার সুযোগ দিয়েছে তৎকালীন বিএনপি সরকার। তসলিমা বিরোধী *উলামার* এমন ব্যাপক প্রতিবাদ-বিক্ষোভের বিষয়টি অনুধাবনের জন্য ব্যক্তি তসলিমা এবং তার লেখালেখি বিষয়ে কিছুটা ধারণা পাওয়া দরকার হবে।

ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলার বাসিন্দা ডাঃ রজব আলীর ২ ছেলে ২ মেয়ের মধ্যে তসলিমা নাসরিন তৃতীয় সন্তান। ময়মনসিংহ শহরে 'অবকাশ', আমলাপাড়া-ঠিকানায় তাদের পারিবারিক বসবাস। *লীমা নাসরিন* এবং *কেকা* নামেও লিখেছেন তিনি। তিনি 'সেঁজুতি' নামের কবিতা পত্র সম্পাদনা করেছেন, 'সকাল কবিতা পরিষদ' নামের সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৫৫] তসলিমা ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করেন ১৯৮৬ সালে। তার দেয়া জন্ম তারিখ অনুযায়ী ১৯৯৩-র নভেম্বরে তসলিমার বয়স ৩২ বৎসর। এ সময়ের মধ্যে তার ১৪টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, এর মধ্যে ৬টি কাব্যগ্রন্থ, ৫টি উপন্যাস এবং ৩টি প্রবন্ধ সংকলন। একাধিক দৈনিক ও সাপ্তাহিকে প্রকাশিত তার কলামের সংকলন ও অন্য লেখা মিলিয়ে তার আরো কিছু গ্রন্থ ইতোমধ্যে প্রকাশিত হবার কথা।

ভারতের বোম্বে থেকে প্রকাশিত ফ্যাশন ম্যাগাজিন *স্যাভী* পত্রিকায় তসলিমা জানিয়েছেন, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজে এমবিবিএস পড়ার সময় তার প্রথম বয়ফ্রেন্ড ছিলো ক্লাসমেট হাবিবুল্লাহ। পাঁচ বছর বন্ধুত্বের পর হাবিবুল্লাহ তাকে বিয়ে করতে চাইলে তসলিমা তা অস্বীকার করে বলেন, 'আমরা বন্ধু, আর কিছু নই।' তসলিমার এ দাবিকে মিথ্যা বলে জানান তার এক সময়ের লেখক বন্ধু ইসহাক খান। ময়মনসিংহে সরেজমিন পর্যবেক্ষণ ও প্রয়োজনীয় খোঁজখবর নিয়ে সাংবাদিক আরিফ ইফতিখার জানান, তসলিমা ক্লাস এইটে পড়ার সময়ই ক্লাসমেট সুদর্শন তরুণ খোকনের সাথে প্রেমের ঘনিষ্ঠতায় দীর্ঘদিন কাটিয়ে দেন। খোকন তখন (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪) ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সইতে মাদকাসক্ত জীবন কাটাচ্ছিলো। তসলিমার অন্য বয়ফ্রেন্ডদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এক পুলিশ কর্মকর্তার ছেলে ফারুক, কবি শামসুল ফয়েজ, সরকারি কর্মকর্তা আওলাদ হোসেন। বিবাহিত আওলাদ হোসেন তসলিমার সাথে পরকীয়া প্রেমে মত্ত হয়ে তার নিজের সংসার ভাঙ্গেন এবং সরকারি চাকুরী খুইয়ে সে সময় (ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪) ময়মনসিংহে বেকার জীবন কাটাচ্ছিলেন।[৫৬] *স্যাভী* পত্রিকায় তসলিমা জানান, ১৯৮১ সালে তিনি ৩ বছরের প্রেমের পরিণতিতে কবি রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে বিয়ে করেন ও ১৯৮৩ সালে একসাথে থাকতে শুরু করেন। অবশ্য ১৯৮৫ সাল থেকে তারা 'নিয়মিত

---

[৫৫] আরিফ ইফতিখার, "তসলিমা নাসরিনের অজানা অধ্যায়", *সাপ্তাহিক রোববার*, ঢাকা, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪, পৃ. ২৯।

[৫৬] ইসহাক খান, "তসলিমা নাসরিনকে খোলা চিঠি" এবং আরিফ ইফতিখার, "তসলিমা নাসরিনের অজানা অধ্যায়", *সাপ্তাহিক রোববার*, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪।

একসাথে' থাকতে শুরু করেন বলেও জানান। রুদ্রার বিষয়ে তসলিমা ৩টি অভিযোগ করেন: ১. রুদ্রার পুরুষাঙ্গে সিফিলিসের আলসার বা ঘা ছিলো, ২. রুদ্র বেশ্যালয়ে যেতো এবং তসলিমা তাকে বেশ্যালয় থেকে ফেরাতে পারেনি ও ৩. রুদ্র তাকে মদ খেয়ে পেটাতো। তসলিমা জানান, 'এ তিনটি কারণেই রুদ্র আমার স্বাধীনতা পছন্দ করতো না। প্রধান কারণ ছিলো সে একজন নারীর স্বাধীনতাকে পছন্দ করতো না'।[৫৭]

তসলিমা ও রুদ্র-র বন্ধু ইসহাক খান তার লেখায়[৫৮] জানান, ১৯৮৬-র শেষ দিকে তসলিমার ইচ্ছায় রুদ্র-তসলিমার বিয়ের ছাড়াছাড়ি (ডিভোর্স) হয়ে যায়। এর 'মাস ছয়েক পর' ইসহাক খান রুদ্র-র বাসায় এক সকালে গিয়ে দেখেন, রুদ্র-র বেডরুমে তসলিমা এবং রুদ্র জানান, তারা এক বিছানায় রাতে থেকেছেন। সেই থেকে তারা আবার 'যৌথ জীবন' অব্যাহত রাখেন। ১৯৮৮ সালে রুদ্র-র ইচ্ছায় রুদ্র-তসলিমার আবার ছাড়াছাড়ি হয়। ইসহাক খানের ভাষায় *চূড়ান্ত ছাড়াছাড়ি*।

ইসহাক খান জানিয়েছেন তসলিমার তিনজন স্বামীর কথা (রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, নাঈমুল ইসলাম খান ও মিনার মাহমুদ)। এর মধ্যে রুদ্র ১৯৯২ সালে মারা যান। অন্য দু'স্বামীর সাথেও তসলিমার *আনুষ্ঠানিক ছাড়াছাড়ি* হয়েছে। নাঈম বাংলাদেশে ঢাকায় সক্রিয় সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত আছেন। তসলিমার সাংবাদিক-সম্পাদক স্বামী মিনার মাহমুদ দেশ ছেড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'নির্বাসন গ্রহণ' করেছেন বলে দাবি করা হয়।

তসলিমার ব্যক্তিগত জীবনের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনার বাইরে প্রচুর রসালো ও বাহ্যত নোংরা, কৌতুহলোদ্দীপক এবং বিতর্কিত ঘটনা প্রবাহ রয়েছে। এখানে তা পাশ কাটানো হলো। এ পর্যায়ে তসলিমার লেখালেখি, চিন্তাধারা ও লক্ষ্য (টার্গেট, মিশন?) বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা পাবার চেষ্টা করা হবে।

সাংবাদিকসুলভ কলাম লেখা, কবিতা লেখা এবং উপন্যাস লেখা- এ তিন মাধ্যমেই তসলিমা প্রচুর লিখেছেন। এ তিন মাধ্যমের লেখালেখির মূল উপজীব্য বিষয়াদি তাৎপর্যপূর্ণভাবে একই রকম। তসলিমা বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাদি বিষয়ে লিখেছেন, 'নারী-পুরুষের বৈষম্য' বিষয়ে লিখেছেন, নারীর প্রতি 'সামাজিক ও ধর্মীয় রীতির আওতায় অবিচারের' বিষয়ে লিখেছেন, সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বহীনতার কথা লিখেছেন, ধর্মীয় অনুশাসনকে বানোয়াট বলেছেন, কুরআন-পরকাল-ফেরেশতা বিষয়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করেছেন, নারী-পুরুষের বিবাহ-বহির্ভুত শারীরিক সম্পর্ক, নারীর জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিচিত্র ও বিকৃতসব পন্থা-প্রক্রিয়ার পক্ষে ও বিয়ে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লিখেছেন, বাংলাদেশের বর্তমান সীমানার বদলে ১৯৪৭-পূর্ব সীমানার পক্ষে লিখেছেন, উপন্যাসের নায়কের মুখে 'শুয়োরের বাচ্চা বাংলাদেশ' বলিয়েছেন। তসলিমার সর্বাধিক বিতর্কিত উপন্যাস *লজ্জায়* তিনি বাংলাদেশ বিরোধী চূড়ান্ত মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

---

[৫৭] *স্যাভী*, বোম্বে, নভেম্বর ১৯৯২।

[৫৮] আরিফ ইফতিখার, *প্রাগুক্ত*, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪।

তসলিমা নাসরিনের সাহিত্য সংশ্লিষ্ট লেখালেখি বিষয়ে সাংবাদিক মোবায়েদুর রহমান একটি মূল্যায়ন লিখেছেন।[৫৯] তসলিমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে একই লেখকের আরেকটি মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছে।[৬০] ১৯৯৩-র ৩১ অক্টোবর কোলকাতার দৈনিক আনন্দবাজারে *বন্দী আমি* শিরোনামে তসলিমা লিখেছেনঃ

> 'বাঙালী বলতে আমি উনিশ কোটি মানুষকে বুঝি। দেশ বলতে বঙ্গদেশ বুঝি। আমরা তোমরা বলে কথা বলতে আমি পছন্দ করি না। আজ না হয় ধর্মের দেওয়াল উঠেছে আমাদের মধ্যে। এতো সূর্যের মতো সত্য যে একদিন এই দেওয়াল ভাঙবে, ধর্ম নির্বাসিত হবে, বাঙালি ফিরে পাবে তার পূর্ব পুরুষের মাটি, দিগন্ত অবধি সবুজ ধানক্ষেত; আম, জাম, কাঠালের বন। মাটির মূর্তির পায়ে ফুল পাতা রেখে কেউ নমো নমো বলবে না, পাপী আর অনুতপ্ত মানুষ মসজিদে পাঁচ বেলা কপাল ঠুকতে যাবে না। একদিন নিশ্চয়ই বাঙ্গালীরা হাতে হাত ধরে হাঁটবে বনগাঁ থেকে বেনাপোল, রংপুর থেকে কোচবিহার, মেঘালয় থেকে হালুয়াঘাট, শিলং থেকে তামাবিল, ভাটিয়ালি গাইতে গাইতে বৈঠা বাইবে মাঝি পদ্মা থেকে গঙ্গার উত্তাল জলে। এরকম একটি স্বপ্ন বুকে নিয়ে আমি বাঁচি। আমার মৃত্যু দিয়েও যদি আজ বাঙ্গালীরা এক দেশের মানুষ হয় আমি হেসে ঝুলব ফাঁসিকাষ্ঠে'।

১৯৯৩ সালে বর্তমান বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো ১১ কোটি ৩৭ লক্ষ। সঙ্গত কারণেই তসলিমার কথিত '১৯ কোটি বাঙ্গালীর' অবশিষ্ট ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ মানুষ পশ্চিম বঙ্গ বা এর সন্নিহিত এলাকার হবার কথা। পশ্চিম বঙ্গের অথবা আসাম-মেঘালয়-ত্রিপুরার বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী কখনোই বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের সাথে পৃথক একটি স্বাধীন বঙ্গদেশ গঠনের দাবি করেনি। সেক্ষেত্রে তসলিমার 'স্বপ্নের বঙ্গদেশ' বলতে স্বাধীন বৃহৎ ভারতের অধীনে একটি 'বৃহত্তর বঙ্গের' কথাই আসার কথা। অন্য কথায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে বিলুপ্ত করে দিয়ে পশ্চিম বঙ্গের সাথে যুক্ত হয়ে ভারতের অধীনস্ত হবার স্বপ্নের কথাই তসলিমা বলছেন। এমন স্বপ্ন এবং দাবি সঙ্গত কারণেই সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিরোধী স্বপ্ন ও দাবি।

অন্যদিকে তসলিমা আল্লাহর অস্তিত্ব, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিকতাকে অস্বীকার করে সুস্পষ্টভাবে 'মুসলমানিত্বের বন্ধন' থেকে বেরিয়ে গেছেন বলে *উলামা* দাবি করেছেন।

একই সাথে তিনি মানব সমাজের ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধসমূহকে অস্বীকার করেছেন। সাংবাদিক মোবায়েদুর রহমানের ভাষায় তসলিমার ৩টি এসাইনমেন্ট হলো :

> '(১) ধর্ম বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম এবং বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করে তার প্রিয় প্রতিবেশী দেশের ধর্মকে এ দেশে আমদানী করার পথ সুগম করা,

---

[৫৯] মোবায়েদুর রহমান, "তসলিমার রচনাঃ সাহিত্যমান ও অশ্লীলতা", *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ঢাকা, ৩ নভেম্বর ১৯৯৩।

[৬০] মোবায়েদুর রহমান, "সাম্প্রদায়িকতা ধর্মদ্রোহিতা ও বিবাহ প্রথার বিলোপঃ তসলিমা নাসরিনের মিশন", *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ১৭ নভেম্বর ১৯৯৩।

(২) দেশ থেকে শালীনতা, মূল্যবোধ এবং নৈতিক চরিত্রের নাম নিশানা মুছে ফেলে নৈতিকতার ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা এবং চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করা,
(৩) বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করে আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিকে ভারতের অঙ্গীভূত করা'।[৬১]

তসলিমার সাহিত্যকর্মকে পশ্চিম বঙ্গের বামপন্থী রাজনীতিক আজিজুল হক অভিহিত করেছেন '... *নারীর আত্মবিলাপ'* হিসেবে।[৬২]

রাজনীতিক আজিজুল হকের নিবন্ধ[৬৩], সাহিত্যিক ইসহাক খানের নিবন্ধ[৬৪], সাংবাদিক মোবায়েদুর রহমানের দু'টি মূল্যায়ন[৬৫] ও সাংবাদিক আরিফ ইফতিখারের রিপোর্ট[৬৬], মিলিয়ে পড়লে পাঠকমাত্রই তসলিমার দেশদ্রোহী-রাষ্ট্রদ্রোহী ('বঙ্গদেশ' তত্ত্ব), ধর্মদ্রোহী (সৃষ্টিকর্তা ও ইসলাম অস্বীকার) ও যৌন বিকৃতি সম্পর্কে একটি মোটামুটি স্বচ্ছ ধারণা পেতে পারেন।

তসলিমার লেখালেখির রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম ও নৈতিকতা বিষয়ক বক্তব্য গুরুতরভাবে বিকৃত, অসম্পূর্ণ, ভিত্তিহীন ও 'বাজারী' প্রকৃতির। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অস্তিত্ববিনাশী তসলিমার 'বন্দী আমি' শীর্ষক[৬৭] লেখার বাইরেও এ পর্যায়ে তার এমন সব বক্তব্য ও মন্তব্য আছে, যা পড়ে তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ মূর্খতার জন্য তাকে কেবল করুণাই করতে পারেন। যেমন, ১৯৪৭ সালের বাংলা বিভাগের জন্য তিনি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে দায়ী করেন (তসলিমার লেখা *'যাবো না কেন যাবো*, পৃ-৬৫)। সামান্য পড়াশোনা করলেই তসলিমার জানার কথা, ১৯৪৭ সালের বাংলা (ও পাঞ্জাব) বিভক্তিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গুরুতরভাবে বিরোধিতা করেছেন। তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের চাপেই বরং বাংলা বিভক্ত হয়।

সমাজের শৃঙ্খলা, এর টিকে থাকা এবং নীতি-নৈতিকতা বিষয়ে তসলিমার যে 'দর্শন' (সমাজ মনোবিজ্ঞানীদের ভাষায় মনোবৈকল্য), তা কেবল ন্যূনতম মানবীয় মূল্যবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে 'সর্বহারা' এক ঘৃণ্য মানব সন্তানের পক্ষেই ধারণ ও লালন করা সম্ভব বলে দাবি করা হয়েছে।

ধর্ম এবং নির্দিষ্টভাবে ইসলাম সম্পর্কে কোনো একটি প্রসঙ্গেও তসলিমা শুদ্ধ সূত্র বা উৎসের ব্যবহার না করে অসংখ্য উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন এবং সেসব অশুদ্ধ ও বিকৃত উদ্বৃতির ভিত্তিতে মনগড়া ব্যাখ্যা করে চলেছেন। একজন বিশ্লেষকের মূল্যায়ন পড়া যাক:

---

৬১ *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ১৭ নভেম্বর, ১৯৯৩।
৬২ *সাপ্তাহিক রোববার*, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪।
৬৩ *তদেব*।
৬৪ *তদেব*।
৬৫ *সাপ্তাহিক পূর্ণিমা*, ৩ ও ১৭নভেম্বর ১৯৯৩।
৬৬ *সাপ্তাহিক রোববার*, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪।
৬৭ *দৈনিক আনন্দবাজার*, কোলকাতা, ৩১ অক্টোবর ১৯৯৩।

তার বই পড়ে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, তিনি ইসলাম সম্পর্কে কোনো Systematic পড়াশুনা করেননি। অনেক অমুসলিমের মতো তিনিও শুধু সমালোচনার জন্য ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেছেন। তার কৌশল হচ্ছে-(ক) কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে ইসলামের খণ্ডচিত্র তুলে ধরা; (খ) কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসের অপব্যাখ্যা করা এবং (গ) কুরআন ও শক্তিশালী হাদীসের পরিবর্তে দুর্বল বলে গণ্য হাদীসকে ভিত্তি করে একটি মতে পৌঁছা এবং তার উপর আক্রমণ চালানো।

এসব কৌশল অবলম্বন করা অন্যায়। এটা কোনো academic নিয়মও নয়। এভাবে কোনো আদর্শ বা ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে না। তার বই থেকে কিছু উদাহরণ দিচ্ছি : তিনি তার গ্রন্থের ১১০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন "মুহাম্মদ এও বলেছেন- 'ঐ স্ত্রীলোক অতি উত্তম, যে দেখিতে সুন্দরী এবং যাহার মোহর অতি নগণ্য' (দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীলোককে মহানবীও অপছন্দ করতেন)।" তিনি হাদীসটির কোনো রেফারেন্স দেননি। সুতরাং হাদীসটি কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তার মন্তব্য যে, 'দেখতে অসুন্দরী স্ত্রীলোককে মহানবীও অপছন্দ করতেন' তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ প্রসঙ্গে বুখারী-মুসলিমের মতো গ্রহণযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি দিচ্ছি : "চারটি গুণের কারণে একটি মেয়ের বিয়ে করার কথা বিবেচনা করা হয় : তার ধনমাল, তার বংশ গৌরব - সামাজিক মান - মর্যাদা, তার রূপ ও সৌন্দর্য এবং তার দীনদারী। কিন্তু তোমরা দীনদার মেয়েকেই গ্রহণ কর"।[৬৮]

কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদীসে সৌন্দর্যকে মান-মর্যাদা অথবা শ্রেষ্ঠত্বের মূল ভিত্তি করা হয়নি। কুরআনের সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছে, "ইন্না আকরামাকুম এন্দাল্লাহে আতকাকুম" অর্থাৎ আল্লাহর নিকট সম্মানিত সে, যে বেশি মুত্তাকি বা আল্লাহর অনুগত। এ ব্যাপারে নারী পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই।

কোনো বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা জানতে হলে ঐ সম্পর্কে কুরআনের মূল বিধান দেখতে হবে। ঐ সম্পর্কে কুরআনে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত থাকলে তাও দেখতে হবে এবং তারপর দেখতে হবে রাসুল (স.) এর নির্ভরযোগ্য সুন্নাহ বা হাদীসে কী আছে এবং এসবের সমন্বিত ব্যাখ্যা করতে হবে। তা না করার কারণেই তসলিমা নাসরিন বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সম্পর্কে বলতে পারছেন যে তিনি অসুন্দরী নারীদের অপছন্দ করতেন।

মোহরানা সম্পর্কেও ঐ একই কথা। কুরআন ও সুন্নাহয় মোহরের কোনো সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। দুই পক্ষের সম্মতির উপরেই তা নির্ভর করবে।

নাসরিনের আর একটি মারাত্মক অপব্যাখ্যার উদাহরণ দিচ্ছি। তিনি লিখছেন : মুসলিম হাদীস শরীফে লেখা 'দুনিয়ার সবকিছু ভোগের সামগ্রী আর দুনিয়ার সর্বোত্তম সামগ্রী হচ্ছে মেয়ে মানুষ। বিনিময় পণ্য হিসাবে, মূল্যবান দাসী হিসাবে, দামী সামগ্রী হিসাবে সমাজে নারীর অবস্থান বলেই নারীকে 'মাল' বলে ডাকতে কারো দ্বিধা নেই। ওরা ডাকে, কারণ ধর্ম ওদের ইন্ধন জোগাচ্ছে, সমাজ ও রাষ্ট্র ওদের আশকারা দিচ্ছে'

---

৬৮ মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *পরিবার ও পারিবারিক জীবন*, ঢাকা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৩, পৃ. ১১১।

(পৃ.-১৪)। অথচ তিনি রাসুলুল্লাহর (স.) মূল উদ্দেশ্য বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। মূল হাদীসটি নিম্নরূপঃ

"ইন্নাদ্দুনিয়া কুল্লাহু মাতাউন ওয়া খাইরু মাতা ইদ্দুনিয়া আল-মারাতুন সালেহাতুন।" অর্থাৎ 'দুনিয়ার সবকিছু সম্পদ এবং দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সম্পদ ধর্মপ্রাণ স্ত্রী।' এই হাদীসে কেবল নারীকে নয় পুরুষসহ সবকিছুকেই সম্পদ বলা হয়েছে। অনেকটা আধুনিক অর্থনীতির মতো, যেখানে মানুষকে মানব সম্পদ বলা হয়। এই হাদীসে সবকিছুকে সম্পদ বললেও সবকিছুকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়নি। এমনকি সকল নারীকেও শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলা হয়নি। কেবল চরিত্রবান এবং সৎস্বভাবের নারীকেই "সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ" বলা হয়েছে। সৎ নারীকে সম্মান দেখানোই ছিলো রাসুলের (স.) উদ্দেশ্য। অথচ নাসরিন তার কি অপব্যাখ্যাই না করলেন।

সূরা নিসা'র ৩৪ নং আয়াতের একটি অংশের ভিত্তিতে নাসরিন বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম নারীকে কোন সম্মান দেয়নি। বরং স্ত্রীকে প্রহার করতে শিক্ষা দিয়েছে (পৃ.-৬০-৬১)। একথা তিনি পুস্তকের বিভিন্ন অংশে বলেছেন। এখানে তিনি ইসলামের একটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরেছেন এবং নারী বা স্ত্রীর প্রতি ইসলাম কি আচরণ করতে বলেছে তার মূল বিধান তিনি গোপন করেছেন। স্ত্রীর প্রতি কি আচরণ করতে হবে এ সম্পর্কিত মূল বিধানসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) "আর স্ত্রীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর, সৎভাবে জীবন-যাপন করো।"
(সূরা নিসা, আয়াত-১৯)

খ) "নারীর প্রতি সদাচরণ কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

"যার চরিত্র-ব্যবহার উত্তম সেই পূর্ণ ঈমানদার, আর তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যক্তি হচ্ছে সে, যে তার স্ত্রীর নিকট সবচেয়ে ভালো।" (তিরমিযী)

এ ছাড়া স্ত্রী ও কন্যাদের প্রতি রাসুলের (স.) আচরণ আমরা সবাই জানি এবং তাই হচ্ছে সুন্নত বা রাসুলের (স.) শিক্ষা যা অনুসরণে মুসলিমগণ নির্দেশিত। ইসলামের এই মূল বিধান উল্লেখ না করে কুরআনের এক ব্যতিক্রমী নির্দেশকে নাসরিন তার আলোচনার ভিত্তি করেছেন। ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্য আয়াতটির ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্যতিক্রমী নির্দেশের আয়াত অংশটি নিম্নরূপ "যদি তোমরা স্ত্রীর পক্ষ হতে 'নুশুজ' (অর্থাৎ Persistent disobedience বা সব সময় অবাধ্যতা, বিদ্রোহ) আশংকা করো তবে তোমরা তাদের বোঝাতে চেষ্টা করো, বিছানায় তাদের থেকে দূরে থাক এবং শাসন কর এবং তারা যদি অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের উপর নির্যাতন চালাবার ছুতো তালাশ করো না" (সূরা নিসা, আয়াত-৩৪)। ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে, পরিবার রক্ষা করা এবং তালাককে যতটা সম্ভব প্রতিহত করা। তদুপরি ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ করা। আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভালো জানেন যে, পরিবারের Senior Partner হিসাবে এবং অধিকতর শক্তিশালী হিসাবে পুরুষ পরিবারে স্ত্রীর অবাধ্যতার ক্ষেত্রে নারীকে নির্যাতন করতে পারে। এ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামের বিধান হচ্ছে অবাধ্যতার ক্ষেত্রেও মূলত বোঝাতেই চেষ্টা করতে হবে এবং প্রয়োজনে কিছু দিন আলাদা থাকতে হবে। সর্বশেষ পদ্ধতি হিসাবে শাসনের কথা বলা

> হয়েছে, যা পরিবারকে রক্ষার সর্বশেষ পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু রাসূল (স.) এই পদ্ধতি অনুসরণ করেননি এবং তা অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন।[৬৯]

তসলিমার এমনি ধারার সুস্পষ্ট রাষ্ট্রবিরোধী, সৃষ্টিকর্তা অস্বীকারকারী ও ন্যূনতম মানবিক মূল্যবোধ অস্বীকারকারী, যা পরিণামে সমাজে গভীর হানাহানি, রক্তপাত, অবিশ্বাস ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, লেখালেখির বিরুদ্ধে সমাজের অন্যসব শ্রেণী-পেশা-গোষ্ঠীর সাথে সাথে বাংলাদেশের রাজনৈতিক *উলামা* ব্যাপক ও তীব্র বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করতে থাকেন। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর ও সিলেট অঞ্চলের নেতা প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে 'তসলিমা বিরোধী' এক হরতাল ৯ অক্টোবর ১৯৯৩ তারিখে সিলেটে পালিত হয়। ধর্মদ্রোহিতা বিরোধী আইন প্রণয়ন, নাস্তিক-মুরতাদদের কঠোর শাস্তিদান, এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধ ও 'জনকণ্ঠ' নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবিতে 'এনজিওদের অপতৎপরতা ও নাস্তিক মুরতাদ প্রতিরোধ আন্দোলন' আয়োজিত (১৪ জুন ১৯৯৪) ঢাকার বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটের সমাবেশ থেকে আন্দোলনের আহবায়ক শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ৩০ জুন (১৯৯৪) দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করেন। হরতালে পিকেটিং-এর সময় ইসলামী ছাত্র মজলিসের স্কুল পড়ুয়া (অষ্টম শ্রেণী) এক কর্মী আরমান কিশোরগঞ্জে নিহত (শহীদ) হন। রাজনৈতিক *উলামার* তীব্র আন্দোলন এবং এক স্কুল ছাত্রের মৃত্যুর ঘটনার প্রেক্ষাপটে তসলিমা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। অনেকে দাবি করেন, দেশত্যাগের ক্ষেত্রে তৎকালীন বিএনপি সরকার তসলিমাকে পরোক্ষে সাহায্য করে। ৩০জুনের সফল হরতাল বিষয়ে একজন ভাষ্যকারের মূল্যায়ন ছিলোঃ

> 'বহু জুন মাস আসবে। বহু ৩০ জুন এসেছে ও আসবে। কিন্তু ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন ইতিহাসে অমর হয়ে রইবে। সম্ভবতঃই ইতিহাসে এই দিবসটিই পবিত্র কোরআন ও হাদীসে রসূল (দঃ) -এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারণার প্রতিবাদে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সম্ভবতঃ সর্বত্র প্রথম পূর্ণ দিবস স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল প্রতিপালিত হয়। ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন ইতিহাসের কাছে চিরদিন এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য চিহ্নিত হয়ে রইবে। ৩০ জুন আরও অনেকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বকীয়তা দাবি করবে। এদিনের সর্বাত্মক হরতাল কর্মসূচী এ দেশের ইতিহাসে বর্তমান শতাব্দীতে প্রথম অরাজনৈতিক আলেম-উলামা ও ইসলামী ব্যক্তিত্ববর্গের ডাকে একটি প্রতিবাদ দিবস হিসাবে উদ্‌যাপিত হলো। এই তাৎপর্যের গভীরতা রাজনীতির পর্যবেক্ষক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বাংলাদেশে হরতাল, ধর্মঘট কোনো নতুন কিছু নয়। কিন্তু ইসলামের অবমাননার প্রতিবাদে জনগণের মধ্য থেকে ওঠে আসা নেতৃত্বের ডাকে সারাদেশে সর্বাত্মক হরতালের ঘটনা এই প্রথম। এছাড়া ৩০ জুনের হরতালের কর্মসূচী সাফল্য নিম্নলিখিত গণদাবিগুলির প্রতি মানুষের সমর্থনের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। দাবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো : (১) পবিত্র কোরআন ও ইসলামের অবমাননাকারীদের শাস্তি প্রদান, (২) ধর্মীয় মহাপুরুষদের চরিত্রহনন ও

---

[৬৯] আবু ফয়সল ও আহমদ মনসুর, *তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা,* ফরিদপুর : আমান প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ১২-১৩।

নিন্দাজ্ঞাপনকে দণ্ডযোগ্য করার জন্য "ব্লাসফেমী" আইন পাস করা; (৩) ধর্মদ্রোহী, দেশদ্রোহী ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল একশ্রেণীর 'এনজিও'র অপতৎপরতা প্রতিরোধ; (৪) কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা-ইত্যাদি।

ইসলামী নেতৃত্বের সোপানে রয়েছেন ধর্মীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল এক দল নিষ্ঠাবান আলেম-উলামা। এদের এই নেতৃত্ব গ্রহণ এবং ঐক্যবদ্ধ মোর্চায় সমবেত হবার মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ওলামা সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্বের উজ্জ্বল (Enlightened) নিদর্শনেরই যেন ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি ঘটলো!

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, ইসলামী আন্দোলনের এই ঐতিহাসিক পর্যায়ে জাতিকে পথ নির্দেশ দিতে এগিয়ে এসেছেন এমন সব ব্যক্তিত্ব, যারা এই সাম্প্রতিককাল পর্যন্তও জ্ঞান-গবেষণা, সাধনা ও ঐকান্তিক সঙ্গোপনে নির্লিপ্ত, নৈর্ব্যক্তিক জীবন-যাপনকেই শ্রেয়ঃ মনে করতেন। পণ্ডিতবর্গের এই উত্তরণ ইসলামী আন্দোলনে সাবজেকটিভ এবং অবজেকটিভ, কুয়ালিটেটিভ এবং কুয়ানটিটেটিভ অর্থাৎ উদ্দেশ্যগত এবং বৈষয়িক, মানগত এবং মাত্রাগত-সর্ববিধ ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।

৩০ জুনের ইসলামী নেতৃত্বের ডাকে আহূত হরতালের তাৎপর্য আরও অনুভব করা যায় এ থেকে যে, এই কর্মসূচীর সর্বাত্মক সাফল্য অনুমান করে নাস্তিক-মুরতাদ ও বাম-রামপন্থীদের পক্ষের শক্তির তরফ থেকেও একই দিবসে অনুরূপ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ তারা অনিবার্য একটি সাফল্যকে হাতছাড়া না করে তাকেও বেনামে হাতানোর মওকা তালাশ করেছিল। কুখ্যাত মুরতাদ শক্তি দর্প ভরে ঘোষণা দিয়েছিল যে, ৩০ জুন তারা ধর্মদ্রোহীদের প্রতিবাদকারীদেরকে মাঠে নামতে দেবে না। অথচ ১ জুলাই '৯৪-এর জাতীয় পত্র-পত্রিকা চিরদিন সাক্ষ্য দেবে যে, এদিন কার্যত গোটা দেশের রাজপথ-জনপথ ছিলো ইসলামী যুব-তরুণ শক্তির দখলে। পক্ষান্তরে, মুরতাদদের প্রশ্রয়পুষ্ট, ভারতীয়-আধিপত্যবাদের দালাল শক্তি পুলিশের ছত্রছায়ায় কোথাও কোথাও কৌশলগত অবস্থান নিয়ে "বীর পুরুষের" ন্যায় বাহাদুরি দেখিয়েছে। ৩০ জুন ঢাকাসহ গোটা দেশের রাজপথে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে সৃষ্টির সর্বোত্তম আওয়াজ, স্রষ্টা-প্রতিপালকের বন্দনা-ধ্বনি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-মুহাম্মাদুর রাসূল আল্লাহ।"

৩০ জুনের হরতালের স্বতঃস্ফূর্ততা প্রয়োজনাতিরিক্তভাবে এ কথাই প্রমাণ করেছে যে, ইসলাম ও কোরআন অবমাননাকারীদের ঠাঁই এ দেশে নাই। ৩০ জুন ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার-যাদের ক্ষমতার কৌশলগত উৎস ছিলো ৫ম সংশোধনীতে উৎকলিত "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম", তারা পালন করেছে নির্বিবাদী, নিরপেক্ষ রেফারী বা আমপায়ারের ভূমিকা। হরতাল চলাকালে মুরতাদ পক্ষের প্রতি পুলিশ সীমাহীন পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। অপরদিকে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস এমনকি গরম পানির ফোয়ারা বর্ষিত হয়েছে ইসলামী যুব-জনতার প্রতি। বিসমিল্লাহ্‌র লেবাসধারী জাতীয়তাবাদী দলীয় সরকারের মুখোশ উন্মোচনের দিন হিসাবেও ৩০ জুন ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রইবে'।[৭০]

---

৭০ *ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিরোধ আন্দোলন*, চলতি প্রকাশনা, ঢাকা, তারিখ বিহীন, ১৯৯৪, পৃ. ৮৩-৮৪।

খালেদা জিয়া শাসনামলে বাবরী মসজিদ লংমার্চ ও তসলিমা বিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক *উলামাকে* নেতৃত্ব দেন *শায়খুল হাদীস* নামে খ্যাত প্রবীণ *আলিম* আল্লামা আজিজুল হক। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের পর ১৯৯৩-র এপ্রিলে অনুষ্ঠিত *সার্কের* ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও-র অংশ গ্রহণের প্রতিবাদে আয়োজিত বিক্ষোভ কর্মসূচী থেকে *শায়খুল হাদীস* আল্লামা আজিজুল হকসহ খেলাফত মজলিস ও ছাত্র মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। তসলিমা বিরোধী তথা ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিরোধ আন্দোলন ও ৩০ মার্চের (১৯৯৪) হরতাল সফল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালনকারী অন্য দল-সংগঠন-গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো মাওলানা মুহিউদ্দিন খান ও মুফতী ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে 'ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা' (১৬ জুন ১৯৯৪-এ গঠিত), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, খেলাফত মজলিস, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, এনডিএ, মুসলিম লীগ, জমিয়তুল মুদাররেসীন, ইসলামী ঐক্য পরিষদ (সিলেট), সর্বদলীয় ইসলামী জোট চট্রগ্রাম, ফুলতলীর (সিলেট) পীর, ছারছীনার (বরিশাল) পীর, পিইএন বাংলাদেশ শাখা, বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতীব মাওলানা উবায়দুল হক, হাটহাজারী মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি আহমদ শফী, জাতীয় সংসদ সদস্য মাওলানা উবায়দুল হক (খেলাফত মজলিস, ইসলামী ঐক্যজোট) ও মাওলানা আতাউর রহমান খান (বিএনপি)।

শেখ হাসিনা শাসনামল

বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের তত্ত্বাবধানে ১৯৯৬-র ১২ জুন জাতীয় সংসদের সপ্তম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে এবং জাতীয় পার্টির সমর্থনে ২৩ জুন ১৯৯৬ সরকার গঠন করে। শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (এরশাদ, পরে নাজিউর রহমান মঞ্জুরের নেতৃত্বে), জামায়াত ও ইসলামী ঐক্যজোটের চারদলীয় জোট অব্যাহত আন্দোলন করে। কিন্তু শেখ হাসিনার সরকার ৫ বছরের পূর্ণ মেয়াদ ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হয় এবং মধ্য জুলাই-এ (২০০১) বিচারপতি লতিফুর রহমানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর জাতীয় সংসদের অষ্টম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে।

শেখ হাসিনা শাসনামলের উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা ও কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে: ক. সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোটের সমন্বয়ে চারদলীয় জোট গঠন, খ. সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনের সর্বস্তরে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ব্যাপক 'দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও পারিবারিকীকরণ', গ. ক্ষমতাসীন দলের ছত্রচ্ছায়ায় সারা দেশে বেশ কিছু সন্ত্রাসী গ্রুপ তৈরী এবং রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হত্যা, ঘ. চরমপন্থী ইসলামী মৌলবাদীদের দমনের নামে ইসলামী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও নিরীহ মাদ্রাসা শিক্ষক-ছাত্রদের ধর-

পাকড় ও হয়রানী এবং ঙ. বেশ ক'টি ব্যাপক বিধ্বংসী বোমা হামলার দায় তদন্তের পূর্বেই রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক *উলামার* ওপর চাপানো।

শেখ হাসিনার শাসনামলে *উলামা*সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক কার্যক্রম ও ঘটনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

ক. বিভিন্ন এনজিও-র ধর্ম বিদ্বেষী কার্যক্রমের প্রতিবাদ,

খ. ফতওয়া নিষিদ্ধের রায় বিরোধী আন্দোলন,

গ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রাজেডী,

ঘ. *উলামা* নির্যাতন,

ঙ. কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী আইন প্রণয়ন না করার জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

ক. এনজিও-র ধর্মবিদ্বেষী কার্যক্রমের প্রতিবাদ

বেসরকারি সংগঠন-সংস্থা(ননগভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন-এনজিও)সমূহ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু করে। বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক হিসেবে ঘোষিত ও কথিত এসব সংস্থা ক্রমশ উন্নয়নসংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রমেই যুক্ত হতে থাকে। বয়স্ক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে এনজিওগুলো কম-বেশী ইতিবাচক সাফল্য প্রদর্শন করলেও কার্যকর দারিদ্র্য বিমোচনে এসব এনজিও উত্থাপিত প্রশ্নাদির জবাবদানে সক্ষম হয়নি। অন্যদিকে বেশ কিছু এনজিও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ধর্মান্তরের কাজে সক্রিয় থাকে বলে অভিযোগ করা হয়। সরকারের এনজিও বিষয়ক দফতর 'এনজিও ব্যুরো' একশ'টি এনজিও-র ওপর তদন্ত চালিয়ে ৫২টিকেই খৃষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরের কাজে সরাসরি লিপ্ত হিসেবে দেখতে পায়।[৭১] 'প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র' নামের একটি এনজিও-র বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়, এটি এনজিওগুলোর সমিতি 'এডাব' (এসোসিয়েশন অব ডেভেলপমেন্ট এজেন্সিজ অব বাংলাদেশ) এর অন্তর্ভুক্ত প্রচুর সংখ্যক এনজিওকে বাংলাদেশের একটি প্রধান দল আওয়ামী লীগ ও বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রমে ১৯৯৬ সালে সক্রিয় করেছিলো। এই এনজিওগুলো পরিকল্পিত, আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য প্রক্রিয়ায় দেশের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অবমাননাকর ও অপমানকর আচরণ ও কার্যক্রম অব্যাহত রাখে বলে *উলামার* পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। এনজিওগুলোর এসব আচরণ ও কার্যক্রম দেশের ধর্মীয় নেতৃত্ব ও ব্যক্তিবর্গের মাঝে গভীর ক্ষোভ সৃষ্টি করে। এমনি এক বাস্তবতায় ১৯৯৮-র ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দেশের পূর্বাঞ্চলীয় জেলা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নিয়াজ মোহাম্মদ খান স্টেডিয়ামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিকাসহ কয়েকটি এনজিও বিজয় মেলার আয়োজন করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়মেলায় অংশ গ্রহণকারী এনজিও কর্মীদের প্ল্যাকার্ড ও শ্লোগানের ভাষা ছিলো: 'ফতোয়াবাজ নিপাত যাক', 'জজ-ম্যাজিস্ট্রেট থাকে ঘরে, মোল্লা কেন বিচার করে', 'হৈ হৈ রৈ রৈ, মোল্লারা গেল কৈ', 'মৌলবাদের চামড়া, তুলে নেব আমরা' ইত্যাদি। বিজয় মেলায় দিনে বক্তৃতা-বিবৃতি-গান-নাচ এবং রাতে নারী-পুরুষের অবাধ সহাবস্থান চলতে থাকার প্রেক্ষাপটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক *উলামা*

---

৭১ মোজাদ্দেদ হাসান তাদনান, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্র্যাজেডি ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১*, ঢাকা: হৃদয় প্রকাশন; ২০০১, পৃ. ১৬।

৭ ডিসেম্বর (১৯৯৮) সেই বিজয় মেলা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য সদলবলে অগ্রসর হয়। এনজিও কর্মী বাহিনী ও *উলামার* সম্মুখ সংঘর্ষে উভয় পক্ষে কিছু ক্ষয়-ক্ষতি ও আঘাত পাবার ঘটনা ঘটলেও এনজিও-র বিজয় মেলা আর অব্যাহত রাখা যায়নি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ঘটনার পর এনজিওগুলোর বিজয় মেলা সিলেট, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে *উলামার* প্রতিরোধের মুখে পড়ে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘটনার পরদিন ৮ ডিসেম্বর উক্ত জেলা শহরে *উলামার* আহ্বানে হরতাল পালিত হয়। ব্রাহ্মণবাড়িযার *উলামার* পক্ষে মুফতি আবদুর রহিম কাসেমী এনজিও 'প্রশিকা'-প্রধান ও তার সহযোগীদের বিবাদী করে একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর এনজিওগুলোর পক্ষ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার *উলামার* বিরুদ্ধে দশকোটি টাকার ক্ষতিপূরণ করে মামলা করা হয়। এ পর্যায়ে 'সরকারের উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপে' দু'পক্ষের মাঝে সমঝোতা হয় এবং এনজিও পক্ষ ঘোষণা দেয়, তারা ইসলাম বিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত হবে না।[৭২] বাহ্যত এ ক্ষেত্রে *উলামাপক্ষ* বিজয়ী হয়।

খ. ফতওয়া নিষিদ্ধের রায় বিরোধী আন্দোলন

২০০১ সালের ১ জানুয়ারী বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের দুই বিচারপতির একটি বেঞ্চ 'সব ধরনের ফতওয়া নিষিদ্ধ' করে একটি রায় প্রদান করেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক *উলামা* ঐক্যবদ্ধ অবস্থান গ্রহণ করেন। হাইকোর্টের এ রায়ের (পূর্ণভাষ্য, পরিশিষ্ট-৪) প্রেক্ষাপটে ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব এবং লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি ফজলুল হক আমিনী উক্ত রায় প্রদানকারী দুই বিচারপতিকে 'মুরতাদ' বা 'ইসলামত্যাগী' ঘোষণা করে ২ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে একটি ফতওয়া (পূর্ণভাষ্য, পরিশিষ্ট-৪ক) প্রদান করেন। ২০০১ সালের ১৪ জানুয়ারী সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ হাইকোর্টের উক্ত রায়কে ৬সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। ২৮ জানুয়ারী ঢাকায় দেশের ফকীহদের[৭৩] এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ২ ফেব্রুয়ারী ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির আয়োজনে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক *উলামা*-মাশায়েখ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন ৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকার প্যারেড স্কোয়ারে 'ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন'-এর ব্যানারে প্রশিকাসহ কিছু এনজিও-র উদ্যোগে এক মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এ দিন হাইকোর্টের 'ফতওয়া নিষিদ্ধকারী' রায়ের বিরুদ্ধে 'ফতওয়া প্রদানের' অপরাধে মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে গ্রেফতার করা হয়। এ দিন ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বানে হরতাল চলাকালে ঢাকার মোহাম্মদপুরের 'নূর মসজিদে' পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়ার লাশ পাওয়া যায়। পর দিন ৪ ফেব্রুয়ারী পুলিশ কনস্টেবল হত্যার অভিযোগে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হককে রংপুর থেকে ঢাকা ফেরার পথে গ্রেফতার করা হয়। শায়খুল হাদীস ও মুফতি আমিনীসহ বহু *আলিমকে* গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড়হুজুর নামে খ্যাত 'জামেয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া'-র প্রিন্সিপাল মাওলানা সিরাজুল ইসলামের অনুমোদন ও আহ্বানে জেলা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় 'হরতাল' পালিত হয়। হরতাল

---

৭২ *তদেব*, পৃ. ১৮।

৭৩ ইসলামী আইনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞকে ফকীহ বলে। এর বহুবচন ফুকাহা।

চলাকালে *উলামা* ও মাদ্রাসা ছাত্রদের শান্তিপূর্ণ এবং 'অনুমোদিত এলাকার মধ্যকার' মিছিলে এক পর্যায়ে বিডিআর ও পুলিশ গুলীবর্ষণ করে। এতে ৮জন নিহত (শহীদ) হন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে চারদলীয় ঐক্যজোট ৭ ফেব্রুয়ারী এবং ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি ৮ ফেব্রুয়ারী সারাদেশে হরতাল আহ্বান করে।

এ পর্যায়ে হাইকোর্টের ফতওয়া নিষিদ্ধের রায় বিরোধী *উলামার* আন্দোলনকে অনুধাবনের জন্য সংশ্লিষ্ট ফতওয়ার ঘটনা, দুই বিচারপতির রায়ের অসঙ্গতির বিভিন্ন দিক, দুই বিচারপতির একজন মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর পূর্ব রেকর্ড ও হাই কোর্টের রায় বিষয়ে সংক্ষিপ্ত ধারণা অর্জন করা হবে। হাইকোর্টের রায়ের ধারাবাহিকতায় হলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রাজেডীকে পৃথক শিরোনামে ব্যাখ্যা করা হবে।

গ. সংশ্লিষ্ট ফতওয়ার ঘটনা

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা নওগাঁর সদর উপজেলার কীর্তিপুর ইউনিয়নস্থ[৭৪] আতিথা (আতিথা ডাঙ্গাপাড়া?) গ্রামের ভ্যান চালক ছাইফুল ইসলাম ছুনু (পিতা-গোলাম মোস্তফা) ১৯৯৮ সালে {২ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে যা হবে দেড় বছর (বাংলাবাজার পত্রিকা) অথবা ২বছর (মানবজমিন)} পার্শ্ববর্তী উপজেলা মহাদেবপুরের শরিফপুর (শরিজপুর? নামের বানানে স্থানীয় পত্রিকা রিপোর্টারদের মাঝে ব্যাপক গরমিল লক্ষণীয়-বর্তমান গবেষক) গ্রামের শাহাদাত হোসেনের কন্যা শাহিদাকে বিয়ে করেন। শাহিদা ৫মাসের অন্তঃস্বত্ত্বা থাকাকালে পারিবারিক (দাম্পত্য?) কলহের এক পর্যায়ে সাইফুল তার স্ত্রী সাহিদাকে 'রেগে' তালাক প্রদান ('তালাক' শব্দ উচ্চারণ করে) করেন। এরপরও তারা স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখেন এবং যথাসময়ে একটি কন্যা সন্তান লাভ করেন (২০০০ সালের ২ ডিসেম্বর কন্যাটির বয়স ১০মাস-বাংলাবাজার পত্রিকা)। নভেম্বর (২০০০) মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সাইফুল-শাহিদার 'তালাকের' প্রসঙ্গটি পুনরায় পারিবারিক পরিসরে আলোচিত হয়। সাইফুলের দাদা (সাইফুলের 'আপন দাদার আপন ভাই' হিসেবে) হাজী আজিজুল ইসলাম (আজিজুল হক?) এ সময় মত (ফতওয়া?) দেন, *তালাক* উচ্চারণের কারণে সাইফুল-শাহিদার তালাক হয়ে গেছে। এজন্য শাহিদার হিল্লা বিয়ে দিতে হবে। পারিবারিক আলোচনার ভিত্তিতে ২০০০ সালের ১৬ নভেম্বর রাত ১১টায় শামসুল নামের সাইফুলের এক চাচাত ভাই-র সাথে শাহিদাকে বিয়ে দেয়া (জোরপূর্বক? বাংলাবাজার পত্রিকা লিখেছে 'জোরপূর্বক' এবং মানবজমিন লিখেছে 'পারিবারিকভাবে আলোচনার ভিত্তিতে') হয়। বিয়ে পড়ান ঢাকার মিরপুরের এক মাদ্রাসার আলিম শ্রেণীর ছাত্র ও হাজী আজিজুল ইসলামের পুত্র মাসুদুন্নবী রাগ। পারিবারিক সমঝোতা ছিলো, শামসুলের সাথে বিয়ে হলেও শাহিদা তার সাথে 'রাতযাপন' (বাসর?) করবে না এবং অতঃপর শামসুল শাহিদাকে তালাক দেবে ও

---

৭৪ বিচারপতি গোলাম রাব্বানী "কীর্তিপুর ইউনিয়ন পরিষদ" লিখেছেন। রিপোর্টের মূলসূত্র বাংলাবাজার পত্রিকায় (দৈনিক) 'পরিষদ' নেই। ' ইউনিয়ন পরিষদ' বলতে সংশ্লিস্ট ইউনিয়নের ভোটার-জনগণের দ্বারা 'নির্বাচিত কমিটি'কে বোঝায়।

সাইফুল তাকে পুনরায় বিয়ে করবে। বাংলাবাজার পত্রিকার রিপোর্টার লিখেছেন, শাহিদাকে সে রাতে শামসুলের ঘরে জোরপূর্বক তুলে দেয়া হয়। মানবজমিন-এর রিপোর্টারও 'সে বাড়ীর এক মহিলার' সূত্রে লিখেন, 'শামসুল-শাহিদার বাসর হয়েছে'। দৈনিক ইনকিলাবের রাজশাহী অফিস-প্রধান রেজাউল করিম রাজু সরেজমিন তদন্ত করা এক রিপোর্টে লিখেন: 'জবরদস্তি করে দেবর সামসুলের সাথে বাসর কাটাতে বাধ্য করা হয়েছে কি-না জানতে চাইলে শাহিদা জিভ কেটে বলেন, সামসুলের ঘরে জোয়ান বউ রয়েছে। তার সাথে আমার দৈহিক সম্পর্কের প্রশ্নই আসে না। হিল্লা বিয়ের পর অবশ্য দু'রাত্রি আমি আমার চাচী শাশুড়ীর সাথে ছিলাম। এরপর মেয়েকে নিয়ে নানীর বাড়ী চলে যাই। কিছুদিন পর সেখান থেকে এসে আমার স্বামীর সাথে আবার বিয়ে হয়। এ নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই। অথচ কিছু কিছু এনজিও এবং তাদের ভাড়াটে লোকজন আমাদের পারিবারিক ঘটনাকে পুঁজি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে নেমেছে'।[৭৫] ইনকিলাবের এ রিপোর্টে শাহিদার 'সরাসরি মুখের উচ্চারণ' ব্যবহার না করলেও 'সরাসরি তার সাথে কথা' বলেই রিপোর্টটি তৈরী করা হয়েছে। এতে এ রিপোর্টটির ভিত্তি বাংলাবাজার পত্রিকা ও মানবজমিন-এর রিপোর্টের তুলনায় বেশি ভিত্তিসম্পন্ন বলে স্বীকার করা যায়। এ পর্যায়ে, শামসুলের সাথে শাহিদার বাসর তথা দৈহিক সম্পর্ক হয়ে থাকুক অথবা না-ই হয়ে থাকুক, 'দু'দিন পর' (বাংলাবাজার পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী) ১৮ ডিসেম্বর ২০০০ শামসুল থেকে তালাক 'গ্রহণ' করে শাহিদা তার নানীবাড়ী যাবার (বাংলাবাজার পত্রিকার রিপোর্টে 'সুকৌশলে সাহিদাকে তার বাবার বাড়ি পাঠাবার' কথা বলা হয়েছে) পর সাইফুল ও তার পরিবারের সদস্যরা পূর্ব সমঝোতা মতো শাহিদাকে 'ফেরত নিতে' অস্বীকৃতি জানায়। মানবজমিনের রিপোর্টার লিখেন: 'এরপর পারিবারিক সমস্যা রূপ নেয় গ্রাম্য সমস্যায়। একজন প্রতিবেশী জানান, এ সময় হাজী আজিজুল ইসলামের বিরোধী পক্ষ তৎপর হয়ে ওঠে। তারা সাইফুলকে স্ত্রী হিসেবে সাহিদাকে গ্রহণ না করতে প্ররোচিত করে। জানা গেছে, হাজী আজিজুল ইসলাম বর্তমান চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠদের একজন। এই চেয়ারম্যানের প্রতিপক্ষ আতোয়ার রহমানও এই ঘটনার সাথে জড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে এই বিষয় নিয়ে সংবাদপত্রে ব্যাপক লেখালেখি শুরু হয়।' 'সাইফুল-শাহিদার তালাক' বিষয়ে সংবাদপত্রে এই 'ব্যাপক লেখালেখির' প্রেক্ষাপটেই বাংলাবাজার পত্রিকার ২ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখের *নওগাঁর গ্রামে আজ ফতোয়াবাজদের সালিসে ভাগ্য নির্ধারণ হবে গৃহবধূ সাহিদার* শীর্ষক রিপোর্টটি হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ২ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখেই তিনি নওঁগার জেলা প্রশাসককে 'সুয়োমোটো রুল' জারি করে 'ফতোয়া প্রদানকারী' (হাজী আজিজুল ইসলাম)কে ১৪ ডিসেম্বর তার কোর্টে হাজির করার নির্দেশ প্রদান করেন। ১৪ ডিসেম্বর শুনানীর পর পরবর্তী ২০০১ সালের ১ জানুয়ারী বিচারপতি গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ 'বহুল বিতর্কিত' রায়টি প্রদান করেন।

---

[৭৫] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১১ জানুয়ারী ২০০১।

ইতোমধ্যে ২ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে, যেদিন হাইকোর্ট সুয়োমোটো রুল জারি করেন, আহুত শালিসী বৈঠক 'সমস্যা সমাধানে' ব্যর্থ হয়। এরপর দিন ৩ ডিসেম্বর রাতে নওগাঁ থানায় এক বৈঠক বসে যাতে হাজী আজিজুল ইসলাম, শাহিদা, সাইফুল ছাড়াও নওগাঁর এসপি, ওসি এবং দু'জন সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। মানবজমিনের রিপোর্ট অনুযায়ী, 'এই বৈঠকে সাহিদাকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে সাইফুলকে রাজী করানো হয়।' এ পর্যায়ে শাহিদাকে বাদী করে নারী ও শিশু নির্যাতন মামলায় মাসুদুন্নবী রাগকে একমাত্র আসামী করে একটি মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। একই দিন, ৩ ডিসেম্বর ২০০০ তারিখে, আগের দিনে পাওয়া হাইকোর্টের রুল অনুযায়ী পুলিশ নিজেরা বাদী হয়ে হাজী আজিজুল ইসলাম, তার দু'পুত্র মাসুদুন্নবী রাগ ও জামাল, শাহিদার স্বামী সাইফুল, হিলার স্বামী শামসুল ও শ্বশুর গোলাম মোস্তফাকে আসামী করে মুসলিম পারিবারিক আইনের ৭ নম্বর বিধান লঙ্ঘন এবং দণ্ড বিধির ৪৮৪, ৫০৮ ও ৪০৯ ধারা ভঙ্গের অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করে। এ মামলায় পুলিশ হাজী আজিজুল ইসলামকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়।

ঘ. দুই বিচারপতির রায়ের বিভিন্ন অসঙ্গতি

২০০১ সালের ১ জানুয়ারী বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ফতওয়া বিষয়ক যে রায় (পরিশিষ্ট-৪) প্রদান করেন, তা মূলত (বেঞ্চের সিনিয়র) বিচারপতি গোলাম রাব্বানী লিখেছেন। বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা সে রায়ে কেবল 'সম্মতি' জানিয়েছেন। ২ সদস্যের বেঞ্চের জুনিয়র বিচারপতি কখনো কখনো তার সিনিয়র বিচারপতির রায়ের সাথে পূর্ণ বা আংশিক ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন অথবা নতুন কিছু বক্তব্য-মন্তব্য যোগ করতে পারেন। বর্তমান ক্ষেত্রে জুনিয়র বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা তেমন কিছু না করে তার সিনিয়রের সাথে 'পূর্ণ একমত' প্রকাশ করেছেন। তাই রায়টি কার্যত দুই বিচারপতির রায় হিসেবেই গণ্য হবার কথা।

ঙ. রায়ের বিভিন্ন অসঙ্গতি

ইতোমধ্যে *উলামা* ও ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ রায়ের যে সব অসঙ্গতি ও ব্যাখ্যাযোগ্য প্রসঙ্গ চিহ্নিত করেছেন সেগুলো হলো:

অ) তালাক কার্যকর হওয়া,
ই) সাইফুল-শাহিদার পুনঃ বিবাহ,
ঈ) ফতওয়ার অর্থ,
উ) ফতওয়া নিষিদ্ধ!,
ঊ) সাইফুল-শাহিদা বিচ্ছেদের মামলায় উলামা,
ঋ) উলামার শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি,
এ) অথঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ শিক্ষণ!,
ঐ) মাদ্রাসা বিলোপ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ!,

ও) 'একের' দোষে 'সকলের' শাস্তি! ও
ঔ) বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর পূর্ব রেকর্ড।

অ. তালাক কার্যকর হওয়া

রায়ে বলা হয়েছে 'একই বৈঠকে তালাক শব্দটি এক অথবা তিনবার উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ কোরআন ও হাদীসের অনুশাসনের পরিপন্থী, এমনকি মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ নম্বর ধারায়ও অবৈধ। এই ধরনের তালাককে সঠিকভাবে তালাকুল বিদায়াত বলা হয়' (পরিশিষ্ট-৪)। ইসলামী জীবন বিধানের দৈনন্দিন বিধানাবলী বিষয়ে মুসলিম আইনবিদদের (ফকীহ) মধ্যে সুন্নী মুসলিমদের চারটি ধারা বা মাযহাব[৭৬] প্রচলিত ও প্রতিটি মাযহাব অন্যগুলোকে ইসলামী বিধান অনুশীলনের অন্যতম শুদ্ধ প্রক্রিয়া হিসেবেও স্বীকার করে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রশ্নের[৭৭] সমাধান বিষয়ে এই চার মাযহাব অথবা আহলে হাদীস[৭৮] অথবা শিয়া[৭৯] মুসলিমদের মাঝে ইসলামের প্রধান পাঁচ স্তম্ভ[৮০] এবং 'বিশ্বাসের'(ঈমান) প্রধান সাতটি[৮১] বিষয়ে কোনো মতভিন্নতা নেই। মুসলিম জীবনের বিয়ে এবং বিয়ে বিচ্ছেদ বিষয়ক বিধানাবলীর ক্ষেত্রে কিছু ভিন্নতা রয়েছে। বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রধান অংশ ইমাম আবু হানিফার নির্দেশিত 'ফিকহী সিদ্ধান্তসমূহ' অনুশীলন করে থাকেন। মুসলিম দম্পতির বিয়ে বিচ্ছেদ বা তালাককে এ মত অনুযায়ী তিন প্রকার বলা হয় এবং তা হলো:

> 'কোনো দম্পতির ক্ষেত্রে বনিবনা হওয়ার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে এবং তালাক একান্ত জরুরী বলে বিবেচিত হলে, নিয়ম হলো প্রথম মাসে স্ত্রীকে মাসিকীমুক্ত পবিত্রাবস্থায় এক তালাক দিয়ে তাকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং তার সাথে কোনরূপ দৈহিক সম্পর্ক না রাখা। এভাবে তিন মাস তথা তিনটি পবিত্রাবস্থা অতিক্রম হলে স্ত্রী তালাক হয়ে যায় আর এটিকে বলা হয় 'আহসান তালাক'। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো, স্ত্রীকে দৈহিক সম্পর্ক থেকে দূরে রেখে তিন মাসে তিনটি পবিত্রাবস্থায় একটি করে তিন তালাক দেয়া। তাকে বলে 'হাসান তালাক'। তৃতীয় পদ্ধতি হলো, একই সাথে তিন তালাক দেয়া। এটিকে বলে 'বিদআত তালাক'। মাসিকী ও মাসিকীমুক্ত উভয় অবস্থায়ই হানাফী মতে তিন তালাক দিলে স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। শেষোক্ত পদ্ধতির তালাকদাতাকেই গুনাহগার বলা হয়েছে'।[৮২]

প্রবীণ সাংবাদিক ও কলামিস্ট মাওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতী 'হানাফী ফিকাহ্' অনুযায়ী মুসলিম বিয়ে বিচ্ছেদের তিনটি প্রকার বা ধরনের স্পষ্ট ও সহজ বর্ণনা

---

৭৬ স্কুল অব থট।

৭৭ আরবীতে বলে মাসয়ালাহ।

৭৮ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব (১৭০৩-১৭৮৭) এই ধারা বা স্কুল অব থট-এর প্রতিষ্ঠাতা।

৭৯ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর ইন্তিকালের পর খিলাফত তথা নেতৃত্বের ন্যায্য দাবিদার ছিলেন হযরত আলী (রা.)-এ মতের অনুসারী মুসলিমগণই মূলত শিয়া হিসেবে পরিচিত।

৮০ স্তম্ভগুলো হলো: কলেমা বা ঈমান, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত।

৮১ 'বিশ্বাসের' (ঈমান) প্রধান সাতটি বিষয়: ক. আল্লাহ, খ. ফেরেশতা, গ. কিতাব, ঘ. রাসূল, ঙ. পরকাল, চ. তকদির ও ছ. হাশর বা পুনরুত্থান দিবস।

৮২ জুলফিকার আহমদ কিসমতী, "তালাক বিড়ম্বনা ও ফতোয়া আতঙ্ক প্রসঙ্গে", *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৫ জানুয়ারী ২০০১।

দিয়েছেন। মুসলিম বিয়ে বিচ্ছেদের তিনটি স্বীকৃত ধরনের একটি 'বিদআত তালাক' বা 'তালাকুল বিদআত'। তালাকের ধরনটি 'বিদআতী' হলেও তাতে 'তালাক' ঠিকই কার্যকর হবে, তবে এ প্রক্রিয়ায় তালাক প্রদানের জন্য তালাকদাতা নিন্দিত, ঘৃণিত ও পরিণামে গুনাহগারও হবে।

হাইকোর্টের রায়ে এ বিষয়ে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে: 'উপরোক্ত বিষয় ও আইনানুগ অবস্থানে আমাদের অভিমত এই যে, সাইফুল এবং শাহিদার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনি' (পরিশিষ্ট-৪)। দুই বিচারপতির এই 'অভিমত'টি (সাইফুল-শাহিদার বিয়ে বিচ্ছেদ না ঘটা) বাংলাদেশের *উলামা* সর্বসম্মতভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। বাংলাদেশের *উলামা* এবং আইনবিদগণ অবশ্য বলেছেন, জেনারেল আইউব খান ঘোষিত 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ১৯৬১' অনুযায়ী দুই বিচারপতি এ বিষয়ে ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানের সকল *আলিম* (ও ফকীহ্) আইউব খানের সে আইন প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ব্যাপক প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক বলেছেন:

> 'আজ আদালত থেকে মুসলমানদের ওপর আইয়ুব খানের ইসলামিক ল' চাপিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। এটা হতে পারে না। আইয়ুব খানের মুসলিম পারিবারিক আইন প্রবর্তনের পর পরই দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ওলামাগণ এ রায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ফ্যামিলি ল' শরীয়ত সম্মত নয়। আমরা আইয়ুব খানের আইন চাই না। আমরা চাই কোরআন হাদিসের নির্ধারিত আইনে জীবন-যাপন করতে। পাকিস্তানের নাম শুনলে এতোদিন দেখেছি গাত্রদাহ হয়। তবে পাকিস্তানের এই নিকৃষ্ট, শরীয়ত পরিপন্থী ফ্যামিলি ল' চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা কেন?'[৮৩]

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম বলেন:

> 'তালাকের ব্যাপারে আদালত যে রায় দিয়েছে তা শরীয়তের সম্পূর্ণ খেলাফ। তবে স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে ১৯৬১ সালের পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ী সাইফুল ও শাহিদার বিচ্ছেদ হয়নি বলে যে রায় দিয়েছেন তা ঐ আইন অনুযায়ী দেয়া হয়েছে। যেহেতু যে আইনের ভিত্তিতে রায় দেয়া হয়েছে সে আইনটি শরীয়তের সম্পূর্ণ বিরোধী, সেহেতু মুসলমানগণ এ রায় মেনে নিতে পারে না। ...যে পাকিস্তানের স্বৈরশাসক গোটা আলেম সমাজের তীব্র আন্দোলনের পরেও ঐ আইনটি বাতিল করেননি, সেই পাকিস্তানেরই পরবর্তী শাসক জেনারেল জিয়াউল হক ঐ আইনটি বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় যে, বাংলাদেশের কোন সরকার ঐ আইনটি বাতিল করেননি'।[৮৪]

ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব ও লালবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেন:

> 'যে মুসলিম পারিবারিক আইন দেশের মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা চলছে, এটা ষড়যন্ত্র। আইয়ুবের আমলে এই আইন যখন পাস করা হয়, আমার সরাসরি ওস্তাদ মাওলানা মুফতি সামসুল হক ফরিদপুরী (রহঃ)-এর নেতৃত্বে দেশের

---

[৮৩] সাক্ষাৎকার, *দৈনিক মানবজমিন*, ১৩ জানুয়ারী ২০০১।

[৮৪] সাক্ষাৎকার, *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৫ জানুয়ারী ২০০১।

> তৌহিদী জনতা সে দিন বিদ্রোহ করে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। আমরা মুসলিম পারিবারিক আইন মানি না। এর কিছু অংশ শরিয়াত সমর্থিত হলেও অধিকাংশ অংশই কোরআন-হাদিস-ফিকাহ্‌র সাথে সংর্ঘষপূর্ণ। ...সরকার পাকিস্তানের ঘোর বিরোধী। তাহলে 'ইসলামের সাথে সংঘর্ষপূর্ণ আইন' গ্রহণ করছে কেন?'[৮৫]

উপস্থাপিত বক্তব্যগুলো থেকে জেনারেল আইয়ুব খান ঘোষিত 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ' বিষয়ে তৎকালীন পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশের *উলামার* বক্তব্য ও অবস্থান জানা যায়। সে আইনকে তারা শরীয়ত বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং আইনটি প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলনও করেছেন। আন্দোলন করে সেই 'মুসলিম পারিবারিক আইন'টি *উলামা* বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে বাতিল করতে সক্ষম না হলেও ১৯৭৭ সালে সামরিক অভ্যুত্থানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল জিয়াউল হক তা পাকিস্তানে বাতিল ঘোষণা করেছেন। তবে সে আইনটি বাংলাদেশে এখনও রাষ্ট্রীয়ভাবে বহাল রাখা হয়েছে।

ই. সাইফুল-শাহিদার পুনঃবিবাহ

দুই বিচারপতির রায়ে বলা হয়েছে: 'এবং যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে এমনকি তখনও শাহিদার পক্ষে সাইফুলকে পুনঃবিবাহ করাতে কোন আইনানুগ বাধা নাই, এ ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির সাথে হিল্লা বিবাহের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই।' (পরিশিষ্ট-৪)। এখানে রায়টিতে এক বিস্ময়কর অযৌক্তিক মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। 'পূর্ণরূপে একটি দম্পতির বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটার' পর সেই বিচ্ছিন্ন নারী-পুরুষ পুনরায় বিয়ে করতে পারবেন 'অন্য কোনো শর্ত পূরণ' ছাড়াই, এমন নির্দেশনা বিচারপতি গোলাম রাব্বানী কোথায় পেলেন, তা তিনি নির্দিষ্ট করে তার রায়ে উল্লেখ করেননি। তবে এ বক্তব্যের পূর্ববর্তী প্যারায় তিনি সৈয়দ আমীর আলী রচিত 'মোহামেডান ল'[৮৬] থেকে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। উক্ত হাদিসে মহানবী (স.) 'এক সাথে তিন তালাক উচ্চারণকারী এক সাহাবীকে তাঁর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দু'টি বিষয় ব্যাখ্যার দাবি রাখে:১. ইসলামী শরীয়তের ব্যাখ্যাকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে সৈয়দ আমীর আলী ও তার গ্রন্থ কি পর্যাপ্ত? ২. উল্লিখিত হাদীসটির মূলসূত্র কোথায়, কোন্ গ্রন্থ এবং হাদীসটির বর্ণনাকারী ও যুগ পরম্পরায় সংরক্ষণকারী কারা? উল্লিখিত হাদীস ও কর্তৃপক্ষ বিষয়ক এ দু'টো প্রশ্নের জবাব উক্ত রায়ে নেই। বিপরীতে খোদ কুরআন শরীফ নির্দেশ দিচ্ছে, তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটার পর সংশ্লিষ্ট নারীকে তালাকদাতা পুরুষ পুনরায় বিয়ে করতে চাইলে 'হিল্লা বিয়ের' মতো একটি জটিল ও অনিশ্চিত শর্ত পূরণ করতে হবে। হিল্লা বিয়ে জটিল, কারণ তালাকপ্রাপ্তা নারীকে অতঃপর অন্য একজন পুরুষের সাথে সমুদয় আনুষ্ঠানিকতাসহ বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। হিল্লা বিয়ে অনিশ্চিত, কারণ যে

---

৮৫ সাক্ষাৎকার, *দৈনিক মানবজমিন*, ৫ জানুয়ারী ২০০১।

৮৬ ভলিউম-২, পঞ্চম সংস্করণ, পৃ. ৪৭৪।

ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট তালাকপ্রাপ্তাকে বিয়ে করছেন, তিনি কবে ইন্তেকাল[৮৭] করবেন-তা কারো জানা থাকার কথা নয়। অথবা তিনি কবে স্বেচ্ছায় উক্ত নারী (স্ত্রী)কে তালাক দেবেন তা-ও অগ্রিম জানা থাকার কথা নয়। তালাকপ্রাপ্তা নারীকে 'তালাক প্রদানের পূর্ব ইচ্ছা-চিন্তা-পরিকল্পনাসহ' বিয়ে করা হলে সেই বিয়েটিই বাতিল গণ্য হবে এবং এ অবস্থায় 'রাতযাপন বা দৈহিক মিলন' জেনা বা ব্যভিচার হবে। ইমাম আবু হানিফার ফিকহী নির্দেশনা বা মাযহাব অনুযায়ী এটিই বিধান। বাংলাদেশের মতো একটি 'হানাফী মাযহাব অনুসারী অধ্যুষিত' জনপদে বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর এই রায় অশুদ্ধ ও বিভ্রান্তিকর রায় হিসেবে *উলামার* নিকট বিবেচিত হয়েছিলো। বাংলাদেশের *উলামা* তাই এ রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ঈ. ফতওয়ার অর্থ

বিচারপতি গোলাম রাব্বানী তার রায়ে লিখেছেন: 'ফতওয়া অর্থ আইনানুগ মত। ইহার অধিকতর অর্থ আইনানুগ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের আইনানুগ মত।' (পরিশিষ্ট-৪)। স্পষ্টতই বিচারপতি গোলাম রাব্বানী ফতওয়া-র অর্থ নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে।

আরবী শব্দ 'ফতওয়া' মূলধাতু 'ফাতা' থেকে এসেছে। এর অর্থ যৌবন, নতুনত্ব, সরলীকরণ বা ব্যাখ্যা। কুরআন শরীফে ফতওয়ার দু'ধরনের ব্যবহার পাওয়া যায়: সুরা নিসার ১২৭ নম্বর আয়াতে (বিয়ে বিষয়ক) 'নির্দিষ্ট বিষয়ে জবাব চাওয়া' অর্থে এবং একই সুরার ১৭৬নম্বর আয়াতে ('কালালাহ-র মীরাস বিষয়ক') 'নির্দিষ্ট জবাব প্রদান' অর্থে।

> 'ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর কাঠামোতে তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে 'ফতোয়ার ধারণার' উন্মেষ ঘটে। তখন এর বিষয় ছিল জ্ঞান। পরবর্তীতে 'জ্ঞান' যখন হাদীসের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ফতোয়া রায় ও ফিকাহ বা আইন শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হয়। ফলে ফতোয়া শব্দটির কৌশলগত ব্যবহার আরও অধিকতর পরিশীলিত হয়।
>
> বিচার সংক্রান্ত কর্তৃত্বের কার্যকারিতার প্রেক্ষাপটে 'ফতোয়া' এবং আদালতের রায় এক নয়। 'ফতোয়ার' আওতা আদালতের রায়ের চেয়ে প্রশস্ততর। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের আওতাভুক্ত 'ইবাদত' বা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুষ্ঠান আদালতের আওতাবহির্ভূত, যদিও এগুলো ইসলামী আইনের অপরিহার্য অংশ এবং আইনশাস্ত্রে ও ফতোয়ায় এটা উল্লেখযোগ্যভাবে উদ্ধৃত হয়। আরও উল্লেখ্য যে, ফতোয়া কারও ওপর বাধ্যতামূলক নয়, যদিও আদালতের রায় বাধ্যতামূলক এবং আইনানুগভাবে কার্যকরী'।[৮৮]

উপস্থাপিত উদ্ধৃতিতে ফতওয়া-র ক্রমবিকাশ ও আদালতের রায়ের সাথে এর পার্থক্য সহজবোধ্য করে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। আলোচিত বিচারপতি এতো গুরুত্বপূর্ণ একটি রায় লিখতে গিয়ে ফতওয়া ও আদালতের রায়ের পার্থক্য নির্ধারণে করুণ ব্যর্থতা প্রদর্শন

---

[৮৭] বিবাহিতা নারী স্বামীর ইন্তেকালের পর "নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে" ইচ্ছেমতো উপযুক্ত পুরুষকে বিয়ে করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তালাকের প্রশ্ন থাকে না।

[৮৮] শাহ আবদুল হান্নান, "ফতোয়া: ঐতিহাসিক ও আইনগত প্রেক্ষাপট", *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০ জানুয়ারী ২০০১।

করেছেন বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি সরাসরি লিখে দিলেন *ফতোয়া অর্থ আইনানুগ মত*। এ মামলাটির এক আইনজীবী, ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলাম, মামলাটির 'রায়ের ওপর স্থগিতাদেশ ও সাময়িক লিভ আবেদনের' শুনানীতে সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের ফুল কোর্টের সামনে বলেন 'হাইকোর্টের রায়ের মাধ্যমে ধর্মীয় মতামত প্রকাশে কোন বাধা সৃষ্টি করা হয়নি। এতে লিগ্যাল অপিনিয়নের ফতোয়াকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। আদালত বলেন, হাইকোর্টের রায়ে রিলিজিয়াস অপিনিয়ন ও লিগ্যাল অপিনিয়নকে পৃথক না করে সব ধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে'।[৮৯] এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, 'ফতওয়া' অর্থ যে কেবল *আইনানুগ মত* নয়, *ধর্মীয় মত* ও বটে, এ কথা বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর আদালতে শুনানীতে অংশ নেয়া ব্যারিস্টার আমীর উল ইসলামসহ অন্য আইনজীবীরাও জানতেন। বাহ্যত মনে হতে পারে জানতেন না কেবল রায়ের লেখক ও সম্মতিদাতা সংশ্লিষ্ট এ দুই বিচারপতি।

উ. ফতওয়া নিষিদ্ধ!

বিচারপতি গোলাম রাব্বানী যেহেতু বোঝেন ফতওয়ার *অধিকতর অর্থ* আইনানুগ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের আইনানুগ মত, তাই তিনি তার কলমের খোঁচায় লিখে চলেন:'বাংলাদেশের আইনব্যবস্থা মুসলিম এবং অন্যান্য প্রচলিত আইন যেভাবে আছে তার উপর উত্থাপিত সকল প্রকার আইনানুগ সমস্যার সমাধান প্রদানের ক্ষমতা কেবলমাত্র আদালতকেই দিয়েছে। তাই আমাদের অভিমত হচ্ছে- যে কোন ধরনের ফতোয়া বর্তমানে কথিত ফতোয়াটিসহ সকলই কর্তৃত্বহীন এবং অবৈধ'।[৯০]

'সব ধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধের রায়' প্রকাশিত হবার পর প্রধানত বাংলাদেশের *উলামা* এক গুরুতর বিশ্বাসগত ও দায়িত্বগত 'উভয় সংকটে' নিপতিত হন। কারণ দৈনন্দিন জীবন যাপন করতে গিয়ে অসংখ্য ব্যক্তি মুসলিম, নারী ও পুরুষ, প্রতিদিন সাধারণত মাদ্রাসা শিক্ষিত *উলামার* কাছে যান নানান বিষয়ে জবাব ও সমাধান পাবার জন্য। এসব জিজ্ঞাসার মধ্যে থাকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় আচার-আনুষ্ঠানিকতার বিষয়াদি। পরিমাণে অল্প হলেও অর্থনৈতিক, আইনগত এবং রাজনৈতিক বিষয়াদিও থাকে এসব জিজ্ঞাসার মধ্যে। পরিভাষাগত দিক থেকে এ যাবতীয় জবাবকেই *ফতওয়া* বলা হয়। বাংলাদেশের *উলামা* যদি এহেন বাস্তবতায় উত্থাপিত প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার (আরবীতে 'মাসয়ালাহ', প্রচলিত গ্রামীণ উচ্চারণে 'মস্‌লা') জবাব (ফতওয়া) দেন, তবে তারা 'নিষিদ্ধ ও বেআইনী' কাজ করবেন, যার জন্য দুই বিচারপতি দণ্ড প্রদানের নির্দেশ জারি করেছেন। আর যদি তারা সে সব প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার জবাব দানে বিরত থাকেন, তবে তারা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার নিকট 'সত্য গোপন ও জ্ঞান গোপন' করার দায়ে অপরাধী গণ্য হবেন। বাংলাদেশের *উলামার* এই উভসংকটের কথা ব্যাখ্যা করেছেন কবি, সাংবাদিক, মাওলানা রূহুল আমীন খান:

> 'ইতোমধ্যে টিভির কোনো কোনো চ্যানেলে, দর্শকদের পক্ষ থেকে অনেক ফতোয়া চাওয়া হয়ে গেছে। অনেক ফতোয়া চাওয়া হয়েছে বাংলাদেশ বেতারের 'দৈনন্দিন

---

[৮৯] *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ১৫ জানুয়ারী ২০০১।

[৯০] পরিশিষ্ট-৪।

জীবনে কুরআন' নামের ধর্মীয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানে, শতশত ফতোয়া চাওয়া হয়েছে যে সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক পত্রিকায় ধর্মীয় ও ফতোয়া বিভাগ চালু রয়েছে সে সকল বিভাগের কাছে, ফতোয়া চাওয়া হয়েছে দেশের বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠিত ফতোয়া বিভাগ এবং দেশের প্রখ্যাত আলিম-উলামা, পীর-মাশায়েখদের কাছে। জনগণের এ ফতোয়া না চেয়ে যেমন উপায় নেই তেমনি যারা কুরআন হাদীস উসুল ফিকাহ অধ্যয়ন করে সুপণ্ডিত হয়েছেন, নবী (সঃ)-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তাদেরও উপায় নেই উত্তর না দিয়ে। এটা তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য। তারা যে বিষয় জানেন জিজ্ঞাসিত হলে সে বিষয়ের উত্তর তাদের দিতেই হবে। অন্যথায়, কিতমানে হক, কিতমানে ইলম- সত্য গোপন করার, বিদ্যা গুপ্ত রাখার, নিজ জ্ঞান থেকে অন্যকে উপকৃত হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অপরাধে তারা অপরাধী হতেন। শরীয়ার আইনে আল্লাহ-রাসূলের বিধানের ভিত্তিতে মতামত সিদ্ধান্ত, ফায়সালা না দেওয়ার অপরাধ, আর ঐ রায় অনুযায়ী অনুরূপ সিদ্ধান্ত দেওয়াটা অপরাধ। কোনো একদিকের অপরাধ না করেতো গত্যন্তর নেই। দারুণ অস্বস্তিকর এ পরিস্থিতি। মাননীয় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ এই ভয়াবহ অস্বস্তি কর অবস্থা থেকে, কিংকর্তব্যবিমূঢ় পরিস্থিতি থেকে আপাতত নাজাত দিয়েছে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের। দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে কোনো রায়ের মাধ্যমে এমন মহাবিপদে স্থায়ীভাবে ফেলে রাখা উচিত কিনা, সে সিদ্ধান্ত বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী যথাসময়ে ঘোষণা করবেন বলে দেশবাসীর প্রত্যাশা।

কুরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াস তথা ইসলামী শরীয়াহ কি কেবল বিবি তালাকের ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ? না, তাতো নয়, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত, জীবনের সকল ক্ষেত্র, সকল বিভাগ ইসলামের আওতাধীন। ইসলাম জীবন ধর্ম। জীবন বিধান। জীবনের সমস্যা অন্তহীন এবং নিত্য নব নব। প্রতিদিন সম্মুখীন হতে হয় বিচিত্র সব জিজ্ঞাসার। আল্লাহতে আত্মসমর্পিত মুমিন বান্দাকে তো আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের আলোকে এর উত্তর জানতে হবে, পেতে হবে এবং সে অনুযায়ী চলতে হবে। আর উদ্ভাবিত যে কোন সমস্যার কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের ভিত্তিতে দালিলিক ফায়সালা, সিদ্ধান্ত ও মতামতের নামইতো 'ফতোয়ো'। এজন্যই ফতোয়া ছাড়া ইসলামী জিন্দেগী অচল। তাই রায়ের ঘোষণা অনুযায়ী সকল ধরনের ফতোয়াই যদি হয় অবৈধ, বেআইনী, আর এই ফতোয়া দেওয়া হয় যদি দণ্ডনীয় অপরাধ এবং এ ধরনের নির্দেশ জারি থাকে তবে দেশে কি এক ভয়াবহ সংকটের উদ্ভব হবে না?'[৯১]

বাংলাদেশের সম্ভাব্য সেই ভয়াবহ সংকটের কথা মনে রেখেই হয়তো সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের ফুল কোর্ট ১৪ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে 'সব ধরনের ফতোয়া নিষিদ্ধের' হাইকোর্ট বেঞ্চের রায় পরবর্তী ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। বাংলাদেশ মসজিদ কাউন্সিলের সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ও ঢাকার লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসার সহকারী মুফতী মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যবের দায়ের করা দু'টি

---

৯১ রুহুল আমীন খান, "ফতোয়া: রায়ের সমর্থন ও বিরুদ্ধাচরণের রহস্য", *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯ জানুয়ারী ২০০১।

সাময়িক লিভ আবেদনের শুনানী শেষে আপীল বিভাগ এ রায় দেন। দু'টি মামলা পরিচালনা করেন যথাক্রমে ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাক এবং এডভোকেট মুজিবুর রহমান ও এডভোকেট নজরুল ইসলাম।[৯২]

উ. সাইফুল-শাহিদা বিচ্ছেদের মামলায় উলামা

বিচারপতি গোলাম রাব্বানী তার রায়ে লিখেন: 'এই ব্যাপারটি নিস্পত্তির আগে আমাদের একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করা প্রয়োজন কেননা একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক মাদ্রাসা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা কোন ধর্মীয় দল গঠন করে তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গোঁড়া হয়ে যায়। তাদের শিক্ষা এবং দৃষ্টিভংগিতে অবশ্যই কোন ত্রুটি থেকে থাকবে'।[৯৩]

রায়ের এ 'পর্যবেক্ষণটি' বিশ্লেষণের জন্য কয়েকটি প্রসঙ্গের গভীরে যাওয়া দরকার হবে। প্রথমত: আলোচিত মামলাটির সাথে *উলামার* সম্পৃক্ততা। 'সাইফুল-শাহিদা বিচ্ছেদ' মামলার কোনো পর্যায়ে *উলামার* কোনো সম্পর্ক-সম্পৃক্ততা ছিলো কি? বিষয়টি একবার খতিয়ে দেখা যাক। *বাংলাবাজার পত্রিকার* যে রিপোর্টের ভিত্তিতে দুই বিচারপতি আলোচিত রায়টি দিলেন, তাতে 'ফতোয়াবাজ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে হাজী আজিজুল হক (আজিজুল ইসলাম?) কে। তার শিক্ষা ও পেশাগত পটভূমি বিষয়ে উক্ত রিপোর্টে কিছু বলা নেই। কিন্তু তাকেই 'ফতোয়াদানকারী' হিসেবে স্বীকার/দাবি করা হয়েছে। দুই বিচারপতি এ ক্ষেত্রে 'আজিজুল' (হক/ইসলাম)এর 'হাজী' পরিচিতিকে *'আলিম'* হবার এবং 'মাদ্রাসা শিক্ষিত' হবার সমার্থক বিবেচনা করে থাকতে পারেন। যদি তেমনটি করে থাকেন, তবে নিশ্চিতভাবেই সেটি তাদের আকাট মূর্খতার প্রমাণ। কারণ যে কোনো মুসলিম ব্যক্তিই অর্থনৈতিক ও শারীরিক সামর্থ থাকলে হজ্ব (যতো সংখ্যক ইচ্ছে) সম্পাদন করতে পারেন, এ জন্য কারো জ্ঞান বা ইলমের পূর্বশর্ত নেই। হাজী 'পরিচিতিকে' *'আলিম'* বা 'মাদ্রাসা শিক্ষিত' হবার সূত্র মনে না করলে 'আজিজুল'কে *'আলিম'* বিবেচনা করার বাহ্যত আর কোনো স্বীকৃত সূত্র নেই। তবে *বাংলাবাজার পত্রিকা* নামের দৈনিকটি যেহেতু 'আজিজুল'কে 'ফতোয়াবাজ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে, নিজেদের যাবতীয় বিবেক-বিবেচনা-জ্ঞান-বুদ্ধি-প্রজ্ঞাকে 'জিম্মি' রেখে দুই বিচারপতি সেই পত্রিকার রিপোর্টটিকেই 'ফতোয়াবাজ মানে *আলিম*'- এমন 'পূর্ব ধারণা ও বিশ্বাসের' ভিত্তিতে 'আজিজুল'কে 'ফতোয়াবাজ *আলিম*' জ্ঞান করে থাকতেও পারেন। সে ক্ষেত্রে এ দুই বিচারপতির 'হাইকোর্টের বিচারপতির' আসন ধারণ করার 'ন্যূনতম যোগ্যতা' বিষয়ে প্রশ্ন তোলার কথা কেউ কেউ বিবেচনা করতে পারেন।

মোট কথা, 'সাইফুল-শাহিদার বিচ্ছেদ' মামলার প্রেক্ষাপটে *উলামার* সম্পৃক্তির প্রসঙ্গটি উত্থাপনই একটি সুস্পষ্ট অবান্তর ও ন্যাক্কারজনকভাবে অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিষয় বলে প্রতিভাত হচ্ছে। এ মামলার রায়ে *উলামার* প্রসঙ্গ এনে দুই বিচারপতি ঠিক সেই অবান্তর ও অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত একটি অর্থহীন অথবা অপ্রয়োজনীয় প্রতিহিংসাপরায়ণ আচরণই করেছেন বলে কেউ কেউ দাবি করতে পারেন।

---

[৯২] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৫ জানুয়ারী ২০০১।

[৯৩] পরিশিষ্ট-৪।

বৃদ্ধ 'আজিজুল' বিষয়ে একটি দৈনিক জানিয়েছে, তিনি স্কুলে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। পাকিস্তান আমলে প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং ১৯৮৯ সালে অবসর গ্রহণ করেন। স্থানীয় এক মসজিদে কিছুদিন ইমামতি করেছেন। স্থানীয় এক ধনাঢ্য ব্যক্তির 'বদলা হজ্ব'[৯৪] করে তিনি 'হাজী' হয়েছেন। ইসলামের মৌলিক বিষয়ে তার কোনো পড়াশোনা নেই।[৯৫]

ঋ. উলামার শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি

সাইফুল-শাহিদার বিয়ে বিচ্ছেদ হলো কি-না এবং তাদের পুনঃবিবাহের জন্য হিল্লা বিয়ের প্রয়োজন আছে কি-না তার সমাধান অথবা ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দুই বিচারপতি সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে মামলাটিতে বাংলাদেশের *উলামার* শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে নিজেদের অভিমত ও পর্যবেক্ষণ চাপিয়ে দিয়েছেন। সঙ্গত কারণেই দুই বিচারপতির এহেন পর্যবেক্ষণকে *ধান ভানতে শীবের গীত* গাইবার মতো মনে হতে পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক পর্যবেক্ষণ হলেও *উলামার* শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে দুই বিচারপতি কি সঠিক পর্যবেক্ষণ গঠনে সক্ষম হয়েছেন? সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণেও দেখা যাবে, দুই বিচারপতি এ ক্ষেত্রেও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। রায়টিতে দুই বিচারপতি বলেছেন 'একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক মাদ্রাসা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা কোন ধর্মীয় দল গঠন করে তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গোঁড়া হয়ে যায়।' পর্যবেক্ষণটিতে ৩টি অংশ আছে: ১. একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক, ২. মাদ্রাসা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা কোন ধর্মীয় দল গঠন করে ও ৩. তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গোঁড়া হয়ে যায়। পর্যবেক্ষণটিকে এভাবেও উপস্থাপন করা যায়: যারা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে অথবা যারা ধর্মীয় (ইসলামী?) দল গঠন করে তারা একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক এবং তারা (উভয় গ্রুপের লোকই) ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গোঁড়া হয়ে যায়। এরপর দুই বিচারপতির 'সমস্যা নির্দেশক' পর্যবেক্ষণ:'তাদের শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই কোন ত্রুটি থেকে থাকবে'।

এবার দুই বিচারপতির পর্যবেক্ষণের যথার্থতা খোঁজা যাক। দুই বিচারপতির পর্যবেক্ষণ থেকে মনে হতে পারে মাদ্রাসায় পড়েন এবং ধর্মীয় (ইসলামী?) দল করেন এমন লোকেরা একটি 'নির্দিষ্ট গ্রুপের'। এই 'নির্দিষ্ট গ্রুপের' লোকদের পরিচয় কী অথবা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, আঞ্চলিক (এবং আরো কিছু উপাদানগত?) ভিত্তি কী, তার কোনো তথ্য-উপাত্ত দুই বিচারপতির রায়ে দেয়া নেই। রায়টিতে গুরুতর ও ন্যাক্কারজনকভাবে সাধারণীকৃত ও ঢালাও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে মন্তব্য করা হয়েছে এবং তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে দুই বিচারপতি অনধিকার চর্চার নিকৃষ্টতম নজির স্থাপন করে সমাজ বিধ্বংসী কিছু নির্দেশনা প্রদান করেছেন বলে সংশ্লিষ্টরা দাবি করতে পারেন। বর্তমান গবেষকের জানা মতে, মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণকারী অথবা ধর্মীয় (এবং

---

[৯৪] আর্থিক দিক থেকে সক্ষম কিন্তু শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি(বর্গ)র পক্ষে অন্য কেউ হজ্ব পালন করাকে বদলা হজ্ব বলা হয়।

[৯৫] *দৈনিক মানবজমিন*, ঢাকা, ৩ জানুয়ারী ২০০১।

বাহ্যত ইসলামী) দল গঠনকারীদের ব্যক্তিগত-পারিবারিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-ধর্মাচরণিক-রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করে ব্যাপক মাত্রার বিজ্ঞানভিত্তিক কোনো গবেষণাকর্ম এখনও পরিচালিত হয়নি। সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণার প্রসঙ্গ হিসেবে এটি (সংশ্লিষ্টদের *নানামাত্রিক পটভূমি*) একটি তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র বিবেচিত হতে পারে। যথার্থ ও পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ছাড়াই বর্তমান গবেষক মাদ্রাসা পড়ুয়া ও ইসলামী দল গঠনকারীদের পটভূমি বিষয়ে একটি প্রাথমিক ধারণা উপস্থাপন করতে পারেন।

বাংলাদেশের মাদ্রাসাসমূহে যারা পড়েন, তাদের মধ্যে নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তান আছেন। তবে উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানের সংখ্যা কম হতে পারে। অবশ্য উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানেরা ইদানীং দেশের 'সাধারণ স্কুলেও' পড়েন না, পড়েন 'ইংরেজী মাধ্যমের' স্কুলে। মাদ্রাসা পড়ুয়াদের মধ্যে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের সন্তান আছেন, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার-প্রযুক্তিবিদের সন্তান আছেন। 'হাতে গুণে' উদাহরণ চাইলে বর্তমান গবেষক তার প্রমাণ দানে সক্ষম। তবে যথার্থ গবেষণাভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত না থাকায় 'বিভিন্ন' পারিবারিক পটভূমির মাদ্রাসা পড়ুয়া সন্তানদের অনুপাত উপস্থাপন করা আপাতত সম্ভব নয়। মোটামুটিভাবে দেশের সকল শ্রেণী-পেশা-সামর্থের পরিবারের সন্তানেরাই মাদ্রাসায় পড়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্য সাধারণ এবং তা হলো অভিভাবকদের ধর্মপ্রাণতা। অভিভাবক ধর্মপ্রাণ হলে 'কোটিপতির সন্তানও' মাদ্রাসায় পড়তে যায় এবং তা না হলে 'নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্তের' সন্তানও মাদ্রাসায় পড়তে যায় না। মাদ্রাসায় পড়াশোনা করে তাৎক্ষণিক বৈষয়িক সুবিধা লাভের সুযোগ কম থাকে। তাই মাদ্রাসায় পড়াতে আগ্রহী অভিভাবকের সংখ্যাও তুলনামূলকভাবে বেশ কমই বটে।

এবার মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভকারীদের কর্মজীবন বিষয়ে কিঞ্চিৎ ধারণা নেয়া যেতে পারে। বলা দরকার, মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা ব্যক্তিদের কর্মজীবনের বিষয়েও কোনো বিজ্ঞানসম্মত গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়নি। তবে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসায় শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ব্যবসা, শিল্প, প্রশাসন, আইন ব্যবসা প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দৃষ্টান্তমূলক সাফল্য ও কৃতিত্বের উদাহরণ প্রচুর পরিমাণে উপস্থাপন করা সম্ভব। রাজশাহী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন-জাতীয় শিক্ষা কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ আবদুল বারী, ভাষা বিজ্ঞানী ড. কাজী দীন মুহম্মদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. মুস্তাফিজুর রহমান, ব্যারিস্টার কোরবান আলী, রাজনীতিক-গবেষক মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, রাজনীতিক মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, মাওলানা এম এ মান্নান, মজলুম জননেতা খ্যাত মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মাওলানা আকরাম খানসহ অসংখ্য *আলিম* রাজনীতি, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, শিল্প,বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে সফল ও কীর্তিমান। কয়েক বৎসর আগে থেকে মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা চালুর প্রেক্ষাপটে *আলিম* ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদও কম-বেশী ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য এদের আরো কিছু সময় লাগবে।

তবে মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গের একটি বড় অংশ দেশে জনগণের ঈমান, আমল, নৈতিকতা প্রভৃতির শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ কার্যক্রমেই নিজেদের প্রধানত নিয়োজিত রাখেন। এসব কাজ 'বস্তুগত দৃষ্টিকোণ' থেকে গুরুতরভাবে অলাভজনক। তবুও মাদ্রাসা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ তথা *উলামা* যুগের পর যুগ ধরে স্বেচ্ছায় এমন অবৈষয়িক, অলাভজনক ও অবাণিজ্যিক কার্যক্রমে ব্যাপৃত থেকে এবং জীবন যাপনের 'ন্যূনতম রসদে' তুষ্ট থেকে জনগণের ঈমান, আমল ও নৈতিক শুদ্ধির কার্যক্রমে নিবেদিত থাকছেন। তাই তাদের মধ্যে বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক দিক থেকে পর্যাপ্ত সফল ব্যক্তি হয়তো পাওয়া যায় না। তাই 'একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক মাদ্রাসা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে' বলে দুই বিচারপতি যে মন্তব্য করেছেন তা নেহায়েতই ভিত্তিহীন এবং স্পষ্টতই অজ্ঞতাপ্রসূত বলে বিবেচিত হতে পারে।

আর ধর্মীয় দল তথা ইসলামী দলগুলোর কী বাস্তবতা? *আলিম* নেতৃত্বের দলসমূহের নীতি নির্ধারণী কর্তৃপক্ষসমূহের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, এসব দলের নেতৃত্বের শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ *আলিম* সদস্য এবং অন্য নেতারা সমাজ-রাষ্ট্রের অন্যসব পেশা-পটভূমি থেকে এসেছেন। সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানের উপাত্তযোগে বিষয়টি ইতোমধ্যে বর্তমান গবেষণায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে, *উলামা* নেতৃত্বের দল বলে যে সব ইসলামী দলের প্রচার-পরিচিতি আছে, সে সব দলেও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত নানা পেশার এবং ভিন্ন ভিন্ন অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে আসা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ যুক্ত রয়েছেন। তাই 'একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক ধর্মীয় দল গঠন করে' বলে দুই বিচারপতি যে ধারণা দিতে চেয়েছেন, তা-ও ভিত্তিহীন এবং নেহায়েত এক মিথ্যার বেসাতি বলে সংশ্লিষ্টরা দাবি করতে পারেন।

দুই বিচারপতি বলেছেন 'একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক ...তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গোঁড়া (ফ্যানাটিক) হয়ে যায়।' কথাটির প্রায়োগিক অর্থ দাঁড়ায়, 'বাংলাদেশের *উলামার* দৃষ্টিভঙ্গি ভুল এবং তাঁরা গোঁড়া।' বাংলাদেশের *উলামার* দৃষ্টিভঙ্গি কোন্ কোন্ ক্ষেত্র, বিষয় ও ইস্যুতে ভুল- তা নিয়ে ফলপ্রসূ ও দীর্ঘ একাডেমিক আলোচনা হতে পারে। কারণ এই *উলামা* ঐক্যবদ্ধ নন, স্থান-কাল-পাত্র ভেদে 'অগ্রাধিকার' চিহ্নিত করার বিষয়ে এই *উলামা* পর্যাপ্ত সফল নন, কর্মপন্থা নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই *উলামা* প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারছেন না- এমনি আরো অনেক বিষয়ে বাংলাদেশের *উলামার* দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রশ্ন আছে এবং সঙ্গত কারণেই এসব প্রশ্ন বাংলাদেশের *উলামার* প্রতি শুভ ইচ্ছার বিনয়ী প্রকাশ হিসেবেই উত্থাপিত হয়ে থাকে। কিন্তু দুই বিচারপতি এই *উলামার* কোন্ 'দৃটিভঙ্গী'কে 'ভুল' হিসেবে নির্দেশ করছেন তা বলা হয়নি। তাই এ পর্যবেক্ষণ আপত্তিকর ও সন্দেহজনক এবং নিন্দনীয় বলে গণ্য হতে পারে।

দুই বিচারপতি এরপর বাংলাদেশের *উলামাকে* গোঁড়া বলছেন। বাংলাদেশের *উলামার* কোন্ কোন্ কার্যক্রমের জন্য দুই বিচারপতি তাদের গোঁড়া বলছেন, তার ন্যূনতম ব্যাখ্যাও রায়টিতে নেই। যে কারো মনে হতে পারে, বাংলাদেশের *উলামাকে* 'গোঁড়া' আখ্যায়িত করার জন্য এ দুই বিচারপতি বড়ো বেশি উদগ্রীব ছিলেন এবং যথার্থ উপযোগী না হলেও একটি সুযোগ পেয়ে তার অসৎ ব্যবহার করেছেন।

বাংলাদেশের *উলামার* অবৈষয়িক ও অবাণিজ্যিক জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গিকে দুই বিচারপতি অবশ্য 'ভুল দৃষ্টিভঙ্গি' হিসেবে সহজেই চিহ্নিত করতে পারেন এবং বৈষয়িক জীবনের নানামুখী প্রলোভন ও আহ্বান সত্ত্বেও সেদিকে পর্যাপ্ত ধাবিত না হবার *উলামার* দৃঢ়তাকে দুই বিচারপতি 'গোঁড়ামীর বিষয়' হিসেবে বিবেচনাও করতে পারেন। বাস্তবে এটি একটি ভিন্নতরো আলোচ্য বিষয় হবারও দাবি করতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবেই বাংলাদেশের *উলামা* নিজেদের 'বিষয় বিমুখ' ও অপ্রাচুর্যের জীবন বেছে নিয়েছেন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ অথবা ভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর বিষয়ে গৃহিত তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের *উলামাকে* কোনোভাবেই 'গোঁড়া' বলার অথবা ভাবার সুযোগ নেই। কারণ ইসলামের সুনির্দিষ্ট বিধানাবলীর বিদ্যমানতায় কেবল এই ধর্মীয় নেতৃত্ব বা *উলামারই* নয়, একজন ব্যক্তি মুসলিমেরও ভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠীর প্রতি অবন্ধুসুলভ আচরণ করা নিষিদ্ধ। সুতীব্র ও সর্বাধিক ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টিকারী অযোধ্যার বাবরী মসজিদ ধ্বংসের (৬ ডিসেম্বর ১৯৯২) ঘটনার পরও বাংলাদেশের *উলামা* কোনো ধরনের অসংযত আচরণ করেননি। বাংলাদেশের দু'এক স্থানে বিক্ষিপ্ত কয়েকটি হিন্দু মন্দির বিরোধী অবাঞ্ছিত যে ঘটনার কথা বলা হয়, সে সব ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলীয় পরিচয়বিহীন কিছু ব্যক্তি মুসলিমের সম্পৃক্ততাই কেবল চিহ্নিত হয়েছে। বাংলাদেশের *উলামা* সেই চূড়ান্ত ক্রান্তিকালে বরং হিন্দু জনগোষ্ঠীর জীবন, সম্পদ ও ধর্মীয় স্থাপনাদির অব্যাহত নিরাপত্তা বিধানে নাগরিকদের প্রণোদনা ও নির্দেশনা প্রদানে ব্যস্ত সময় যাপন করেছেন।

আর যে বিষয়টিতে সাধারণভাবে বাংলাদেশের *উলামার* অবাঞ্ছিত সম্পৃক্ততার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয় তা হলো ফতওয়া প্রদান এবং প্রধানত নারীর স্বার্থ-বিরোধী পক্ষে ফতওয়া প্রদান। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এ পর্যন্ত যতোগুলো ফতওয়ার ঘটনার কথা গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়েছে, তার শতকরা এক ভাগের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের ন্যূনতম স্বীকৃত কোনো *আলিমের* সম্পৃক্ততা ছিলো না। *আলিমের* সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি আলোচিত 'সাইফুল-শাহিদার ঘটনার' কথিত ফতওয়ার ক্ষেত্রেও। তবে বাংলাদেশের *উলামা* ফতওয়া দেন এবং দিয়ে থাকেন। এ জন্য কিছু প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাও রয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থায় ফতওয়া প্রদানের সর্বোচ্চ কেন্দ্র হলো 'জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল'। ১৯৯৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হককে চেয়ারম্যান করে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফতওয়া প্রদানের জন্য বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মাদ্রাসাগুলোয় (প্রধানত কওমী মাদ্রাসাসমূহে) একটি করে বিভাগ বা শাখা রয়েছে। এর বাইরেও বাংলাদেশের খ্যাতিমান মুফতিগণ দেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় বিভিন্ন সময় প্রকাশ্যে (প্রায়শই গণমাধ্যমের সাহায্যে) ফতওয়া প্রদান করেছেন। দেশদ্রোহী-ধর্মদ্রোহী তসলিমা নাসরিন বিষয়ক ফতওয়াটি এ ক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এ সব প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য ফতওয়ার বিষয় নিয়ে ন্যায্যত কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি। অন্তত যারা ইসলামী জীবন বিধানে বিশ্বাস করেন এবং অথবা এর প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধা রাখেন, তারা সে সব ফতওয়া বিষয়ে প্রশ্ন তোলেননি। যেমন প্রশ্ন

তোলা হয়নি নওগাঁর আলোচিত 'সাইফুল-শাহিদা ঘটনার' কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত পার্শ্ববর্তী সাপাহার উপজেলার তিলনা ইউনিয়নস্থ দমদমা গ্রামের 'মফিজউদ্দিন-জরিনা ঘটনায়' এক শিক্ষিত *আলিমের* (মুফতির) দেয়া ফতওয়ার ঘটনায়। একটি সাপ্তাহিক জানায়, দিন-মজুর মফিজউদ্দিন রাগের মাথায় স্ত্রী জরিনাকে মৌখিকভাবে তালাকের কথা উচ্চারণ করে। এ কথা তার ভাগ্নে নজরুল ও ভাতিজা শামসুদ্দিন শুনতে পেয়ে গ্রাম্য শালিস বসায়। শালিসে লোকজন কোনো 'মাওলানার' নিকট থেকে এ ব্যাপারে ফতওয়া জানতে বলে। এ ব্যাপারে স্থানীয় নিশ্চিন্তপুর কাছেমিয়া জামেউল উলুম মাদ্রাসার মুফতি তার দেয়া ফতোয়ায় লিখেন: 'মফিজউদ্দিন-জরিনার পূর্বের ন্যায় সংসার করতে শরীয়তে কোনো বাধা নেই। সাক্ষীগণের মতবিরোধের কারণে তাদের জবানবন্দী গ্রহণযোগ্য নয়।' এর পরও সে গ্রামের মাতব্বর হাজী ফরিজউদ্দিন এ ফতওয়া মানতে অস্বীকার করেন এবং 'হিল্লা বিয়ে ছাড়া মফিজের স্ত্রী হারাম' বলে ঘোষণা দেন। এ মাতব্বর ঈদের জামাত থেকে মফিজ ও তার দু'ছেলেকে বের করে দিলে বিষয়টি আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং পুলিশ হাজী ফরিজসহ তার ৫ সহযোগীকে গ্রেফতার করে'।[৯৬] এ ঘটনাটিও নির্দেশ করে, বাংলাদেশের শিক্ষিত *উলামা* বিয়ে-তালাক বিষয়ক হোক অথবা অন্য বিষয়ে হোক, আনুষ্ঠানিকভাবে যে সব ফতওয়া প্রদান করেছেন, সেগুলো কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি করেনি অথবা সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলায় বিঘ্ন ঘটায়নি। তাই ফতওয়া প্রদানের বাস্তবতায় বাংলাদেশের *উলামাকে* গোঁড়া আখ্যায়িত করার ন্যায্য সুযোগ নেই।

এ. অথঃ মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ শিক্ষণ!

বাংলাদেশের *উলামার* কল্পিত 'গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গি' সংশোধনের জন্য দুই বিচারপতির 'তাৎক্ষণিক সুপারিশ' হলো: 'মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সমস্ত মসজিদের খতিবদেরকে তাদের শুক্রবারের খুৎবায় অধ্যাদেশটি আলোচনা করার অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে'।[৯৭] ইতোমধ্যে অবশ্য জেনারেল আইয়ুব খান ঘোষিত ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ সম্পর্কে বাংলাদেশের *উলামার* দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের *উলামা* সেই ১৯৬১ সালের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের 'লৌহ শাসন'কে তাচ্ছিল্য দেখিয়ে তার ঘোষিত আইনটিকে সে সময়ই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইতোমধ্যে জানা গেছে, খোদ পাকিস্তানেরই পরবর্তী এক সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশটি সে দেশে বাতিল ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশের দুই বিচারপতি এ তথ্যটি জানেন কি-না, তা নিশ্চিত নয়। বাংলাদেশে অবশ্য জেনারেল আইয়ুব খানের এ আইনটি রাষ্ট্রীয়ভাবে এখনও বাতিল করা হয়নি। কিন্তু *উলামাসহ* অনেকেই দুই বিচারপতির প্রতি তীব্রভাবে এ বলে প্রশ্ন করেছেন, পাকিস্তানের বিষয়ে সাধারণভাবে অনীহা থাকলেও স্বৈরশাসক জেনারেল আইয়ুব খানের এ আইনটির

---

[৯৬] *সাপ্তাহিক বিক্রম*, ঢাকা, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১।

[৯৭] পরিশিষ্ট-৪।

প্রতি অমন প্রীতির ভাব প্রদর্শিত হচ্ছে কেনো এবং খোদ পাকিস্তানেই যা বাতিল বলে ঘোষিত হয়েছে, বাংলাদেশে সেই 'বাতিল আইনটি' শিক্ষার্থী ও দেশবাসীকে কেনো শেখাতে হবে?[৯৮]

দুই বিচারপতি মসজিদের ইমামদেরকে রাজনৈতিক শাসকদের আজ্ঞাবহ বানাতে চেয়েছেন, বাংলাদেশের স্বাধীন খতিব ও সচেতন নাগরিকদের জন্য সেটি আরো বেশি বিস্ময় ও ক্রোধের বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো। 'শাসকের সম্মুখে অপ্রিয় সত্য উচ্চারণের' জন্য মুমিনদের প্রতি মহানবীর (স.) যে স্থায়ী প্রণোদনা বিদ্যমান, *উলামা* এবং নির্দিষ্টভাবে জুময়ার খতিবদের জন্য সেটি আরো বেশি তাৎপর্যবহ বিষয়। সত্যপন্থী ও নির্ভীক *উলামা* তাদের ঈমান, জ্ঞান ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হন এবং জনগণকে সেদিকে নিয়মিতভাবে আহ্বান করে থাকেন। দুই বিচারপতি 'জেনারেল আইয়ুব খানের আইনটি' জুময়ার খুতবায় আলোচনার 'নির্দেশ দানের' যে পরামর্শ রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষকে প্রদান করেছেন, তা নেহায়েতই এক অর্বাচীনসুলভ ধৃষ্টতা হিসেবে *উলামার* নিকট বিবেচিত ও নিন্দিত হয়েছে।

ঐ. মাদ্রাসা বিলোপ ও ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ!

বাংলাদেশের *উলামাকে* গোঁড়া হওয়া থেকে 'মুক্ত' (!) করার 'দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা' হিসেবে দুই বিচারপতির সুপারিশ: 'আমরা একটি এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করছি এবং সংবিধানের ৪১ (১) অনুচ্ছেদের অধীনে আইন, জনশৃঙ্খলা এবং নৈতিকতার নিশ্চয়তার শর্তে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন করতে হবে'।[৯৯] দেশব্যাপী একটি এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর জন্য খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ ও *উলামার* পক্ষ থেকেও ইতোমধ্যে দাবি করা হয়েছে। তবে সেই একধারার শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে যদি ড. কুদরত-ই-খুদা প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থা হয়, তবে তার তীব্র বিরোধিতা করেছেন বাংলাদেশের *উলামা*। কারণ সে শিক্ষা ব্যবস্থায় নাগরিকদের নৈতিকতা শেখাবার এবং সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালা ও তার বিধানাবলী শেখাবার কোনো আয়োজন রাখা হয়নি। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রফেসর এম শামসুল হকের নেতৃত্বেও একটি শিক্ষা কমিশন কুদরত-ই-খুদা প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় অনুরূপ একধারার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করেছিলো। বাংলাদেশের *উলামা* এবং ইসলামপন্থী দল ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে সে প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছিলো। কারণ প্রস্তাবিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করার কথা ছিলো কিন্তু তার স্থলে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় নৈতিকতা শেখানো এবং আল্লাহতায়ালা ও তার ন্যূনতম বিধানাবলী

---

৯৮ খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক, সাক্ষাৎকার, *মানবজমিন*, ১৩-১-২০০১, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, সাক্ষাৎকার, *মানবজমিন*, ৫-১-২০০১, অধ্যাপক গোলাম আযম, সাক্ষাৎকার, *ইনকিলাব*, ১৫-১-২০০১, বিস্তারিত পাঠ: তৌহিদুর রহমান (সম্পা.), আদালতের কাঠগড়ায় ফতোয়া বিবাহ তালাক, (ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন, ২০০১), পৃ. ২১৭-২৯।

৯৯ পরিশিষ্ট-৪।

শেখাবার কোনো ব্যবস্থা রাখা হয়নি। বাংলাদেশের *উলামা* এবং ইসলামী চিন্তাবিদদের পক্ষ থেকে একটি এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে, যাতে প্রচলিত 'সাধারণ বৈষয়িক শিক্ষার' পাশাপাশি নৈতিকতা, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালা ও মুমিনের জীবন পরিচালনার জন্য ন্যূনতম বিধানাবলী শেখাবার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু দুই বিচারপতির প্রস্তাবিত (এবং কাঙ্খিত) একটি একধারার শিক্ষা ব্যবস্থার স্বরূপ রায়টিতে ব্যাখ্যা করা হয়নি বলে এ বিষয়ে গভীর অস্পষ্টতা ও সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিলো। বাংলাদেশের *উলামা* দুই বিচারপতির প্রস্তাবিত একধারার শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে ড. কুদরত-ই-খুদা এবং ড. এম শামসুল হক প্রস্তাবিত এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থাকেই অনুমান করেছেন, যাতে কেবল প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষাকে বিলুপ্ত করার কথা বলা হয়েছে। এহেন অনুমানের ও উপলব্ধির কারণে বাংলাদেশের *উলামা* দুই বিচারপতির 'একধারার শিক্ষা ব্যবস্থার' প্রস্তাবকে সাধারণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা উবায়দুল হকের মতো শীর্ষ *আলিমগণ* মনে করেন, মাওলানা ওবায়দুল হকের ভাষায়, 'অবশ্য সাধারণ শিক্ষার সাথে যদি মাদ্রাসা শিক্ষার মূল বিষয়গুলো সংযুক্ত করা হত, তবে আজকে সমাজে এই অবস্থা ঘটত না। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হত এবং ইসলামের ১ম স্বর্ণযুগের 'খায়ের ও বরকত' বাংলাদেশে ফিরে আসত। কাজেই আমাদের দাবি হল, মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর ঢালাও সমালোচনা পরিহার করে সাধারণ শিক্ষার প্রতি স্তরে কোরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা সংযুক্ত করা হোক'।[১০০] মাওলানা ওবায়দুল হক বাংলাদেশের সর্বস্তরে নীতিহীনতার সয়লাব এবং নানামাত্রিক দুর্নীতিজাত অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার জন্য কার্যত নৈতিকতার শিক্ষা বর্জিত সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।

প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাবিহীন দুই বিচারপতির 'একটি একধারার শিক্ষা ব্যবস্থার' প্রস্তাবটি কার্যত কোনো মহলে অনুকূল আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়নি।

দুই বিচারপতি বলেছেন 'সংবিধানের ৪১(১) অনুচ্ছেদের অধীনে আইন, জনশৃংখলা এবং নৈতিকতার শর্তে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন করতে হবে।' বাংলাদেশের সংবিধানে ৪১(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে:

> 'আইন, জনশৃংখলা ও নৈতিকতা সাপেক্ষে-
>
> (ক) প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রহিয়াছে;
>
> (খ) প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের স্থাপন, রক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার অধিকার রহিয়াছে।'

এর সহজ অর্থ দাঁড়ায়, দেশে বিদ্যমান আইন, জনশৃঙ্খলা এবং নৈতিকতার পরিপন্থী না হলে যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন ও প্রচার করতে পারবে এবং প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায় তার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও

---

[১০০] সাক্ষাৎকার, *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৭ জানুয়ারী ২০০১।

ব্যবস্থাপনার অধিকার পাবে। তার অর্থ, বাংলাদেশের ব্যক্তি নাগরিক অথবা কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় বা উপ-সম্প্রদায় 'ধর্মের নামে' বাংলাদেশের বিদ্যমান আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা লংঘন করতে পারবে না। অন্য কথায়, বাংলাদেশে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' আছে তবে তা অবাধ নয়, বাংলাদেশে 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বিদ্যমান আইন, জনশৃংখলা ও নৈতিকতার শর্তে নিয়ন্ত্রিত হয়েই চলছে। তারপরও দুই বিচারপতি 'ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের আইন' করার সুপারিশ করছেন কেনো? তা-ও আবার খোদ সংবিধানে বর্ণিত তিন পূর্বশর্তের (আইন, জনশৃংখলা ও নৈতিকতা) ভিত্তিতেই। বাংলাদেশে কি আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা পরিপন্থী 'ধর্মাচরণের' জন্য আইন নেই? আছে। এবং আছে বলেই নওগাঁ ও সাপাহারের ঘটনায় পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। তার পরও দুই বিচারপতি 'ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন' প্রণয়নের সুপারিশ করেছেন কেনো? স্পষ্টতই এটি একটি 'বাহুল্য' আচরণ। হাইকোর্টের বিচারপতির নিকট থেকে মানুষ সঙ্গত কারণেই *বাহুল্য* আচরণ কামনা করেন না।

দুই বিচারপতির এই 'অযাচিত পরামর্শ' যেহেতু 'সাইফুল-শাহিদার হিল্লা বিয়ে' বিষয়ক মামলায় (বাস্তবে 'সুয়োমোটো' বা *বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর 'স্বতঃপ্রণোদিত মামলা'*) এবং অবাঞ্ছিত প্রক্রিয়ায় (ধান ভানতে শীবের গীত গাইবার ধারায়) বাংলাদেশের *উলামার* সংশ্লিষ্টতার প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে, বাহ্যত তাই মনে হতে পারে, বাংলাদেশের *উলামা* আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা পরিপন্থী প্রক্রিয়ায় 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' ভোগ ও প্রয়োগ করছেন। বাংলাদেশের বাস্তবতা কি তা-ই নির্দেশ করে? করে না। একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী অথবা গোষ্ঠী হিসেবে বাংলাদেশের *উলামার* বিরুদ্ধে সাধারণভাবে 'ধর্মাচরণের' প্রেক্ষাপটে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা লংঘনের কোনো রেকর্ড-প্রমাণ আছে কি? নেই। আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা লংঘনের রেকর্ড বরং অন্য দু'একটি শ্রেণী-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আছে। অভিযোগ আছে:

ক. কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের বিরুদ্ধে (চাঁদাবাজি, সন্ত্রাস),

খ. স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে (ক্লাশে মনোযোগ না দিয়ে 'টিউশনি' করা),

গ. রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে (ঘুষ গ্রহণ- *'বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তারা প্রথম শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ'*-মন্তব্যটি ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের),

ঘ. রাষ্ট্রায়ত্ত চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে (প্রাইভেট প্রাকটিসে অন্যায্য মাত্রায় মনোযোগ প্রদান),

ঙ. বিভিন্ন আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধে (ঘুষের বিনিময়ে রায় প্রদান বা জামিন প্রদান, খোদ বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে)

এবং এমনি আরো কিছু কিছু শ্রেণী-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা লঙ্ঘনের রেকর্ড রয়েছে। শ্রেণী অথবা গোষ্ঠী হিসেবে বাংলাদেশের *উলামা* যেহেতু বড়ো

বেশি সনাতনপন্থী এবং 'বিষয়-বৈভব বুদ্ধিহীন', তাই তাদের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে নৈতিকতা লংঘন এবং নির্দিষ্টভাবে আইন ও জনশৃঙ্খলা লংঘনের অভিযোগ ওঠেনি। তা সত্ত্বেও দুই বিচারপতি এহেন সুপারিশ কেনো করলেন? এ ক্ষেত্রে দুই বিচারপতির আচরণ যে উৎকটভাবে অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত, তা যে কারো মনে হতে পারে।

রায়টিতে দুই বিচারপতি অতঃপর বলছেন: 'রাষ্ট্র অবশ্যই জনশৃঙ্খলা এবং নৈতিকতার সংজ্ঞা প্রদানকারী এবং উহা অবশ্যই সমাজকে শিক্ষিত করে তুলবে'।[১০১]

প্রধানত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্র 'জনশৃঙ্খলা' বিষয়ে সংজ্ঞা নির্ধারণের কর্তৃত্ব পেতেই পারে এবং তার প্রয়োগও করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র নৈতিকতার সংজ্ঞা প্রদান করার অধিকারী কি-না এবং সেই নৈতিকতা 'নীতিগতভাবে' সকল নাগরিকের 'বিনা বাক্য ব্যয়ে ও নির্দ্বিধায়' স্বীকার করা ন্যায্য কি-না, সে বিষয়ে অন্তত 'একাডেমিক বিতর্কের' সুযোগ আছে বলেই মনে করা হয়। একজন ভাষ্যকার এ পর্যায়ে লিখেন:

> 'আর মুসলমানদের নৈতিকতার সংজ্ঞাও আল্লাহ্ ও রাসূল তথা ইসলাম ছাড়া নিরূপণের অধিকার আছে কার? যদি এর বিপরীত কেউ দিতে অগ্রসর হয়ও তবে মুসলমানরা তা মানবেই বা কেন। মুসলমানদের জন্য নৈতিকতার সংজ্ঞা নিরূপণকারী একমাত্র আল্লাহ্ ও রাসূল। পাশ্চাত্যে প্রাপ্তবয়স্ক নারী পুরুষের স্বেচ্ছায় ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া অনৈতিক নয়, কুমারী মাতৃত্ব অনৈতিক নয়, সমকামিতাও কোথাও কোথাও অনৈতিক নয়। বিবাহবন্ধন ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মত 'লিভ টুগেদার' অনৈতিক নয়, উলঙ্গপনা, রূপ-যৌবনের প্রদর্শনী, মদ,জুয়া অনৈতিক নয়। কোন কোন ধর্মে-সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মহিলার এক সঙ্গে একাধিক স্বামী থাকা অনৈতিক নয়, কিন্তু আমাদের ধর্মে এর কোনটা কি নৈতিক? নৈতিকতার মানদণ্ড কি? এটা একেক ধর্মে, একেক সমাজে, একেক যুগে একেক রূপ। মুসলমানদের জন্য কোনটা নৈতিক আর কোনটা অনৈতিক তা আল্লাহ্ ও রাসূল নিরূপণ করে দিয়েছেন, নির্ধারণ করে দিয়েছেন। মুসলমান, সে যে দেশের, যে সমাজের হোক না কেন, সে যে যুগেরই হোকনা কেন এতে কোন হেরফের হবে না'।[১০২]

একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান (ধর্মতো বটেই) হিসেবে ইসলাম 'নৈতিকতা' বিষয়ে মৌলিক ও স্থায়ী নির্দেশনা প্রদান করেছে। একজন মুসলিমকে নৈতিকতা বিষয়ক সেই মৌলিক ও স্থায়ী নির্দেশনা মান্য করেই জীবন যাপন করতে হবে। রাষ্ট্র নির্ধারিত নৈতিকতার সংজ্ঞায় যদি ইসলাম প্রদত্ত নৈতিকতার মৌলিক ও স্থায়ী নির্দেশনার সাথে 'সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক' উপাদান থাকে, তবে একজন মুসলিম তেমন রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা মান্য করতে পারেন না। তেমন বাস্তবতায় ব্যক্তি মুসলিমকে রাষ্ট্রীয় সেই 'নৈতিকতার সংজ্ঞা' পরিবর্তনের জন্য আন্দোলন-প্রচেষ্টা চালাতে হবে অথবা অন্ততপক্ষে সেই নির্দিষ্ট 'নৈতিকতার প্রসঙ্গটি' ব্যক্তি মুসলিমের জন্য প্রযোজ্য নয়, রাষ্টের মাধ্যমে তেমন বিধি প্রণয়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং দুই বিচারপতি নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণের যে 'অবাধ রাষ্ট্রীয় অধিকারের'

---

[১০১] পরিশিষ্ট-৪।

[১০২] রুহুল আমীন খান, *প্রাগুক্ত*, ১৯ জানুয়ারী ২০০১

কথা বলেছেন, মুসলিম নাগরিকদের নিকট তা গ্রহণযোগ্য নয়। 'ইসলামী নৈতিকতার' সাথে 'রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা' সাংঘর্ষিক হলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য এক পর্যায়ে তা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধের প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। দুই বিচারপতির জানা দরকার, আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা নাগরিকদের ওপর নৈতিকতা চাপিয়ে দেয় না। কারণ রাষ্ট্র মূলত একটি রাজনৈতিক আয়োজন, নৈতিক প্রতিষ্ঠান নয়।

'উহা (রাষ্ট্র) অবশ্যই সমাজকে শিক্ষিত করে তুলবে' বলে দুই বিচারপতি যে পর্যবেক্ষণ অথবা অভিমত ব্যক্ত করেছেন, 'নীতিগতভাবে' তা স্বীকার করতে বাধা নেই। তবে দুই বিচারপতি 'আইন বিদ্যার' বাইরে আর কোনো বিদ্যা চর্চা করেছেন কি-না, রায়টির পাঠকবৃন্দের তেমন তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন হতে পারে। কারণ দুই বিচারপতি 'সমাজ' বলতে কি বোঝাতে চেয়েছেন, 'সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের' শিক্ষার্থীদের মনে সে বিষয়ে নির্দিষ্টভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে। রাষ্ট্র তার 'নাগরিকদের' জন্য 'কল্যাণ কর্মসূচীর' আওতায় আরো কিছু আয়োজনের পাশাপাশি 'অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক' প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। 'সমাজকে' শিক্ষিত করে তোলা আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা 'দায়িত্ব' মনে করে কি-না, তা একটি একাডেমিক আলোচনার প্রসঙ্গও হতে পারে। কিন্তু 'ব্যাখ্যাবিহীন বক্তব্যের' মাধ্যমে তেমন বিষয় নিয়ে 'নাড়াচাড়া' করা হাইকোর্টের বিচারকের দায়িত্বের আওতায় পড়ে কি-না এবং তা 'অনধিকার চর্চা' কি-না, তেমন প্রশ্ন উত্থাপনের কথা সংশ্লিষ্টরা ভাবতে পারেন।

ঙ. 'একের' দোষে 'সকলের' শাস্তি!

আলোচিত রায়টি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল মহলই একটি সাধারণ নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং সেটি হলো 'একের' দোষে 'সকলকে' শাস্তি প্রদানের মতো দুই বিচারপতির অবিবেচনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি। প্রায় সকলেই বলছেন, নওগাঁর এক প্রত্যন্ত গ্রামে 'একজন *আলিম*' (বাস্তবে যার অস্তিত্ব বা সংশ্লিষ্টতা নেই) একটি 'ভুল ফতওয়া' {প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো 'ফতওয়া' প্রদানের ঘটনাই ঘটেনি, ঘটেছে প্রথমত 'পারিবারিক পর্যায়ের শালিসী' বৈঠক ও এর অবিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং অতঃপর গ্রামীণ মাতব্বর-চেয়ারম্যানদের ব্যক্তিগত অথবা স্বার্থগত নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের চলমান-অব্যাহত দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে 'পারিবারিক শালিসীতে গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অস্বীকৃতির প্রেক্ষাপটে এক ধরনের 'গ্রামীণ জটিলতা' (দেখুন, তারেক ফজল, বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার: নির্যাতিতা দুই নারীর ঘটনা সমীক্ষা, মোহাম্মদ এ হাকিম সম্পাদিত *বাংলাদেশ পলিটিক্যাল স্টাডিজ*, ১৯৯৪, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), যা বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশে বিভিন্ন ও বিচিত্র সব ইস্যুতে ঘটে থাকে} যদি দিয়েও থাকেন, তবে সেই 'অপরাধে' ইসলামী জীবন বিধানের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান খোদ ফতওয়াকেই কেনো নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে? সাধারণ যুক্তি ও কাণ্ডজ্ঞান অনুযায়ী 'ভুল ফতওয়া প্রদানকারীকেই' কেবল দায়ী করা যেতে পারে এবং উপযুক্ত শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু দুই বিচারপতির কাণ্ডজ্ঞানে এ যুক্তি ও বিবেচনার স্থান ছিলো না। বাংলাদেশ মসজিদ কাউন্সিলের সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের এ পর্যায়ে মূল্যায়ন এমন:

> 'ড্রাইভার তো কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়ে ফেলতেই পারে। তার জন্য বিচার হবে কার? অদক্ষ ড্রাইভারের, না এ জন্য সকল প্রকার ড্রাইভিং নিষিদ্ধ করে দিতে হবে? এটা কেমন অদ্ভুত কথা যে, কারো কোন ভুলের জন্য সকলেই অপরাধী গণ্য হবে? এহেন আবদার অন্যায় ও গর্হিত'।[১০৩]

আরেকজন ভাষ্যকার লিখছেন:

> 'এসব বিশেষজ্ঞদের মতে একজন অজ্ঞলোকের ভুল ফতোয়ার কারণে যদি ফতোয়াকেই অবৈধ ঘোষণা করা হয় তাহলে দেশের উচ্চ আদালতসহ সকল বিচার ব্যবস্থা তুলে দেয়া উচিত। কারণ বিচারকদের দুর্নীতি নিয়ে খোদ একজন বিচারপতি কথা তুলেছেন। একজন বিচারপতি উৎকোচ গ্রহণের দায় নিয়ে পদত্যাগ করেছেন। ফতোয়া বিরোধী রায়কে সামনে রেখে কেউ যদি বিচার বিভাগকে বন্ধ করার দাবি করেন, তাহলে তাকে কিভাবে অযৌক্তিক বলতে পারবে? এখানেই শেষ নয়, যে বেঞ্চ এ রায় দিয়েছে সেই বেঞ্চের সিনিয়র বিচারপতি মোঃ গোলাম রাব্বানীর বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের প্রমাণ আছে বলে ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা বলেছেন। তাছাড়া তার একটি রায় সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ সর্বসম্মতভাবে বাতিল করে দিয়েছে। আর তার পেশার সাথে সঙ্গতিহীন কাজের জন্য আপীল বিভাগের পক্ষ থেকে তিরস্কার করা হয়েছে। ফতোয়া বিরোধী রায়ের প্রতি তাঁর ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ থাকলে তার পদত্যাগ করা উচিত নয় কি? একজন হাতুড়ে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসায় কোন রোগী মারা গেলে আমরা কি চিকিৎসা ব্যবস্থা বন্ধ করে দেব ? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের হাতে একজন ছাত্রী ধর্ষিত হওয়ায় সকল শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করা কি যৌক্তিক হবে?'[১০৪]

দুই বিচারপতির যুক্তিবোধ বিষয়ে আর মন্তব্য না করাই শ্রেয় বিবেচিত হতে পারে।

ঔ. বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর পূর্ব রেকর্ড

আলোচিত 'অনধিকার চর্চামূলক' ও 'বাহুল্যপূর্ণ' বক্তব্যের রায়টির মতো রায় প্রদানের রেকর্ড বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর আরো রয়েছে এবং সে সব রায়ের জন্য তিনি তার উচ্চতর আদালত আপীল বিভাগে চূড়ান্তভাবে নিন্দিত, ধিকৃত ও বর্জিত হয়েছেন এবং উচ্চতর আদালতের সিনিয়র বিচারকগণ তাকে ইতঃপূর্বে একাধিকবার নজিরবিহীন কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দিলেও তিনি সতর্ক হতে পারেননি। প্রধানত 'শরীয়ত পরিপন্থী' সুয়োমোটো রায় দেবার তার অভ্যাসকে 'প্যাথলজিক্যাল' বা 'রোগপ্রবণতা' হিসেবে উচ্চতর আদালত চিহ্নিত করলেও বিচারপতি গোলাম রাব্বানী সেই 'ধিকৃত অভ্যাসটি' থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং ২০০১ সালের *প্রথম দিনটিতে* তিনি তেমন আরেকটি রায় প্রদান করেছেন। বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর 'বিচারিক দক্ষতা ও যোগ্যতা' বিষয়ক একটি মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়েছিলো ঢাকার একটি বাংলা দৈনিকে। প্রসঙ্গিক বিবেচনায় সেই মূল্যায়নটি পরিশিষ্টে (পরিশিষ্ট-৪) দেয়া হলো।

---

[১০৩] সাক্ষাৎকার, *দৈনিক ইনকিলাব*, ৯ জানুয়ারী ২০০১।

[১০৪] *সাপ্তাহিক* বিক্রম, ১ ফেব্রুয়ারী ২০০১।

হাইকোর্টের রায় বিষয়ে আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত

১জানুযারী ২০০১ তারিখে হাইকোর্টের বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ 'সব ধরনের ফতওয়া নিষিদ্ধ' করে যে রায় প্রদান করেন, সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ ১৪ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে তার 'পর্যবেক্ষণসহ কার্যকরী অংশকে ৬ সপ্তাহের জন্য স্থগিত' ঘোষণা করে। বাংলাদেশ মসজিদ কাউন্সিলের সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও লালবাগ জামেয়া কোরআনিয়া মাদ্রাসার সহকারী মুফতি মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়্যবের দায়ের করা দু'টি 'সাময়িক লিভ আবেদনের' শুনানী শেষে আপীল বিভাগের 'ফুল কোর্ট' উক্ত স্থগিতাদেশ প্রদান করেন।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, আলোচিত 'ফতওয়া নিষিদ্ধকারী' হাইকোর্টের রায়টি বাতিল হয়নি।[১০৫] তবে কোনো কোনো আইনজ্ঞের ধারণা, 'সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ' মামলাটির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ না করলে আপীল বিভাগের '৬ সপ্তাহের স্থগিতাদেশটি স্থায়ী স্থগিতাদেশে পরিণত হবে।'

হাইকোর্টের রায় বিরোধী উলামার আন্দোলন

১ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে হাইকোর্টের আলোচিত 'ফতওয়া নিষিদ্ধকারী' রায় ঘোষিত হবার পর বাংলাদেশের *উলামা* ব্যাপকভাবে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। ঢাকায় ২৮ জানুয়ারী ২০০১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় 'ফকীহ সম্মেলন'। ইসলামী আইন বাস্ত বায়ন কমিটি-র ব্যানারে ঢাকার পল্টন ময়দানে ২ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে '*উলামা*-মাশায়েখ জাতীয় মহাসমাবেশ' অনুষ্ঠিত হয়। মুফতি ফজলুল হক আমিনীর সভাপতিত্বে মহাসমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক। মহাসমাবেশে দুই বিচারপতির 'ফতওয়া নিষিদ্ধকারী রায়' বাতিলের দাবি জানানো হয়, জেনারেল আইয়ুব খান প্রবর্তিত ১৯৬১ সালের 'মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ' বাতিলের দাবি জানানো হয়, শেখ মুজিবের ছবি সরকারি অফিস-আদালত-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদর্শনের সংসদীয় আইন প্রত্যাহারের দাবি করা হয়, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র বন্ধ ও শরীয়তের আইন বাস্তবায়নের দাবি করা হয়।[১০৬] এ মহাসমাবেশে আসার পথে ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ বিভিন্ন স্থান থেকে রওনা করা বিপুল সংখ্যক যান বাহনে আক্রমণ চালানো ও সেগুলোকে ঢাকায় আসতে না দেয়ার প্রতিবাদে মহাসমাবেশ থেকে পরদিন ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ বৃহত্তর ঢাকায় পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করা হয়। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি আহুত বৃহত্তর ঢাকায় ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে হরতাল চলাকালে ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার অন্তর্গত নূর মসজিদে এক পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়ার রক্তাক্ত লাশ পাওয়া যায়। সে

---

[১০৫] মুফতি ফজলুল হক আমিনীর 'জনসভার ভাষণ', *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০০৩।

[১০৬] *উলামা*-মাশায়েখ মহাসমাবেশের একটি বিবরণ বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুখপত্র '*মজলিস সংবাদ*' বিশেষ সংখ্যা, মে ২০০১-এ পাওয়া যায়। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সেই বিবরণটি পরিশিষ্ট-৫ আকারে উপস্থাপিত হলো।

দিন সকাল ১০টায় মসজিদটিতে সমবেত মাদ্রাসার ছাত্রদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শ্লোগানের মাধ্যমে মিছিলের পরামর্শ দিয়ে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক নির্দিষ্ট কিছু ছাত্রকে হাদীসগ্রন্থ বুখারী শরীফের পাঠদান করতে থাকেন। ইসলামী ঐক্যজোট ঢাকা মহানগরীর আহবায়ক মাওলানা আবদুর রব ইউসুফী ও মোহাম্মদপুরস্থ জামেয়া মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কালামের নেতৃত্বে একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল মোহাম্মদপুরের কয়েকটি সড়ক প্রদক্ষিণ করে স্থানীয় 'শিয়া মসজিদ চৌরাস্তায়' সমাপ্ত হয়। মিছিল শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিজ নিজ গন্তব্যে ফিরে যাবার পর্যায়ে মোহাম্মদপুর থানার ওসি মুহসিনুজ্জামানের নেতৃত্বে পুলিশ মিছিলকারীদের ওপর লাঠিপেটা শুরু করে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় কিছু মাদ্রাসা ছাত্র পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য নিকটবর্তী 'নূর মসজিদে' আশ্রয় গ্রহণ করে। পুলিশ মসজিদে ঢুকে মাদ্রাসা ছাত্রদের পেটাতে থাকে। সেখানে পূর্ব থেকেই ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর *শায়খুল হাদীস* আল্লামা আজিজুল হক বুখারী শরীফের পাঠ দিচ্ছিলেন। এ সময় পুলিশ তার পুত্রসহ *শায়খুল হাদীস*কে একটি রিক্শায় উঠিয়ে দিয়ে বাসায় চলে যাবার অনুরোধ করে। এর এক ঘন্টা পর পুলিশ সেই মসজিদের ভেতর রক্তাক্ত নিহত পুলিশ কন্স্টেবল বাদশা মিয়ার লাশ পাবার ঘোষণা দেয়। পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে রাজধানীর সর্বত্র রক্তাক্ত বাদশা মিয়ার লাশের ছবি ও মাদ্রাসা থেকে উদ্ধারকৃত বলে কথিত কিছু ছুরি-চাকুর ছবি সংবলিত চার রঙ্গা পোস্টার দেখা যায়। প্রথমে দাবি করা হয়েছিলো পুলিশ কন্স্টেবল বাদশা মিয়াকে 'অভিযুক্ত মাদ্রাসা ছাত্ররা' জবাই করে মসজিদে হত্যা করেছে। পরে লাশটির পোস্টমর্টেম রিপোর্ট থেকে জানা যায়, 'মাথায় আঘাতজনিত কারণে বাদশার মৃত্যু হয়েছে।' ঘটনার পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারী সরকার সমর্থক দৈনিকগুলো প্রায় একই ভাষায় পুলিশ কন্স্টেবল হত্যার জন্য 'মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক-মৌলবাদী ও তালেবানদের' দায়ী করে রিপোর্ট প্রকাশ করে। শায়খুল হাদীসকে পুত্রসহ রিক্শায় বাসায় চলে যাবার অনুরোধ করে সেই পুলিশই পরে তাকে হত্যাকাণ্ডের ৬ নম্বর আসামী করে। অতি দ্রুততায় মুদ্রিত ও রাজধানীর সর্বত্র চার রঙা পোস্টারে প্রদর্শিত *ছুরি-চাকুগুলোকে* সাধারণ সচেতন নাগরিকেরাও প্রতি বছর 'কোরবানীর পশু জবাইর' কাজে ব্যবহৃত কওমী মাদ্রাসাসমূহে সাধারণভাবে সংরক্ষিত ছুরি-চাকু হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হন।

৩ ফেব্রুয়ারীর হরতাল চলাকালে একটি সমজিদে পুলিশ কন্স্টেবলের রক্তাক্ত মৃতদেহ প্রাপ্তির বিষয়টিকে সরকার ও ইসলামবিরোধী মহলগুলো ব্যাপক ও পরিকল্পিতভাবে 'ফতওয়া নিষিদ্ধকারী রায় বিরোধী' *উলামা* ও ইসলামপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবহারের অব্যাহত চেষ্টা চালায়। *উলামার* পক্ষ থেকে পুলিশ কন্স্টেবল হত্যাকাণ্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করা হলেও সরকার পুলিশী তদন্ত করেই হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব *উলামা* ও ইসলামপন্থী দলসমূহের ওপর চাপায়।[১০৭] ৩ ফেব্রুয়ারী ঢাকা থেকে ফতওয়া নিষিদ্ধকারী রায়দাতা দুই বিচারপতির বিরুদ্ধে 'ফতওয়াদানের' অভিযোগে মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন ৪ ফেব্রুয়ারী রংপুরে জনসভা শেষে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনকালে পুলিশ কন্স্টেবল হত্যার অভিযোগে

---

১০৭ পুলিশ কন্স্টেবল বাদশা মিয়া হত্যাকাণ্ড বিষয়ে ঢাকার কয়েকটি দৈনিকে প্রকাশিত কিছু অনুসন্ধানী রিপোর্টের কয়েকটিকে পরিশিষ্ট-৬ এ উপস্থাপন করা হলো। এ থেকে স্পর্শকাতর এ হত্যাকাণ্ডটির নেপথ্যের ঘটনাপ্রবাহ বিষয়ে একটি স্পষ্ট ধারণা অর্জন করা সম্ভব হবে।

পুলিশ শায়খুল হাদীস, মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী ও এ আর এম আব্দুল মতিনসহ ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করে। *শায়খুল হাদীস* আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতি ফজলুল হক আমিনীসহ ফতওয়া বিরোধী আন্দোলনকারী *উলামাকে* গ্রেফতারের প্রতিবাদে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বড়হুজুর খ্যাত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে জেলা শহরটিতে হরতাল আহ্বান করেন, যার ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় এক ট্র্যাজেডির - 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্র্যাজেডি ২০০১' নামে যা ইতিহাস হয়ে থাকবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্র্যাজেডি ২০০১

হাইকোর্টের দুই বিচারপতির 'ফতওয়া নিষিদ্ধকারী রায়ের' প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় জন্ম নেয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্র্যাজেডি ২০০১। এর তাৎক্ষণিক সূত্র ৩ ও ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে যথাক্রমে মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের গ্রেফতার। উল্লেখ করা যেতে পারে, মুফতি ফজলুল হক আমিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সন্তান, এবং জেলা শহরে অবস্থিত জামেয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া মাদ্রাসা ও এর বর্তমান প্রিন্সিপাল, শতাব্দীর স্বাক্ষর, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (বড় হুজুর)এর ছাত্র। তাই মুফতি আমিনী এবং অশীতিপর বৃদ্ধ ও ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীসের গ্রেফতারের সংবাদে সারাদেশের মতো জেলা শহর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সর্বস্তরের ক্ষুব্ধ ও প্রতিবাদী *উলামা* ৫ ফেব্রুয়ারী তাদের বড় হুজুরের নিকট দাবি উত্থাপন করেন পরদিন ৬ ফেব্রুয়ারী সেই জেলা শহরে হরতাল ঘোষণা করার। বড় হুজুর তার অনুসারী *উলামাকে* পরদিন *তসবীহ হাতে যিকিরের সাথে* সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালনের অনুমতি প্রদান করেন। অনুসারী *উলামা* তাদের বড় হুজুরের নির্দেশ মোতাবেক ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে শান্তিপূর্ণ পন্থায় হরতাল পালন করতে থাকেন। এ হরতাল এবং সংশ্লিষ্ট হত্যাকাণ্ডের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্র্যাজেডি ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১' শীর্ষক গ্রন্থে :

> 'তাসবীহ হাতে জিকিররত তৌহিদী জনতা জামেয়া ইউনুছিয়া মাদ্রাসার সামনে সকাল ১০ টার দিকে জড়ো হতে থাকে। পিকেটারদের গ্রেফতারের খবর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে আশে পাশের গ্রাম থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল পুলিশ বি.ডি.আরদের নিরাপত্তা বেষ্টনী পেরিয়ে শহরে প্রবেশে ব্যর্থ হয়। এদিকে ঠিক সাড়ে দশটার দিকে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মাদ্রাসা জামেয়া ইউনুসিয়ার সংলগ্ন টি.এ রোডে অবস্থানকারী পিকেটিংরত জনতার উপর কোনরূপ পূর্বসতর্কীকরণ ছাড়াই বি.ডি.আর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ করে। আলেম ওলামাদের শান্তিপূর্ণ মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক টি,এ রোড অতিক্রম করে ষ্টেশন রোডের দিকে যাচ্ছিল। এটা শহরের যে কোন মিছিলের গতানুগতিক ধারা ষ্টেশন চত্বর থেকে ঘুরে আবার শহরে চলে আসা। কিন্তু জেলা পরিষদ মার্কেটের দক্ষিণ প্রান্তে রেল গেইটের কাছে বি.ডি. আর এক অভিনব পদ্ধতিতে লাল ব্যানার ঝুলিয়ে রাখে যাতে সাদা কালিতে লেখা ছিল, 'সাদা রেখা অতিক্রম করিলে গুলি করা হবে।'
>
> সচেতন মহলের প্রশ্ন কার্ফূ কিংবা ১৪৪ ধারা জারী করা ছাড়াই রেল গেইটের কাছাকাছি আসলে গুলি করার পরিকল্পনা কি পূর্ব থেকেই ছিল? এ সিদ্ধান্ত কে নিয়েছিল? কেন নিয়েছিল?

মিছিলটি কালীবাড়ীর মোড় হয়ে বাটারফ্লাই কোম্পানীর শোরুমের বরাবর আসলে দাঙ্গা পুলিশ মিছিলটি ঘিরে ফেলে এবং মিছিলের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন মিছিলটি আবার পিছনের দিকে ফিরিয়ে আনে। এ সময় জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট মিছিলে গুলি করার জন্য লিখিত অনুমতি দিয়ে দেয়। অথচ এসময় কোনরূপ সংঘর্ষ বা মিছিলকারীদের পক্ষ থেকে বি.ডি.আর পুলিশ আক্রান্ত হয়নি। এমনকি মিছিলকারীরা কোন ভাংচুরেও মত্ত ছিল না। সেখান থেকে মেজর নাসির এর নেতৃত্বে ডাবল মার্চ করে বিডিআর কালীবাড়ী মোড় পার হয়ে আশিক প্লাজার কাছাকাছি চলে আসে। আগুয়ান বি.ডি.আর বাহিনীর তৎপরতায় সর্বস্তরের তৌহিদী জনতার মিছিলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তারপরই বি.ডি.আর বাহিনী কোনরূপ পূর্ব সর্তকীকরণ ছাড়াই নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। মুহূর্তের মধ্যে গুলিবিদ্ধ হয়ে তাজুল ইসলামসহ আরো অনেকে সড়কের উপরে লুটিয়ে পড়েন। ঘটে যায় বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত ঘটনা। এতবড় হত্যাযজ্ঞ স্বাধীন দেশে আর হয়নি। একটানা চলতে থাকে টা-টা-টা শব্দ। কিন্তু শব্দটা এক জায়গায় থেমে থাকেনি। শহরের প্রধান সড়ক টি,এ রোডে চলে কয়েক ঘন্টাব্যাপী নারকীয় তাণ্ডব। কি প্রতিরোধ? কোথায় প্রতিরোধ? আক্রমণ তো শুধুই একতরফা। যাকে যেখানে পাচ্ছে পাখির মত গুলি করা হচ্ছে। ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে দু'পাশের দোকানের শার্টার, সাইনবোর্ড, লাইটপোষ্ট। সকাল ১১টায় কালিবাড়ীর মোড়ে একটি বুলেট এফোর ওফোর করে দেয় আলাউদ্দিনের তলপেট। একই সময়ে পাওয়ার হাউজ রোডের ছাত্রাবাসের সামনে বুলেটের নির্মম শিকার হন সুজন। তার লাশ সেখান থেকে প্রায় দুইশত গজ রাস্তা টেনে হিঁচড়ে কালিবাড়ীর মোড়ে রক্ষিত পুলিশের ভ্যানে তোলা হয়। এ দিকে কাউতলী মোড়ে ঝরে পড়ে আরেকটি তাজা প্রাণ হাফেজ সাইফুল ইসলাম। বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলতে থাকে থেমে থেমে গুলির শব্দ আর মর্টারের আওয়াজ।

গুলিবিদ্ধ ছাত্র জনতাকে ধরাধরি করে কিংবা পাঁজা কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে। সেখানে এক বিভিষীকাময় অবস্থা। ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই, এম্বুলেন্স অকেজো। লাশ পড়ে আছে মর্গে। আহতরা ভুগছে এক কঠিন নিরাপত্তাহীনতায়। রাস্ত ার মোড়ে মোড়ে জট্‌লা ছত্রভঙ্গ করতে এখানে ওখানে চলছে সাঁড়াশি আক্রমণ। আহতরা গোপনে আশ্রয় নিয়েছে বিভিন্ন প্রাইভেট হাসপাতালে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে সংকটাপন্ন হচ্ছে আহতদের জীবন। স্বজনরা রক্তের সন্ধানে হন্যে হয়ে দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে।

সাংবাদিক, ফটোসাংবাদিকরাও রেহাই পাননি পুলিশ বিডিআর এর আক্রমণ থেকে। ঢাকা থেকে আগত ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার ডকুমেন্টগুলি নষ্ট করে দেয়া হয়। টি.এ রোডে একজন ভিডিও করছিলেন এই ধ্বংসযজ্ঞের। বি.ডি.আর সেই ক্যাসেটের ফিতাও ছিড়ে ফেলেন প্রকাশ্যে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা শহর এক মৃতপুরীতে পরিণত হয়। কাক, চিল কা-কা করে উড়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে বারুদের গন্ধ। বাতাসের গতিও যেন থমকে গেছে। শহরের প্রধান প্রধান সড়কগুলি রক্তস্রোতে প্লাবিত। অলিতে গলিতে চলছে ছোটাছুটি, কান্নার রোল ধ্বনিত হচ্ছে সর্বত্র। একটি আতংকিত শিহরণে ছটফট করছে গোটা জনপদ। গুরুতর আহতদের দুই মাইক্রো বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সুচিকিৎসার আশায়

ঢাকার উদ্দেশ্যে। একজন ইমামকে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। পথিমধ্যে ঐ ইমাম সাহেবকে গ্রেফতার করে প্রেরণ করা হয় জেল হাজতে।

সেদিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নেমেছিল একাত্তরের ২৫শে মার্চের মত আরেক কালো রাত। বি.ডি.আর এর হর্ণ বাজানো টহল গাড়ীর আনাগোনা পরিবেশকে আরো করুণ এবং বেদনাবিধুর করে তোলে। চারিদিকে ধ্বনিতে হচ্ছে মৃত্যুর আলাপন। থেকে থেকে শিশুর আর্ত চিৎকার, নববধূ হারালো তার স্বামীকে, এতিম হলো শিমরাইলকান্দির ফুটফুটে শিশু জুনেদ সহ অনেকে'।[১০৮]

ব্রাহ্মণবাড়িয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে চারদলীয় ঐক্যজোট ৭ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহ্বান করে। ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি একই ইস্যুতে ৮ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী হরতাল পালন করে।

ইসলাম বিদ্বেষী আচরণ ও উলামা নির্যাতন

শেখ হাসিনার শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উভয় পরিচয়ের *উলামার* প্রতি কঠোর ও নির্মম আচরণ করা হয়। সরকারের ভেতরে এবং বাইরে থেকে সমর্থক-বুদ্ধিজীবী বামপন্থী ও ধর্মবিদ্বেষী শক্তিসমূহের মারমুখী ভূমিকার কারণে বাংলাদেশের সকল পর্যায়ের *উলামা* শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি নেতিবাচক অবস্থান গ্রহণে বাধ্য হন। রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে সরকার *উলামাকে* দমিয়ে রাখা অথবা সমূলে ধ্বংস করার চেষ্টা করে। বিপরীতে *উলামা* 'ঈমানী শক্তিতে' বলীয়ান হয়ে সরকারের ইসলাম ও *উলামা* বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করে। সাধারণভাবে বিশ্বাস করা হয়, বাংলাদেশের *উলামাকে* তালেবান-আল-কায়েদার সহযোগী ও উগ্র মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য অন্তর্ঘাতমূলক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে হত্যাকাণ্ডে শেখ হাসিনা সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা পালন করে বলে অভিযোগ ওঠে। বোমা হামলা ঘটনার অনিবার্য প্রক্রিয়ায় মামলা দায়ের ও জেল জুলুমের অসংখ্য ঘটনা ঘটতে থাকে। *উলামা* বিরোধী সরকারি আচরণের অংশ হিসেবেই ফতওয়া নিষিদ্ধকারী হাইকোর্টের রায়ের বিষয়ে সরকারের নির্লিপ্ততা, রায় বিরোধী আন্দোলনে *উলামার* বিরুদ্ধে সরকারের প্রত্যক্ষ অবস্থান গ্রহণ, পুলিশ কনস্টেবলের রহস্যপূর্ণ হত্যাকাণ্ড ও এর দায় অশীতিপরবৃদ্ধ *আলিমনেতা* শায়খুল হাদীসসহ *উলামার* ওপর চাপানো এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ঠাণ্ডা মাথায় হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের *উলামার* বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অব্যাহত দমন নীতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই শেখ হাসিনা সরকার সামগ্রিক কর্মকৌশলের মাধ্যমে ইসলামী নীতি, রীতি, প্রতীক, প্রতিষ্ঠান এবং *উলামা* বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে সে সব সরকারি ও সরকার সমর্থক ব্যক্তি-গোষ্ঠী-প্রতিষ্ঠান-সংগঠনসমূহের কার্যক্রম ও আচরণের একটি বাছাইকৃত বিবরণ তুলে ধরা হলো:

১. রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় আহূত ইমাম সম্মেলনে ২৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ইমামদের সার্টিফিকেট বিতরণকালে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারীকৃত ১৩টি আচরণবিধির ১টিতে '*আল্লাহু আকবর*' ধ্বনি দেয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[১০৯]

---

[১০৮] মোজাদ্দেদ হাসান তাদনান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১-৩২।

[১০৯] *দৈনিক সংগ্রাম*, ৪ মে ১৯৯৯।

২. আওয়ামী সরকারের আমলে মূর্তির (স্বরস্বতী দেবী) পায়ের নীচে কোরআনের আয়াত ছাপানো হয়েছে। ইসলামী ভার্সিটিতে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা হিন্দুদের 'বাণী অর্চনা' অনুষ্ঠানের দাওয়াত কার্ডে স্বরস্বতীর পায়ের নীচে কোরআনের আয়াত ছাপায়।[১১০]

৩. 'বাংলাদেশের স্রষ্টা কে?' ক) আল্লাহ খ) রাসুল গ) ফেরেশতা ঘ) বঙ্গবন্ধু, ময়মনসিংহের মুকুল বিদ্যানিকেতন উচ্চবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা ১৯৯৬-এর নবম শ্রেণীর ইসলাম ধর্মের নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে উপরোক্ত প্রশ্নটি করা হয়।[১১১]

৪. মুসলিম জাতির পিতা কে? ক) শেখ মুজিবর রহমান খ) ওমর (রা.) গ) ইব্রাহীম (আ.) ঘ) নূহ (আ.), এমনি একটি প্রশ্ন করা হয় ময়মনসিংহের আরেকটি স্কুলে।[১১২]

৫. মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাকের বই "বাংলা ভাষায় মুসলিম লেখক গ্রন্থপঞ্জি" শিরোনামের পাণ্ডুলিপি থেকে মুসলিম শব্দ বাদ না দেয়ায় বাংলা একাডেমী তা প্রত্যাখ্যান করে।[১১৩]

৬. আওয়ামী সরকারের আমলে বিভিন্ন স্থানে কোরআন শরীফ নর্দমায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২ জুন ১৯৯৯ মিরপুরে, ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০০ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০০ রাজশাহীতে উল্লেখযোগ্য।[১১৪]

৭. আওয়ামী ছাত্রলীগের ক্যাডাররা পবিত্র কোরআনকে পোড়াতে মোটেও দ্বিধা করেনি। এর মধ্যে বরিশাল ও মানিকগঞ্জে উল্লেখযোগ্য।[১১৫]

৮. ১৪ জুলাই ২০০০ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা অবিলম্বে সংবিধান থেকে 'বিস্‌মিল্লাহ' বাতিল করার দাবি জানান। উল্লেখ্য, ঐক্য পরিষদের নেতারা যেমন মেজর জেনারেল(অব.) সি আর দত্ত, নিমচন্দ্র ভৌমিক, বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্য আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবী হিসেবেই পরিচিত।[১১৬]

৯. কুমিল্লা জেলা যুবলীগের সভাপতি শহীদুল ইসলাম শাহীন ৯ একর ওয়াক্‌ফকৃত জমি দখলের উদ্দেশ্যে বাগিচাগাঁও এলাকায় প্রায় সোয়াশ' বছরের একটি পুরাতন মসজিদ ভেঙ্গে ফেলে দেয়। জনরোষ থেকে রক্ষার জন্য নামে মাত্র সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করে। এমনকি পুরাতন মসজিদ কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে জোরপূর্বক নতুন মসজিদ কমিটি গঠন করে সে এতে স্বঘোষিত সেক্রেটারী হয়।[১১৭]

১০. ১২ মার্চ ২০০১ গভীর রাতে ফেনীতে ছাত্রলীগ, যুবলীগ ক্যাডাররা শহরের দাউদপুর ব্রীজের দক্ষিণপার্শ্বে আরামবাগ এলাকায় তিন বছর আগে প্রতিষ্ঠিত একটি পাঞ্জেগানা মসজিদকে রাতারাতি গায়েব করে ফেলে। মসজিদটি খাস জমির উপর

---

[১১০] *দৈনিক সংগ্রাম*, ১৬ জানুয়ারী ১৯৯৯।
[১১১] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১২ ডিসেম্বর ১৯৯৬।
[১১২] *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৬।
[১১৩] *দৈনিক সংগ্রাম ও দৈনিক ইনকিলাব*, ৫ অক্টোবর ১৯৯৭।
[১১৪] *বিভিন্ন সংবাদপত্রের রিপোর্ট*।
[১১৫] *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ জুলাই ২০০০।
[১১৬] *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৫ জুলাই ২০০০।
[১১৭] *দৈনিক মানবজমিন*, ৯ নভেম্বর ২০০০।

প্রতিষ্ঠিত ছিল। জমিটি দখল করার জন্য আওয়ামী ক্যাডাররা সম্পূর্ণ মসজিদটিই রাতের আঁধারে গায়েব করে ফেলে।[১১৮]

১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জন্য নির্মিতব্য একটি আবাসিক হলের ডিজাইন থেকে মসজিদ বাদ দেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫শ' মুসলিম ছাত্রের জন্য ১০কোটি টাকা ব্যয়ে অমর একুশে নামে এই হলটি নির্মাণ করা হয়েছে। কার্জন হল সংলগ্ন পুরাতন জাদুঘরের পাশে নির্মিতব্য এই হলে মূল ডিজাইনার প্রকৌশলী নিশ্চিত করে বলেন, নতুন হলটির ডিজাইনে কোন মসজিদ নেই।[১১৯]

১২. ৬ জুন ২০০০ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের এক অনুষ্ঠানে আওয়ামী ঘরানার সংগঠন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্যপরিষদের নেতারা মুসলমানদের নামের আগে 'মোহাম্মদ' ও 'আলহাজ্ব' বাদ দেয়ার দাবি জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে আওয়ামী নেতা সি আর দত্ত, সুধাংশু শেখর হালদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।[১২০]

১৩. বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আলী আজগর হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে সন্ত্রাসী (নাউযুবিল্লাহ) হিসেবে আখ্যায়িত করে। জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এস কে সাদেক প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকলেও কোন প্রতিবাদ করেননি।[১২১]

১৪. আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরই প্রায় ৩০০টি মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দেয়। উচ্চতর প্রতিষ্ঠানে ইসলামিক হিস্ট্রি, ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় নতুন করে অনুমোদন প্রদান বন্ধ করে দিয়েছে। এসব বিষয়ে নতুন করে কোন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে না। ৬ জুলাই ১৯৯৯ দেশে ৩০০টি মাদ্রাসার অনুদান বন্ধের প্রতিবাদে সরকারি দল ও বিরোধী দলের মধ্যে জাতীয় সংসদে তুমুল বাকবিতণ্ডা হয়।[১২২]

১৫. আওয়ামী সরকার প্রতিটি হত্যাকাণ্ডে, যেমন যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে হত্যাকাণ্ড (৬ মার্চ, ১৯৯৯), কবি শামসুর রাহমানকে কথিত হত্যা প্রচেষ্টা (২ জানুয়ারী ১৯৯৯), কাজী আরেফ হত্যাকাণ্ড (৬ ফেব্রুয়ারী '৯৯), সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যাকাণ্ড, (১৬ জুলাই ২০০০), সিপিবি-র মহাসমাবেশে বোমা বিস্ফোরণে হত্যাকাণ্ড (২০ জানুয়ারী ২০০১), ১লা বৈশাখে রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণে হত্যাকাণ্ড (১৪ এপ্রিল ২০০১), আলেম ওলামাদের জড়িয়ে শতশত আলেম ওলামা ও ইসলাম পন্থীদের গ্রেফতার করেছে। এ পর্যন্ত সরকার ৩০ হাজার আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করেছে। অথচ এসব ঘটনার কোনটিতেই আলেম ওলামা বা ইসলামপন্থীরা জড়িত প্রমাণিত হয়নি।[১২৩]

১৬. ৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ হরতাল চলাকালে পুলিশ আলেম-ওলামা, দাঁড়ি-টুপিধারীদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালায়। ৪ ফেব্রুয়ারী ডেইলী স্টারে প্রকাশিত একটি চিত্রে

---

[১১৮] *দৈনিক মানবজমিন* ও *দৈনিক যুগান্তর*, ১৫ মার্চ ২০০১।

[১১৯] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৬ নভেম্বর ১৯৯৯।

[১২০] *দৈনিক যুগান্তর* ও *দৈনিক ইনকিলাব*, ৭ জুন ২০০০।

[১২১] *সংবাদ ভাষ্য*।

[১২২] *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৭ আগস্ট, ১৯৯৯ ও *দৈনিক দিনকাল*, ৭ জুলাই ১৯৯৯।

[১২৩] *দৈনিক দিনকাল*, ২৫ মার্চ ২০০১।

দেখা যায়, পুলিশ একজন আলেমকে উলঙ্গ করে পিচঢালা রাস্তায় টেনে হেচড়ে নিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ বায়তুল মোকররম মসজিদের *"আল্লাহু আকবার"* লেখা লোগোতে টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে। আরেক দল পুলিশ বুট জুতা পায়ে বীরদর্পে মসজিদ থেকে বের হচ্ছে।[১২৪]

১৭. চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে হঠাৎ করে কোন কারণ ছাড়াই পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত ও তাফসীর বন্ধ করে দেয়া হয়।[১২৫]

১৮. ৩১ অক্টোবর'৯৬ বায়তুল মুকাররম মসজিদের খতিবের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী করা হয়। মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে এক সমাবেশে বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের সহযোগী ইনুপন্থী জাসদ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহিল কাইয়ুম তার বিরুদ্ধে সিএমএম আদালতে একটি নালিসী মামলা দায়ের করে।[১২৬]

১৯. ২৮ জানুয়ারী ২০০১ শেখ মুজিবের নামে কটুক্তি করার মিথ্যা অজুহাতে যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা ফরিদপুর সদর থানার বায়তুল মোকাদ্দাস জামে মসজিদের ইমাম হাফেজ মাওলানা নুরুল ইসলামকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করে। এর পর তারা ইমামকে পুলিশে সোপর্দ করে।[১২৭]

২০. আ'লীগ সরকার জনগণের নিরাপত্তা দানে ব্যর্থ হলেও পেটোয়া বাহিনী দিয়ে তাফসীর মাহফিল, সীরাত মাহফিল, ওয়াজ মাহফিলে ১৪৪ ধারা জারি করতে বড়ই পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছে। এর মধ্যে প্রখ্যাত আলেম মাওলানা দেলওয়ার হোসাইন সাঈদীর ১১ নভেম্বর ২০০০ চট্টগ্রাম ও ১৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ ফরিদপুরের তাফসীর মাহফিল নিষিদ্ধ উলেখযোগ্য।[১২৮]

২১.ধর্ম ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের কারণে ১৯৯৮ সাল থেকে ১৯৯৯ সালে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্ব যাত্রীদের সংখ্যা ১ হাজার ৪১ জন কম হয়। মক্কা শরীফে বাড়ী ভাড়ার নামে হাজীদের টাকা আত্মসাৎ, হেরেম শরীফের বহু দূরে দুর্গম পাহাড়ের ওপর কষ্টকর যাতায়াত, মোটা অংকের ফি দেয়ার পরও হজ্ব অনুষ্ঠানে মোয়াল্লেমদের গাফিলতিসহ নানা অনিয়মের ফলে সরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ্বযাত্রী সংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।[১২৯]

২২. পশ্চিমবঙ্গের অনুকরণে (সেখানে মাইকে আযান দেয়া নিষিদ্ধ) রমযানের সময়ই নীলফামারীতে মাইক ব্যবহার করে রোযাদারদের ডাকানো নিষিদ্ধ করা হয়। নীলফামারী জেলা প্রশাসন এই নিষেধাজ্ঞা জারী করে।[১৩০]

২৩. চট্টগ্রাম ইসলামী সমাজকল্যাণ পরিষদ আয়োজিত ঐতিহাসিক তাফসীর মাহফিল বন্ধের ষড়যন্ত্র করে সরকার। এর জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে। ১০ নভেম্বর শুক্রবার

---

[১২৪] *দৈনিক মানবজমিন*, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১।

[১২৫] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৯ অক্টোবর ১৯৯৬।

[১২৬] *দৈনিক সংগ্রাম*, ১ নভেম্বর ১৯৯৬।

[১২৭] *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৯ জানুয়ারী ২০০১।

[১২৮] *দৈনিক যুগান্তর*, ১২ নভেম্বর ২০০০ ও *দৈনিক মানবজমিন*, ১৪ ফেব্রুয়ারী ২০০১।

[১২৯] *দৈনিক দিনকাল*, ২০ ফেব্রুয়ারী ২০০০।

[১৩০] *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৯।

মুসল্লিরা এর প্রতিবাদে বিভিন্ন মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠি চার্জ করে। এক পর্যায়ে পুলিশ বুট-জুতা পড়ে চট্টগ্রামের প্রধান মসজিদ আন্দরকিল্লা শাহী মসজিদে প্রবেশ করে বহু নিরীহ মুসল্লিকে গ্রেফতার করে।[১৩১]

২৪. ২৭ মার্চ ২০০১ প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা ডাক্তার এস এ মালেক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে রমনা কালিমন্দির ও আনন্দময়ী আশ্রম নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে আওয়ামী নেতা শ্রী শুধাংশু শেখর হালদার হুংকার দিয়ে বলেন, ফতোয়াবাজদের (ইসলামপন্থীদের) আমরা সাগরে চুবিয়ে মারবই। তাদের নিশ্চিহ্ন করতে না পারলে কালীমাতা জাগবে না।[১৩২]

২৫. আওয়ামী সরকার অন্যায়ভাবে দেশবরেণ্য ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম-এ-দ্বীন মাওলানা ওবায়দুল হককে বায়তুল মোকররম জাতীয় মসজিদের খতিব পদ থেকে অব্যাহতি দেয় ২২ এপ্রিল ২০০১। তার অব্যাহতি পত্রে বলা হয় বয়স ৭৩ বছর তাই তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। অথচ পূর্বের সকল খতিবই আমৃত্যু স্বপদে বহাল ছিলেন। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক নিয়োগকৃত খতিবকে কাদিয়ানী সমর্থক মাওলানা (?) আব্দুল আউয়াল এর স্বাক্ষরে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পরে জনতার দাবিতে এবং আদালতের রায়ে সরকার নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং তিনি স্বপদে ফিরে আসেন।[১৩৩]

২৬. ২২ জুলাই ২০০০ ঢাকার ইস্টার্ণ প্লাজা মসজিদের খতিব ও ঢাকা জেলা ইমাম সমিতির সেক্রেটারী হাফেজ মাসুদুর রহমানকে ছাত্রলীগের ক্যাডাররা শিবির কর্মী সন্দেহে মারপিট করে হাত-পা ভেঙ্গে দেয়।[১৩৪]

২৭. আওয়ামী সন্ত্রাসীরা কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার শ্রীপুরের মান্দারিয়া ছালেহীয়া দারুছ্ছুন্নাহ এতিমখানাটি আগুনে পুড়িয়ে দেয়। স্থানীয় লোকদের মতে, এলাকার কুখ্যাত সন্ত্রাসী কামালের নেতৃত্বে একদল যুবক এতিমখানাটিতে অগ্নিসংযোগ করলে ৩টি ঘর, মাদ্রাসার গুদামে ৫০মণ চালসহ প্রায় দশ লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।[১৩৫]

২৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে জাতীয় কবি কাজী নজরুলের মাজার। কবির বিখ্যাত উক্ত 'মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই'। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে দাফন করা হয়। কবরের ফলকে উৎকীর্ণ ছিল সেই বিখ্যাত উক্তি "মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিও ভাই। যেন গোরে থেকেও মুয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই"। আওয়ামী সরকার ক্ষমতায় আসর পর ১৯৯৯ সালের ২৫মে উক্ত ফলক ভেঙ্গে নতুন একটি ফলক নির্মাণ করে যাতে কবির ঐ কবিতাটি স্থান পায়নি।[১৩৬]

---

[১৩১] *দৈনিক যুগান্তর* ও *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১ নভেম্বর ২০০০।

[১৩২] *দৈনিক যুগান্তর* ও *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৮ মার্চ ২০০১।

[১৩৩] *দৈনিক সংগ্রাম* ও *দৈনিক যুগান্তর*, ২৩ এপ্রিল ২০০১।

[১৩৪] *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ জুলাই ২০০০।

[১৩৫] *দৈনিক আজকের কাগজ*, ১৪ মে ২০০১।

[১৩৬] *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৩ মে ২০০১।

২৯. বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সম্প্রীতির দেশ। শত শত বছর যাবত এ দেশে হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা প্রতিবেশী হিসাবে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছে। আওয়ামী লীগ কল্পিত মৌলবাদের দানব আবিস্কার করে মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে। মৌলবাদ কথাটা খৃষ্ট ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট, ইসলামে এর কোন স্থান নেই। মৌলবাদের কল্পিত দানব বধ করার জন্য বাংলাদেশে মৌলবাদীদের ঘাঁটি গড়ে উঠেছে মর্মে অব্যাহত মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমা প্রভূদের খুশী করার জন্য মৌলবাদ আতংক ছড়িয়ে দিয়ে শেখ হাসিনার সরকার বাংলাদেশের উদার ভাবমূর্তিকেই বিনষ্ট করেছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরের সময় নানা মিথ্যা তথ্য সম্বলিত মৌলবাদের উদ্বেগজনক বিস্তার লাভের অলিক কাহিনী সম্বলিত পুস্তিকা বিতরণ করা হয়।[১৩৭]

৩০. আল্লাহ, রাসূল (দঃ), নামাজ, বেহেস্তসহ বিভিন্ন ইসলামী বিধি বিধানকে কটাক্ষকারিণী, জরায়ুর স্বাধীনতার দাবিদার, বাংলাদেশের সীমানা মুছে ফেলার প্রত্যাশী মুরতাদ তসলিমা নাসরীনকে সমর্থন সহযোগিতা যুগিয়েছে আওয়ামী ঘরানার বুদ্ধিজীবীগণ। এমনকি ধর্মদ্রোহী তসলিমার বিরুদ্ধে তৌহিদী জনতা কর্তৃক আহূত ৩০ জুন ১৯৯৪ সালের হরতালকে প্রতিরোধের ঘোষণা দিয়েছিল আওয়ামী মন্ত্রী ও প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক। চরম ইসলাম বিদ্বেষী লেখিকা তসলিমা নাসরীন আওয়ামী সরকার ও তাদের বুদ্ধিজীবী সাঙ্গপাঙ্গদের সহযোগিতায় ৮ আগস্ট বাংলাদেশে প্রবেশ করে। পরে অবশ্য জনতার প্রবল আপত্তির মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।[১৩৮]

৩১. ***মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি বেশ্যার খদ্দের আহ্বানের সমতুল্য*** কবিতাংশের কবি শ্যামসুর রাহমান আওয়ামীলীগের কাছে অঘোষিত জাতীয় কবি। ***'দীর্ঘক্ষণ আযান অসহ্য'*** আখ্যায়িতকারী কবির চৌধুরীকে আওয়ামী সরকার *জাতীয় অধ্যাপক* করে পুরস্কৃত করেছে। অথচ *জাতীয় অধ্যাপক* ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ-এর মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে কোন প্রকার *শোকবাণীও* প্রদান করা হয়নি।

৩২. এককালে ঢাকাকে বলা হত 'মসজিদের নগরী'। আওয়ামী সরকার এখানে অসংখ্য মূর্তি স্থাপন করে 'মসজিদের নগরী'কে আজ 'মূর্তির নগরী'তে রূপান্তরিত করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপন করেছে জোড় মূর্তি, গুচ্ছ মূর্তি, রাজুর ভাস্কর্য, বিবেকানন্দ মূর্তি, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি প্রভৃতি। তারা ৩৬০টি মূর্তি স্থাপন করতে চায়। অথচ আমাদের মহানবী (দ.) ৩৬০টি মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছিলেন।[১৩৯]

৩৩. এই সরকার 'ভেলেন্টাইনস ডে'র মতো ইসলাম বিরোধী বেহায়া অনুষ্ঠানকে উৎসাহ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারী ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং আ'লীগ সরকারের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবাইদুল কাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে এক অনুষ্ঠানে বলেন, "মনিকা-ক্লিনটন প্রেম অমর হোক"।[১৪০]

---

[১৩৭] *দৈনিক মানবজমিন*, ১৭ জুলাই ২০০১।

[১৩৮] *দৈনিক ইনকিলাব*, ৯ আগস্ট ১৯৯৬।

[১৩৯] *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্যাগাজিন* ২০০১।

[১৪০] *দৈনিক ভোরের কাগজ* ও *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯।

৩৪. ২৮ জানুয়ারী ১৯৯৯ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর দিলীপ কুমার সিনহা এক অনুষ্ঠানে হিন্দুদের মতো শেখ হাসিনাকে সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠানটির পাঠ শুরু হয় 'ওঁম শান্তি' 'ওঁম শান্তি' উচ্চারণের মাধ্যমে। (২৮ জানুয়ারী ১৯৯৯ *বাংলাদেশ টেলিভিশন অুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করে)*।

৩৫. ২০ নভেম্বর ১৯৯৯-৮৮ বছর বয়সে সুফিয়া কালাম ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর ৩ দিন পর ২৪ নভেম্বর দাফন করা হয়। ২৩ নভেম্বর দিবাগত রাত ছিল পবিত্র শবেবরাত এবং ২৪ নভেম্বর সরকারি ছুটি। কিন্তু ২৪ নভেম্বরকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করে সরকার শবে বরাতের পবিত্রতাকে ক্ষুন্ন করে।[১৪১]

৩৬. এই সরকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে রাখার জন্য পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামী শব্দ যেমন আল্লাহ, রাসুল (সা.) তুলে ফেলে। এমনকি হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনী যা অতীতে নবম ও দশম শ্রেণীর সিলেবাসে ছিল তা বাদ দেয়া হয়েছে। আর তার জন্যই জাতীয় টেক্সট্‌বুক বোর্ডে বসানো হয়েছে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোককে।

৩৭. ইসলামিয়াতে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ৫০ নম্বর করার সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। পরে জনতার প্রবল আন্দোলনে তা সরকার বাতিল করতে বাধ্য হয়।[১৪২]

৩৮. শেখ হাসিনা সরকার চালুকৃত ইসলাম বিরোধী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের উল্লেখযোগ্য দিক হল:
প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার স্তর হবে সম্পূর্ণ ধর্মের প্রভাব মুক্ত। (অধ্যায় ৪, ৬)।
মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোন ধর্ম শিক্ষা থাকবে না।
নবম ও দশম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেও ধর্ম শিক্ষা নেওয়া যাবে না (অধ্যায় ৮, ১১)।[১৪৩]

শেখ হাসিনা শাসনামলে টুপি-দাঁড়িধারী ব্যক্তিদের রাজাকার, মৌলবাদী, স্বাধীনতা বিরোধী আখ্যা দিয়ে সরকার সমর্থক বিভিন্ন পর্যায়ের সন্ত্রাসী ও ক্যাডার নাজেহাল-নির্যাতন করেছে। এমনি বাস্তবতায় ৫১১ জন আলিমের একটি বিবৃতি বিভিন্ন দৈনিকে ছাপা হয়:

> 'দেশের ৫১১জন বিশিষ্ট আলেম টুপি-দাঁড়ি ও পাঞ্জাবী পরিধানকারীদের নিরাপত্তা চেয়ে এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন। তারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, মোহাম্মদপুরের কনস্টেবল বাদশা মিয়া হত্যার সঙ্গে আলেম-ওলামা ও মাদ্রাসার ছাত্রদের জড়িয়ে এখন বিভিন্ন স্থানে টুপি-দাঁড়ি ও পাঞ্জাবী পরিধানকারীদের যত্রতত্র গ্রেফতার করে জুলুম-নির্যাতন করা হচ্ছে। একের দোষে অন্যকে লাঞ্ছিত করা সভ্য সমাজের কাজ হতে পারে না। আলেমগণ অত্যন্ত দুঃখ করে বলেন, সরকারের ভূমিকা দেখে মনে হয় সরকার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই বাদশাহ্ মিয়াকে হত্যা করেছে ইসলামী লেবাসধারীদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য। অন্যথায় খুন হয়েছে মোহাম্মদপুরে অথচ সরকার হিংসার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে দেশব্যাপী।

---

[১৪১] *দৈনিক প্রথম আলো* ও *দৈনিক ইনকিলাব*, ২২ নভেম্বর ১৯৯৯।
[১৪২] *দৈনিক ইনকিলাব*, ২৪ আগস্ট ১৯৯৬।
[১৪৩] ড. মাহবুব উল্লাহ ও অন্য সম্পাদকবৃন্দ, ২০০১, পৃ. ৭৩-৮৩।

আলেমগণ বলেন, আমরা সাধারণ টুপি-দাঁড়িওয়ালাদের নিরাপত্তা চাই। অপরদিকে তারা বলেন, বিভিন্ন দৈনিকে ১৬৫ ও ১১০ জন আলেমের বিবৃতি "চরমোনাই পীর সাহেব, মুফতি আমিনী ও শায়খুল হাদিসের ফাঁসি চাই" আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। দেশের শ্রদ্ধাভাজন আলেম-ওলামাদের ফাঁসি দাবি করা কোন মুসলমানের কাজ হতে পারে না। তারা বলেন, আলেম নামধারী এহেন বিবৃতিদানকারীরা ক্ষমতাসীনদেরই তল্পীবাহক। তা না হলে কোন আলেম হাক্কানী আলেমদের ফাঁসি চাইতে পারে না। তারা এ রকম বক্তব্য-বিবৃতি থেকে বিরত থাকার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী আলেমগণ হলেন: মাওলানা মকবুল হোসাইন, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল কাইয়ুম, মাওলানা নেছারউদ্দিন, মাওলানা নূর হোসেন, মাওলানা কেফায়াতুল্লাহ কাশপী, মাওলানা মুহিউদ্দিন, মাওলানা সারোয়ার হোসেন, মাওলানা ইদ্রিস, মাওলানা মোস্তফা কামাল, মাওলানা আফছার উদ্দিন প্রমুখ'।[১৪৪]

কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী আইন প্রণয়ন না করার জাতীয় ঐকমত্য

হাইকোর্টের ফতওয়া নিষিদ্ধকারী রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের *উলামা* নিজেদের মাঝে ব্যাপক ঐক্য ও সংহতি গড়ে তুলতে সক্ষম হন এবং কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলাম পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন না করার বিষয়ে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নিকট থেকে নীতিগত অঙ্গীকার আদায়ে সুস্পষ্ট সাফল্য অর্জন করেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ফতওয়া নিষিদ্ধকারী হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য দলীয় অবস্থান গ্রহণ না করলেও দলটির নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন পর্যায়ে ঘোষণা করতে থাকেন, আওয়ামী লীগ কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করবে না। দলটির জাতীয় নির্বাচনের (অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ১ অক্টোবর ২০০১) জন্য প্রণীত ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণায় আওয়ামী লীগ আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্গীকার করে, *দলটি পুনরায় শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন করবে না*। অন্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিএনপি, জাতীয় পার্টি (৩ গ্রুপ: সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদ, সাবেক মন্ত্রী নাজিউর রহমান মঞ্জুর এবং সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু-র নেতৃত্বে) ও মুসলিম লীগ নিজ নিজ নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো বা ঘোষণায় *ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়ন না করার ঘোষণা* প্রদান করে। ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো অনেকটা 'স্বাভাবিক ঘোষণা' হিসেবেই নির্বাচিত হলে 'ইসলামী শরীয়ত' অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করে বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ইসলামী কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিএনপি বেশ আগে থেকেই 'সরকার বিরোধী জোট' হিসেবে 'চারদলীয় জোট' গঠনে আগ্রহী হয় ও জোটভিত্তিক আন্দোলনে সক্রিয় থাকে। এ চারদলীয় জোটে প্রথমে সাবেক প্রেসিডেন্ট এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি শরীক ছিলো। পরে ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনা সরকারের সাথে 'সমঝোতা' বিষয়ক জটিলতায় এরশাদ নেতৃত্বের জাতীয় পার্টি চারদলীয় জোট ত্যাগ করলে দলটির মহাসচিব নাজিউর

---

[১৪৪] *'মজলিস সংবাদ'*, বিশেষ সংখ্যা, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুখপত্র, ঢাকা, মে ২০০১, পৃ. ৩৩।

রহমান মঞ্জুর-এর নেতৃত্বে দলটির একটি অংশ চারদলীয় জোটে থেকে যায় 'জাতীয় পার্টি' নামে। পরে এর নাম রাখা হয় বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বিজেপি)। চারদলীয় জোটের শরীক অন্য দু'টি দল হলো জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ঐক্যজোট। ইসলামী ঐক্যজোট বাস্তবে স্বয়ং কয়েকটি ইসলামী দল ও গোষ্ঠীর মিলিত জোট। এতে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, ফরায়েজী আন্দোলন, ইসলামী মোর্চা প্রভৃতি ইসলামপন্থী দল ও গোষ্ঠী যুক্ত হয়েছিলো। চারদলীয় জোট ২০০১ সালের ১অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনেও জোটগতভাবে অংশ নেয় এবং দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে জয়লাভ করে। এরশাদের নেতৃত্বের জাতীয় পার্টি আরেকটি ইসলামী দল 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের' সাথে মিলে 'ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট' নামে একটি নির্বাচনী জোট গঠন করে। এ নির্বাচনী জোটটি ক্ষমতা পেলে ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার ঘোষণা প্রদান করে। নির্বাচনী ফলাফলে অবশ্য দেখা যায়, দু'দলের এ নির্বাচনী জোটটির কেবল জাতীয় পার্টি মনোনীত ১৪জন প্রার্থীই বিজয়ী হয়েছেন এবং *চরমোনাই-র পীর* হিসেবে খ্যাত মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীমের নেতৃত্বাধীন ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কোনো প্রার্থী জয়ী হতে পারেননি।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক এবং ভাষ্যকারগণ মনে করেন, চারদলীয় জোট প্রার্থীদের এবং নির্দিষ্টভাবে বিএনপি দলীয় প্রার্থীদের ব্যাপক বিজয়ের পেছনে ক্ষমতাসীন অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যাপক ও নির্মম *উলামা* বিরোধী নির্যাতনমূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আর আওয়ামী লীগ সরকারের *উলামা* বিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সর্বোচ্চ মাত্রার ত্যাগ স্বীকার করে ইসলামী ঐক্যজোটভুক্ত দল ও গোষ্ঠীসমূহ এবং নির্দিষ্টভাবে শায়খুল হাদীসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও ইসলামী ছাত্র মজলিস এবং মুফতি আমিনী-মাওলানা মুহিউদ্দীন খানের নেতৃত্বে ইসলামী মোর্চা।

সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ

বাংলাদেশে *উলামার* রাজনৈতিক *ভূমিকা* বিষয়ে এ পর্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা যায়। বর্তমান গবেষণাকর্মের প্রস্তাবনাতেই বলা হয়েছে, ***উলামার* রাজনীতি সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম ও আচরণকেই রাজনীতিতে এ *উলামার ভূমিকা*** হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। সে বিবেচনায় বাংলাদেশের *উলামার* 'রাজনৈতিক ভূমিকার' একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপন বেশ কঠিন এবং সময় ও শ্রমসাধ্য কাজ হবে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে *উলামার প্রভাব* বিস্তারের ইস্যু ও বিষয়গুলোর মোটামুটি একটি পূর্ণ চিত্র এখানে উপস্থাপিত হয়েছে। এ কাজের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, **বাংলাদেশের সরকার ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে উলামার যে কোনো মাত্রার 'গম্যতা'কে রাজনীতিতে উলামার প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা হবে।** সে নিরীখে বাংলাদেশের সরকারসমূহ ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে

বাংলাদেশের উলামার প্রভাব বিস্তারের উল্লেখযোগ্য সব ক'টি ক্ষেত্র ও বিষয়ের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা বর্তমান গবেষণাকর্মে পাওয়া যাবে।

শেখ মুজিব শাসনামলে সরকার ও শাসক দলের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে *উলামার* প্রত্যক্ষ *প্রভাব* চিহ্নিত করা যায়নি। দালাল আইন প্রত্যাহার, মাদ্রাসাগুলোকে সক্রিয় হতে সাহায্য করা, রেডিও-টিভিতে পুনরায় কুরআন তেলাওয়াত চালু করা, ইসলামিক একাডেমিকে কাজ করতে দেয়া ও পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, ওআইসি-র সদস্য পদ গ্রহণ প্রভৃতি ইস্যু ও ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ *আলিমের* নাম আলোচিত হলেও এ সব ক্ষেত্র ও ইস্যুতে তাদের কাউকে *প্রভাবক* হিসেবে নির্দিষ্টভাবে কোনো পক্ষ থেকে স্বীকার করা হয়নি অথবা দাবি করা হয়নি। তবে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে *আশুরার ছুটি চালুসহ* কয়েকটি ইস্যুতে *প্রভাবক* হিসেবে দাবি করা হয়েছে।

জিয়াউর রহমান শাসনামলে বেশ কিছু ক্ষেত্র ও ইস্যুতে রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও ক্ষমতাসীন দলের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বাংলাদেশের *উলামার* প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট *প্রভাব* চিহ্নিত করা গেছে।

সংবিধানের *প্রস্তাবনায়* 'বিসমিল্লাহ' সংযোজন এবং *তিনটি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি* পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম *প্রভাবকের* ভূমিকায় ছিলেন বলে দাবি করা হয়।[১৪৫] ক্ষমতায় আসীন হবার স্বল্প ব্যবধানেই জেনারেল জিয়ার সাথে ১৯৭৫ সালের ২৪ নভেম্বর অন্য চারজন রাজনীতিকসহ মাওলানা আবদুর রহীম সাক্ষাতের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং তিনি সে দফাসহ জেনারেল জিয়ার সাথে সাক্ষাতের প্রতিটি সুযোগেই সংবিধানের এ সব সংশোধনের বিষয়ে তার অভিমত প্রয়োজনীয় গুরুত্বসহ উপস্থাপন করেছেন এবং ফলত কাঙ্খিত সাংবিধানিক সংশোধনী সম্পন্ন হয়েছে।

১৯৭৬ সালের রাজনৈতিক দলবিধিতে ধর্মভিত্তিক তথা ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল গঠনে নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা না থাকার ক্ষেত্রে মাওলানা আবদুর রহীমের পরোক্ষ *প্রভাবের* কথা স্বীকার করা হয়।

ঢাকা জিপিও-র নিকটবর্তী (জিরো পয়েন্ট/শহীদ নূর হোসেন চত্বর) রোড আইল্যান্ডে ১৯৭৭ সালের প্রথমার্ধে একটি মূর্তি (ভাস্কর্য) নির্মাণের সরকারি প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে অন্য *উলামার* পাশাপাশি মাওলানা আবদুর রহীম *প্রভাবকের* ভূমিকা পালন করেন।

দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে মাওলানা আবদুর রহীম অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ ও তা' থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে *মাথা নত* করার চলমান রীতির প্রতিবাদ ও বিরোধিতা করেন এবং এ প্রশ্নে 'ইসলামী রীতি' ('সালাম' জানিয়ে প্রবেশ করা) মান্য ও

---

[১৪৫] নূর হোসেন মজিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১-১৬২।

চালু করায় তাকে ও তার অনুগামীদের কোনো 'প্রশ্ন করা' থেকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বিরত রাখতে সক্ষম হন।

জাতীয় সংসদের সদস্য ও অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে সংসদ অধিবেশনে মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য 'দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা' পালনের চলমান রীতির সাথে (অথবা পরিবর্তে) মৃতের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মুনাজাত করার 'ইসলামী রীতি' চালু ও বাস্তবায়নে মাওলানা আবদুর রহীম *সফল* হয়েছিলেন।

জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলাকালে নামাজের সময় হলে 'নামাজের বিরতি' প্রদান ও 'আজান দিয়ে' জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের রীতি প্রচলনে মাওলানা আবদুর রহীম *সফল* হয়েছিলেন। জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরুর জন্য কুরআন তেলওয়াত করা এবং এ জন্য নির্দিষ্ট উপযুক্ত ব্যক্তি*(ক্বারী)* নিয়োগের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাওলানা আবদুর রহীম *সক্ষম* হয়েছিলেন।

জিয়াউর রহমান শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ বৃদ্ধি ও মাদ্রাসার 'দাখিল' শ্রেণীর মানোন্নয়নের সরকারি নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাওলানা এম এ মান্নান *প্রভাবকের* ভূমিকা পালন করেন বলে দাবি করা হয়। হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ শাসনামলে ইসলামকে *রাষ্ট্রধর্ম* ঘোষণা করা ও মাদ্রাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মাওলানা এম এ মান্নান ও শর্ষিনার মরহুম পীর মাওলানা আবু জাফর ছালেহ *প্রভাব* বিস্তার করেন বলে স্বীকার করা হয়।

খালেদা জিয়ার শাসনামলে (১৯৯১-১৯৯৬) রাষ্ট্রীয়-সরকারি বা শাসকদলের কোনো নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে *উলামার* প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট *প্রভাব* বিস্তারের তেমন কোনো দাবি করা হয় না। বাবরী মসজিদ ধ্বংসের প্রতিবাদে *লংমার্চ* করা এবং তসলিমা নাসরিনের 'ধর্মদ্রোহী-রাষ্ট্রদ্রোহী' লেখালেখির প্রতিবাদে আন্দোলন করাই এ সময়ে বাংলাদেশের *উলামার* প্রধান *ভূমিকা* হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

শেখ হাসিনা শাসনামলে (১৯৯৬-২০০১) দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কুরআন-সুন্নাহ বা ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়ন না করার অঙ্গীকার ঘোষণার ক্ষেত্রে এ দেশের *উলামা* যৌথভাবে *প্রভাবকের* ভূমিকা পালন করেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়
রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়া ও বাংলাদেশের আলিমসমাজঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ অঞ্চলের রাজনীতিতে *উলামার* ভূমিকা বিভিন্ন মাত্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অব্যাহতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। *উলামার* রাজনৈতিক *ভূমিকা*ও এ সময়ে বেশ উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে। রাজনৈতিক ভূমিকার ক্ষেত্রে *উলামা* এ অঞ্চলে কখনো শীর্ষ শাসকদের আনুকূল্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের চূড়ান্ত স্তরে অবস্থান করেছেন, আবার কখনো এ *উলামা* রাজনৈতিক কার্যক্রম থেকে প্রচুর ব্যবধানে 'লোক চক্ষুর অন্তরালে' জ্ঞান সাধনা ও তাওহীদের[১] শিক্ষণ-প্রশিক্ষণে ব্যাপৃত থেকেছেন। সম্রাট আকবরের পূর্বকালে *উলামা* রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের শিখরে অবস্থান করেছেন। সম্রাট আকবর *উলামার* বিরুদ্ধে নির্যাতন চালিয়েছেন এবং সব ধরনের সুবিধা থেকে *উলামা*কে বঞ্চিত করেছেন। এ অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে। তিনি *উলামা*কে পুনরায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার পাদ প্রদীপে তুলে আনেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসনামলে *উলামা* ক্রমশ নির্যাতিত হয়ে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এতে ব্যর্থ হবার পর তীব্র রাষ্ট্রীয় দমন-নিপীড়নের মুখে *উলামা* ক্রমশ নিজেকে গুটিয়ে নেন এবং 'দেওবন্দ ধারার' প্রবর্তন করেন। এই দেওবন্দ ধারা থেকেই ১৯১৯ সালে পুনরায় গঠিত হয় রাজনীতি সচেতন *উলামার* সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ এবং বৃটিশ-ভারত বিভক্তির কিছু আগে, ১৯৪৫ সালে, গঠিত হয় জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম। অবশ্য ইতোমধ্যে, ১৯৪১ সালে, পুরোপুরি রাজনৈতিক দলের আকারে এক *আলিমের* নেতৃত্বে গঠিত হয় জামায়াতে ইসলামী হিন্দ। বৃটিশ-ভারত বিভক্তির কিছু আগে-পরে পুরো উপমহাদেশ জুড়ে এবং নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশ অঞ্চলে রাজনীতিতে *উলামার* ব্যাপক সক্রিয়তা ও নেতৃত্ব লক্ষ্য করা যায়। অবিভক্ত পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ অঞ্চলে *উলামার* রাজনৈতিক ভূমিকা ক্রমশ গৌণ হতে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন অচিন্ত্যপূর্ব বাস্তবতায় হতবিহ্বল ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় *উলামা* পুনরায় অরাজনৈতিক নীরবতা অবলম্বন করেন। হাতে গোণা কিছু ক্ষেত্রে অতি নগণ্য সংখ্যক *আলিম* কার্যত সক্রিয় নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেন। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের শেখ মুজিব শাসনামলে *উলামা* কার্যকর রাজনৈতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে সক্ষম হননি। জিয়াউর রহমান শাসনামল থেকে *উলামার* রাজনৈতিক সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় এবং তা ক্রমশ দৃঢ়তা অর্জন করে। ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে এই *উলামা* চারদলীয় জোট সরকারের অন্যতম শরীকে পরিণত হয়। এটি বাংলাদেশের *উলামার* দ্রুত অগ্রগতি হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। আবার কেউ একে অপর্যাপ্ত অর্জন হিসেবেও বিবেচনা করতে পারেন।

---

১ শাব্দিক অর্থ একত্ববাদ। আল্লাহ-ই একমাত্র স্রষ্টা-এ বিশ্বাসের নাম তাওহীদ।

রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশী উলামার সমস্যা

২০০১ সালে এসে রাজনীতিতে *উলামার* অর্জনকে যারা অপর্যাপ্ত বিবেচনা করেন, তারা বাংলাদেশের *উলামার* কিছু সমস্যা চিহ্নিত করে থাকেন। সমস্যাগুলো হলোঃ

ক. যুগ সচেতনতার অভাব,
খ. রাজনীতি সচেতনতার অভাব,
গ. প্রযুক্তি সচেতনতা ও এর ব্যবহারে উদাসীনতা,
ঘ. সাংগঠনিক দুর্বলতা,
ঙ. সামর্থ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব,
চ. হঠকারী ও চরমপন্থী মনোভাবের অস্তিত্ব,
ছ. অগ্রাধিকার নির্ধারণে উদাসীনতা,
জ. ব্যাপক গণসম্পৃক্ততার অভাব,
ঝ. আধুনিক শ্রেণীর ভীতি ও ভুল ধারণা,
ঞ. বুদ্ধিজীবীদের সাথে সমন্বয়ের অভাব,
ট. শিক্ষা ও আন্দোলনে নারী সম্পৃক্ততায় অবহেলা,
ঠ. সংখ্যালঘুর ভুল ধারণা,
ড. বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উদাসীনতা,
ঢ. গণমাধ্যমে স্বল্প প্রবেশাধিকার,
ণ. নেতৃত্বে 'অর্জন নীতি' বিষয়ে অবহেলা,
ত. যুক্তির বদলে আবেগের প্রাধান্য,
থ. দায়িত্বের পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণে অবহেলা,
দ. ক্ষুদ্র 'মাসয়ালাহ' বা প্রশ্ন বিষয়ে অনৈক্য,
ধ. জনগণের চলতি সমস্যা বিষয়ে উদাসীনতা,
ন. বৈষয়িক সমর্থন-যোগানের অভাব,
প. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অতিরঞ্জিত প্রচারণার যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক জবাবদানে উদাসীনতা ও
ফ. কার্যকর-টেকসই জোট গঠনে ব্যর্থতা।

ক. যুগ সচেতনতার অভাব

বাংলাদেশের *উলামার* যুগ সচেতনতার অভাবের বিষয়টিকে একজন গবেষক-রাজনীতিক যথার্থ ও ঋজু উচ্চারণে বলেছেন 'যুগের সমস্যা, দাবি, যুগ মানস, যুগের জটিলতা ও যুগ পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব'।[২] বাংলাদেশের *উলামা* কুরআন ও হাদীস এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির চর্চা পর্যাপ্ত করেননি এবং করছেন না-এমন অভিযোগ সচরাচর উত্থাপিত হয় না। প্রশ্ন উত্থাপিত হয় কুরআন-হাদীস তথা ইসলামী শরীয়াহ-র বিধানাবলীর সময়োপযোগী ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়নের প্রয়োজনে বাংলাদেশের *উলামার* মাঝে

---

[২] অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

'যুগের সমস্যা, দাবি, যুগ মানস, যুগের জটিলতা ও যুগ পরিস্থিতি' সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও ধারণা আছে কি-না এ বিষয়ে। এমন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় বাংলাদেশের *উলামার* পাঠ্য তালিকা দেখে, কর্মকৌশল পর্যবেক্ষণ করে এবং ব্যাখ্যা-বক্তব্য বিশ্লেষণ করে। বাংলাদেশের মতো একটি জনপদে বাস করে এ দেশের জনসংখ্যা, জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার, জনগণের জীবিকার সূত্র ও জীবিকার্জনের প্রবণতা, এ দেশের ভূমির উৎপাদন সামর্থ, জনগণের চিত্ত বিনোদন প্রবণতা, জনগণের সামাজিক সম্পর্কের বিবর্তন এবং এসব আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চের প্রেক্ষাপটে শরীয়াহর সমযোপযোগী নির্দেশনা বিষয়ে অতি ক্ষুদ্র সংখ্যক *আলিমের* জ্ঞান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। এ দেশের *উলামার* শিক্ষাসূচিতে উল্লিখিত প্রশ্নাদির জবাব দানের ব্যবস্থা না থাকায় *উলামার* পক্ষে এসব প্রশ্নের 'শরীয়াহভিত্তিক' জবাব জানা সহজ নয়, স্বাভাবিকও নয়। এমন যুগ জিজ্ঞাসার জবাব জানা না থাকায় বাংলাদেশের *উলামার* পক্ষে এ দেশের রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তার করা সম্ভব হচ্ছে না।

খ. রাজনীতি সচেতনতার অভাব

বাংলাদেশের *উলামা* কেবল দেশের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রশ্নাদির বিষয়ে ব্যাপকভাবে অসচেতন নন, তারা দেশের রাজনীতির অতীত ঘটনা প্রবাহসহ চলমান রাজনীতির ধারা-প্রবণতা সম্পর্কেও পর্যাপ্ত সচেতন থাকেন না। এ বিষয়ে *উলামার* মনোযোগেরই অভাব রয়েছে। রাজনীতির ঘটনা প্রবাহ বিষয়ে না জেনে এবং এসব বিষয়ে আগ্রহী না হয়ে রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তার প্রক্রিয়ায় অংশীদার হওয়া যায় না এবং যাবে না, তা-ই স্বাভাবিক।

গ. প্রযুক্তি অসচেতনতা এবং এর ব্যবহারে উদাসীনতা

চলমান বিশ্ব কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার ঘটছে। বর্তমানের প্রভূত উন্নত প্রযুক্তি বিভিন্ন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি, মতবাদ, আদর্শ ও তত্ত্বের প্রচার ও প্রসারে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। প্রযুক্তির ব্যবহার জীবন মানের উন্নয়ন ঘটাচ্ছে। এই উন্নত প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার সম্পর্কে বাংলাদেশের *উলামা* পর্যাপ্ত সচেতন নন এবং তার চেয়েও নেতিবাচক বিষয় হলো, এ দেশের *উলামা* আধুনিক উন্নত প্রযুক্তির বহুল ব্যবহার বিষয়ে মনোযোগী নন। কিছু ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারকে *উলামা* নিরুৎসাহিত করে থাকেন। উদ্ভাবক যিনিই হোন, আধুনিক প্রযুক্তির উত্তরাধিকারী সকল মানুষ এবং এর উপকার ও সুবিধা প্রাপ্তির অধিকার সবারই সমান। কিছু ক্ষেত্রে প্রযুক্তির মন্দ ব্যবহারের বিষয়গুলো *উলামা* সামনে আনতে চান এবং তার প্রেক্ষাপটেই *উলামার* মাঝে এক ধরনের প্রযুক্তি-বিরোধী মনোভাবের সৃষ্টি হয়। সর্বাধুনিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তি ইন্টারনেট। এর যেমন নিকৃষ্টতম ব্যবহার সম্ভব, সমানভাবে অথবা তার চেয়েও অধিকতর উৎকৃষ্ট ব্যবহারও সম্ভব। বাংলাদেশের *উলামার* প্রযুক্তি অসচেতনতা এবং এক ধরনের 'প্রযুক্তি অনীহ মনোভাব' রাজনীতির প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ায় *উলামার* পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

ঘ. সাংগঠনিক দুর্বলতা

তত্ত্ব-মতবাদ-আদর্শ প্রচারের জন্য এবং এর প্রসার ও প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সক্ষম ও কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা অনিবার্য পূর্বশর্ত। কার্যকর সাংগঠনিক কাঠামোকে ইংরেজীতে 'নেটওয়ার্ক' বলে অভিহিত করা হয়। বাংলায় একে *জালকর্ম* বলা যায়। সমগ্র দেশব্যাপী *উলামা* সংগঠনের শাখা-উপশাখা সংগঠন গড়ে তোলা, শাখা-উপশাখা সংগঠনের সাথে কেন্দ্রীয় সংগঠনের সার্বক্ষণিক ও কার্যকর যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন করা এবং গৃহিত অথবা ঘোষিত কর্মকৌশলের আলোকে আন্দোলন-সংগ্রামের কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হলে দেশীয় রাজনৈতিক বাস্তবতায় *প্রভাব* বিস্তার করা ও তা অব্যাহত রাখা সম্ভব। বিপরীতে বাংলাদেশের *উলামা* নেতৃত্বের দলগুলোর সমগ্র দেশব্যাপী জেলা পর্যায়েও কার্যকর সংগঠন প্রতিষ্ঠিত নেই, কেন্দ্র-শাখার কাজে পর্যাপ্ত যোগাযোগ-সমন্বয় নেই এবং 'অব্যাহত' নয় বরং 'মৌসুমী' কর্মসূচীতেও সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন-সংগ্রাম বিস্তৃত হয় না। এমনি সাংগঠনিক দুরবস্থায় *উলামার* পক্ষে সামগ্রিক দেশীয় রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তার করতে না পারাই স্বাভাবিক বিবেচিত হয়।

ঙ. সামর্থ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাব

বাংলাদেশের *উলামা* প্রায়শই নিজেদের সামর্থ-সক্ষমতা বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখেন না। আন্দোলন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে একটি পক্ষকে কেবল আপন সামর্থ-সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হলেই চলে না, প্রতিপক্ষের সামর্থ-সক্ষমতা সম্পর্কে জানতে হয় এবং নিজেদের দুর্বলতা-অপূর্ণতার বিষয়গুলো সম্পর্কেও জানতে হয়। বাংলাদেশের *উলামা* ইসলামী সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে 'অতি নিকট ভবিষ্যৎ' সাফল্যের দাবি করেছেন। সেসব *দাবি* বাস্তবতা থেকে 'তাৎপর্যপূর্ণ দূরত্বে' অবস্থানের সত্যতাই বিভিন্ন সময়ে প্রতীয়মান হয়েছে। এর বাইরে বিভিন্ন ইস্যুতে *উলামা* যে লক্ষ্য (টার্গেট) নির্ধারণ করেছিলেন, সে লক্ষ্য কদাচিৎই অর্জিত হয়েছে। আবার কিছু ইস্যুতে *উলামা* তাৎক্ষণিক সাফল্য অর্জন করলেও ইস্যুটির দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া বিষয়ে *উলামার* প্রস্তুতি থাকেনি অথবা ইস্যুটি 'প্রতিরোধ প্রকৃতির' হলে তাতে সম্ভাব্য আঘাতপ্রাপ্তদের বা ক্ষতিগ্রস্তদের সেবা-সমর্থনের জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি ছাড়াই *উলামাকে* 'রক্তময় কর্মসূচী' গ্রহণ করতে দেখা গেছে। নিজেদের সামর্থ-সক্ষমতা এবং ঘাটতি-দুর্ববলতা বিষয়ক যথার্থ তথ্য-উপাত্ত না থাকা বাংলাদেশের *উলামার* একটি অব্যাহত সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

চ. হঠকারী ও চরমপন্থী মনোভাবের অস্তিত্ব

বাংলাদেশের *উলামার* আন্দোলন-সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু কিছু হঠকারী কর্মপন্থা পরিলক্ষিত হয়, ক্ষুদ্র সংখ্যক *উলামার* মাঝে চরমপন্থী মনোভাব বিরাজ করে। উপযুক্ত মানবিক, বৈষয়িক ও পারিবেশিক প্রস্তুতি ছাড়াই কতিপয় *আলিমকে* 'অকল্পনীয় দ্রুততায়' ইসলামী বিপ্লব সাধন অথবা ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রকাশ করতে দেখা যায়। আবার কতিপয় *আলিম* 'বাংলাদেশীয় বাস্তবতা'কে বিবেচনায় না রেখে ভিন্ন কোনো কোনো রাষ্ট্রের আদলে ইসলামী বিপ্লব বা সরকার প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের কথা বলেন।

তবে এ ক্ষেত্রে শুভ সংবাদ হলো, বাংলাদেশের *উলামার* অতি ক্ষুদ্র অংশের মাঝেই এমনসব প্রবণতা দেখা যায়। এসব প্রবণতা সমগ্র *উলামাকে* কখনো থম্‌কে দিতে পারে, বিভ্রান্ত করতে পারে অথবা প্রভাবিত করতে পারে। এই ক্ষুদ্র সংখ্যক *আলিমকে* নিবৃত্ত করা অথবা নিষ্ক্রিয় করায় বৃহত্তর *উলামার* মনোযোগী হওয়া উচিত বলে দাবি করা হয়।

ছ. অগ্রাধিকার নির্ধারণে উদাসীনতা

বাংলাদেশের *উলামার* আন্দোলন-সংগ্রামে অগ্রাধিকার নির্ধারণে বহুমাত্রিক উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। কোন্ ইস্যু বা বিষয়ে কতোটা মনোযোগ দেয়া উচিত অথবা কতো মূল্য দেয়া উচিত এবং কোন্ ইস্যু বা প্রসঙ্গকে পাশ কাটিয়ে কোন্‌টিকে আগে সম্পন্ন করা উচিত, এসব বিবেচনাকে বাংলাদেশের *উলামা* কদাচিৎই গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনেকটা 'হুজুগ' বা 'তাৎক্ষণিক বিবেচনা'কে সামনে রেখেই *উলামার* কার্যক্রম চলে। ফলে বাস্তবে কম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে অনেক বেশি মনোযোগ ও মূল্য প্রদান করে বেশি গুরুত্বের ইস্যুর সময়ে এ *উলামা* ক্লান্তিতে গতিহীন থাকেন। একজন গবেষকের পর্যবেক্ষণ এ পর্যায়ে প্রণিধানযোগ্য:

> 'আমাদের প্রতিপক্ষ অনেক। কিন্তু সবাই এক ধরনের নয়। কেউ সরাসরি শত্রু। কেউ পরোক্ষ শত্রু। আবার কেউ কেউ বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শত্রু। কাজেই সবাইকে একসঙ্গে শত্রু বানানো কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কাজ নয়। আমাদের নির্ধারণ করতে হবে প্রধান শত্রু কে?'[৩]

এ পর্যবেক্ষণের 'শত্রু'-র প্রসঙ্গটিকে বাংলাদেশর *উলামার* মনোযোগ দেয়ার ইস্যু বা বিষয় বা ক্ষেত্রের সমার্থক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তার প্রক্রিয়ায় অগ্রাধিকারের গুরুত্ব না দেয়া বাংলাদেশের *উলামার* অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

জ. ব্যাপক গণসম্পৃক্ততার অভাব

বাংলাদেশের *উলামা* তার নিয়মিত ও সাংবাৎসরিক কার্যক্রমে দেশের ব্যাপক-সর্বস্তরের জনগণের জীবন প্রবাহে যুক্ত হতে পারেন না অথবা সর্বস্তরের জনগণকে স্বীয় কার্যক্রমের বিষয়ে আকৃষ্ট ও সংশ্লিষ্ট করতে পারেন না। জনগণের নিয়মিত জীবনের অতি নগণ্য সংখ্যক কার্যক্রমের সাথে *উলামার* প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা দেখা যায়। ব্যাপক জনগোষ্ঠীর জীবন প্রবাহের সাথে বিভিন্নভাবে ও নানা মাত্রায় সংশ্লিষ্ট ও সম্পৃক্ত না হয়ে জনগণকে *প্রভাবিত* করার বাসনা যৌক্তিক নয়। জনগণের বৈষয়িক জীবনের ব্যাপক কর্ম প্রবাহে *উলামা* নিজেকে 'প্রসঙ্গ' করতে সফল না হওয়া রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তারে *উলামার* জন্য একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

---

৩ অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, "বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন : প্রাসঙ্গিক ভাবনা", *ছাত্র পরিক্রমা*, ইসলামী ছাত্র মজলিসের মুখপত্র, ঢাকা, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০০২, পৃ. ১৩।

ঝ. আধুনিক শ্রেণীর ভুল ধারণা ও ভীতি

উলামার কার্যক্রম ও লক্ষ্য তথা ইসলাম ও ইসলামী রাষ্ট্র বিষয়ে মুসলিম অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে আধুনিক ও বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মাঝে ব্যাপক ভুল ধারণা রয়েছে। ভুল ধারণার ফল হিসেবে গভীর ভীতিও রয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ প্রয়োজন কি-না, সম্ভব কি-না, সম্ভব হলে তেমন রাষ্ট্র ও সমাজে বিদ্যমান রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার 'সুযোগ-সুবিধাসমূহ' থাকবে কি-না, আধুনিক ও বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের মাঝে এসব বিষয়ে প্রায় শতভাগ অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও শঙ্কা অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যমান সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা, মত-পথের স্বাধীনতা, 'নারী অধিকার', মানবাধিকার, সংখ্যালঘুর অধিকার, বিনোদন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। বাংলাদেশের *উলামা* আধুনিক বা বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত নাগরিকদের এসব প্রশ্নে অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও শঙ্কা দূরীকরণে পর্যাপ্ত উদ্যোগ নেননি এবং/অথবা পর্যাপ্ত সফল হননি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তারের ক্ষেত্রে *উলামার* জন্য বৈষয়িক শিক্ষিত মানুষদের ভুল ধারণা, অস্পষ্টতা, সন্দেহ ও শঙ্কা একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসেবে বিরাজমান বলে মনে করা হয়।

ঞ. বুদ্ধিজীবীদের সাথে সমন্বয়ের অভাব

বাংলাদেশে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চাকারীদের একটি বড় অংশ সরাসরি ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ বিষয়ে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। এ অংশের বুদ্ধিজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার বিষয়টি *উলামার* জন্য সহজ নয়। অবশিষ্ট বুদ্ধিজীবীগণ ইসলাম, ইসলামী আদর্শ ও *উলামা* সম্পর্কে ইতিবাচক ও অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করেন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী সত্ত্বেও এ অংশের বুদ্ধিজীবীদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি ইসলামী আদর্শ বিষয়ে পর্যাপ্ত ও স্পষ্ট ধারণা রাখেন না। কারণ এ ব্যক্তিবর্গের জ্ঞানের ভিত্তি বৈষয়িক জ্ঞান। এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের নিকট ইসলামী আদর্শ প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায়ে উপস্থাপন করা হলে তারা ইসলামী আদর্শের জন্য তথা *উলামার* আন্দোলন-সংগ্রামের পক্ষে তাদের বৈষয়িক জ্ঞান ও যোগ্যতার কার্যকর অনুকূল ব্যবহার করতে সক্ষম হতে পারেন। এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের সাথে *উলামার* সমন্বিত কোনো যোগাযোগ কাঠামো গড়ে না ওঠায় *উলামা* অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন বুদ্ধিজীবীদের সেবা-সহায়তা থেকে বঞ্চিত থাকছেন বলে মনে করা হয়।

ট. শিক্ষা ও আন্দোলনে নারীর সম্পৃক্ততায় অবহেলা

বাংলাদেশের *উলামা* নারী শিক্ষা বিষয়ে সাধারণভাবে অবহেলা প্রদর্শন করে চলেছেন। মক্তব-মাদ্রাসা পর্যায়ে ছেলেদের শিক্ষাদান বিষয়ে *উলামা* যে পরিমাণে উদ্যোগ-আয়োজন সম্পন্ন করেছেন, মেয়েদের জন্য করেছেন তার চেয়ে অনেক অনেক কম। বাংলাদেশে নারীর সংখ্যা পুরুষের প্রায় সমান। নারীর সহশিক্ষার বিপরীতে *উলামা* অবস্থান নিয়েছেন, কিন্তু অনুকূল প্রক্রিয়ায় নারীর জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত শিক্ষা দানের পর্যাপ্ত ও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেননি। সময়ের দাবি মেটাতে নারী শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত থাকতে পারেনি।

সহশিক্ষা ব্যবস্থায় নারী বৈষয়িক শিক্ষায় পুরুষের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণ বৈষয়িক শিক্ষায় শিক্ষিত নারী অন্য পুরুষের মতো ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ বিষয়ে ভুল ধারণা ও বিকৃত ধারণা অর্জন করেছে। তাই 'ইসলামী ব্যবস্থা' বিষয়ে বাংলাদেশের নারীর ভীতি ও শঙ্কা পুরুষের চাইতে বেশি। 'ইসলামী ব্যবস্থা' বিষয়ে জ্ঞানহীন নারী *উলামার* রাজনৈতিক ভিত্তির ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বাংলাদেশের *উলামা* আন্দোলন ও সংগ্রামে নারীর অংশ গ্রহণ অথবা অংশ প্রদানকে আরো বেশি নেতিবাচক অবস্থান থেকে বিবেচনা করেছে। ফলে আন্দোলন-সংগ্রামে বাংলাদেশের *উলামা* নারীর সমর্থন ন্যূনতম মাত্রায় পেয়ে থাকেন।

ঠ. সংখ্যালঘুর ভুল ধারণা

ধর্মীয় পরিচয়ে বাংলাদেশর হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান জনগোষ্ঠী সংখ্যালঘু হিসেবে বিদ্যমান। চলমান সাধারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কতোটা শ্রেয়তর ও নিশ্চিন্ত পরিবেশ পেতে পারে, এমন স্পষ্ট ধারণা বাংলাদেশের *উলামা* ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে প্রদানে পর্যাপ্ত সফল হননি। তাই সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সাধারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে *উলামার* নেতৃত্বে ইসলামী ব্যবস্থার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বাংলাদেশের মতো ধর্মীয় জনসংখ্যার বন্টনের দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুর সমর্থন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংখ্যালঘুর সমর্থন না হোক, এর বিরোধিতাকে নিষ্ক্রিয়-নির্বিষ করার বিষয়ে *উলামার* ইতিবাচক ভূমিকা পালন গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে।

ড. বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে উদাসীনতা

বাংলাদেশের *উলামা* তার আন্দোলন-সংগ্রামের প্রথামাফিক কর্মপ্রক্রিয়ার বাইরে অন্যবিধ পন্থা-কৌশলকে কদাচিৎ মূল্য দিয়ে থাকেন। আন্দোলন-সংগ্রামের সহায়ক কৌশল হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশল তথা লেখালেখি ও প্রকাশনার মাধ্যমকে *উলামা* পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করেননি এবং এই ক্ষেত্রকে কার্যকরভাবে কাজে লাগাবার জন্য নির্দিষ্ট 'কিছু জনশক্তির' নির্দিষ্ট নিয়োগকে তেমন উৎসাহিত করেননি। 'মুখের উচ্চারণের' চাইতে কখনো কখনো 'কলমের আঁচড়' সংশ্লিষ্টদের বেশি কার্যকরভাবে *প্রভাবিত* করতে পারে। এ বিষয়ে *উলামার* আস্থাহীনতার কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। আন্দোলন-সংগ্রামের সহায়ক হিসেবে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তথা বিনোদনমূলক মাধ্যমসমূহকে (নাটক, মঞ্চ, চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, আবৃত্তি, চারু ও কারুকলা প্রভৃতি) *উলামা* কখনো ইতিবাচক অর্থে গ্রহণ করেছেন, এমন প্রমাণ খুব বিরল। সাংস্কৃতিক তথা বিনোদনমূলক মাধ্যম জনগণকে আন্দোলন-সংগ্রামে যথেষ্ট পরিমাণে কার্যকরভাবে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্ত করতে সক্ষম বলে বিশ্বাস করা হলেও *উলামার* মাঝে এ বিশ্বাসের তেমন বিস্তৃতি নেই বলেই প্রতীয়মান হয়।

রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তার প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশের *উলামার* অন্যতম বড় সমস্যা হিসেবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রতি উদাসীনতাকে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

ঢ. গণমাধ্যমে স্বল্প প্রবেশাধিকার

দেশের গণমাধ্যমে, ইলেক্‌ট্রনিক ও প্রিন্টিং, স্বল্প প্রবেশাধিকার বাংলাদেশের রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তার প্রক্রিয়ায় *উলামার* জন্য অন্যতম সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। ইলেক্‌ট্রনিক মিডিয়ায় ইদানীং কিঞ্চিৎ মাত্রায় *উলামার* অংশগ্রহণ দেখা যায়। নিকট অতীতে তা-ও ছিলো না। প্রিন্টিং গণমাধ্যমের মালিকানার ক্ষেত্রে *উলামা* ন্যূনতম অধিকার অর্জন করেছেন। লেখালেখি বা তথ্য উপস্থাপনার ক্ষেত্রে *উলামা* ব্যাপকভাবে পিছিয়ে রয়েছেন। গণমাধ্যম আধুনিক বিশ্বের গতিময় মানব জীবনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সারণি-৭ থেকে *উলামার* কর্তৃত্বে বাংলাদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা (দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক প্রভৃতি) বিষয়ে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

সারণি ৭: বাংলাদেশে *উলামার* 'কর্তৃত্বে' (সম্পাদনা / প্রকাশনা / পৃষ্ঠপোষকতা) প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা

ক্র. নং	পত্রিকার নাম	ধরন (মাসিক/ পাক্ষিক)	সম্পাদক	কর্তৃপক্ষ (ব্যক্তি - সংস্থা- সংগঠন)	প্রকাশকাল	অব্যাহত	প্রচার সংখ্যা	প্রকাশের স্থান	মন্তব্য
১.	মদীনা	মাসিক	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	মাওলানা মুহিউদ্দীন খান	১৯৬১	হ্যাঁ	৭০০০০	ঢাকা	
২.	মুঈনুল ইসলাম	মাসিক	মাওলানা আহমদ শফী	দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম	বর্তমান	হ্যাঁ	১০০০০	হাটহাজারী চট্টগ্রাম	ইসলাম প্রচার নামে ১৯৪৩ থেকে শুরু
৩.	পয়গামে হক	মাসিক	মাওলানা মোস্তাফা আজাদ	মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী	১৯৯২	হ্যাঁ	৪০০০	ঢাকা	
৪.	জমিয়ত	সাপ্তাহিক	মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী	মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী	১৯৯১	হ্যাঁ	১০০০০	ঢাকা	
৫.	আল হক	মাসিক	মাওলানা সুলতান যউক	দারুল মাআরিফ আল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম	১৯৯২	হ্যাঁ	২৫০০০	চট্টগ্রাম	

৬.	দ্বীনী বিপ্লব	মাসিক	মাওলানা আবদুল মালেক হালিম	হাইলধর বালক বালিকা মাদ্রাসা, আনোয়ারা চট্টগ্রাম		হ্যাঁ	১০০০	আনোয়ারা চট্টগ্রাম	
৭.	পয়গামে হক	মাসিক	মাওলানা বাহাউদিন যাকারিয়া	মাওলানা বাহাউদ্দিন যাকারিয়া		হ্যাঁ		ঢাকা	
৮.	রহমত	মাসিক	মাওলানা মনযূর আহমাদ	মাওলানা আহমাদ উল্লাহ আশরাফ	১৯৯২	হ্যাঁ	২৫০০০*	ঢাকা	প্রথমে ১৯৭৮
৯.	জাগো প্রহরী	সাপ্তাহিক	মাওলানা জাফরুল্লাহ খান	মাওলানা জাফরুল্লাহ খান	১৯৭৮	হ্যাঁ	৫০০০	ঢাকা	
১০.	তৌহিদী পরিক্রমা	মাসিক	মাওলানা শাহীনুর পাশা চৌধুরী	মাওলানা শাহীনূর পাশা চৌধুরী এ্যাডভোকেট	১৯৯৫	হ্যাঁ	৫০০০	সিলেট	
১১.	দ্বীন দুনিয়া	মাসিক	মাওলানা এ কে মাহমুদুল হক	মাওলানা আব্দুল জব্বার, বায়তুশ শরফ চট্টগ্রাম	১৯৮০	হ্যাঁ	৬০০০	চট্টগ্রাম	
১২.	তরজুমান	মাসিক	মাওলানা জালাল উদ্দীন	আঞ্জুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া ছুন্নিয়া, চট্টগ্রাম মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ তাহের শাহ	১৯৮১	হ্যাঁ	২০০০	চট্টগ্রাম	
১৩.	হেদায়াত	মাসিক	মাওলানা জাফরুল্লাহ খান	কুরআন প্রচার সংস্থা, চট্টগ্রাম	১৯৭৮	হ্যাঁ	২০০০	চট্টগ্রাম	

১৪.	কওমী কণ্ঠ	মাসিক	মাওলানা গোলাম মোস্তফা	কওমী পাবলিকেশন্স, ঢাকা	১৯৯৫	হ্যাঁ	৫০০০	ঢাকা	
১৫.	জাগো মুজাহিদ	সাপ্তাহিক	মুফতী আ. হাই	মুফতী আ. হাই	১৯৯০	২০০০ সালে	২৫০০০	ঢাকা	
১৬.	রহমানী পয়গাম	মাসিক	মাওলানা মামুনুল হক	শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক জামেয়া রহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা	১৯৯২	হ্যাঁ	৫০০০	ঢাকা	
১৭.	কলম	মাসিক	মাওলানা আবু তাহের মেসবাহ	মাদ্রাসাতুল মদীনা আশরাফাবাদ লালবাগ, ঢাকা	-	হ্যাঁ	-	ঢাকা	
১৮.	আদর্শ নারী	মাসিক	মুফতি আবুল হাসান শামসাবাদী	মুফতি আবুল হাসান শামসাবাদী	১৯৯২	হ্যাঁ	৫০০০০	ঢাকা	
১৯.	নেয়ামত	মাসিক	মাওলানা আ. সালাম	মাওলানা আবদুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদী	-	হ্যাঁ	২০০০	ঢাকা	
২০.	দাওয়াত	মাসিক	মুফতী ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী	জামেয়া উলুমুল ইসলামিয়া, চট্টগ্রাম	১৯৯৫	হ্যাঁ	৩০০০	ঢাকা	
২১.	আল ফুরকান	মাসিক	মাওলানা আতিকুল হক	মাওলানা আতিকুল হক, হিজবুল কুররা	১৯৮৪	হ্যাঁ		ঢাকা	

২২.	আল আশরাফ	মাসিক	মাওলানা রুহুল আমীন	মাওলানা রুহুল আমিন.		হ্যাঁ		ঢাকা	
২৩.	সংস্কার	মাসিক	মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল			হ্যাঁ		ঢাকা	
২৪.	আত্‌তাওহীদ	মাসিক	মাওলানা হারুন ইসলামাবাদী	মাওলানা ইউনুস, জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম	১৯৭০	হ্যাঁ	২০০০	পটিয়া চট্টগ্রাম	
২৫.	নয়া দুনিয়া	সাপ্তাহিক	মাওলানা মুস্তফা মঈনুদ্দীন খান	মাওলানা মহিউদ্দীন খান		হ্যাঁ		ঢাকা	
২৬.	মুসলিম জাহান	সাপ্তাহিক	মাওলানা মুস্তফা মঈনুদ্দীন খান	মাওলানা মহিউদ্দীন খান		হ্যাঁ		ঢাকা	
২৭.	পাথেয়	মাসিক	মাওলানা ফরিদ উদ্দীন মাসউদ	ইসলামী গবেষণা পরিষদ, ঢাকা	১৯৮৪	হ্যাঁ	৩০০০	ঢাকা	
২৮.	আল জামেয়া	মাসিক	মাওলানা নেয়ামত উল্লাহ আলফরীদী	মাও. মাহমুদুল হাসান, জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, যাত্রাবাড়ী,ঢাকা		হ্যাঁ	৩০০০	ঢাকা	
২৯.	কাবার পথে	মাসিক	মাওলানা সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া	মাওলানা সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া	১৯৯৩	হ্যাঁ	৩২০০০*	ঢাকা	

৩০.	ইসলাহ	সাপ্তাহিক	মাওলানা সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া	মাওলানা সাইফুদ্দীন ইয়াহইয়া	১৯৯৮	হ্যাঁ	১৮০০০*	ঢাকা	
৩১.	আল বালাগ	মাসিক	মাওলানা আমীনুল ইসলাম	মাওলানা আমীনুল ইসলাম		হ্যাঁ	২০০০	ঢাকা	
৩২.	আর রশীদ	মাসিক	মাওলানা জমিরউদ্দীন	জামেয়া ইসলামিয়া ওবায়দিয়া হাফেজুল উলুম মাদ্রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	১৯৯১	হ্যাঁ	৫০০০	ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	
৩৩.	দাওয়াতুল হক	মাসিক	মুফতী হাবীবুর রহমান কাসেমী	জামেয়া ইসলামিয়া নাছিরুল ইসলাম, নাজিরহাট, চট্টগ্রাম	১৯৯২	হ্যাঁ	৩০০০	চট্টগ্রাম	
৩৪.	আল ফারুক	মাসিক	মাওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী	জামেয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম মাদানিয়া, বিশ্বনাথ, সিলেট	২০০১	হ্যাঁ	২০০০	বিশ্বনাথ, সিলেট	
৩৫.	আল বাইয়্যিনাত	মাসিক	মাওলানা মুহাম্মদ মাহবুব আলম	সাইয়িদ দিল্লুর রহমান মুহম্মদিয়া জামিয়া শরীফ রাজারবাগ, ঢাকা	১৯৯০	হ্যাঁ		ঢাকা	
৩৬.	হক পয়গাম	মাসিক			১৯৯০			ঢাকা	
৩৭.	নতুন কলম							ঢাকা	

৩৮.	নতুন সফর							ঢাকা	
৩৯.	আরাফাত	সাপ্তাহিক	মীর আ.ওয়াহহাব লাবীব	প্রফেসর ড. মাওলানা মু. আবদুল বারী বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা	১৯৫৯	হ্যাঁ	৩০০০*	ঢাকা	
৪০.	আত্‌তাহরীক	মাসিক	মাওলানা মু সাখাওয়াত হোসাইন	প্রফেসর ড. মু. আসাদুল্লাহ আল গালিব, হাদীস ফাউন্ডেশন, রাজশাহী	১৯৯৭	হ্যাঁ	১১০০০*	রাজশাহী	
৪১.	আত্মার বাণী	মাসিক	মাওলানা এম সাইদুর রহমান আল মাহবুবী	মাওলানা মাহবুব-এ-খোদা দেওয়ানবাগী বাবে রহমত, আরামবাগ, ঢাকা	১৯৯৬	হ্যাঁ		ঢাকা	
৪২.	নেহদায়ে ইসলাম	মাসিক	মাওলানা মু. গুলজার হোসাইন	দরবারে ফুরফুরা শরীফ, মার্কাজে ইশাআতে ইসলাম, মিরপুর, ঢাকা	১৯৪১	হ্যাঁ		ঢাকা	
৪৩.	ইনকিলাব	দৈনিক	এ এম এম বাহাউদ্দিন	মাওলানা এম এ মান্নান	১৯৮৫	হ্যাঁ	১৬০০০০	ঢাকা	
৪৪.	আলমুজাদ্দেদ	দৈনিক		বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, আটরশির পীর সাহেব	১৯৯৪	হ্যাঁ		ঢাকা	
৪৫.	পূর্ণিমা	সাপ্তাহিক		মাওলানা এম এ মান্নান	১৯৮৬	হ্যাঁ	৩০০০০	ঢাকা	

৪৬.	পরওয়ানা	মাসিক	মাওলানা হুসামউদ্দীন চৌধুরী	ফুলতলীর পীর মাওলানা অ. লতিফ চৌধুরী	১৯৯১	হ্যাঁ	৫০০০	ঢাকা	
৪৭.	আলহামিদ	মাসিক	মাওলানা আবু আমার আব্দুল্লাহ্	খান্‌কায়ে শিরাজিয়া		হ্যাঁ	৫০০০	ঢাকা	
৪৮.	মুসলিম ডাইজেস্ট	মাসিক	মাহবুবুর রহমান	প্রকৌশলী মাহবুবুর রহমান	১৯৯৮	হ্যাঁ		ঢাকা	
৪৯.	পৃথিবী	মাসিক	অধ্যাপক এ কে এম নাজির আহমদ	বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা	১৯৮১	হ্যাঁ	১০০০০	ঢাকা	
৫০.	কলম	ত্রৈমাসিক	মা. অধ্যাপক আ. মান্নান তালিব	তালিব	-	হ্যাঁ	১০০০০	ঢাকা	

* চিহ্নিত প্রচার সংখ্যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত। অন্য প্রচারসংখ্যা আনুমানিক।

সূত্র: এ অসম্পূর্ণ সারণিটি মাওলানা আব্দুর রহীম ইসলামাবাদী ও মাওলানা মনযূর আহমাদের সহযোগিতায় বর্তমান গবেষকের তৈরী।

ণ. নেতৃত্বে 'অর্জন নীতি' বিষয়ে অবহেলা

বাংলাদেশের *উলামার* নেতৃত্বের কাঠামোতে 'নেতৃত্বের' জন্য 'অর্জন নীতি' (এচিভমেন্ট ক্রাইটেরিয়া) কদাচিৎ কার্যকর হয়ে থাকে। বয়সের জ্যেষ্ঠতা অথবা 'ছাত্রদের বিপরীতে' *'শিক্ষক'* হওয়াকে *উলামার* সাংগঠনিক কাঠামোতে *নেতৃত্বের যোগ্যতা* হিসেবে সাধারণভাবে বিবেচনা করা হয়। নেতৃত্বের জন্য এ রীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'আরোপণ নীতি' (এস্ক্রিপটিভ ক্রাইটেরিয়া) বলা হয়। এটি নেতৃত্বের সনাতন রীতি। নেতৃত্বের আধুনিক রীতিতে ব্যক্তির 'অর্জিত যোগ্যতাকে' বেশি বিবেচনা করা হয়। নেতৃত্বের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ক্ষমতা, সমন্বয়ের দক্ষতা, উপস্থাপন শৈলী, ব্যবস্থাপনাগত যোগ্যতা, জনশক্তিকে মোহিত ও আকৃষ্ট করার ক্ষমতা প্রভৃতির ভিত্তিতে ব্যক্তির নেতৃত্বের যোগ্যতা বিবেচনা করা হয়। বয়সে প্রবীণ হলে অথবা অন্যদের শিক্ষক হলেই কারো মাঝে নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। বাংলাদেশের *উলামার*

নেতৃত্বের কাঠামোতে 'অর্জন নীতির' স্বল্প প্রয়োগ তার কার্যকর নেতৃত্বের জন্য সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান বলে মনে করা হয়।

ত. যুক্তির বদলে আবেগের প্রাধান্য

বাংলাদেশের *উলামার* আন্দোলন-সংগ্রামে প্রায়শই যুক্তির বদলে আবেগের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আবেগতাড়িত আন্দোলন-সংগ্রামে তাৎক্ষণিক সুফল পাওয়া যায়। কিন্তু সে আবেগকে ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা কঠিন হয়। কারণ আবেগ সাধারণত স্বল্পস্থায়ী মানবিক উপাদান। যুক্তির ভিত্তিতে আন্দোলন-সংগ্রাম রচিত হলে তা দীর্ঘমেয়াদী যৌক্তিক লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে। বাংলাদেশের *উলামার* আন্দোলন-সংগ্রামে কখনো সংশ্লিষ্ট ইস্যু বা ঘটনার প্রতি আবেগ আবার কখনো নেতার প্রতি আবেগ অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে। আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি আবেগ হওয়ায় তা সমুদ্রের ফেনারাশির মতো ফুলে-ফুঁশে ওঠে বটে, কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সহসাই তা আবার 'মিলিয়ে' যায় 'সমুদ্রের অথৈ জলরাশির' মাঝে। বাংলাদেশের *উলামার* আন্দোলন-সংগ্রামে আবেগ সৃষ্টিকারী নেতা হিসেবে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ (হাফেয্জী হুজুর) ও আবেগ সৃষ্টিকারী ইস্যু বা ঘটনা হিসেবে লেখিকা তসলিমা বা কতিপয় এনজিও-র ধর্মদ্রোহীতাকে বিবেচনা করা যেতে পারে। নেতা ও ইস্যুর বিষয়ে আন্দোলনকারীদের মাঝে আবেগের চাইতে যুক্তির ভিত্তি দৃঢ় হলে তা লক্ষ্যে পৌছাতে অথবা দীর্ঘতর সময় আন্দোলন-সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। যে কোনো আন্দোলন-সংগ্রামে সংশ্লিষ্টদের মধ্যকার আবেগ একটি মূল্যবান উপাদান বটে, কিন্তু তা মূল ভিত্তি হওয়া সঙ্গত নয়। আন্দোলন-সংগ্রামে সংশ্লিষ্টদেরকে টার্গেট বিষয়ে যুক্তির নিরীখে ঐক্যবদ্ধ করা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করার বিষয়ে উদাসীনতাকে বাংলাদেশের *উলামার* জন্য একটি সমস্যা হিসবে বিবেচনা করা হয়।

থ. দায়িত্বের পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণে অবহেলা

আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি(বর্গ)কে নিয়োগ করতে হয়। এতে ক্রমশ সংশ্লিষ্টরা নির্দিষ্ট দায়িত্ব সম্পাদনে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে সক্ষম হন। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় দায়িত্বের পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণ। এ প্রক্রিয়ায় কাউকে একাধিক অথবা অনেক দায়িত্ব দেয়া হয় না। আবার একজন দায়িত্বপ্রাপ্তকে কিছুটা দীর্ঘ সময় একই দায়িত্বপালনের সুযোগ দেয়া হয়। তাতে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর-বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে কম-বেশী বিশেষজ্ঞে পরিণত হন। আন্দোলন-সংগ্রামের প্রচলিত রুটিন দায়িত্ব সম্পাদনের পাশাপাশি গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, সাংস্কৃতিক বলয়, শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে তত্ত্বাবধান, কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য পৃথক ব্যক্তি(বর্গ)কে নিযুক্ত করা উচিত। বাংলাদশের *উলামা* নেতৃত্বের দল-সংগঠনমূহে দায়িত্বের পৃথকীকরণ ও বিশেষীকরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক মনোযোগ লক্ষ্য করা গেছে। এ ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত মনোযোগ দেয়ার এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে বলে মনে করা হয়।

দ. ক্ষুদ্র মাসয়ালাহ বা 'প্রশ্ন' বিষয়ে অনৈক্য

ইসলাম তথা ইসলামী শরীয়ত মানব জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রশ্নের জবাব দিয়ে থাকে। কিছু প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট জবাব প্রদান করা হয়, কিছু প্রশ্নের বিকল্পসহ জবাব দেয়া হয় এবং কিছু প্রশ্নের জবাবের ক্ষেত্রে কিছু মূলনীতিভিত্তিক স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী জবাবের ব্যবস্থা রাখা হয়। শরীয়তের সুনির্দিষ্ট জবাবভিত্তিক 'প্রশ্ন'সমূহে *উলামার* মাঝে বিরোধ বা অনৈক্য প্রায় বিরল। বিকল্পসহ জবাবভিত্তিক প্রশ্নগুলো সম্পর্কেও *উলামার* মাঝে বিরোধ লক্ষণীয় নয়। কারণ অনুমোদিত বিকল্প জবাবের যে কোনোটি যে কারো অবলম্বনের সুযোগকে সবাই স্বীকার করেন। *উলামার* মাঝে বিরোধ বা অনৈক্যের বিষয়গুলো মূলত অতি ক্ষুদ্র প্রকৃতির এবং যেগুলোর জবাব স্থান-কাল-পাত্রভিত্তিক হবার সুযোগ রাখা হয়েছে। আরবী 'সাওয়াল' শব্দের অর্থ প্রশ্ন। আরবী 'মাসয়ালাহ' শব্দের অর্থ 'প্রশ্নযোগ্য বিষয় বা ক্ষেত্র'। সাধারণ প্রচলনে মাসয়ালাহ্ শব্দকেই 'প্রশ্ন' অর্থে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের *উলামার* মাঝে ক্ষুদ্রসব মাসয়ালাহ বিষয়ে পর্যাপ্ত বিরোধ ও অনৈক্য প্রকাশিত হয়ে থাকে। এ অনৈক্য রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তারের ক্ষেত্রে *উলামার* জন্য একটি বড় সমস্যা হিসেবে বিদ্যমান।

ধ. জনগণের চলতি সমস্যা বিষয়ে উদাসীনতা

বাংলাদেশের *উলামা* জনগণের দৈনন্দিন ও চলতি সমস্যা বিষয়ে কদাচিৎ মনোযোগী হয়ে থাকেন। জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, মশা-মাছির উৎপাত, যাতায়াত-যোগাযোগের দুর্ভোগ, ছিনতাই-রাহাজানিসহ আইন-শৃংখলার অবনতি, নারী-শিশু অপহরণ, এসিড নিক্ষেপসহ নারী নির্যাতন প্রভৃতি চলমান নাগরিক সমস্যা বিষয়ে *উলামাকে নিষ্ক্রিয়* ও উদাসীন বলে মনে হতে পারে। জনগণের এসব সমস্যা নিয়ে কথা বলে আন্দোলন করে বামপন্থীসহ অন্য রাজনীতিকরা জনপ্রিয়তা ও জনঘনিষ্ঠতা অর্জন করেন। পরকালীন শান্তি-সুখ বিষয়সহ আধ্যাত্মিক বিষয়াদি নিয়েই *উলামাকে* বেশি মনোযোগী থাকতে দেখা যায়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে কাঙ্খিত *প্রভাব* বিস্তারে *উলামার* পিছিয়ে থাকার ক্ষেত্রে জনগণের চলতি সমস্যাদি বিষয়ে উদাসীন থাকাকেও একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

ন. বৈষয়িক সমর্থন-যোগানের অভাব

বাংলাদেশের রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তারের ক্ষেত্রে *উলামার* হাতে পর্যাপ্ত বৈষয়িক সমর্থন ও যোগান না থাকা একটি সমস্যা ও বাধা হিসেবে বিদ্যমান বলে মনে করা হয়। বৈষয়িক সমর্থন ও যোগানকে পেশীশক্তি ও বিত্তশক্তি হিসেবে বিভক্ত করা যেতে পারে। আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সজ্জিত সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলোর সশস্ত্র ক্যাডারদের বিপরীতে *উলামা* যথার্থই অসহায়। *উলামার* পক্ষে অবৈধ অস্ত্র ধারণ করা সম্ভব নয়। চলমান রাজনীতির এহেন মারদাঙ্গা প্রকৃতির বিপরীতে *উলামার* প্রতিযোগিতার সুযোগ না থাকায় তাকে এ ক্ষেত্রে দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ও *প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ায়* পিছিয়ে থাকাকে বিনা বাক্যে স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় নেই।

চলমান রাজনীতি বহুলাংশে বিত্ত নির্ভরও বটে। *উলামার* নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত বিত্ত নেই। তবে সাধারণ রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগের দরকার হয়, সংযমী ও শ্রেয়তর নৈতিকতা সম্পন্ন হওয়ায় *উলামার* কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সে পরিমাণ বিত্ত বিনিয়োগ অনিবার্য নয় বলে বিশ্বাস করা হয়। এরপরও যে পরিমাণ বিনিয়োগের দরকার হয়ে থাকে, একটি সুসংবদ্ধ ও পরিকল্পিত 'অর্থায়ন ব্যবস্থা' গড়ে তোলার মাধ্যমে *উলামা* এ সমস্যার সমাধানে সক্ষম হতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশের *উলামা* নেতৃত্বের সংগঠনে কাঙ্খিত 'অর্থায়ন ব্যবস্থা' গড়ে তোলা হয়নি। ফলে আন্দোলন-সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য অর্থায়ন সংকট *উলামার* জন্য একটি সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। একজন লেখকের এ সংশ্লিষ্ট ভাষ্য এ পর্যায়ে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। তিনি লিখেছেন:

> 'বর্তমানের মারদাঙ্গার রাজনীতিতে ইসলামী দলগুলোর রাজনৈতিক ভূমিকা অনেকখানি নিস্প্রভ হয়ে গেছে। তবে বর্তমানে রাজনীতি যে ভয়াবহ মারদাঙ্গার রূপ ধারণ করেছে তাতে উলামায়ে হক্কানীর ন্যায়নীতির রাজনীতি অনেকটা অচল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বর্তমানে রাজনীতির জন্য যে বিরাট অর্থনৈতিক যোগানের প্রয়োজন, তার যোগান দেওয়া আলেম উলামাদের জন্য অসম্ভব বটে। যে কারণে একান্ত সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও উলামায়ে কিরামের রাজনীতি এ দেশে সচল হয়ে উঠছেনা'।[৪]

উদ্ধৃত ভাষ্যের 'মারদাঙ্গার রাজনীতি' বিষয়ক বক্তব্যকে সমর্থন করা যায়। তবে 'অর্থনৈতিক যোগানের' বিষয়টিকে 'অসম্ভব' হিসেবে স্বীকার করা ন্যায্য নয় বলে বর্তমান গবেষক বিশ্বাস করতে চান। আন্দোলন-সংগ্রামের জন্য একটি পরিকল্পিত ও সুসংবদ্ধ 'অর্থায়ন ব্যবস্থা' গড়ে তুলতে মনোযোগী না হলে বাংলাদেশের *উলামার* জন্য তা একটি সমস্যা হয়েই থাকার কথা।

প. মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট অতিরঞ্জিত প্রচারণার যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক জবাবদানে উদাসীনতা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে *উলামার* ভূমিকার বিষয়টি রাজনীতিতে *উলামার* জন্য একটি স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। *উলামা*-বিরোধী রাজনীতিকরা 'রাজনৈতিক প্রয়োজনে' *উলামার* বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাকে অভিযোগ আকারে উত্থাপন করে থাকেন এবং সে সব অভিযোগ কম বয়সী তরুণ-যুবকসহ জনগণের মাঝে *উলামা* বিষয়ে একটি নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করে। এ নেতিবাচক ধারণা *উলামার* জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশে ৯মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, এতে 'অসংখ্য' প্রাণহানি ঘটেছে, নারীর সম্ভমহানি ঘটেছে এবং সম্পদহানি ঘটেছে-এসবই খাঁটি সত্য। তবে এসব খাঁটি সত্য পরিসংখ্যানের 'উপাত্তভিত্তিক' 'নির্দিষ্ট সত্য' নয়। মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা ও নারীর সম্ভমহানির সংখ্যা ব্যাপকভাবে বিতর্কিত হয়ে রয়েছে। এসব

---

৪ আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ ইয়াহইয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, ঢাকা: কওমী পাবলিকেশন্স (২য় সংস্করণ), ২০০০।

বিতর্কিত সত্যকে 'অবিতর্কিত ও নির্দিষ্ট' সত্যে পরিণত করার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মাঝে আগ্রহের প্রচুর ঘাটতি রয়েছে। প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তি 'অনির্দিষ্ট বিতর্কিত সত্য' হিসেবে ঢালাওভাবে *উলামার* বিরুদ্ধে উচ্চারণ করে থাকেন *স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী, নারী নির্যাতনকারী* প্রভৃতি শব্দ ও শব্দগুচ্ছ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে *উলামার* এক ক্ষুদ্রতম অংশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং *উলামার* বিরুদ্ধে হত্যা অথবা নারী নির্যাতনের ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। শান্তি কমিটি অথবা রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌স বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র সংখ্যক *উলামার* বিরুদ্ধে অবশ্য পাকিস্তানী বাহিনীর সাহায্যকারী অথবা সমর্থনকারীর নির্দিষ্ট অভিযোগ উঠেছিলো। স্বাধীন বাংলাদেশে তেমন ক্ষুদ্র সংখ্যক *উলামাকে* 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২' -এর আওতায় আটক করে পরে মুক্তও করে দেয়া হয়। ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে *সাধারণ ক্ষমা* ঘোষণার দিনই, ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩, শর্ষীনার তৎকালীন পীর মাওলানা আবু জাফর সালেহকে মুক্তি দেয়া হয়। স্মরণ করা যেতে পারে, ঘোষিত সাধারণ ক্ষমায় কেবল পাক বাহিনীর সমর্থক ও সহযোগিদের মুক্তিদানের এবং ধর্ষণ ও হত্যাসহ ছয়টি নির্দিষ্ট অভিযোগে (বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ৩০২, ৩০৪, ৩৭৬, ৪৩৫, ৪৪৮ ও ৪৬৬-এর আওতায়) আটকদের যথারীতি বিচার করার কথা ছিলো। এ সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্ত প্রমাণ করে, বাংলাদেশের যে ক্ষুদ্রসংখ্যক *উলামা* মুক্তিযুদ্ধকালে বিভিন্ন মাত্রায় পাকিস্তানী বাহিনীকে সমর্থন অথবা সহযোগিতা দিয়েছেন, তারা প্রায় কেউই নারী নির্যাতন অথবা হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না। এ জন্যই সংশ্লিষ্ট *আলিমদের* প্রায় কাউকেই এ অভিযোগে কোনো শাস্তিও ভোগ করতে হয়নি। এ প্রসঙ্গে ১৯৭০-এর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী-র এক প্রার্থী, মাগুড়ার মাওলানা খন্দকার আবুল খায়েরের লেখা থেকে দু'টি বাক্য স্মরণ করা যেতে পারে:

> 'দেশের লোক যদি আমাদের শত্রুই মনে করত তবে আমরাতো ভারতে পালাইনি। আমরা দেশে রইলাম কি করে? আমাদের কি কোন যাদু-মন্ত্র জানা ছিল? ...যদি ইসলামপন্থী লোকদেরকে লোকে শত্রু মনে করত তাহলে ৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পরে তারা বাঁচল কি করে? তারা তো ভারতে বা পাকিস্তানে পালায়নি?' [৫]

মাওলানা খন্দকার আবুল খায়ের উত্থাপিত প্রশ্নগুলো এ পর্যায়ে বিশেষভাবেই প্রাসঙ্গিক এবং মূল্যায়নের দাবিদার। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে ইসলামপন্থী ব্যক্তিবর্গ এবং নির্দিষ্টভাবে *উলামা* যদি ব্যাপকভাবে নীতিবিরোধী, সমাজবিরোধী এবং আইনবিরোধী কার্যক্রমে যুক্ত থাকতেন, তবে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী দিনগুলোয় লোকালয়, জনপদ ও সমাজে *উলামার* প্রাণে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। বাস্তবে *উলামা* আপন লোকালয়, জনপদ ও সমাজেই কর্মময় জীবনে সচল থেকেছেন। তবে আলোচিত দালাল আইনের আওতায় ক্ষুদ্র সংখ্যক *উলামাকে* আটক করা হয়েছিলো এবং প্রায় শতভাগ ক্ষেত্রে বিনা সাজায় *উলামা* মুক্ত হয়ে তার লোকালয় ও সমাজে ফিরেও এসেছেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের অনেক সময় পরে রাজনৈতিক

---

[৫] খন্দকার আবুল খায়ের, *১৯৭১-এ কি ঘটেছিল রাজাকার কারা ছিল*, যশোর : তৌহিদ প্রকাশনী (৩য় সংস্করণ), ১৯৯২: ১০৪, ১০৫।

প্রতিপক্ষ 'রাজনীতির স্বার্থে' *উলামার* বিরুদ্ধে তথ্য-যুক্তি-ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে চলেছেন। বিপরীতে *উলামার* পক্ষ থেকেও এসব অভিযোগের যুক্তি ও তথ্যভিত্তিক জবাব প্রদানে পর্যাপ্ত উদ্যোগ-আয়োজন দেখা যায় না। ফলে নতুন প্রজন্মসহ দেশবাসী *উলামার* বিষয়ে ব্যাপকভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে থাকেন। জনগণের এ বিভ্রান্তি *উলামার* রাজনৈতিক *প্রভাব* বিস্তারে এক বড় বাধা হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

ফ. কার্যকর ও টেকসই জোট গঠনে ব্যর্থতা

সমগ্র অথবা বেশিরভাগ *উলামার* কার্যকর ও টেকসই একটি জোট গঠনে *উলামার* ব্যর্থতাকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তারে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনে *উলামার* সক্ষম না হবার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের *উলামা* কয়েক দফায় জোট গঠনের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সে জোট পর্যাপ্ত কার্যকর ও টেকসই প্রমাণিত হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে *উলামা* প্রথম ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করেন ১৯৭৬ সালে। এ বৎসর ২৪ আগস্ট কয়েকটি ইসলামপন্থী দলের (জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফতে রাব্বানী পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি, বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি, ইমারত পার্টি প্রভৃতি) নেতা-কর্মীরা ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) গঠন করেন। কিন্তু 'ঐক্যবদ্ধ' এ দলটি এক বৎসরের মাথায় ভাঙ্গনের মুখোমুখি হয়। তৎকালীন সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক দলবিধির আওতায় গঠিত দল আইডিএলের প্রতিষ্ঠার বৎসরান্তে 'দলীয় কাউন্সিল' আয়োজনের বাধ্যবাধকতা ছিলো। দলটির চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারী জেনারেল যথাসময়ে দলীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠানের উদ্যোগ না নেয়ায় ১৯৭৭ সালের ২৩ অক্টোবর দলটির 'রিকুইজিশন কাউন্সিলের'[৬] আয়োজন করা হয়। দলটির চেয়ারম্যান মাওলানা সিদ্দিক আহমদ ও সেক্রেটারী জেনারেল এডভোকেট শফিকুর রহমান 'রিকুইজিশন কাউন্সিলের' বিরোধিতা করেন ও তাতে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। কাউন্সিলটিতে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয়। পূর্ববর্তী চেয়ারম্যান মাওলানা সিদ্দিক আহমদ আইডিএল নামে আরো কিছুদিন দলীয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখে অবশেষে তার 'মূল দল' নেজামে ইসলাম পার্টি পুনরুজ্জীবিত করেন। আইডিএলের জেলা, থানা প্রভৃতি স্থানীয় কমিটিসমূহ গঠনের পর দেখা যায় এ সব নেতৃত্ব কাঠামোয় সাবেক জামায়াতের নেতা-কর্মীরাই অধিকাংশ পদ-পদবী লাভ করেন। অন্য দলসমূহের নেতা-কর্মীদের বেশির ভাগই উপেক্ষিত হয়েছেন। এতে অন্য 'সাবেক দলসমূহের' নেতা-কর্মীরা ভাবতে শুরু করেন 'তাঁদেরকে সাবেক জামাআতের স্বার্থে ব্যবহার করার লক্ষ্যেই ঐক্যবদ্ধ ইসলামী আন্দোলনের নামে আইডিএল গঠন করা হয়েছে।'।[৭] দলীয় কাউন্সিল আহ্বানে মাওলানা সিদ্দিক আহমদ ও

---

৬ নূর হোসেন মজিদী, *মওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ১৭০।

৭ *তদেব*, পৃ. ১৬৯।

এডভোকেট শফিকুর রহমানের অনাগ্রহের পেছনে এ 'ভাবনাকে' প্রধান কারণ বলে মনে করা হয়। দলীয় বার্ষিক কাউন্সিল আহ্বানে চেয়ারম্যান-সেক্রেটারী জেনারেলের অনীহার প্রেক্ষাপটে 'প্রতিবাদী নেতা-কর্মীদের' আইডিএলের 'রিকুইজিশন কাউন্সিল' আহ্বান করার মাধ্যমে 'ঐক্যবদ্ধ ইসলামী দল আইডিএল' প্রথম ভাঙ্গনের মুখে পড়ে। এ ক্ষেত্রে নীতিগত দিক থেকে এবং বাহ্যত 'রিকুইজিশন কাউন্সিল' আহ্বানকে 'নির্দোষ'এবং প্রয়োজনীয় উদ্যোগ হিসেবে স্বীকার করার সুযোগ আছে। তবে এ ঘটনার এক বৎসরের কম সময়ের ব্যবধানে অধ্যাপক গোলাম আজম বাংলাদেশে ফেরার (১১ জুলাই ১৯৭৮) পর সাবেক জামায়াতের নেতা-কর্মীদের একটি অংশ 'আইডিএল হত্যা প্রক্রিয়ায়' পরিকল্পিতভাবে অংশ নেন। তারা ১৯৭৮ সালের শেষ দিকে অধ্যাপক গোলাম আযমকে জামায়াতের 'অঘোষিত' আমীর *নির্বাচিত* করেন। ১৯৭৯-র মার্চে জামায়াত 'আনুষ্ঠানিকভাবে' কার্যক্রম শুরু করলেও অধ্যাপক গোলাম আযম দলটির 'অনানুষ্ঠানিক কিন্তু কার্যকর' আমীর হিসেবে কয়েকমাস আগে থেকেই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ১৯৭৯ সালের ২০ আগস্ট জামায়াতের মজলিসে শুরার বৈঠকে 'আইডিএল বন্ধ' করে দেয়ার এবং আইডিএলের ছয় সংসদ সদস্যকে জামায়াতে যোগদানের নির্দেশ দেয়া হয়। সেই সাথে বলা হয়, জামায়াতে যোগদান না করার অর্থ 'জামায়াত ত্যাগ' এবং 'এ জামায়াত ত্যাগ ইসলাম-ত্যাগের সমতুল্য।'[৮] এসব কার্যক্রমের আলোকে বলা চলে, বাংলাদেশের প্রথম ঐক্যবদ্ধ ইসলামী দল আইডিএল ভেঙ্গে দেয়া বা একে অকার্যকর করার দায় তৎকালীন আইডিএল-এ থাকা 'জামায়াতপন্থী' জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের। আইডিএলকে বাংলাদেশের প্রথম *উলামা* নেতৃত্বের দল বলেও স্বীকার করা যেতে পারে।

হাফেয্‌জী হুজুর নামে খ্যাত *আলিম* ও পীর মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহর নেতৃত্বে একটি ১১ দলীয় ইসলামী জোট গঠিত হয় ১৯৮৪-র নভেম্বরে। স্মরণ করা যেতে পারে, পত্র প্রেরণ ও সাক্ষাতের মাধ্যমে তিনি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোচিত হতে শুরু করেন। ১৯৮১-র প্রেসিডেন্ট নিবাচনে অংশ নিয়ে তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৮১-র ২৯ নভেম্বর তিনি বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন নামে একটি দল গঠন করেন। ১৯৮৩-র ২৩ জুলাই ঢাকার কামরাঙ্গীরচরস্থ তার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় দেশের প্রায় সকল দলের নেতাদের গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে তিনি ব্যাপকভাবে আলোচিত হন। গোলটেবিল বৈঠকটির ধারাবাহিকতায় ১১টি দলের সমন্বয়ে ১৯৮৪-র নভেম্বরে তার নেতৃত্বে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। ঐ জোট ৩ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেঃ ১. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের অপসারণ, ২. একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ এবং ৩. গণভোটের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত ইসলামী সংবিধান অনুমোদন।[৯] এ জোট ১৯৮৬-র তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন

---

[৮] *তদেব*, পৃ. ১৮৩।

[৯] *তদেব*, পৃ. ২২২।

পর্যন্ত টিকেছিলো। জোটটির ৩ দফা কর্মসূচির প্রথমটি ছিলো 'গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের অপসারণ।' কিন্তু জোটের মূল নেতা হাফেয্জী হুজুরের দল বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন 'ক্ষমতাসীন সরকার অব্যাহত রাখার' সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় জোটটি আর টিকে থাকতে পারেনি।

এরপর ১৯৮৭-র ১৩ মার্চ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে ইসলামী দলসমূহের একটি জোট (৩ মার্চ ঢাকার হোটেল শরীফ ইন্স-এ জোটের ঘোষণা দেয়া হয়) গঠিত হয়। চরমোনাইর পীর হিসেবে খ্যাত মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম এ জোটের 'প্রধান মুখপাত্র' নিযুক্ত হন। এ জোটটি এক পর্যায়ে ১৯৯০সালে[১০] প্রধান মুখপাত্র মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীমের নেতৃত্বে একটি 'দলে' পরিণত হয়। কারো মতে, ১৯৯১-র পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনকে 'দলে পরিণত' করার 'প্রক্রিয়া' শুরু করা হয়।[১১] ফলে 'জোট' হিসেবে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৯১-র পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশের *উলামা* পুনরায় একটি জোট গঠন করেন। নাম রাখেন *ইসলামী ঐক্যজোট*। শরীকদল হিসেবে ছিলো বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, ইসলামী মোর্চা, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ও ফরায়েজী জামায়াত। নির্বাচনে জোটের প্রার্থী হিসেবে খেলাফত মজলিসের নেতা মাওলানা ওবায়দুল হক (জকিগঞ্জ, সিলেট) নির্বাচিত হন। ১৯৯৬-র সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন ইসলামী ঐক্যজোট ত্যাগ করে।

২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ জোটের ৩ জন প্রার্থী (ইসলামী মোর্চার নেতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস ও খেলাফত মজলিসের নেতা মুফতি শহীদুল ইসলাম) নির্বাচিত হন। ইসলামী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠিত হয় শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হককে চেয়ারম্যান এবং মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে মহাসচিবের দায়িত্ব প্রদান করে। দীর্ঘ দিন, এক দশক, নেতৃত্বের এ কাঠামোতেই ইসলামী ঐক্যজোট কার্যক্রম পরিচালনা করে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশের বেশি আসনে বিজয়ী হয়। নির্বাচনের পর মুফতি ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্বে ইসলামী ঐক্যজোটের শরীক দলগুলো জোটের নতুন নেতৃত্ব কাঠামো গঠনের উদ্যোগ নেয়। শায়খুল হাদীসের নেতৃত্বে খেলাফত মজলিস এ উদ্যোগের সাথে ভিন্নমত প্রকাশ করে বিদ্যমান নেতৃত্ব-কাঠামো অব্যাহত রাখার কথা বলে। বাহ্যত দ্রুততার সাথেই মুফতি ফজলুল হক আমিনী খেলাফত মজলিস ছাড়া জোটের অন্য শরীক দলগুলোর সমর্থনে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান নির্বাচিত

---

[১০] মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

[১১] নূর হোসেন মজিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩।

হতে সক্ষম হন। এ নেতৃত্বের কাঠামোতে শায়খুল হাদীসকে জোটের উপদেষ্টা নিযুক্ত করা হয়। বিপরীতে *শায়খুল হাদীসের* নেতৃত্বে খেলাফত মজলিস ইসলামী ঐক্যজোটের পূর্ববর্তী নেতৃত্ব-কাঠামোর মহাসচিবের দায়িত্ব থেকে মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে বাদ দিয়ে (বহিস্কার?) জোটের যুগ্ম মহাসচিব এআরএম আবদুল মতিনকে ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ঘোষণা করে। ইসলামী ঐক্যজোটের এ ভাঙ্গন-বিভক্তি রোধ করার জন্য দেশের শীর্ষ *উলামা* এবং কয়েকজন সৌদী *আলিম* একাধিকবার উদ্যোগ নিয়েও ব্যর্থ হন। পর্যবেক্ষক মহল 'ইসলামী ঐক্যজোটের' এ পর্যায়ের ভাঙ্গন-বিভক্তির পিছনে জোট সরকারের 'মন্ত্রিত্ব লাভের' ইচ্ছাকে মূল নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য বিবৃতি থেকে এই 'মন্ত্রিত্বের' প্রশ্নটি[১২] অনুধাবন করা যায়।

উপস্থাপিত বিবরণ থেকে *উলামা* নেতৃত্বের চারটি ঐক্যবদ্ধ দল-জোটের গঠন ও বিলুপ্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে। এ পর্যায়ে প্রশ্ন আসছে, বাংলাদেশে কার্যকর ও টেকসই *উলামা* নেতৃত্বের জোট কেনো গড়ে উঠছে না? এ প্রশ্নের জবাব পাবার জন্য বর্তমান গবেষক দেশের *উলামা* নেতৃত্বের দলগুলোর নেতৃত্ব ও ঘনিষ্ঠ পর্যায়ের কয়েকজনের লিখিত ও মৌখিক সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। তাতে যে বিষয়গুলো পাওয়া যায় তা হলো:

ক. অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অভাব,
খ. একক নেতৃত্বের শূন্যতায় যৌথ নেতৃত্ব গড়ে না তোলা,
গ. উপযোগী সাংগঠনিক ও নেতৃত্ব কাঠামোর অভাব,
ঘ. ইস্যুভিত্তিক ঐক্য,
ঙ. শিথিল সমঝোতা ও অঙ্গীকার,
চ. ঐক্যের বস্তুগত ভিত্তির অভাব ও
ছ. দলীয় অহমিকা, সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিক আত্মগরিমা।

ক. অবিসংবাদিত নেতৃত্বের অভাব

বাংলাদেশের *উলামার* মাঝে এমন নেতার তীব্র ঘাটতি রয়েছে, যাকে সমগ্র অথবা বেশিরভাগ *উলামা* বিনা বাক্যে, বিনা প্রশ্নে, বিনা বিসংবাদ-বিবাদে গ্রহণ করতে পারেন। সম্ভবত মাওলানা মোহাম্মদউল্লাহ হাফেযজী হুজুরকে বাংলাদেশের *উলামা* অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকার করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। কিন্তু মাওলানা মোহাম্মদউল্লাহ নিজেই ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুজ ও চলাচলে-উপস্থাপনায়-সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরনির্ভর। যখন তিনি দৃশ্যপটে আবির্ভূত হলেন এবং নেতৃত্বে বরিত হলেন, সে সময় পারিবারিক সদস্যদের সাহায্য ছাড়া তার নিয়মিত কার্যক্রম পরিচালনার শারীরিক সামর্থও ছিলো না। এই শারীরিক অসামর্থ ছাড়াও তার প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা ছিলো প্রায় শুন্যের কোঠায়। নেতৃত্ব, সমন্বয় ও পরিকল্পনার স্বকীয় যোগ্যতার অভাবে স্বীয় জীবদ্দশায় তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত *দল* খেলাফত আন্দোলন ও *১১ দলীয় জোট* সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ সংহত করতে ও টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাস্তবে মাওলানা

---

[১২] অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১ (ক)।

মোহাম্মদউল্লাহর ছিলো ব্যক্তিগত সততা, নির্লোভ চরিত্র, বিশ্বাসগত ঐকান্তিকতা, জ্ঞানের গভীরতা এবং বয়সের জ্যেষ্ঠতার যোগ্যতা। এসব যোগ্যতার কারণে আবেগের আকর্ষণে দেশের *উলামা* তার নেতৃত্বের প্রতি প্রায় নিঃশর্ত সমর্থন প্রদান করেছিলেন। কিন্তু ১১ দলীয় জোট 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের মাত্র দু'বৎসরের মাথায় যখন তিনি তার ঘোষিত 'তিন দফা কর্মসূচি বিরোধী' অবস্থান গ্রহণ করে জেনারেল এরশাদ ঘোষিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেয়ার সিদ্ধান্ত 'চাপিয়ে' দিতে চাইলেন, আবেগের আকর্ষণে তার চারপাশে সমবেত *উলামা* 'নীতি রক্ষার যৌক্তিক কারণে' তাকে ত্যাগ করেন। ভেঙ্গে যায় তার দল খেলাফত আন্দোলন ও তাতে নেতৃত্ব দেন তার দীর্ঘ দিনের অনুরাগী-সহকর্মী, *শায়খুল হাদীস* হিসেবে খ্যাতিমান, আল্লামা আজিজুল হক ও বর্ষীয়ান ওয়ায়েজ (বক্তা) মাওলানা আবদুল গাফ্ফার। দাবি করা হয়, নীতিরক্ষার যৌক্তিক তাগিদে খেলাফত আন্দোলনের বড়ো অংশটি শায়খুল হাদীসের অনুগামী হয়েছিলেন। বিলুপ্ত হয় *হাফেয্জী হুজুর* প্রতিষ্ঠিত ১১দলীয় জোট সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদও। হাফেয্জী হুজুর জীবিতাবস্থায়ই প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আবেগের সম্বল নিয়ে রাজনীতির আন্দোলন-সংগ্রাম দীর্ঘ দিন অব্যাহত রাখা যায় না। হাফেয্জী হুজুরের নেতৃত্বের এ ব্যর্থতার পর বাংলাদেশের *উলামার* মাঝে বাস্তবে আর কোনো অবিসংবাদিত *আলিম* নেতার উত্থান ঘটেনি। তাই 'অবিসংবাদিত নেতৃত্বের' যোগ্যতায় কেউ কার্যকর ও টেকসই *উলামা* জোটও গড়তে পারেননি।

খ. একক নেতৃত্বের শূন্যতায় যৌথ নেতৃত্ব গড়ে না তোলা

অবিসংবাদিত *আলিম* নেতৃত্ব না থাকার বাস্তবতায় *উলামা* নিজেদের মাঝে একটি যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেননি। ফলে একটি কার্যকর ও টেকসই *উলামা* নেতৃত্বের জোটও প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৯৯১সালে যে ইসলামী ঐক্যজোট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তাতে বৃহৎ শরীক দল খেলাফত মজলিসের শীর্ষ নেতা *শায়খুল হাদীসকে চেয়ারম্যান* হিসেবে সংশ্লিষ্টরা স্বীকার করেছিলেন। প্রতি বৎসর নেতৃত্ব (চেয়ারম্যান?) নির্বাচনের সমঝোতাও ছিলো বলে দাবি করা হয়। কিন্তু বাস্তবে দীর্ঘ দশ বৎসরের মেয়াদে ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান পরিবর্তন বা নির্বাচন বিষয়ে বাহ্যত কোনো কার্যক্রম-চিন্তা ভাবনার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। ইসলামী ঐক্যজোটে যৌথ নেতৃত্ব বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা থাকলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কাছাকাছি এসে এ জোটটি হয়তোবা খণ্ডিত হতো না।

গ. উপযোগী সাংগঠনিক ও নেতৃত্ব কাঠামোর অভাব

উপযোগী সাংগঠনিক ও নেতৃত্ব কাঠামোর অভাবও কার্যকর ও টেকসই *উলামা* জোট গঠনে একটি সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। *হাফেয্জী হুজুরের* সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ, চরমোনাইর পীরের নেতৃত্বের ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এবং *শায়খুল হাদীসের* নেতৃত্বের ইসলামী ঐক্যজোট-এর কোনোটিতেই ঘোষিত নেতৃত্বের কাঠামো ছিলো না (অথবা কার্যকর হয়নি) বা লিখিত গঠনতন্ত্র-ঘোষণাপত্র ছিলো না। বাংলাদেশের দু'টি বৃহৎ রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি (এরশাদ)-র দলীয় নেতৃত্ব কাঠামোয় প্রেসিডিয়ামের (সভাপতিমণ্ডলী) ব্যবস্থা ব্যাখ্যা হয়েছে। এটি একটি যৌথ

নেতৃত্ব কাঠামোর নিদর্শন। বাংলাদেশের বামপন্থী দলগুলোর জোটে 'আবর্তনমূলক নেতৃত্ব' কার্যকর ও টেকসই প্রমাণিত হয়েছে। *উলামা* নেতৃত্বের জোট গঠনের ক্ষেত্রে যৌথ নেতৃত্বের নিদর্শন বাংলাদেশের *উলামার* পর্যবেক্ষণে কখনো এসেছে তেমন প্রমাণ নেই। বস্তুত উপযোগী সাংগঠনিক ও নেতৃত্ব কাঠামোর অভাবে *উলামার* কার্যকর ও টেকসই জোট প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি।

ঘ. ইস্যুভিত্তিক ঐক্য

বাংলাদেশের *উলামা* বিভিন্ন সময়ে জোটবদ্ধ হয়েছেন এবং বাহ্যত সেসব জোটকে দীর্ঘমেয়াদী জোট ভাবার সুযোগ থাকে। বাস্তবে এ *উলামা* ইস্যুভিত্তিক ঐক্য পছন্দ করেন এবং কার্যত সংশ্লিষ্ট ইস্যুর অবসানে *উলামা* ঐক্যেরও অবসান ঘটে। সঙ্গত কারণেই টেকসই *উলামা* জোট প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

ঙ. শিথিল সমঝোতা ও অঙ্গীকার

বাংলাদেশের *উলামা* এ পর্যন্ত শিথিল অঙ্গীকারে বেশি আগ্রহী থেকেছেন, ঢিলেঢালা সমঝোতা পছন্দ করেছেন। তারই প্রমাণ *উলামার* অন্তত তিন দফায় জোটবদ্ধ হওয়া এবং খুব দ্রুতই জোটবদ্ধতার অঙ্গীকার ও সমঝোতা অস্বীকার করে পৃথক হয়ে যাওয়া। কোনো কোনো ভাষ্যকার-বিশ্লেষকের মতে, বাংলাদেশের *উলামা* কিছু ক্ষুদ্র-মাঝারী 'শরীয়তী মাসয়ালাহ' বা প্রশ্নে যেমন ভিন্নমত পোষণ করে অব্যাহতভাবে পৃথক অবস্থান নিয়ে থাকেন, জোট বা ঐক্যের বিষয়টিকেও তারা তেমন করেই বিবেচনা করে থাকেন। তাই *উলামার* জোট গঠন ও বিলুপ্তি অতি দ্রুত ঘটে থাকে। *উলামার* এই দৃষ্টিভঙ্গি একটি টেকসই ও কার্যকর জোট প্রতিষ্ঠায় একটি বড় অন্তরায় হিসেবে বিদ্যমান বলে মনে করা হয়।

চ. ঐক্যের বস্তুগত ভিত্তির অভাব

বাংলাদেশে টেকসই ও কার্যকর *উলামা* জোট গঠনের ক্ষেত্রে ঐক্যের বস্তুগত ভিত্তির অভাবকেও বড় কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের *উলামা* সকল কার্যক্রমের জন্য সওয়াব বা পরকালীন পূন্যের বিষয়টিকে উৎসাহ-আগ্রহের ভিত্তি হিসেবে সাধারণত বিবেচনা করে থাকেন। ঐক্য বা জোট গঠনের জন্যও সওয়াবের ভিত্তিকেই প্রাধান্যে রাখেন *উলামা*। আবার সওয়াব অর্জন অথবা 'পুঞ্জীভূত' করার আরো অসংখ্য পন্থা-প্রক্রিয়ার কথাও *উলামার* নিশ্চিতভাবেই জানা থাকে এবং যে কোনো মুহূর্তেই *উলামা* সওয়াব অর্জনের 'বিকল্প পন্থা-প্রক্রিয়াকে' অগ্রাধিকার প্রদানের কথা ভাবতে পারেন এবং বাস্তবে ভাবেন। ফলে *উলামা* জোট বা ঐক্য টেকসই হয় না। *উলামার* জোট বা ঐক্যের জন্য নির্দিষ্টভাবে এক বা একাধিক বস্তুগত ভিত্তি নির্ধারণ করা গেলে এবং পরবর্তী ব্যক্তিগত-গোষ্ঠীগত প্রাপ্তির ধারণা স্পষ্ট করা গেলে *উলামার* জোট অধিকতর টেকসই হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়।

ছ. দলীয় অহমিকা, সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিক আত্মগরিমা

বাংলাদেশে টেকসই ও কার্যকর *উলামা* জোট প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দলীয় অহমিকা, সংকীর্ণতা ও ব্যক্তিক আত্মগরিমা একটি বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। বাংলাদেশের

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক বলেন, 'ইসলামী আন্দোলনের জন্য ঐক্যের ব্যাপক প্রয়াস নেয়া হয়েছে, সফলতা আসেনি। বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন আত্মগরিমা পরিত্যাগ'।[১৩] ব্যক্তিগত আত্মগরিমার মতোই দলীয় অহমিকা ও সংকীর্ণতা ব্যাপকভিত্তিক এবং টেকসই *উলামা* জোট প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হিসেবে বিদ্যমান বলে প্রমাণিত হয়েছে।

কার্যকর ও টেকসই *উলামা* জোট বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের রাজনীতির প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ায় *উলামা* ব্যাপক ও গভীরভাবে অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করা হয়। ২০০১সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে *উলামার* একটি আংশিক বা খণ্ডিত জোট (ইসলামী ঐক্যজোট) চারদলীয় জোটের ব্যানারে অংশ নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে ব্যাপক স্বীকৃতি অর্জন করেছে, জাতীয় সংসদের ৩টি আসনে বিজয়ী হয়েছে এবং চারদলীয় জোটের বেশ কিছু প্রার্থীর বিজয়ে *নিয়ামকের* ভূমিকা পালন করেছে বলে স্বীকার করা হয়। সিলেটের 'ফুলতলীর পীর' হিসেবে খ্যাত আল্লামা আবদুল লতিফ চৌধুরী বলেন: 'ওলামায়ে কেরাম ঐক্যবদ্ধ হলেই ইসলামী হুকুমত কায়েম সম্ভব'।[১৪]

রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে উলামার সম্ভাবনা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তার প্রক্রিয়ায় *উলামার* সম্ভাবনার বিষয়টিকেও অনেক গবেষক-বিশ্লেষক বিবেচনায় রাখেন। সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলোকে এভাবে চিহ্নিত করা যায়:

১. রাজনীতি সচেতনতার প্রসার,
২. রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রসার,
৩. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তৎপরতা বৃদ্ধি,
৪. আধুনিক শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি,
৫. পাঠ্য তালিকার আধুনিকায়নে মনোযোগ বৃদ্ধি,
৬. প্রকাশনা-গণমাধ্যম বিষয়ে মনোযোগ বৃদ্ধি ও
৭. বৃহত্তর ঐক্য বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি।

১. রাজনীতি সচেতনতার প্রসার

বাংলাদেশের *উলামার* মাঝে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনীতি বিষয়ে সচেতনতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। *উলামার* এবং বিশেষত কওমী মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভকারী *উলামার* মাঝে রাজনীতি সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ *প্রভাব* বিস্তারকারী ভূমিকা পালন করেন মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ *হাফেয্জী হুজুর*।

> 'হাফেজ্জী হুজুর রাজনীতির অঙ্গনে আসার কারণে কাওমী মাদ্রাসার আলিমদের রাজনীতি করার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কারণ তারা মনে করতেন শুধুমাত্র কতিপয়

---

১৩ *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৪ মার্চ ২০০৩।

১৪ *তদেব*, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০০২।

লোক এ কাজ করলেই অন্যান্যদের ফরজে কেফায়া আদায় হয়ে যাবে। *হাফেজ্জী হুজুর* এ পথে আসায় তাদের সে ভুল ভেঙ্গে যায়'।[১৫]

বাস্তবেই বিষয়টি এমন ছিলো। নবতিপরবৃদ্ধ মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহর আহ্বানে বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যক *আলিম* রাজনীতি বিষয়ে আগ্রহী ও সচেতন হয়ে ওঠেন। তবে এ-ও স্বীকার করতে হবে, মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ-সৃষ্ট *উলামার* মধ্যকার রাজনীতি বিষয়ক সচেতনতা, আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস একদিকে ছিলো সামুদ্রিক জলরাশির ফেনার মতো এবং অন্যদিকে ছিলো রাজনৈতিক কুশলতামুক্ত এক স্থূল ও অপরিকল্পিত-অপরিণামদর্শী যাত্রা। ফলে তার জীবনকালেই *উলামার* মাঝে সৃষ্ট আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস ক্রমশ ম্রিয়মান হতে দেখা গেছে এবং তার সৃষ্ট রাজনৈতিক দল (খেলাফত আন্দোলন) বিভক্ত হয়েছে ও 'খেলাফত প্রতিষ্ঠাকামী' ১১দলীয় জোট 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' বিলুপ্তি বরণ করেছে। তার প্রতিষ্ঠিত দলটি তার জীবনকালেই 'পারিবারিক উত্তরাধিকার সূত্রের নেতৃত্বে' পরিচালিত (বড় ছেলে মাওলানা আহমদ উল্লাহ আশরাফ, অন্য ছেলেরা এবং জামাতা মুফতি ফজলুল হক আমিনীর নেতৃত্ব। অবশ্য সহসাই দলটির নেতৃত্ব থেকে জামাতা মুফতি আমিনীও চ্যুত হয়েছেন অথবা সরে এসেছেন এবং অতঃপর নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়েছেন) হতে শুরু করে। খেলাফত আন্দোলন নামের এ দলটি রাজনৈতিক ও নির্বাচনী নীতি ও কৌশল প্রণয়নে এতোটাই ব্যর্থতার প্রমাণ রাখে যে, ১৯৮৬-র তৃতীয় জাতীয় সংসদ থেকে শুরু করে ২০০১-এর অষ্টম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত প্রতিটি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিয়ে একটি আসনেও বিজয়ী হতে সক্ষম হয়নি। রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কুশলতার ক্ষেত্রে মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ ও তার উত্তরাধিকারীদের এতো ব্যাপক দুর্বলতার পরও স্বীকার করা দরকার, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাদী *উলামাকে* রাজনীতিমুখী করার ক্ষেত্রে তিনি সবার চাইতে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

২. রাজনৈতিক সক্রিয়তার প্রসার

বাংলাদেশের *উলামা* ক্রমশ রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠছেন। ১৯৯১সালে *উলামা* নেতৃত্বের জোট 'ইসলামী ঐক্যজোট' গঠিত হবার পর এটি তিনটি জাতীয় নির্বাচনে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। অবশ্য ২০০১সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট 'চারদলীয় জোটের' একটি 'অংশীদার দল' হিসেবে অংশ নেয় এবং ৩টি আসনে বিজয়ী হয়। ১৯৯৪সালের ৩০ জুন 'রাষ্ট্রদ্রোহী ও ধর্মদ্রোহীদের' বিরুদ্ধে এ দেশের *উলামা* দেশব্যাপী প্রথমবারের মতো *পূর্ণ দিবস* হরতাল সফল করতে সক্ষম হন। ১৯৯৭-র ডিসেম্বরে *উলামা* ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ দেশের বিভিন্ন শহরে 'ধর্মবিদ্বেষী এনজিও সমাবেশ' প্রতিরোধ কর্মসূচি পালনে সফলতা অর্জন করেন। এই *উলামা* ২০০১ সালের ৩ ও ৮ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী পূর্ণ দিবস হরতাল পালন করেন। এসব প্রকাশ্য ও ঘোষিত কার্যক্রম থেকে প্রতীয়মান হয়, সাম্প্রতিক বছরগুলোয় বাংলাদেশের *উলামার* মাঝে রাজনৈতিক সক্রিয়তার মোটামুটি প্রসার ঘটেছে।

---

[১৫] মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া, সাক্ষাৎকার, পরিশিষ্ট-১।

৩. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তৎপরতা বৃদ্ধি

ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা তথা 'খিলাফত' প্রতিষ্ঠা *উলামার* পার্থিব জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা একটি ব্যাপক ও বিপুল কার্যক্রমের ফলাফল হিসেবে অর্জনের বিষয়। *উলামার* পক্ষ থেকে ক্রমাগতভাবে সেই লক্ষ্য অর্জন বা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত হয়ে থাকে। 'প্রত্যয়' ব্যক্ত করা আর 'বস্তুগত' উদ্যোগ-আয়োজনের মাধ্যমে ক্রমশ 'লক্ষ্য' অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়া এক বিষয় নয়। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে *উলামা* কার্যকর বস্তুগত উদ্যোগ-আয়োজনের প্রতিও ধীর গতিতে অগ্রসর হচ্ছেন বলে প্রতীয়মান হয়। দেশব্যাপী স্থায়ী ও কার্যকর সাংগঠনিক জালকর্ম প্রতিষ্ঠা, দেশব্যাপী স্থানীয় পর্যায়ে গতিশীল ও যৌক্তিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, অনুকূল জনমত গঠন, বিভিন্ন কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন, জনপ্রতিনিধিত্বশীল ও প্রশাসনিক সংস্থা-সংগঠনসমূহে প্রবেশাধিকার অর্জন প্রভৃতি 'সাধারণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার' বস্তুগত 'এককসমূহের' শর্তপূরণে বাংলাদেশের *উলামার* আগ্রহ ও প্রস্তুতি বিভিন্ন মাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছে।

৪. আধুনিক শ্রেণীর সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

বাংলাদেশের *উলামা* ক্রমশ দেশের বস্তুগত শিক্ষায় শিক্ষিতজনদের সাথে বিভিন্ন সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করছেন। দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর একটি করে 'উলামা ফ্রন্ট' বা *উলামার* নেতৃত্বে একটি অঙ্গ সংগঠন রয়েছে। এ অঙ্গ সংগঠনের *উলামা* নেতৃত্ব সাধারণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সাথে মতামতের বিনিময় করে থাকেন। সমাজের অন্যসব শ্রেণী-পেশার মানুষদের সাথেও *উলামার* 'সহাবস্থানমূলক' কার্যক্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক শ্রেণীর সাথে *উলামার* এ সম্পৃক্ততা *উলামা* ও ইসলামী ব্যবস্থার প্রতি প্রথমোক্ত শ্রেণীর ভীতি ও ভুল ধারণা অবসানে সহায়ক হবার কথা।

৫. পাঠ্য তালিকার আধুনিকায়নে মনোযোগ বৃদ্ধি

উলামার পাঠ্য তালিকা সংশোধন ও আধুনিকায়নে মনোযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। রাষ্ট্রীয় অনুদানপুষ্ট 'আলিয়া' মাদ্রাসাসমূহে বেশ আগে থেকেই 'সাধারণ বস্তুগত' বিষয়াদির অন্তর্ভুক্তি ছিলো এবং জিয়াউর রহমানের শাসনামল থেকে ক্রমশ পাঠ্য তালিকায় এসব বিষয়াদির 'অংশ' বৃদ্ধি ও 'উন্নীত' করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এসব মাদ্রাসায় 'বিজ্ঞান' বিষয়ের পাঠদান শুরু হওয়ায় চিকিৎসা ও প্রকৌশল-প্রযুক্তি বিদ্যার উচ্চতর ডিগ্রী অর্জনেও *'আলিম'* শিক্ষার্থীরা সক্ষম ও সফল হয়েছেন। এর ফলে বর্তমানে অন্যসব পেশাজীবীদের মতো চিকিৎসা ও প্রকৌশল পেশাতেও *আলিম* সদস্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। অন্যদিকে সম্পূর্ণ বেসরকারি-ব্যক্তিগত উদ্যোগ-পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত ও পরিচালিত 'কওমী' মাদ্রাসাসমূহে ইতোমধ্যে 'বস্তুগত পাঠ্যবিষয়াদির' অন্তর্ভুক্তি যথেষ্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। যুগের দাবি পূরণে এসব মাদ্রাসাও কম-বেশী মনোযোগী হচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। দাবি করা হয়, ভারতের উত্তর প্রদেশস্থ 'দারুল উলুম দেওবন্দ' (দেওবন্দ মাদ্রাসা নামে খ্যাত) থেকে পাঠ গ্রহণকারী মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা ইয়াহ্ইয়া কান্ধলভী,

মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী কলেজ-ভার্সিটি পড়ুয়া ছাত্রদের জন্য স্বল্পমেয়াদী ইসলামী বিষয়াদি পাঠদানের প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন। মাওলানা থানভী এ জন্য পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত ও পুস্তক রচনার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন বলেও দাবি করা হয়।[১৬] দাবি করা হয়, পূর্ববর্তী *উলামার* আকাঙ্খার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাওলানা সালমান ১৯৮৫-র ১ জুলাই ঢাকার মিরপুরে তেমন পাঠ্য তালিকাসমৃদ্ধ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন, খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা সাইয়েদ হাসান আলী নদভী যার নাম রাখেন 'মাদ্রাসা দারুর রাশাদ'। এ মাদ্রাসাটি ২০০১ সালের মার্চে 'ইদারাতুল মা'আরিফ' নামের একটি বিভাগ চালু করে, যাতে 'সাহিত্য-সাংবাদিকতা, গবেষণা ও বৃত্তিমূলক' শিক্ষা দেয়া হবে।[১৭] বাহ্যত এটি একটি চমৎকার ও আগ্রহ সৃষ্টিকারী ইতিবাচক উদ্যোগ। বাংলাদেশের *উলামার* পাঠ্য তালিকা আধুনিকায়নে সৃষ্ট এ আগ্রহকে একটি বিশেষ সম্ভাবনার দিক হিসেবে স্বীকার করা যায়।

৬. প্রকাশনা ও গণমাধ্যম বিষয়ে মনোযোগ বৃদ্ধি

বাংলাদেশের *উলামার* জন্য সম্ভাবনার আরেকটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে প্রকাশনা ও গণমাধ্যম বিষয়ে *উলামার* মনোযোগ বৃদ্ধি। প্রকাশনা ও গণমাধ্যমকে নিকট অতীতেও *উলামা* নেহায়েৎ তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। সাম্প্রতিক সময়ে *উলামার* সে দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গণমাধ্যম এবং নির্দিষ্টভাবে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে কয়েক বৎসর আগেও *উলামার* প্রবেশাধিকার ও অংশগ্রহণ প্রায় শূন্যের কোঠায় ছিলো। বেসরকারি উদ্যোগে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার (*চ্যানেল আই, ইটিভি, এটিএন বাংলা ও এনটিভি* প্রভৃতি) পর থেকে *উলামা* এসব মাধ্যমের সাথে ক্রমশ সংশ্লিষ্ট হয়েছেন ও প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ২০০১ সাল নাগাদ ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমে *উলামার* একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য সীমিত প্রবেশাধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। অন্যদিকে মুদ্রিত গণমাধ্যমেও এ সময়ে *উলামার* লেখালেখিসহ প্রবেশাধিকার দৃষ্টিগ্রাহ্য হতে থাকে। একই সময়ে *উলামার* উদ্যোগে বেশ কিছু সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রকাশনা পাঠকের হাতে পৌঁছুতে থাকে। এসব প্রকাশনার পাঠক কম-বেশী নির্দিষ্ট গণ্ডিভুক্ত। তবুও এ প্রক্রিয়ায় *উলামা* গণমাধ্যমের জগতে একটি আসন প্রতিষ্ঠার দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছেন। মাওলানা মুহিউদ্দিন খান সম্পাদিত ও প্রকাশিত প্রায় চার দশকের পত্রিকা *মাসিক মদীনা* ইতোমধ্যে ক্ষুদ্র হলেও একটি প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। এর বাইরে *উলামার* প্রায় প্রতিটি দল-সংগঠন-গোষ্ঠী এক বা একাধিক পত্রিকা (সাপ্তাহিক-মাসিক-ত্রৈমাসিক) প্রকাশ করে চলেছে (সারণি-৭ দ্রষ্টব্য)। গণমাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত এসব প্রকাশনার বাইরে *উলামার* উদ্যোগে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিভিন্ন বিষয় ও আকারের গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে *প্রভাব* বিস্তারের প্রক্রিয়ায় প্রকাশনা ও গণমাধ্যম বিষয়ে *উলামার* এ মনোযোগ বৃদ্ধি *উলামার* জন্য একটি উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করছে বলে প্রতীয়মান হয়।

---

[১৬] লিয়াকত আলী, "মাদরাসা দারুর রাশাদ : একটি ব্যতিক্রমধর্মী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান", *দৈনিক ইনকিলাব*, ১৭ মার্চ ২০০৩।

[১৭] *তদেব*।

৭. বৃহত্তর ঐক্য বিষয়ে আগ্রহ বৃদ্ধি

বাংলাদেশের *উলামার* বৃহত্তর ঐক্যের পক্ষে *উলামার* মাঝে আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতোমধ্যে *উলামা* নেতৃত্বের তিনটি জোট (সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও ইসলামী ঐক্যজোট) কেনো বিলুপ্ত হলো/ভেঙ্গে গেলো এবং একটি কার্যকর ও টেকসই *উলামা* নেতৃত্বের জোট প্রতিষ্ঠার জন্য কোন্ কোন্ শর্ত পূরণ করতে হবে-এমন একটি প্রশ্ন বর্তমান গবেষক কয়েকজন ইসলামপন্থী চিন্তাবিদ ও রাজনীতিতের নিকট করেছিলেন। তাদের মধ্যে সাংবাদিক-সাহিত্যিক-রাজনীতিক, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমীর ও সে সুবাদে ইসলামী ঐক্যজোটের কেন্দ্রীয় নেতা অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক ও সাংবাদিক-রাজনীতিক মাসুদ মজুমদার লিখিত জবাব দিয়েছেন {জবাবের পূর্ণপাঠ-পরিশিষ্ট -১(ক)}। অধ্যাপক আখতার ফারুক বলেছেন, 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ছিল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সর্বস্তরের ওলামা মাশায়েখ ও দ্বীনদার লোকদের সমন্বয়ে গঠিত নিছক একটি দ্বীনি সংগঠন। তদানিন্তন সরকারের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির জন্যেই ছিল তাদের আন্দোলন।'

অধ্যাপক আখতার ফারুকের এ মূল্যায়নের সাথে অনেকেই ভিন্নমত পোষণ ও প্রকাশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে দু'টো 'কারণ' বলা যেতে পারে। এক. 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ' নামের জোটটির 'পূর্ণনাম' ছিলো 'খেলাফত কায়েমের লক্ষ্যে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ।' একটি 'নিছক দ্বীনি সংগঠন' দ্বারা 'সরকারের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির' জন্য 'খেলাফত কায়েমের লক্ষ্য' নির্ধারণ করা পর্যাপ্ত যৌক্তিক কথা নয়। দুই. সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের ঘোষিত তিন দফা কর্মসূচি ছিলো: ক. গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন সরকারের অপসারণ, খ. একটি অন্তর্বর্তীকালীন বিপ্লবী সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পণ ও গ. গণভোটের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত ইসলামী সংবিধান অনুমোদন। 'ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টিকামী' 'নিছক একটি দ্বীনী সংগঠন'-এর পক্ষে 'গণঅভ্যুত্থান,' 'সরকার অপসারণ, 'বিপ্লবী সরকার' গঠন ও 'ইসলামী সংবিধান' রচনার মতো কর্মসূচি নির্ধারণও বেমানান কাজই বটে। তাই অধ্যাপক ফারুকের এ মূল্যায়ন গুরুতরভাবে খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ বিবেচিত হতে পারে। 'নাম নির্ধারণ' ও 'কর্মসূচি ঘোষণার' আলোকে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদকে একটি 'সম্ভাবনাময় জোট' ('সংগঠন' মাত্র নয়) হিসেবে চিহ্নিত করার পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

অধ্যাপক আখতার ফারুক লিখেছেন, 'বলা বাহুল্য, চরমোনাইর পীর সাহেব ও মুফতী আমিনী সাহেব শায়খুল হাদীস সাহেবের দীর্ঘ সময়ের প্রিয় ছাত্র। সে ক্ষেত্রে ছাত্ররা ক্ষেত্র বিশেষে ওস্তাদের সাথে অন্য কিছু করলেও সময়মতো ঠিক হয়ে যায়। ইত্যবসরে বরেণ্য ওলামা-মাশায়েখরা ঐক্যজোটকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। আশা করি শীঘ্রই এর সুফল দেখা দেবে।' এখানে অধ্যাপক ফারুক ইসলামী ঐক্যজোট বিভক্ত হবার কারণ হিসেবে 'ওস্তাদের সাথে' তার ছাত্রদের 'অন্যকিছু করা'কে চিহ্নিত করছেন। এমন মূল্যায়ন বড়ো সরলীকৃত বলে বিবেচিত হতে পারে।

অধ্যাপক ফারুক দেশের বরেণ্য *উলামার* 'ঐক্যমুখী' উদ্যোগের কথা বলেছেন। বস্তুত *উলামার* বৃহত্তর ও কার্যকর ঐক্যের বিষয়টি বাংলাদেশের *উলামার* প্রায় সর্বস্তরে গুরুত্ব অর্জন করেছে, এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ইতিবাচক সম্ভাবনা।

দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল ও সরকারের নীতি নির্ধারণ-নীতি বাস্তবায়নে *উলামার প্রভাব* বিস্তারের ক্ষেত্রে যে বহুমুখী ও বহুমাত্রিক সমস্যার কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এখন পর্যন্ত 'প্রকাশিত' এ সংশ্লিষ্ট সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো বিশেষভাবেই সে তুলনায় স্বল্প ও ক্ষুদ্র। ব্যাখ্যাকৃত সমস্যাগুলোর মাঝেই কার্যত সেগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের ধারণা ও উপায় চিহ্নিত করা সম্ভব।

সপ্তম অধ্যায়
উপসংহার

বাংলাদেশ অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার সময় থেকে রাজনীতিতে *উলামা* সংশ্লিষ্টতার সুযোগ পান অথবা সুযোগ গ্রহণ করেন। এরপর প্রাক-মুঘল আমল, মুঘল আমল, স্বাধীন সুলতানী ও নবাবী আমলে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক কার্যক্রমে *উলামা* বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও মাত্রায় ভূমিকা পালন করেন এবং প্রভাব বিস্তার করেন। 'পলাশীর পরাজয়'-পরবর্তী বৃটিশ-ভারতীয় আমলে *উলামা* আন্দোলন-সংগ্রাম-বিদ্রোহ-বিপ্লবের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত থাকেন। পাকিস্তানী আমলে *উলামা* পুনরায় রাজনৈতিক কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন ও কাঙ্খিত *প্রভাব* বিস্তারের চেষ্টা করেন। *উলামার* এ দীর্ঘ সময়ের রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ভূমিকা পালন ও *প্রভাব* বিস্তারের প্রচেষ্টা বিষয়ে 'রাজনীতিতে উলামা: বাংলাদেশ-পূর্ব উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপট' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

।।২।।

'বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা ও আলিমসমাজ' শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের *উলামার* শ্রেণী-ভাগ, মুক্তিযুদ্ধে *উলামার* ব্যাপক নিষ্ক্রিয়তার কারণ এবং এ সময়ে সক্রিয় ক্ষুদ্র সংখ্যক *উলামার* কার্যক্রম ও আচরণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ব্যাখ্যায় দেখা গেছে, ১৯৭০-এর নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে 'সমগ্র *উলামা*' গঠিতব্য আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে ছিলেন। কেউ এ দাবি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, কেউ মৌনতায় তা সমর্থন করেছেন। ভূট্টো-ইয়াহিয়া চক্র গণহত্যা চাপিয়ে দেয়ার পর রাজনীতি বিষয়ে সচেতন *উলামার* বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ গভীর নিশ্চলতা-নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেন। অবশিষ্ট সচেতন *উলামার* বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ও ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের পক্ষে শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনী প্রভৃতি 'কাঠামোতে' সম্পৃক্ত হন এবং অপর ক্ষুদ্র অংশের কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেন অথবা সমর্থনমূলক কার্যক্রমে সক্রিয় থাকেন, কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকে 'অগ্রহণযোগ্য' হিসেবে চিহ্নিত করে সামর্থমতো ঘনিষ্ঠ *উলামা* ও অন্যদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন ও নিজেরা 'প্রকাশ্য অবস্থান' গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। এই শেষোক্ত ক্ষুদ্র সংখ্যক *উলামার* তালিকায় জামায়াত নেতা মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীমের নাম নেয়া যায়। *উলামার* শ্রেণী-ভাগের ব্যাখ্যায় প্রতীয়মান হয়েছে, তৎকালে সমগ্র *উলামার* সর্বোচ্চ শতকরা দশ ভাগ চলমান রাজনীতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তারা সবাই শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষে ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে এই 'দশ ভাগ *উলামার* শতকরা অন্তত সত্তর ভাগ' গভীর নিশ্চলতা-নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করেন। 'সমগ্র *উলামার*' অবশিষ্ট শতকরা প্রায় 'তিন ভাগ' *উলামার* বৃহৎ অংশ (৬০%-৮০% বা সমগ্র উলামার ১.৬%-১.৮%) 'ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান' রক্ষা বা 'পাকিস্তানের ভূ-খণ্ডগত সংহতি' রক্ষার লক্ষ্যে 'শান্তি কমিটি' গঠন করেন অথবা সামরিক বাহিনীর প্রতিষ্ঠিত সহায়ক রাজাকার প্রভৃতি বাহিনীর সাথে সম্পৃক্ত হন। বাংলাদেশী *উলামার* আরেকটি ক্ষুদ্রাংশ (সমগ্র *উলামার* ১.২%-১.৪% প্রায়) পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যা বিরোধী কার্যক্রম ও

সক্রিয় মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন এবং অথবা শান্তি কমিটি বা রাজাকার বাহিনীর সাথে *উলামার* (এবং ইসলামপন্থীদের) সম্পৃক্ততা ও সংশ্লিষ্টতাকে অগ্রহণযোগ্য আচরণ হিসেবে চিহ্নিত করে *উলামা* (ও ইসলামপন্থীদের)কে তা থেকে বিরত রাখার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য চেষ্টা চালান।

'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে ১৯৭১-র ২৫ মার্চ মধ্যরাত থেকে শুরু হওয়া গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমগ্র *উলামা* অথবা অন্তত রাজনীতি সচেতন ১০% *উলামা* কেনো অংশ নিতে পারেননি অথবা সক্রিয় হতে পারেননি, এ অধ্যায়ে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে *উলামার* সক্রিয় না হবার অথবা সক্রিয় হতে না পারার সাতটি কারণ অথবা প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলো হলো:

১. আওয়ামী লীগ ও ভারতভীতি,
২. ভারত গমনে বাধা ও ঝুঁকি,
৩. সব দলকে সাথে রাখতে আওয়ামী লীগের অনীহা,
৪. জনগণের করণীয় ও স্বাধীনতা বিষয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা,
৫. স্বাধীনতা ঘোষণায় সমাজতন্ত্রীদের অতি উৎসাহ,
৬. যুদ্ধের স্বরূপ উপলব্ধিতে *উলামার* ব্যর্থতা ও
৭. পাকিস্তান প্রীতি।

একটি সম্ভাব্য আবেগমুক্ত ও নিরাসক্ত পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত এ সাত কারণের মধ্যে যেমন আছে *উলামার* দূরদর্শী, অন্তর্দৃষ্টি ও উপলব্ধির সীমাবদ্ধতা, যেমন আছে সমাজতন্ত্রপন্থী ও ভারতীয় পক্ষের সৃষ্ট বিভ্রান্তি ও শঙ্কাজনক পরিবেশ, তেমনি আছে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদাতা আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবের পক্ষ থেকে প্রদর্শিত অসহযোগী আচরণ। ক্ষেত্র ও ঘটনা বিশেষে একাধিক কারণ চিহ্নিত করা গেলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে *উলামার* অংশ না নেয়ার পেছনে চিহ্নিত সবগুলো কারণ একই সাথে অথবা সমানভাবে কার্যকর ছিলো, তা বলার সুযোগ নেই। বর্তমান পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণে যেমন মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে *উলামার* অবস্থানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনি বর্তমান গবেষণা থেকে কয়েকটি 'তাৎপর্যপূর্ণ সত্য' স্বীকৃতি অর্জন করেছে। পরবর্তী কোনো গবেষণা থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশের *উলামার* 'অবস্থানগত সুনির্দিষ্ট তথ্য ও উপাত্তসমূহ' আশা করা যেতে পারে। স্বীকৃত তাৎপর্যপূর্ণ 'সত্যগুলোর' একটি হলো, *মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতীয় ভূমিতে আশ্রয় লাভ এবং যুদ্ধ পরিচালনায় ভারতীয় বস্তুগত সমর্থন-সাহায্য লাভ কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ ও রুশপন্থী রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-সমর্থকদের জন্য অনুমোদিত ছিলো, অন্য কারো জন্য নয়।* তাই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার বা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়ার জন্য ভারত গমন ও ভারতীয় সমর্থন যে পরিমাণ ও মাত্রায় প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হবে, 'জীবন-ঝুঁকির' কারণে ভারতে যেতে না পারার প্রেক্ষাপটে সচেতন *উলামার* যে অংশটি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা না করে নীরবতা-নিষ্ক্রিয়তা 'অবলম্বন' করেছিলেন তেমন *উলামার* প্রতি সে পরিমাণ ও মাত্রায় সহানুভূতিপূর্ণ অনুকূল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা ন্যায্য বিবেচিত হতে পারে।

।।৩।।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশে উলামা নেতৃত্বের দলগুলোর নেতৃত্ব কাঠামো পরীক্ষা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অর্ধেকের বেশি পদে *আলিম* সদস্য থাকলে একটি দলকে বর্তমান গবেষণায় '*উলামা* নেতৃত্বের দল' হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন বর্তমান গবেষণায় গৃহিত মানদণ্ডে বাংলাদেশে *উলামা* নেতৃত্বের দল হিসেবে বিদ্যমান। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কাঠামোয় *আলিম* সদস্যের পরিমাণ শতকরা ৫২.১৭% থেকে ১০০% (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কাঠামোয় *আলিম* সদস্যের পরিমাণ শতকরা ৫৪.২৮% থেকে ৯০.৯০% (সারণি-৩ দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশের আরেকটি সম্ভাব্য *উলামা* নেতৃত্বের দল নেজামে ইসলাম পার্টি। কিন্তু দলটির ঢাকাস্থ কেন্দ্রীয় অফিস ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সাথে অনেকবার সরাসরি, বাহক ও ডাক মারফত যোগাযোগ করেও দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনো তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। নেতৃত্বের তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব না হলেও দলটি একটি সম্ভাব্য *উলামা* নেতৃত্বের দল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে একটি সম্ভাব্য *উলামা* নেতৃত্বের দল বলে প্রায়শ অনুমান করা হয়। তালিকা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এ দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কাঠামোয় *আলিম* সদস্যের পরিমাণ শতকরা ২৫% থেকে ৩১.৩৬% (সারণি-১ দ্রষ্টব্য)। বর্তমান গবেষণায় গৃহিত মানদণ্ড (৫০% + *আলিম* সদস্য) অনুযায়ী এ দলটি *উলামা* নেতৃত্বের দল নয়।

বাংলাদেশের আইনসভা *জাতীয় সংসদে আলিম* সদস্যের একটি পরিসংখ্যান (সারণি-৪, ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য) এ অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। সর্বশেষ অষ্টম জাতীয় সংসদে সর্বোচ্চ পরিমাণ *উলামা* প্রতিনিধিত্ব (৫%) বিদ্যমান।

বাংলাদেশের সরকারসমূহের মধ্যে বিচারপতি আবদুস সাত্তার (১৯৮১, মাওলানা এম এ মান্নান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী), জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ (১৯৮৬, মাওলানা এম এ মান্নান, ত্রাণ ও ধর্মমন্ত্রী, ১৯৮৮, মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী), শেখ হাসিনা (১৯৯৬, মাওলানা নূরুল ইসলাম, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী) ও বেগম খালেদা জিয়া (২০০১, মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, কৃষিমন্ত্রী ও পরে শিল্পমন্ত্রী) সরকারে *আলিম* সদস্য দেখা গেছে। অন্য সরকারগুলোয় কোনো *আলিম* সদস্য ছিলেন না।

।।৪।।

'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ: বিভিন্ন শাসনামলে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায়ে বর্তমান গবেষণার প্রস্তাবিত সময়কালে (১৯৭২-২০০১) বাংলাদেশের সরকারসমূহ ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে *উলামা* নির্দিষ্টভাবে কোনো *প্রভাব* বিস্তার করেছেন কি-না, তা পরীক্ষা করা হয়েছে (সারণি-৮ দ্র.) এবং জবাব ইতিবাচক হলে *প্রভাব* বিস্তারের ক্ষেত্র ও ইস্যুগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

শেখ মুজিবের শাসনামল পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বৈরী পরিবেশ-প্রতিবেশ সত্ত্বেও এবং অনির্দিষ্ট-অস্পষ্ট-ব্যাপক আওতাসম্পন্ন 'দালাল আইন' প্রণয়ন করে তার অধীনে গ্রেফতার-বিচার করেও সাধারণভাবে বাংলাদেশের *উলামাকে* এবং নির্দিষ্টভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো *আলিমকে* মুক্তিযুদ্ধকালে খুন-ধর্ষণ-লুট-যুদ্ধাপরাধের মতো কোনো অপরাধের জন্য 'প্রমাণিত অপরাধী' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়নি এবং তাই শাস্তিও দেয়া যায়নি। শর্ষীনার তৎকালীন পীর মাওলানা আবু জাফর সালেহ অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে ও মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর অনুকূলে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি হিন্দু সম্পত্তি, এমনকি হিন্দু নারীদেরও, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (মাল-এ-গণীমত) হিসেবে লুণ্ঠনের পক্ষে ফতওয়া দিয়েছিলেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ[১] করা হয়। দালাল আইনে যথারীতি মাওলানা সালেহকে গ্রেফতারও করা হয়। বাস্তবে দেখা যায়, ১৯৭৩-র ৩০ নভেম্বর 'মুক্তিযুদ্ধকালীন দালালদের' প্রতি সরকার (বঙ্গবন্ধু?) প্রদত্ত সাধারণ ক্ষমার ঘোষণাটি পরদিনের (১ ডিসেম্বর ১৯৭৩) দৈনিকসমূহে প্রকাশের পাশাপাশি মাওলানা সালেহ-র মুক্তিলাভের সংবাদটিও প্রকাশিত হয়। দ্রুততম সময়ে তিনি 'সাধারণ ক্ষমা'র আওতায় মুক্তি পেয়েছিলেন। সাধারণ ক্ষমার ঘোষণায় স্পষ্ট করেই বলা ছিলো, খুন-ধর্ষণ-অগ্নিসংযোগ-যুদ্ধাপরাধের জন্য দায়ীরা এ সাধারণ ক্ষমার আওতায় পড়বেন না। তার সহজ অর্থ, মাওলানা সালেহ-র বিরুদ্ধে 'কার্যত এসব অপরাধের অভিযোগ ছিলো না বা বাস্তবে এসব অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি অথবা এসব অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।' মাওলানা সালেহ-র মতো আলোচিত *আলিমের* বিরুদ্ধেই যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হয়নি, সেখানে অন্য *উলামার* বিরুদ্ধে 'আমলযোগ্য অপরাধের' অভিযোগ উত্থাপন বা অভিযোগ প্রমাণ করতে না পারাই স্বাভাবিক ছিলো। এ ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ। 'আইনের' মারপ্যাচে ধূর্ত অপরাধীরা আদালতে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণে কখনো কখনো সক্ষম হয়ে থাকেন। কিন্তু 'সমাজের লোকেরা' অপরাধীকে ঠিকই চিহ্নিত করে থাকেন এবং 'সময়-সুযোগ' অনুকূল বিবেচিত হলে 'সমাজের লোকেরা' এবং নির্দিষ্টভাবে 'ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ' সংশ্লিষ্ট অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী মুজিব শাসনামলে মুক্তিযুদ্ধকালীন অপরাধের জন্য অনেক রাজাকার ও মুক্তিযোদ্ধার বিরুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তজনদের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে। দেশের মাদ্রাসাগুলো চালু করার মতো সাহসহারা *উলামা* সেদিনগুলোর বৈরী পরিবেশে নিজ নিজ লোকালয়-জনপদ-সমাজে নিশ্চিতভাবেই ব্যাপকভাবে আক্রান্ত ও নিহত হতেন, যদি তারা বাস্তবেই খুন-ধর্ষণ-লুট-যুদ্ধাপরাধের মতো অপরাধমূলক কার্যক্রমে মুক্তিযুদ্ধকালে গ্রাহ্য মাত্রায় জড়িত হতেন। *উলামার* বিরুদ্ধে এমন 'সামাজিক শাস্তির' তথ্যও প্রকাশিত হয়নি। 'জয়বাংলা' শ্লোগান দিতে অস্বীকৃতির জন্য বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের হাতে কয়েকজন *আলিম* ও ইসলামপন্থী নেতা-কর্মীর নিহত হবার তথ্য জানা যায়।[২] তাই নির্দিষ্ট করে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের *উলামা চিহ্নিত অপরাধমূলক কার্যক্রমের সাথে* উল্লেখযোগ্য মাত্রায় যুক্ত ছিলেন না।

---

১ মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ*, ঢাকা: প্রকাশক-মাহমুদ কলি, ১৯৯১।

২ খায়ের, ১৯৯০, পৃ. ১১৪-১১৫।

শেখ মুজিব শাসনামলের শুরুতে অনেক মাদ্রাসা বেশ কিছুদিন 'তালাবদ্ধ' ছিলো। এজন্য সরকারি কোনো নির্দেশনা ছিলো কি-না, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মাঝে মতের ভিন্নতা ও অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। মাদ্রাসাসমূহ বন্ধ রাখার আনুষ্ঠানিক সরকারি নির্দেশ না থাকলেও সম্ভবত 'বৈরী পরিবেশে সাহসের অভাবে' সংশ্লিষ্টরা মাদ্রাসাগুলোর পঠন-পাঠন কার্যক্রম শুরু করতে পারেননি। সে সময়ে সরকার বিরোধী সোচ্চার রাজনীতিক মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী 'বন্ধ মাদ্রাসাগুলো খুলে দেয়ার' জন্য[৩] একাধিকবার জনসভার ভাষণে সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছিলেন। মাওলানা ভাসানীর এ দাবি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হবার কারণে 'তালাবদ্ধ মাদ্রাসাগুলো' সচল করার অনুকূলে সরকারি অবস্থান সৃষ্টি অথবা সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের মাঝে মাদ্রাসাগুলো চালু করার মতো সাহস-উদ্যম সঞ্চারে মূল *প্রভাব* বিস্তারের কৃতিত্বটি মাওলানা ভাসানীর জন্যই নির্ধারিত হয়।

সারণি ৮: বাংলাদেশের সরকারসমূহ ও প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহের নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে *উলামার* প্রভাব বিস্তার

ক্র. নং	প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গ / ক্ষেত্র / ঘটনা	সময়কাল	প্রভাবিত সরকার/দল	প্রভাব বিস্তারকারী	প্রভাবের / সাফল্যের মাত্রা
১.	আশুরার সরকারি ছুটি পুনঃপ্রবর্তন	১৯৭২-৭৩	শেখ মুজিব সরকার	মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী	১০০%/বেশিরভাগ
২.	তালাবদ্ধ মাদ্রাসাসমূহ খুলে দেয়া	১৯৭৩	"	মাওলানা ভাসানী ও অন্যান্য	১০০%/বেশিরভাগ
৩.	রেডিও-টিভিতে কুরআন তেলাওয়াত পুনরায় চালু করা	১৯৭৩	"	মাওলানা ভাসানী, মাওলানা আঃ রশীদ তর্কবাগীশ ও অন্যান্য	১০০%/বেশিরভাগ
৪.	দাউদ হায়দারের নির্বাসন	১৯৭৪	"	সম্মিলিত উলামা	১০০%
৫.	ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা	১৯৭৫	"	মাওলানা ভাসানী, মাওলানা আঃ রশীদ তর্কবাগীশ ও অন্যান্য	১০০%/বেশিরভাগ
৬.	ওআইসি-র সদস্য পদ গ্রহণ	১৯৭৪	"	"	১০০%/অনির্দিষ্ট
৭.	৩টি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সংশোধন	১৯৭৬-৭৭	জিয়াউর রহমান সরকার	মাওলানা আবদুর রহীম	১০০%/অনির্দিষ্ট
৮.	ঢাকার জিরো পয়েন্টে মূর্তি নির্মাণ বাতিল	১৯৭৭	"	"	বেশিরভাগ
৯.	সংসদের অধিবেশন কক্ষে গমন-নির্গমনে মাথানত করার স্থলে 'সালাম' দানের রীতি চালু	১৯৭৯ (২য় জাতীয় সংসদ)	"	"	১০০%/বেশিরভাগ
১০.	সংসদে বিশিষ্ট জনদের মৃত্যুতে মুনাজাতের রীতি চালু	"	"	"	১০০%/বেশিরভাগ
১১.	সংসদের অধিবেশন চলাকালে নামাজের বিরতি ও আজান দিয়ে জামায়াতে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা চালু - ৮	"	"	"	১০০%/বেশিরভাগ
১২.	সংসদের প্রতিদিনের	"	"	"	১০০%/বেশিরভাগ

[৩] মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা*, ঢাকা: দারুস সালাম পাবলিকেশন্স (২য় সংস্করণ), ১৯৯৮।

ক্র. নং	প্রভাব বিস্তারের প্রসঙ্গ / ক্ষেত্র / ঘটনা	সময়কাল	প্রভাবিত সরকার/দল	প্রভাব বিস্তারকারী	প্রভাবের / সাফল্যের মাত্রা
	অধিবেশনের শুরুতে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান চালু-এজন্য নির্দিষ্ট ক্বারী নিয়োগ				
১৩.	মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন	জিয়া শাসনামল	"	মাওলানা এম এ মান্নান	১০০%/বেশিরভাগ
১৪.	মাদ্রাসা শিক্ষার 'সমমান' উন্নয়ন	১৯৮৪-৮৫	"	"	১০০%/বেশিরভাগ
১৫.	ইসলাম 'রাষ্ট্রধর্ম' ও শুক্রবার সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা	১৯৮৮	এরশাদ সরকার	পীর মাওলানা আবু জাফর সালেহ ও মাওলানা এম এ মান্নান	বেশিরভাগ /অনির্দিষ্ট
১৬.	হাইকোর্টের 'ফতওয়া নিষিদ্ধকারী' রায় ও ধর্মবিদ্বেষী এনজিও বিরোধী আন্দোলনের ফলে *কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন প্রণয়ন না করার ঘোষণা।*	শেখ হাসিনা শাসনামল ২০০১	শেখ হাসিনার সরকার ও আওয়ামী লীগসহ প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ	*শায়খুল হাদীস* আল্লামা আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ও অন্যান্য	১০০%

বাতিল ঘোষিত 'আশুরার সরকারি ছুটি' চালু করতে মুজিব সরকারের ওপর *প্রভাব* বিস্তারের কৃতিত্বও মাওলানা ভাসানী অর্জন করেন।

এর বাইরে রাষ্ট্রীয় রেডিও-টেলিভিশনে কুরআন তেলাওয়াত চালু করা, প্রথমে ইসলামিক একাডেমী চালু করা ও পরে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা, বাংলাদেশের ওআইসি-র সদস্য পদ গ্রহণ প্রভৃতি কার্যক্রমে শেখ মুজিব সরকারের ওপর পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ *প্রভাব* বিস্তারের দাবিদার হিসাবে মাওলানা ভাসানীর পাশাপাশি মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মাওলানা আলাউদ্দীন আল আজহারী প্রমুখের নাম স্মরণযোগ্য।

জিয়াউর রহমান শাসনামলে ক. রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির তিনটির সংশোধন, খ. ঢাকার জিরো পয়েন্টে মূর্তি নির্মাণের সরকারি সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার, গ. জাতীয় সংসদের মূল অধিবেশন কক্ষে গমন-নির্গমনের সময়ে মাথা নত করার রীতির স্থলে 'সালাম' প্রদানের রীতি প্রচলন, ঘ. জাতীয় সংসদে 'বিশিষ্টজনদের' ইন্তেকালে মুনাজাতের রীতি প্রচলন, ঙ. সংসদের অধিবেশন চলাকালে নামাজের বিরতি প্রদান ও আজান দিয়ে জামায়াতের সাথে নামাজ আদায়ের বিধান প্রচলন, চ. সংসদের প্রতি দিনের অধিবেশনের শুরুতে নির্ধারিত ক্বারীর মাধ্যমে কুরআন তেলাওয়াতের বিধান প্রচলন-এসব জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, সরকারি ও সংসদীয় নীতি-রীতি-বিধি প্রণয়ন-সংশোধন-বাস্তবায়নে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম প্রধান *প্রভাব বিস্তারকারীর* কৃতিত্ব অর্জন করেন।

জিয়াউর রহমান শাসনামলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের নেতা মাওলানা এম এ মান্নান মাদ্রাসা শিক্ষার অগ্রগতি ও মানোন্নয়নে সরকারি নীতিকে *প্রভাবিত* করেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

এরশাদ শাসনামলে ইসলামকে 'রাষ্ট্রধর্ম' ঘোষণা করা ও শুক্রবারকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার ক্ষেত্রে শর্ষিনার তৎকালীন পীর মাওলানা আবু জাফর সালেহ ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের নেতা মাওলানা এম এ মান্নান সরকারি নীতি নির্ধারক মহলকে *প্রভাবিত* করেন বলে দাবি করা হয়। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার 'সমমান' নীতি সংশোধন করে

মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য 'উন্নীত সমমান' প্রদানের ক্ষেত্রে মাওলানা এম এ মান্নান সরকারি নীতিতে *প্রভাবকের* ভূমিকা পালন করেন বলে মনে করা হয়।

খালেদা জিয়া শাসনামলে (১৯৯১-১৯৯৬) বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী দু'টি বিশাল রাজনৈতিক কর্মসূচি *উলামার* নেতৃত্বে পালিত হয়। একটি 'বাবরী মসজিদ লংমার্চ', নেতৃত্ব দেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক। অন্যটি লেখিকা তসলিমা ইস্যুতে 'ধর্মদ্রোহী-রাষ্ট্রদ্রোহী' বিরোধী দেশব্যাপী পূর্ণদিবস (৩০ জুন ১৯৯৪) হরতাল পালন, নেতৃত্ব দেন শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক, মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও মাওলানা মুহিউদ্দিন খান প্রমুখ। এ দু'টি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নের কোনো প্রসঙ্গ জড়িত ছিলো না। তবে এর ফলে দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ধর্ম বিরোধী নীতি-কর্মসূচি বিষয়ে গভীর সতর্কতা অবলম্বনের তাগিদ অনুভব করে বলে মনে করা হয়।

শেখ হাসিনা শাসনামলে ১৯৯৮-র ডিসেম্বরে ব্রাহ্মণবাড়িয়াসহ বিভিন্ন শহরে ধর্মবিদ্বেষী এনজিওসমূহের সমাবেশ প্রতিরোধ করেন *উলামা*। এতে নেতৃত্ব দেন মুফতি ফজলুল হক আমিনী। হাইকোর্টের 'ফতওয়া নিষিদ্ধকারী' রায়ের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলেন *উলামা*। ঢাকার পল্টন ময়দানে ২০০১-এর ২ ফেব্রুয়ারী *উলামা* আহুত বিশাল মহাসমাবেশে প্রধান অতিথি ও সভাপতি ছিলেন যথাক্রমে শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ও মুফতি ফজলুল হক আমিনী। ধর্ম বিদ্বেষী এনজিওসমূহকে বাহ্যত পৃষ্ঠপোষকতাদানকারী শেখ হাসিনা সরকার *উলামার* রাজনৈতিক উত্থান রোধের লক্ষ্যে 'জননিরাপত্তা বিঘ্নিত করার' অভিযোগে মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে ৩ ফেব্রুয়ারী (২০০১) ঢাকা থেকে এবং পুলিশ কন্‌স্টেবল হত্যার অভিযোগে ঢাকার অদূরে গাজীপুর থেকে ৪ ফেব্রুয়ারী গভীর রাতে *শায়খুল হাদীস* আল্লামা আজিজুল হককে গ্রেফতার করে। *শায়খুল হাদীস* ও মুফতি আমিনীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৬ ফেব্রুয়ারী স্থানীয় *উলামার* আহ্বানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে পূর্ণদিবস হরতাল পালিত হয়। শান্তিপূর্ণ হরতাল পালনকালে পুলিশ-বিডিআরের গুলীতে সেখানে ৬ জন (৮জন?) শাহাদৎ বরণ করেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিএনপি নেতৃত্বের ৪দলীয় জোটের আহ্বানে ৭ ফেব্রুয়ারী এবং *উলামার* আহ্বানে ৮ ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়।

মূলত *উলামার* নেতৃত্বে ধর্মবিদ্বেষী এনজিও ও ফতওয়া নিষিদ্ধকারী হাইকোর্টের রায় বিরোধী দেশব্যাপী গণআন্দোলনের ও আত্মত্যাগের প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী দল আওয়ামী লীগসহ দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আনুষ্ঠানিকভাতবে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়, *কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না।* এটি বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোঁর নীতি নির্ধারণে সম্মিলিত *উলামার প্রভাব বিস্তারের* একটি স্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

।।৫।।

'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজের প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়া: সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাংলাদেশের *উলামা* এবং নির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক *উলামা* কর্মসম্পাদন

প্রক্রিয়ায় যে সব প্রধান সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন তেমন ২২টি সমস্যা চিহ্নিত করে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এবং একই প্রশ্নে বাংলাদেশের *উলামার* জন্য বিদ্যমান সম্ভাবনাগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে *উলামার* জন্য চিহ্নিত সমস্যাগুলোর সবগুলো হয়তো একই সময়ে একইভাবে সমগ্র *উলামার* জন্য প্রযোজ্য নয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সমস্যাগুলো ভিন্ন মাত্রা ও আকারে বিদ্যমান। সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা ও ব্যাখ্যা করার প্রক্রিয়াতেই সেগুলোর সম্ভাব্য সমাধানের পন্থা-প্রক্রিয়া বিষয়ে ধারণা পাওয়া সম্ভব। এ ক্ষেত্রে *উলামার* জন্য বিদ্যমান সম্ভাবনার বিষয় ও ক্ষেত্রসমূহকে আরো কার্যকর পন্থায় ব্যবহার করে ও বিদ্যমান সমস্যাসমূহকে সমাধানের জন্য নীতিগত অঙ্গীকার ঘোষণা করে সক্রিয় হলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে *উলামার* কাঙ্খিত 'পার্থিব লক্ষ্য' অর্জন সম্ভব বলে তথ্যাভিজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞবৃন্দ বিশ্বাস করেন।

।।৬।।

বর্তমান গবেষণায় 'রাজনীতিতে *উলামার ভূমিকা*' বলতে ***বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিষয়াদিতে উলামার যে কোনো মাধ্যম ও পন্থায় (লেখা-বলা-করা) যে কোনো মাত্রার সক্রিয়তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে***। এ ধরনের একটি ব্যাপক ও নমনীয় আওতাসম্পন্ন সংজ্ঞা(সূত্র?)র প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে বাংলাদেশের *উলামার* ব্যাপক ও বিস্তৃত *ভূমিকা* নির্দেশ করা যাবে, তা-ই স্বাভাবিক। তবে বর্তমান গবেষণায় *ভূমিকার* বদলে *উলামার প্রভাব* চিহ্নিত করার বিষয়েই মূল মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে। রাজনীতির গোষ্ঠী তত্ত্বের (গ্রুপ থিওরী) আলোকে বাংলাদেশের *উলামাকে* যেমন একটি একক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (প্রেশার গ্রুপ) হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি সমগ্র *উলামাকে* চার শ্রেণী-ভাগের গোষ্ঠী হিসেবেও চিহ্নিত করা সম্ভব। সমগ্র *উলামা* একটি একক চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে রাজনীতিতে বিদ্যমান বলেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধর্ম, *উলামা* ও *উলামা*-স্বার্থ বিরোধী নীতি গ্রহণ ও কার্যক্রম থেকে সাধারণত বিরত থাকেন, *উলামাকে* দলভুক্ত, আকৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করতে চান, নিজেদের 'ধার্মিক' হিসেবে 'প্রকাশের' ক্ষেত্রে কখনো প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন, ধর্ম মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা-ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা-মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা-ওয়াক্‌ফ্ প্রশাসন প্রতিষ্ঠাসহ ধর্মসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানাদি প্রতিষ্ঠা ও পৃষ্ঠপোষকতায় মনোযোগ 'প্রকাশ' করেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে 'সমগ্র *উলামার*' চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে বিদ্যমানতা পরীক্ষা করার জন্য বাস্তবে প্রচুর ক্ষেত্র রয়েছে। আবার সমগ্র *উলামাকে* চার শ্রেণী-ভাগের চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসাসমূহসহ দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে *উলামা* কাজ করছেন, তাকে প্রাতিষ্ঠানিক চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (ইন্সটিটিউশনাল প্রেশার গ্রুপ) হিসেবে বিবেচনা করা যায়। জমিয়াতুল মোদাররেসীন, মাদাসা শিক্ষক সমিতি প্রভৃতি *সমিতির* সাথে সংশ্লিষ্ট *উলামা* সমিতিভুক্ত (এসোসিয়েশনাল) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত হতে পারেন। বিভিন্ন খান্‌কাহ-দরগাহ-সিলসিলা ও পীর-মুরীদী ধারার সাথে সংশ্লিষ্ট *উলামাকে* অসমিতিভুক্ত (নন-এসোসিয়েশনাল) চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলা যেতে পারে। দেশব্যাপী

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যক্তি পর্যায়ের *উলামা*কে রাজনীতির গোষ্ঠী তত্ত্বের 'তাৎক্ষণিক' (এনমিক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে স্বীকার করার সুযোগ রয়েছে। *উলামার* এ চার শ্রেণী-ভাগ নিজ নিজ 'স্বার্থ' (সংশ্লিষ্টরা জানেন, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর আরেক নাম স্বার্থ গোষ্ঠী বা ইন্টারেস্ট গ্রুপ) সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের অনুকূল নানামাত্রিক সক্রিয়তা অব্যাহত রাখে। এসব সক্রিয়তার যেমন তাৎক্ষণিক ফলাফল রয়েছে, মধ্য মেয়াদী ফলাফল রয়েছে, তেমনি রয়েছে দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল। এ সামগ্রিক ফলাফল নিয়েই *উলামা* বাংলাদেশের রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজ-সংস্কৃতির অনিবার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিদ্যমান রয়েছেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭২ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে বেশ কিছু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বিবর্তন, রূপান্তর ও উন্নয়ন ঘটেছে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি সাংস্কৃতিক (*রাজনৈতিক সংস্কৃতি*) পরিবর্তন সহজেই উপলব্ধি করা যায় এবং তা হলো বাঙালী সংস্কৃতির ইসলামায়ন। ১৯৭৫ পর্যন্ত যে আওয়ামী লীগ সর্বতোভাবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দল হিসেবে সক্রিয় ছিলো, এর পরবর্তী সময়ে এ দলটি এর শ্লোগানসহ বক্তব্যে প্রচুর ইসলামী শব্দ, পরিভাষা ও আচরণ (*লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- নৌকার মালিক তুই আল্লাহ* প্রভৃতি) গ্রহণ করেছে। এটি হয়েছে নানামাত্রিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার স্বার্থে, বিএনপিসহ বিভিন্ন মধ্য ও ডানপন্থী দলগুলোর সাথে নির্বাচনকেন্দ্রিক জনপ্রিয়তা অর্জনের দৌড়ে এগিয়ে থাকার প্রয়োজনে। বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে ১৯৭২ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়ে ইসলামায়ন প্রক্রিয়ায় এ দেশের আলিমসমাজের প্রভাবের বিষযটি নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আউয়াল, আবদুল, *বঙ্গবন্ধু : ইসলামিক মূল্যবোধ ও মুসলিম বিশ্ব*, ঢাকাঃ আওয়ামী উলামা পরিষদ, তারিখ নেই।
২. আলম, মাহবুবুল, *বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত*, ঢাকাঃ ১৯৮২।
৩. আলাভী, হামযা, *'পাকিস্তান ও ইসলাম : জাতিসত্তা, মতাদর্শ ও রাষ্ট্র'*, অনু : ডালেম চন্দ্র বর্মণ, *সমাজ নিরীক্ষণ*, ঢাকা, নভেম্বর ১৯৮৮।
৪. আযম, গোলাম, *আমার বাংলাদেশ*, ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৯৯৫।
৫. আসাদ, আবুল, *কালো পঁচিশের আগে ও পরে*, ঢাকাঃ ইতিহাস পরিষদ, ১৯৯০।
৬. আহমদ, কমরুদ্দীন, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকাঃ নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮২।
৭. আহাদ, অলি, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি (২য় সংস্করণ), ১৯৮৯।
৮. ইসলাম, সাইফুল, *স্বাধীনতা ভাসানী ভারত*, ঢাকাঃ বস্তু প্রকাশন, ১৯৯৩।
৯. ইয়াহইয়া, আবুল ফাতাহ্ মুহাম্মদ, *দেওবন্দ আন্দোলন : ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান* (২য় সংস্করণ), ঢাকাঃ কওমী পাবলিকেশন্স, ২০০০।
১০. উল্লাহ, মাহবুব ও অন্য সম্পাদকবৃন্দ, *আওয়ামী দুঃশাসন : একটি প্রামাণ্য দলিল*, ঢাকাঃ বাংলাদেশ গবেষণা কেন্দ্র, ২০০১।
১১. কাদের, আহমদ আবদুল, *ইসলামী আন্দোলন ও উলামা সমাজ*, ঢাকাঃ চিন্তাধারা প্রকাশনী, ১৯৯৪।
১২. খান, এলাহী নেওয়াজ, *শহীদের রক্তভেজা ব্রাহ্মণবাড়িয়া*, ঢাকাঃ রক্তপলাশ, ২০০১।
১৩. খায়ের, খন্দকার আবুল, *১৯৭১-এ কি ঘটেছিল রাজাকার কারা ছিল*, যশোর : তৌহিদ প্রকাশনী (৩য় সংস্করণ), ১৯৯২।
১৪. জলিল, মেজর এম এ, *মেজর জলিল রচনাবলী*, ঢাকাঃ মেজর জলিল পরিষদ, ১৯৯৭।
১৫. টাবী, আলী আকবর, *মুক্তিযুদ্ধে দৈনিক সংগ্রামের ভূমিকা*, ঢাকাঃ হালিমুল্লাহ্ খন্দর, ১৯৯২।
১৬. ডিএলআর, ঢাকাঃ *১৯৭৫।*
১৭. তাদনান, মোজাদ্দেদ হাসান, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্র্যাজেডি ৬ ফেব্রুয়ারী ২০০১*, ঢাকাঃ হৃদয় প্রকাশন, ২০০১।
১৮. নিযামী, খালিক আহমদ, *শাহ ওয়ালিউল্লাহর রাজনৈতিক পত্রাবলী*, মোহাম্মদ আবুল বাশার আখন্দ, অনু. ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।
১৯. ফয়সল, আবু ও মনসুর, আহমদ, *তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিদ্বেষ ও অপব্যাখ্যা*, ফরিদপুর : আমান প্রকাশনী, ১৯৯৩।

২০. ভূঁইয়া, এম এ ওদুদ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন*, ঢাকা: রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৮৯।

২১. মজিদী, নূর হোসেন, *মওলানা আবদুর রহীম (র.) : একটি বিপ্লবী জীবন*, ঢাকা: মাম্মী প্রকাশনী, ২০০৩।

২২. মান্নান, মোহাম্মদ আবদুল, *আমাদের জাতিসত্তার বিকাশধারা* (২য় সংস্করণ), ঢাকা: দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।

২৩. মাসকারেনহাস, এন্থনী, *বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ* (*বাংলাদেশ: এ লিগ্যাসী অব ব্লাড*-এর বাংলা অনুবাদ, মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান), ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ১৯৯৫।

২৪. মুরশিদ, গোলাম, *ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাংলাদেশ*, আলী আনওয়ার সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।

২৫. মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়* (২য় সংস্করণ), ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৭।

২৬. মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *একাত্তরের ঘাতক জামাতে ইসলামীর অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৯।

২৭. মোহাইমেন, এম.এ., *ঢাকা-আগরতলা-মুজিব-নগর*, ঢাকা: পাইওনিয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯।

২৮. মোহাম্মদ, হাসান, *বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিম সমাজের ভূমিকা: একটি পর্যালোচনা*, চট্টগ্রাম: চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিজ, সমাজ বিজ্ঞান, নভেম্বর ১৯৯১।

২৯. রহমান, তৌহিদুর (সম্পা.), *আদালতের কাঠগড়ায় ফতোয়া বিবাহ তালাক*, ঢাকা: আর আই এস পাবলিকেশন, ২০০১।

৩০. রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, খণ্ড ০২ ও ১৫, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৫।

৩১. রায়না, অশোকা, *ইনসাইড র' : দি ইন্ডিয়াস সিক্রেট সার্ভিস*, ঢাকা: মিলারস প্রকাশনী, ১৯৯৩।

৩২. রীয়াজ, আলী, *শেখ মুজিব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা: আনন্দধারা, ১৯৮৭।

৩৩. শওকত, মুহাম্মদ নূর হুসাইন, *আইডিএল : একটি বিপ্লবী চেতনা*, ঢাকা: দীয়া প্রকাশনী, ১৯৮০।

৩৪. সংবিধান, বাংলাদেশের, ১৯৭২ সালের ১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত *বাংলাদেশ গেজেট*-র অতিরিক্ত সংখ্যার প্রথম খণ্ড, ঢাকা।

৩৫. সংবিধান, বাংলাদেশের, ঢাকা: আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০০০।

৩৬. সাইয়িদ, অধ্যাপক আবু, *সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম*, ঢাকা: মুক্তি প্রকাশনী, ১৯৯২।

৩৭. হক, মাসুদুল, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ*, ঢাকা: প্রকাশক-মাহমুদ কলি, ১৯৯১।

৩৮. হাসান, মঈদুল, *মূলধারা '৭১*, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৮৬।

৩৯. *ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিরোধ আন্দোলন*, ঢাকা: চলতি প্রকাশনা, তারিখ বিহীন।
৪০. Ahmad, Aziz, *Islamic Modernism in India and Pakistan 1857-1964*, London: Oxford University Press, 1967.
৪১. Ahmad, Moudud, *Bangladesh: Quest for Autonomy*, Dhaka: UPL,1986.
৪২. Aqiqi, Bakhshieshi, *TEN DECADES OF ULAMA'S STRUGGLE*, Tehran : Islamic Propagation Organization, 1985.
৪৩. Badauni, Abdul Qadir, *Muntakhabut Tawarikh*, Vol. 2, in English, Calcutta : 1884.
৪৪. Badauni, Abdul Qadir, *Muntakhabut Tawarikh*, Vol. 3, in English, Calcutta : 1889.
৪৫. Binder, Leonard, *Religion and Politics in Pakistan*, Berkeley : University of California Press, 1963.
৪৬. Fadl, Abul, *Akbarnamah*, Vol. 2, in English, Calcutta : 1886.
৪৭. Fadl, Abul, *Akbarnamah*, Vol. 3, in English, Calcutta : 1886.
৪৮. Gibb, H.A.R and Bowen, Harold, *Islamic Society and West*, London: Oxford University Press, 1965.
৪৯. Jahan, Raunaq, *Pakistan: Failure in National Integration*, Dhaka: Oxford University Press, 1973.
৫০. Khan, Nawab Samsam ud Dawlah Shah Nawaz, *Mathirul Umara*, Vol. I, in English, Calcutta: 1888.
৫১. Khan, Nawab Samsam ud Dawlah Shah Nawaz, *Mathirul Umara*, Vol. 3, in English, Calcutta: 1894.
৫২. Lasswell, H.D. *Politics, Who Gets What, When, How*, New York: McGraw-Hill, 1936.
৫৩. Lasswell, H. & Kaplan, A. *Power and Society*, New Heaven: Yele University Press, 1950.
৫৪. Latif, Mohammad Abdul, *The Role of Ulama in Bengal Politics (1906-1947)*, unpublished Ph.D. Thesis, University of Dhaka, 1998.
৫৫. Lindzey, G, Ed., *Handbook of Social Psychology*, Vol. I, Cambridge: Mass : Adison-Wesley, 1954.
৫৬. Linton, R. *The Study of Man*, New York: Appleton-Century, 1936.
৫৭. Maniruzzaman, Talukder, *Radical Politics and Emergence of Bangladesh*, Dhaka: Bangladesh Book International, 1972.
৫৮. Mead, G. H. *Mind, Self and Society*, in C.W. Morris, Ed., Chicago: The University of Chicago Press, 1934.
৫৯. Morton, R.K. *Patterns of Influence*, in P.F. Lezerfeld & F. Stanton, Eds., *Communication Research*, New York: Harpers, 1949.
৬০. Neiman, L.J. & Hugher, J.W., *The Problem of the Concept of Role: a Re-survey of the Literature*, Vol. 30, 1951.
৬১. Qureshi, Ishtiaq Husain, *Ulema in Politics* (reprint), Delhi : Renaissance Publishing House, 1985.
৬২. Sarbin, T.R. *Role Theory*, in G. Lindzey, Ed., *Handbook of Social Psychology*, Vol. I, Cambridge: Mass : Adison-Wesley, 1954.
৬৩. Simon, H.A. "Notes on the Observation and Management of Political Power", *Journal of Politics*, Vol. 15, 1953.
৬৪. Smith, Donald Eugene, *Religion, Politics and Social Change in the Third World: A Source Book*, New York: The Free Press, 1971.
৬৫. Zaman, Muhammad Qasim, *The Ulama in Contemporary Islam : CUSTODIANS OF CHANGE*, Princeton : Princeton University Press, 2002.

পরিশিষ্ট ১

বাংলাদেশের রাজনীতিতে উলামার ভূমিকা ও প্রভাব বিষয়ে নির্দিষ্ট প্রশ্নমালাভিত্তিক সাক্ষাৎকারসমূহ

বর্তমান গবেষণাকর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য ছয়টি প্রশ্ন সংবলিত একটি প্রশ্নমালা কয়েকজন *আলিম* রাজনীতিক ও *উলামা*-রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও লেখকের নিকট লিখিত জবাবের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিলো। তাদের মধ্যে বিশিষ্ট *আলিম*-রাজনীতিক-লেখক-সম্পাদক ও ইসলামী ঐক্যজোটের সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান মাওলানা মুহিউদ্দিন খান এবং নেজামে ইসলাম পার্টির কার্যকরী সভাপতি মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী প্রশ্নমালার লিখিত জবাবের বদলে আংশিক মৌখিক সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। লিখিত জবাব দিতে প্রাথমিক সম্মতি জানিয়েও অবশেষে জবাব দানে অপারগতা প্রকাশ করেন জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম। সংশ্লিষ্ট প্রশ্নমালাটির লিখিত জবাব প্রদান করেন:

ক. *উলামা*-রাজনীতির বিশেষজ্ঞ ও প্রবীণ সাংবাদিক অধ্যাপক আবদুল গফুর (গফুর, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০০২),

খ. জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা আবু তাহের (তাহের, সেপ্টেম্বর ২৭, ২০০২),

গ. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর ও *উলামা*-রাজনীতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও লেখক অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের (কাদের, সেপ্টেম্বর ২২, ২০০২),

ঘ. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ (শফিকুল্লাহ, অক্টোবর ২২, ২০০২),

ঙ. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া (ইয়াহইয়া, অক্টোবর ২২, ২০০২) ও

চ. সাংবাদিক-গবেষক জনাব নূর হোসেন মজিদী (মজিদী, অক্টোবর ১১, ২০০২)।

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া সংশ্লিষ্ট প্রশ্নমালাটির জবাব ধারাবাহিকভাবে না দিয়ে একটি *টানা* জবাব দিয়েছেন। কেউ কেউ দু'-একটি প্রশ্নের জবাব দানে বিরত থেকেছেন।

প্রশ্ন-এক: *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে সাধারণভাবে এ দেশের আলিমদের ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠী-দলগত অবস্থান ও ভূমিকা বিষয়ে আপনার পর্যবেক্ষণ কী?*

অধ্যাপক আবদুল গফুর: পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি জমিয়তে উলামা হিন্দ, জামায়াতে ইসলামী, ইমারত পার্টি (আঞ্চলিক) প্রভৃতি সংগঠনের সংশ্লিষ্ট আলেমরা ছাড়া দেশে অন্যান্য অধিকাংশ আলেম সমর্থন দান করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অবশ্য সকল আলেমই পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কম-বেশি প্রচেষ্টা চালান। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকালে আলেম সমাজের একটি বৃহৎ অংশ পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী দেশে যে হত্যা ও ধ্বংস অভিযান চালায় তার সঙ্গে তাদের খুব কমই সংশ্লিষ্টতা ছিল। আলেমদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেন, তাদের মধ্যে এই ভীতি কাজ করেছিল যে, মুক্তিযুদ্ধে ভারতের প্রভাব থাকা এবং ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় জীবনে ভারতের প্রভাব পড়বে। ফলে বাংলাদেশ প্রকৃত অর্থে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না এবং এ রাষ্ট্রে ইসলামের প্রভাব খর্ব হবে।

অবশ্য আওয়ামী লীগ সমর্থক মওলানা অলিয়র রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী ওলামা পার্টির সংশ্লিষ্ট লোকেরা এবং পাকিস্তান সেনা বাহিনীর অত্যাচারে ত্যক্ত-বিরক্ত বহু গ্রাম্য আলেম, ইমাম, মুয়াজ্জেন ও

ধর্মপ্রাণ মুসলমান মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তারা মুক্তিযুদ্ধে গোপনে সহায়তাও দান করেন। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা এবং মুক্তিযুদ্ধ সমর্থনকারী জনগণের প্রতি অন্যায় নির্যাতনের জন্য যারা কুখ্যাতি অর্জন করে, সেই রাজাকার, আলবদর, আল শাম্‌স প্রভৃতি সংস্থার সঙ্গে আলেম বা মাদ্রাসা ছাত্রদের খুব কম সংখ্যকেরই সম্পর্ক ছিল।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আলেম সমাজ প্রধানত তিনটি সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এগুলি হচ্ছেঃ নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও জামায়াতে ইসলামী। এছাড়া বিভিন্নভাবেও ছিলেন বহু আলেম, পীর, মাশায়েখ ইত্যাদি। এরা অধিকাংশই বাংলাদেশ হলে ইসলামের ক্ষতি হবে বলে মনে করতেন। কাশফের অধিকারী বুযুর্গদের প্রতি এ দেশের মানুষদের দুর্বলতার কারণে একাত্তরের সেই রক্তঝরা দিনগুলিতে অনেকেই কাশফের অধিকারী বুযুর্গদের কাছে ছুটে যেতেন, পাকিস্তান থাকবে, না বাংলাদেশ হবে- এটা জানতে। আমি নিজেও ঐ সময়ে দেখা করেছিলাম এক বুযুর্গের সাথে একই প্রশ্নের উত্তর পেতে। তিনি বললেন, বাংলাদেশ হবে, তবে বাংলাদেশে ইসলামের চেতনা ও প্রভাব বর্তমানের চেয়ে আরও বৃদ্ধি পাবে। পরবর্তী ইতিহাস তাঁর ভবিষ্যৎবাণী সত্য প্রমাণ করেছে।

অধ্যাপক মাওলানা মো. আবু তাহেরঃ পাকিস্তান ছিলো বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই বাঙ্গালীদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সকল অধিকার সুনিশ্চিত করা হোক, এটা ছিল এ দেশের আলেম সমাজ তথা বৃহত্তর ইসলাম-পছন্দ জনগোষ্ঠির কামনা। দেশ ভেঙ্গে গেলে মুসলমানদের ক্ষতি হতে পারে, বিশেষ করে পাকিস্তানের এই অঞ্চল ভারতীয় আধিপত্যবাদের কবলে নিপতিত হবে এই আশংকা ছিল প্রবল। তাই এ দেশের আলেম সমাজ তথা বৃহত্তর ইসলামী জনগোষ্ঠী স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারেনি।

অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদেরঃ ভারতভীতি, পাকিস্তান মিথ ও আলেম-বিরোধী প্রচারণার কারণে সাধারণভাবে আলেম সমাজ মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা অনুধাবন ও কাম্য ভূমিকা পালন করতে পারেনি। তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক আলেম মুক্তিযুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন।

প্রফেসর ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহঃ মৌলিকভাবে আলিমগণ দেশপ্রেমিক। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রতি তারা সদা আন্তরিক। ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা এর স্বাক্ষর রেখেছেন। আর এটাই ইসলামের শিক্ষা। দেশে ইসলামী অনুশাসন প্রবর্তনের জন্য সরকারের দায়িত্ব অপরিসীম। সরকার অনুকূল না হলে জনগণের প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হয় না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূলে আলিমগণের প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তানে ইসলামী শাসন বলবৎ হবে। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেনঃ প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলের ওপর মোহর মেরে দেওয়া হয়, তা আর বৃদ্ধি লাভ করে না। তবে যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় পাহারারত থাকে, তার আমল তার মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে এবং সে কবরের ফিতনা থেকে নিরাপদ লাভ করে।' পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আলিমগণ সে ভূ-খণ্ডে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক অগ্রসর হয়। কিন্তু শাসকদের অন্যায় আচরণের কারণে পূর্ব পাকিস্তানের নানা বিষয়ে তারা বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। পার্লামেন্ট নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভের পরও তৎকালীন শাসক শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। এরই ফলশ্রুতিতে মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয়। ইসলামের নামে অর্জিত দেশটিকে দ্বি-খণ্ডিত করার সংগ্রাম শুরু হয়। এ ক্ষেত্রে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের আলিমগণ সাধারণভাবে পাকিস্তানকে দ্বি-খণ্ডিত করার ব্যাপারে একমত হতে পারেনি। পাকিস্তানকে রেখেই সমস্যা সমাধানের পক্ষে ছিলেন অধিকাংশ আলিম। দলগতভাবেও আলিমগণের অবস্থান অনুরূপ ছিল। তবে ব্যক্তিগতভাবে কিছু কিছু আলিম মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের ভূমিকা এবং সেনাবাহিনীর নির্বিচার নির্যাতনের বিপক্ষে তারা অবস্থান গ্রহণ করেন। কারণ রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি নিজের অধিকার সংরক্ষণে নিহত হয় সে শহীদ'।

নূর হোসেন মজিদীঃ মুক্তিযুদ্ধকালে বাংলাদেশের ওলামায়ে কেরামের বেশিরভাগই ছিলেন অরাজনৈতিক; মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে তাঁদের কোন স্বতঃস্ফূর্ত সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। অবশ্য পরিস্থিতির চাপে

এদের একটা অংশ, বিশেষত যুবক মাদ্রাসা ছাত্রদের একাংশ পাক-বাহিনীর তৈরী করা আধা-সামরিক বাহিনীগুলোতে যোগদান করতে বাধ্য হন। একইভাবে এদের অনেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তির বিভিন্ন রাজনৈতিক বৈঠকে অংশ গ্রহণে বাধ্য হন। অবশ্য সেক্ষেত্রে তাঁদের ভূমিকা কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়া-মুনাজাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। ব্যতিক্রম হলেও সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের দৃষ্টান্তও রয়েছে। ওলামায়ে কেরাম ও পীর-মাশায়েখের এবং মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যকার একটি সংখ্যালঘু অংশ পাকিস্তান আমলের শেষ দিক পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন। এদের মধ্যে যারা আলীয়া নেছাবের আলেম ছিলেন তাঁদের বেশির ভাগই জামাআতে ইসলামীর সাথে জড়িত ছিলেন। কিছু সংখ্যক মুসলিম লীগের তিন গ্রুপ ও পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি)-র সাথে জড়িত ছিলেন। এদের সকলেই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দলীয় ভূমিকার অনুসরণ করেন অর্থাৎ বিভিন্ন পর্যায়ে শান্তি কমিটিতে সদস্য পদ গ্রহণ করেন। এদের মধ্যকার তরুণ আলেমগণের অংশ বিশেষ আধা-সামরিক বাহিনীতেও অংশগ্রহণ করেন। আলীয়া নেছাবের মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে বলা যায়, একমাত্র ছাত্রসংগঠন ছিল জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়া। এটি ছিল আধা-রাজনৈতিক ছাত্রসংগঠন। বাইরে এটি শুধু মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন হিসেবে পরিচিত ছিল (অর্থাৎ অরাজনৈতিক ও দলীয় সম্পর্কবিহীন)। কিন্তু পর্দার আড়ালে এটি জামাআতে ইসলামীর ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্রসংঘের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ ও অগ্রসর কর্মীগণ সাধারণত: ইসলামী ছাত্রসংঘের সদস্য ও সাথী ছিলেন এবং ইসলামী ছাত্রসংঘের মজলিসে শূরাই প্রতি বছর নির্বাচনকালে পর্দান্তরাল থেকে এর সভাপতি-সম্পাদক ও সম্ভব হলে আরো কিছু পদ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দিত। কিন্তু সারা দেশের আলীয়া নেছাবের মাদ্রসাহ-ছাত্রদের একটা ক্ষুদ্র অংশই জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার সদস্য ছিল। কোন কোন জিলায় আদৌ শাখা ও সদস্য ছিল না। এ সংগঠনটি ছিল প্রধানত: ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায়। এর সদস্যদের সকলে সংগঠনটির জামাআতের সাথে সম্পর্কের কথা জানত না। যারা জানত কেবল তারাই মুক্তিযুদ্ধকালে জামাআতের ভূমিকার অনুগমন করে এবং তাদের একাংশ আধা-সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে। বাকীরা তাদের জ্যেষ্ঠদের অনুসরণে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার জন্যে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে যা ছিল প্রধানত: নৈতিক সমর্থনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

কওমী ধারার আলেমগণের একটি বিরাট অংশ ছিলেন অরাজনৈতিক। যারা রাজনীতি করতেন তাঁরা প্রধানতঃ জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি এবং জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম (মাহমুদ-হাজারভী গ্রুপ)-এর সাথে জড়িত ছিলেন। প্রথম দলটি ছিল পাকিস্তানের ঐক্যের সমর্থক। তাই স্বভাবতঃই দলটির আলেম নেতা-কর্মীগণ শান্তি কমিটির সদস্য হয়ে অথবা না হয়েও পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা পালন করেছিলেন। কওমী মাদ্রাসাহসমূহের ছাত্রদের মধ্যেও এ দলের সমর্থক ছিল। কিন্তু দলটির তরুণ আলেমগণ বা ছাত্র-সদস্যগণ আধা-সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন কিনা সে সম্পর্কে আমার কাছে কোন নিশ্চিত তথ্য নেই। পাকিস্তান আমলে মাহমুদ-হাজারভী গ্রুপকে ভারতপন্থী হিসেবে সন্দেহের চোখে দেখা হত। কারণ এরা ছিলেন মওলানা হোসেন আহমদ মাদানীর সমর্থক এবং তাঁদের অনেকে এক সময় কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। তাই স্বভাবতঃই তাঁরা পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে কোন ভূমিকা পালন করেননি। তবে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বলেও জানা যায়নি। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের নীরব সমর্থন ছিল।

কওমী ধারার তৎকালীন অরাজনৈতিক অংশটি সম্পর্কে বলতে হয়, সক্রিয় রাজনীতিতে না থাকলেও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁরা উদাসীনও ছিলেন না। ভারতে অবস্থিত দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে আত্মিক সম্পর্কের কারণে তাঁরা ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টিতে ব্যথিত ছিলেন যদিও পাকিস্তান-বিরোধী ছিলেন না। তাই মুক্তিযুদ্ধকালে এদের নিষ্ক্রিয় নৈতিক সহানুভূতির পাল্লা কিছুটা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ভারী ছিল বলে অনেকে মনে করেন। এমন কি কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে থাকতে পারেন। বেগম জিয়ার পূর্ববর্তী শাসনামলের শেষ দিকে শায়খুল হাদীস মওলানা আজিজুল হকের ওপর হামলা হলে তৎকালীন ছাত্রলীগ সভাপতি এর নিন্দায় প্রদত্ত বিবৃতিতে তাঁকে 'মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের আলেম' বলে অভিহিত করেছিলেন। এটা কি কেবল রাজনৈতিক ছিল, নাকি এর পিছনে কোন সারবত্তা ছিল তা অনুসন্ধান সাপেক্ষ বিষয়।

বাহাদুরপুরের মরহুম পীর হযরত মওলানা মোহ্সেনুদ্দিন দুদু মিয়া 'ফারায়েযী জামাআত'-এর নেতৃত্ব দিতেন। কিন্তু এটি ছিল খুবই ছোট একটি দল এবং এতে আলেমের সংখ্যা কত ছিল তা জানা নেই। অবশ্য পাকিস্তান আমলের শেষ দিকে দুদু মিয়া ছিলেন শীর্ষ নেতাদের অন্যতম। তিনি নূরুল আমীনের নেতৃত্বাধীন এনডিএফ-এ যোগ দিয়েছিলেন। পরে পিডিপি গঠন হলে এনডিএফ তাতে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু দুদু মিয়া তাতে ছিলেন কি না স্মরণ করতে পারছি না। তবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কোন পক্ষেই তাঁর কোন ভূমিকার কথা শোনা যায়নি।

আলীয়া নেছাবের আলেম ও মাদ্রাসাহ্ ছাত্রদের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের সমর্থক অতি ক্ষুদ্র একটি গ্রুপ ছিল। এদের মধ্যে কতক মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় রাজনৈতিক ও সামরিক ভূমিকা নিয়েছে সন্দেহ নেই। তবে সংখ্যা শক্তির ক্ষুদ্রতার কারণে তাঁদের ভূমিকার গুরুত্ব অনুল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে কোন উল্লেখ করার মত বড় আলেম না থাকায়।

সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত না থাকলেও পরোক্ষ সম্পর্কের কারণে কতক নির্দলীয় আলেম ও পীর পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা পালন করেন। জমিয়তুল মোদাররেসীনের সভাপতি মওলানা এম এ মান্নান-যিনি এক সময় মুসলিম লীগের গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন-পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। তবে তিনি জমিয়তভুক্ত মাদ্রাসা শিক্ষকগণকে পাকিস্তানের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণ করানোর চেষ্টা করেছিলেন কি না বা তাঁরা কোন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কি না জানা নেই।

যতদূর জানা যায়, শর্ষীনার মরহুম পীর আবু জাফর মোহাম্মদ ছালেহ্ শর্ষীনা মাদ্রাসাহ্র ছাত্রদের সমবায়ে পাকিস্তানের সমর্থনে একটি আধা-সামরিক মুজাহিদ বাহিনী গঠন করেছিলেন। এ কারণে স্বাধীনতার পর তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়।

জামাআতে ইসলামীর তৎকালীন কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর হযরত মওলানা আবদুর রহীম (র.) জনমতের প্রতিকূলে পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে ভূমিকা গ্রহণকে ভুল বলে মনে করতেন। একারণে তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামাআতে ইসলামী ও পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘকে এরূপ ভূমিকা গ্রহণ না করার জন্যে পরামর্শ দিয়েছিলেন যা শোনা হয়নি। তবে তাঁর এ ভূমিকা দলীয় চৌহদ্দীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে তাঁর কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। তবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার আগে তিনি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের (অর্থাৎ আওয়ামী লীগের) কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। অবশ্য ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ইসলামপন্থী ও মুসলিমপন্থী সকল দলই আওয়ামী লীগের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানাচ্ছিল এবং আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম পরিষদে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করছিল। কিন্তু ২৫শে মার্চের পর আওয়ামী লীগ নেতারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে এবং একাংশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ ও একাংশ পাক-বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে ইসলাম ও মুসলিমপন্থী দলগুলোর নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

প্রশ্ন-দুই: *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে আপনার দলীয় ভূমিকাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন (প্রযোজ্য হলে জবাব দিন)?*

তাহের: আমার দল জামায়াতে ইসলামী শুরু থেকেই এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু ভারতীয় সহযোগিতায় দেশ স্বাধীন হলে সত্যিকারভাবে কতটুকু স্বাধীনতা আমরা পাবো সে ব্যাপারে আমাদের প্রবল আশংকা ছিল। ৭১-৭৫ এর সময়কাল আমাদের সে আশংকাকে সত্য প্রমাণ করেছে।

কাদের: প্রযোজ্য নয়।

মজিদী: মুক্তিযুদ্ধকালে আমি একটি ইসলামী দলের সাথে জড়িত ছিলাম এবং স্বভাবতঃই পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন আমার বয়স মাত্র সোয়া উনিশ বছর। দেশের এক প্রত্যন্ত মফস্বল শহরে অবস্থানরত এ বয়সের একজন রাজনৈতিক কর্মীর পক্ষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করা ও

সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একেবারেই সম্ভব ছিল না। তখন নেতাদের মূল্যায়ন ও সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে হচ্ছিল। পরবর্তীকালে আমি এ ধারণায় উপনীত হই যে, আমেরিকা, ভারত ও জুলফিকার আলী ভূট্টো নিজ নিজ স্বার্থে পাকিস্তানকে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (যদিও শেখ মুজিবর রহমান ১৯৭০-এর নির্বাচনের পূর্বে পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্যে কাজ করেন কিন্তু নির্বাচনের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবার চেষ্টা করেন), এমতাবস্থায় দেশের প্রায় সকল জনগণের মতের বিপরীতে পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার জন্যে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ ঠিক হয়নি। পাক-বাহিনীকে পাকিস্তান রক্ষার জন্য নয়, বরং 'বাঙ্গালীরা পাকিস্তান ভেঙ্গেছে' বলে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে যাবার পক্ষে যুক্তি তৈরীর জন্যেই ২৫শে মার্চের গণহত্যার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী করতে বাধ্য করা হয়-এটা না বুঝতে পারা ছিল নেতাদের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা।

আমি ১৯৬৯-এর আগস্ট থেকে ১৯৭৪ এর মে পর্যন্ত দলটির সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকি। অতঃপর এর কর্মপদ্ধতির অবাস্তবতায় হতাশ হই এবং ১৯৭৪ এর অক্টোবরের শুরুতে দলটির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি।

আমি ১৯৬৯-এর আগস্ট থেকে হযরত মওলানা আবদুর রহীম (র.) এর বই-পুস্তকের সাথে পরিচিত হই, ১৯৭০-এর নভেম্বরে তাঁর সাথে পরিচিত হই। ১৯৭৫-এর শুরুর দিকে মুক্তিযুদ্ধকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন অবগত হই এবং তা আমার দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে দারুণভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

মুক্তিযুদ্ধকালে আমার রাজনৈতিক অবস্থানের পিছনে কোন রকমের পার্থিব বা রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল না, বরং যে ভূমিকা পালন করেছি তা সরল বিশ্বাসে ও আন্তরিক হবার কারণে করেছি। তাই এ ভূমিকা ভুল হলেও সেজন্য সংশ্লিষ্ট নেতাদের ভুল সিদ্ধান্তকেই দায়ী মনে করি। তাই আমি আমার ভূমিকার জন্য মোটেই লজ্জিত নই ঠিক যেভাবে এ ভূমিকাকে ভুল বলে স্বীকার করতে লজ্জিত নই। তাছাড়া আমি কোনরূপ অপরাধমূলক কাজ করিনি। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের স্থানীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আমাকে 'ভাল ছেলে' বলে জানতেন এবং আমার বিরুদ্ধে কারো কোন অভিযোগ ছিল না। এ ছাড়া আমি আমার নিজ গ্রামে ও আশেপাশের বিরাট এলাকায় সকলের প্রিয় ছিলাম যদিও তাঁদের প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক ছিলেন। একটি মজার স্মৃতি: মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে জিলা শহরের পতন ঘটলে যখন গ্রামে ফিরলাম তখন গ্রামের হাটের ভিতর দিয়ে আসার সময় কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা আমার পিছু নিলে গ্রামের এক হিন্দু ডাক্তার তাঁর ছেলেকে আমার সাথে দিয়ে হাট পার করিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পৌছে দেন। লজ্জিত হওয়ার মত কোন কাজ করলে এ সহানুভূতি ও সহৃদয়তা পেতাম না।

প্রশ্ন-তিন: *স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমদের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কি?*

গফুর: স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের অব্যবহিত পর আলেমদের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে বললে কম বলা হয়। ঢালাওভাবে তখন নেতৃস্থানীয় আলেম-উলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ ও পীর-মাশায়েখদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। অনেককে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। দাঁড়ী, টুপিধারী লোকদের প্রথম দিকে বহু দিন নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কাটাতে হয়। অবশ্য বৃহত্তর জনসমাজে এর ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ায় আটক আলেম-উলামা, পীর-মাশায়েখদের এক বছর পর ছেড়ে দেয়ার পালা শুরু হয়। দালাল আইনে আটকদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ধরে মাদ্রাসা বন্ধ রাখা হয়। পরে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলেমদের চেষ্টায় মাদ্রাসাসমূহ পুনরায় খুলে দেয়া হয়। সে নিরিখে বলা যায় সে সময় ঢালাওভাবে আলেমদের ভূমিকার অবমূল্যায়ন সামাজিক বাস্তবতার কারণে বেশি দিন চালানো সম্ভব হয়নি।

তাহের: শুধু অবমূল্যায়নই করা হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে শাসনতান্ত্রিকভাবে ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ওলামা সমাজ তথা ইসলামপন্থীদের উপর চালানো হয়েছিল চরম জুলুম, নির্যাতন, অত্যাচার। দেশের ইতিহাসে এ সময়টি (৭১-৭৫) কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে অবশ্যই।

কাদের: স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলেমদের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। সাংবিধানিকভাবে ইসলামভিত্তিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আলেম সমাজের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠিগত ও দলগত রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগই বন্ধ করে দেয়া হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ও ইসলামী গোষ্ঠিগুলোকে কোণঠাসা করা হয়। মাদ্রাসা বন্ধের বা সংকোচনের উদ্যোগ নেয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধকালীন ব্যক্তি বিশেষের ভূমিকাকে কেন্দ্র করে ঢালাওভাবে আলেমদের দোষারোপ করা হয় ও তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা হয়। তাদের রাজনীতিতে সক্রিয় হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দেয়া হয়। তাদের অস্তিত্বই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে পড়ে।

শফিকুল্লাহ: দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে রাজনীতিতে আলিমগণের ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা হয়। রাজনীতিবিদগণ আলিমগণের তৎকালীন কর্মতৎপরতাকে দেশের জন্য অকল্যাণকর ছিল বলে অভিহিত করেন। বিভিন্নস্থানে অনেক আলিমকে শহীদ করা হয়। এমনকি রাজনীতিতে যাদের কোন ভূমিকা ছিল না এমন অনেক আলিম ব্যক্তিও অবস্থার শিকার হয়ে পড়েন।

মজিদী: আপনার এ প্রশ্নটি আমার কাছে অনেকটা অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। কারণ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে আলেমদের উল্লেখ করার মত কোন ভূমিকা ছিল না (যা ১নং প্রশ্নের উত্তর থেকে সুস্পষ্ট), অতএব, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলেমদের ভূমিকাকে অবমূল্যায়নের প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক নয় (যেমন প্রাসঙ্গিক আর্মি, বিডিআর ও অ-আওয়ামী মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকার অবমূল্যায়ন-সংবিধান প্রণয়ন ও সরকার গঠনে তাদেরকে কোন ভূমিকা পালন করতে না দেয়া)। অবশ্য ইসলাম ও মুসলিমপন্থী দলগুলোকে বেআইনী করা অনৈতিক, মানবাধিকার বিরোধী ও অগণতান্ত্রিক কাজ হয়েছিল। কারণ ১৯৭১ এর ২৬শে মার্চ থেকে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিল একটি অন্তর্বর্তীকাল। এ সময় যারা পাকিস্তানের অখণ্ডত্বের বা স্বাধীন বাংলাদেশ গড়ার পক্ষে ছিলেন তাঁদের কারো দেশপ্রেম ও আন্তরিকতায় সন্দেহ করা চলে না (ব্যক্তিগতভাবে কেউ কোন অসদুদ্দেশ্য পোষণ বা অপরাধ করলে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার)। ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পর কেউ বাংলাদেশকে প্রত্যাখ্যান করলে কেবল তাকেই স্বাধীনতা বিরোধী বা দেশদ্রোহী বলা যেতে পারে।

অবশ্য ঐসব দলকে নিষিদ্ধ না করলেও তাদের বা আলেমদের পক্ষে তখনকার রাজনৈতিক অঙ্গনে কোনরূপ প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করা সম্ভব হত না। সেক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা হত ইতিবাচক ও গঠনমূলক এবং আওয়ামী সরকারের সাথে সমঝোতামূলক। জাসদের মত ভূমিকা পালন তাদের পক্ষে সম্ভব হত না। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার কারণে যেমন ঐসব দলের গণভিত্তি পূর্বাপেক্ষাও দুর্বল হয়ে গিয়েছিল তেমনি শেখ মুজিবের মোকাবিলায় দাঁড় করাবার মত কোন আকর্ষণীয় নেতৃত্ব আলেমদের মধ্যে ছিল না। এমনকি মওলানা ভাসানী বা মেজর জলীলের মত আকর্ষণীয় নেতৃত্বও ছিল না। অতএব, ইসলাম ও মুসলিমপন্থী দলগুলোকে বেআইনী না করলে আওয়ামী লীগেরই লাভ হত। কারণ আওয়ামী লীগ ইসলামের দুশমন বলে দেশবাসীর মনে ধারণা গড়ে ওঠার জন্যে এটাও একটা কারণ।

প্রশ্ন-চার: *বাংলাদেশের এযাবৎকালের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ অথবা রাষ্ট্রীয় নীতি সংশোধনের ক্ষেত্রে এ দেশের আলিমদের ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠী-দল-জোটগত কোনো প্রভাব ছিলো কী (জবাব ইতিবাচক হলে প্রসঙ্গ-ইস্যু-নীতিসমূহের উল্লেখসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন)?*

গফুর: রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ ও রাষ্ট্রীয় নীতি সংশোধনের প্রসঙ্গে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়:

(এক) বাংলাদেশের স্বাধীনতার (১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের) অব্যবহিত পর যে সরকার ক্ষমতাসীন হয়, সে সরকারের আমলে প্রথম দিকে রেডিও-টেলিভিশনে কোরআন তেলাওয়াত বন্ধ ছিল এবং জনমনে এর প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। ঐ সরকারে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা থাকায় এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে পাকিস্তান আমলে জনগণের প্রধান ধর্ম ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ হিসাবে রাষ্ট্রীয় রেডিও-টিভিতে কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠও প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশ আমলে এই নিয়ম বন্ধ করা হলে প্রবল প্রতিক্রিয়া হয়। অচিরেই সরকার

ভুল বুঝতে পেরে পাকিস্তান আমলের মত কোরআন তেলাওয়াতের পাশাপাশি গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠের ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন করে। এর পেছনে কোন বিশেষ আলেম বা সংস্থার প্রভাব ছিল কি না বলা যায় না, তবে সরকারি নেতৃবৃন্দ জনগণের মনোভাব আঁচ করেই এ কাজটি করেন বলে মনে হয়।

(দুই) প্রথম সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ঘোষণা সাধারণভাবে ধর্মপ্রাণ মানুষ এবং বিশেষভাবে আলেম সমাজের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হয়, তা নিরসনের লক্ষ্যে সরকারি নেতৃবৃন্দ তখন প্রায়-প্রায়ই ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হতেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়, ধর্মীয় উদারতা এবং সকল ধর্মের প্রতি সমান মর্যাদা প্রদর্শন।

(তিন) ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে মুজিব সরকারের সরকারি ছুটির তালিকা থেকে মহরমের ছুটি বাদ দেয়া হয়। এর বিরুদ্ধে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে এক বিবৃতি দেন এবং একটি পোস্টার ছাপেন যার শিরোনাম ছিল-'ই[illegible] জিন্দা হোতা হ্যায় হর কারবালা কি বাদ'। মওলানা ভাসানীর হুঁশিয়ারীর পর ১০ মহরমের ছুটি পুনঃপ্রবর্তিত করা হয়।

(চার) স্বাধীনতার পর দীর্ঘ দিন সরকারের অঘোষিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিভিন্ন মাদ্রাসা বন্ধ থাকে। তখন মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ারও একটা প্রচেষ্টা চলে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ প্রমুখ আলেম এবং শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক আবুল ফজল প্রমুখ বাস্তববাদী শিক্ষাবিদদের অনুরোধে শেখ মুজিব মাদ্রাসা খুলে দেবার নির্দেশ দেন।

(পাঁচ) মুজিব সরকার ইসলামের সঙ্গে সঙ্গতিশীল কতিপয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, যেমন (ক) রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানের নাম সোহরোয়ার্দী উদ্যান) ঘোড়দৌড় বন্ধ করা। (খ) লাইসেন্স ব্যতিরেকে মদ্যপান নিষিদ্ধ করা। (গ) পাকিস্তান আমলের ইসলামিক একাডেমী ও বায়তুল মোকাররম সোসাইটির সমন্বয়ের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ গঠন করা (ঘ) ভারতের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও লাহোর ইসলামিক সামিটে যোগ দিয়ে ওআইসির সদস্যপদ গ্রহণ। এসব পদক্ষেপ জনগণের বিশ্বাস অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত হয়। তবে, শেষোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে মওলানা ভাসানীর পরামর্শ কার্যকর ছিল।

(ছয়) স্বাধীনতার পর এক শ্রেণীর ভারত-ঘেষাঁ বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদ প্রচার করতে শুরু করেন যে, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার মূলে ছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণ। অথচ এ বক্তব্য বাস্তবতা ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গতিশীল ছিলো না। কারণ সাতচল্লিশ সালে সাবেক উপমহাদেশকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলিম-অধ্যুষিত এলাকাসমূহে যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তার একটি প্রদেশ হিসাবে পূর্ববঙ্গ নামক যে ভূখণ্ড আমরা লাভ করি, তারই বর্তমান পরিচয় বাংলাদেশ। সুতরাং দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক সাতচল্লিশের পার্টিশন অস্বীকার করা আমাদের স্বাধীনতার প্রথম ভিত্তিকেই অস্বীকার করার শামিল। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে উপমহাদেশের মুসলিম-অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে যে স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপরেখা আমরা প্রথম লাভ করি, তাকে প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা সাতচল্লিশে পাই একটি প্রদেশের অবয়বে। তাকেই চূড়ান্ত পর্যায়ে একাত্তরে লাভ করি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে। সুতরাং সাতচল্লিশ ও একাত্তর এ দু-টির কোন পর্যায়কেই বাস্তবতার নিরিখে অস্বীকার করবার উপায় নেই আমাদের। এই দৃষ্টিতে বিচার করলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিবর্তনের পেছনে দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নই ওঠে না। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার অজুহাতে ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক 'নারায়ে তকবীর আল্লাহু আকবার' 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' প্রভৃতি স্লোগান ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। ১৫ আগস্টের পট পরিবর্তনের পর এসব আবার চালু হয়। এর পেছনে আলেম সমাজের নয়, মুক্তিযোদ্ধাদের যে অংশটি আগস্ট অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দেন, তাদের অবদানই ছিল প্রধান।

(সাত) বাংলাদেশের সংবিধানের অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ধর্মনিরপেক্ষতা-র স্থানে ''সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস'' সংযোজন, সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এবং পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে 'মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে বিশেষ সুসম্পর্ক রক্ষা'র ধারা সংযোজন করেন স্বাধীনতার ঘোষক, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমান। তাছাড়া তিনি ধর্মীয় আদর্শে পরিচালিত রাজনৈতিক

সংগঠনসমূহের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে রাজনীতি-ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তও উন্মোচন করেন। তাঁর এই পদক্ষেপের পিছনে আলেম সমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ, বাস্তবতা-বোধ কাজ করে থাকবে। তাঁর এই পদক্ষেপ আলেম সমাজ ও ইসলামপন্থী মহলে বহুল প্রশংসিত হয়।

(আট) ১৯৮২ সালে নির্বাচিত সাত্তার সরকারকে সরিয়ে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন তদানীন্তন সেনা প্রধান জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি মুসলিম বৈশিষ্ট্যভিত্তিক তিনটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন- যেমন, (ক) সংবিধান সংশোধন করে ইসলামকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, (খ) শুক্রবারকে সাপ্তাহিক ছুটির দিন ঘোষণা, (গ) রেডক্রস সোসাইটিকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে রূপান্তর। এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে তাঁর মন্ত্রীসভার অন্যতম মন্ত্রী জমিয়তুল মোদাররেসিনের সভাপতি মওলানা এম.এ. মান্নান ও শর্ষীনার পীর মরহুম মওলানা আবু জাফর সালেহ (রা.) এর প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। তবে এসবের পাশাপাশি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলকারীর ধর্মের অপব্যবহারের মারফৎ জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের ইচ্ছাও ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়।

(নয়) ১৯৯১ সালে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রথম অবাধ নির্বাচনে পরাজিত হবার পর আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা নিজেকে ইসলামী আদর্শের ধারক-বাহক প্রমাণের তাগিদে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনকালে হিজাব, তসবীহ-সজ্জিত হয়ে প্রচারণা চালান। কিন্তু ক্ষমতায় যাবার পর যেভাবে দেশের প্রখ্যাত আলেম উলামা, মাদ্রাসা ও মাদ্রাসার শিক্ষক-ছাত্রদের বিরুদ্ধে নৃশংস অভিযান চালান, তাতে তাঁর ইসলাম-বিরোধী ও ভারত-ঘেঁষা স্বরূপই নতুন করে প্রমাণিত হয়। আর এ কারণেই ২০০১ সালের নির্বাচনে আলেম-উলামা ও দেশের বৃহত্তর জনগণের ব্যাপক সমর্থনে চারদলীয় জোট দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক আসন পেয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে। ২০০১ সালের এই ব্যালট বিপ্লবের পিছনে দেশের আলেম-উলামার সুস্পষ্ট প্রভাব ছিল।

(দশ) বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর দেশে ভারতীয় প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হওয়ায় অনেকের মধ্যে ইসলামের প্রতি প্রকাশ্যে বিরূপ বক্তব্য প্রদানের একটা প্রবণতা দেখা দেয়। তরুণ কবি দাউদ হায়দার নবী-রসূলদের আক্রমণ করে একটি কবিতা রচনা করলে আলেম সমাজ ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তারা এই ধর্মদ্রোহী কবিতার জন্য দাউদের বিচার ও শাস্তি দাবি জানান। এতে সরকার জনরোষ থেকে রক্ষার জন্য তাকে গ্রেপ্তার করে গোপনে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেন। পরবর্তী কালে তসলিমা নাসরিন নামক এক লেখিকা ইসলামের রিরুদ্ধে জঘণ্যতম আক্রমণ চালিয়ে লেখালেখি শুরু করে। সারা দেশে এর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়। জনগণ মারমুখো হয়ে দাঁড়ালে সরকার পক্ষ থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তসলিমা নাসরিন ভারত ও বিভিন্ন পশ্চিমা দেশের নেতৃবৃন্দের প্ররোচনায় তাঁর ইসলাম বিরোধী লেখালেখি অব্যাহত রাখে। ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করলে সে দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রয়াস পায়। কিন্তু সরকার অল্প দিন পরই জনমতের ভয়ে তাকে পুনরায় বিদেশে ফিরে যেতে বাধ্য করে। উভয় কবির ক্ষেত্রেই আলেম সমাজের নেতৃত্বে জনগণের সৃষ্ট আন্দোলনের মুখে সরকার ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়।

তাহের: মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান গণভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম এবং আল্লাহ তায়ালার উপর বিশ্বাস ও আস্থাকে যাবতীয় কাজের উৎস হিসাবে সংযোজন করেন। জনমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই তিনি শাসনতন্ত্রে এ সংশোধনী এনেছিলেন। আর এ জনমত গঠনের ক্ষেত্রে আলেমদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও সক্রিয়।

কাদের: স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সৃষ্ট প্রাথমিক সংকট কিছুটা কেটে উঠার সাথে সাথেই আলেম সমাজ সক্রিয় হতে শুরু করে। রাজনৈতিক-আদর্শিক দিক থেকে যে দেশটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছে আলেম সমাজ তা বুঝতে শুরু করে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যে ভাবে ধর্ম ও আলেম সমাজের বিরোধীতা প্রকট আকার ধারণ করে তাতে আলেম সমাজ আর চুপ করে বসে থাকতে পারেনি। দাউদ

হায়দার নামক এক কবি অত্যন্ত জঘন্যভাবে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), হযরত ঈসা (আঃ) কে আক্রমণ করে কবিতা লিখে বসে। সারাদেশে তার তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। আলেম সমাজ ও জনগণ মাঠে নামে। সরকার কবিতাটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও কুলাঙ্গার দাউদ হায়দারকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া ধর্ম ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতি পলিসি, ড. কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশ ইত্যাদি বিষয়ে দেশের ধর্মীয় সমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। আলেম সমাজের পক্ষ থেকে সরকারের উপর চাপ বাড়তে থাকে। আলেম সমাজ ও জনগণের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সম্পর্কে বিরূপ ধারণা দানা বেঁধে উঠে। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে তদানীন্তন সরকারি নেতারা চাপে পড়ে "ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মীয় সহনশীলতা, ধর্মহীনতা বা ধর্ম বিরোধীতা নয় - " এ ধরনের ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো খুলে দেয়া হয়। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গভবনে মিলাদ ইত্যাদির আয়োজন করা শুরু হয়। বেতার ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদীতে কুরআন তেলাওয়াত, খোদা হাফেজ ইত্যাদি বলা শুরু করা হয়। '৭৫ পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাতিল," বিসমিল্লাহ "ও "আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা" সংযোজন ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রে আলেম সমাজের চাপ ও প্রয়াস ছিলো। আলেম সমাজ তখন মাওলানা সিদ্দিক আহমদ (রঃ) ও মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (রঃ) এর নেতৃত্বে সংশোধিত রাষ্ট্রীয় নীতিমালা যাতে রেফারেন্ডামে জনগণ সমর্থন করে তার জন্যে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সে পটভূমিতেই ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৬ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের জাতীয় স্বার্থ ও ইসলাম বিরোধী প্রতিটি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথমেই সোচ্চার হয়েছে শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বে আলেম সমাজের প্রতিনিধিত্বশীল জোট ইসলামী ঐক্যজোট ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস। ২০০১ সালের ১অক্টোবরের নির্বাচনে চারদলীয় জোটের বিপুল বিজয়ের পিছনেও রয়েছে আলেম সমাজের ব্যক্তিগত ও জোটগত সক্রিয় ভূমিকা।

শফিকুল্লাহ: বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং সংশোধনে আলিমগণের ব্যক্তিগত এবং দলগত যথেষ্ট প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। এমনকি কিছু দিন পর্যন্ত মাদ্রাসাগুলোর কার্যক্রম অচল ছিল। ঐ সময় মাদ্রাসা শিক্ষা সচল করার ক্ষেত্রে মাওলানা তর্কবাগীসের অবদান ছিল অনন্য সাধারণ। বাংলাদেশের ৪টি মূলনীতির মধ্যে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা দু'টি অন্যতম মূলনীতি ছিল। আলিমগণের নির্ভীক বক্তব্য, ওয়াজ-নসীহত, লিখনী এবং দলীয় আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এ দু'টি মূলনীতি প্রায় অকার্যকর হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের কয়েকটি সংশোধন, বিসমিল্লাহ সংযোজন ইত্যাদি এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

মজিদী: ১৯৭৫-এর ৭ই নভেম্বরের সিপাহী জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক সরকারের ওপর হযরত মওলানা আবদুর রহীম (র.) প্রভাব বিস্তার করতে এবং সংবিধানের মূলনীতি সংশোধনে উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁর পরামর্শেই সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'-এর স্থলে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ওপর ঈমান ও আস্থা' যোগ করা হয়। এছাড়া মওলানা আবদুর রহীম (র.) এর চাপে জিরো পয়েন্ট থেকে রাতের আঁধারে নির্মীয়মান ভাস্কর্যমূর্তি সরিয়ে নেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে জেনারেল এরশাদ সংবিধানে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেন। ওলামায়ে কেরামের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ ও পরে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান জনসমর্থনের প্রেক্ষিতে নিজেকে ইসলাম-দরদী প্রমাণ করার জন্যেই এরশাদ এ পদক্ষেপ নেন।

প্রশ্ন-পাঁচ: *বাংলাদেশের সরকার গঠনকারী দলসমূহের নীতি নির্ধারণ অথবা নীতি সংশোধনের ক্ষেত্রে এ দেশের আলিমদের ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠী-দল-জোটগত কোনো প্রভাব ছিলো কী (জবাব ইতিবাচক হলে প্রসঙ্গ-ইস্যু-নীতিসমূহের উল্লেখসহ সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিন)?*

গফুর: বাংলাদেশে এ যাবৎ যে সব দল সরকার গঠন করেছে সেগুলো হচ্ছে: আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি। ১৯৭২-৭৫ আমলে এক পর্যায়ে ন্যাপ (মোজাফফর) ও কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি) আওয়ামী লীগের (বাংলাদেশ) সরকার গঠনে সহযোগিতা প্রদান করে। আওয়ামী লীগের কিছু

কিছু নীতি নির্ধারণে মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মওলানা ফজলুল করিম, মওলানা মুহিউদ্দিন শামী প্রমুখ কিছু কিছু আলেমের প্রভাব ছিল। মাদ্রাসা খুলে দেয়া, মাদ্রাসা বোর্ড গঠন, ইসলামিক একাডেমী পরিচালনা ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এদের (প্রভাব নয়) পরামর্শ ইতিবাচক অবদান রাখে। যতদিন শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন, মাঝে মাঝে তিনি কোন কোন ইস্যুতে মওলানা ভাসানীর পরামর্শ নিতেন, যেমন ওআইসির লাহোর সামিটে যোগ দেয়ার ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর পরামর্শ কার্যকর ছিল। তবে বহু বিষয়ে আবার মওলানা ভাসানীর সঙ্গে মুজিব সরকারের গুরুতর পার্থক্যও ছিল। যেমন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম থেকে অবাঙ্গালী মুসলমানদের নাম বাদ দেয়ার যে নীতি মুজিব নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে, সে ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর সমর্থন ছিল না। মওলানা ভাসানীর নিজের প্রতিষ্ঠিত কাগমারী মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজের জাতীয়করণ করার সময় শেখ মুজিব অবাঙ্গালী অজুহাতে কলেজটিকে 'সরকারি ভাসানী কলেজ' নামকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করলে মওলানা ভাসানী তার তীব্র বিরোধিতা করেন। ফলে মওলানা মোহাম্মদ আলী কলেজ হিসাবেই সেটিকে জাতীয়করণ করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি) গঠনের ব্যাপারে ভাসানী ন্যাপ-এর বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি, তাঁর দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির উর্দ্ধে অবস্থানের কারণে, মওলানা ভাসানীর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। বিএনপি প্রতিষ্ঠিত হয় মওলানা ভাসানীর ইন্তেকালের (১৯৭৬) পরে। তবে এই দুই নেতার মধ্যে একটা গভীর বোঝাপড়া ছিল। মওলানা ভাসানীর আহূত ফারাক্কা লং মার্চ কর্মসূচী (১৬মে ১৯৭৬) বাস্তবায়নে জিয়া সরকারের পরোক্ষ সহযোগিতা ছিল। বিএনপি গঠনের সময় বহু সাবেক মুসলিম লীগ নেতা এর সাথে সংশ্লিষ্ট হন। এদের মধ্যে কিশোরগঞ্জের মওলানা আতাউর রহমান খান, চট্টগ্রামের সৈয়দ আবুল বশর মাইজভান্ডারী অন্যতম। সাবেক মুসলিম লীগ নেতা, জমিয়তুল মোদাররেসীন-এর সভাপতি মওলানা এম. এ. মান্নানও জিয়াউর রহমানের সরকারে যোগ দেন। বিএনপি দল হিসেবে আওয়ামী লীগের তুলনায় ইসলামী আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ায় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বহু আলেম বিএনপিকে নির্বাচনকালে সমর্থন করেন।

বাংলাদেশে যে সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক আলেম রয়েছেন সেসবের মধ্যে জামায়াতে ইসলামী, খেলাফত মজলিস, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, নেজামে ইসলাম পার্টি, ইসলামী ঐক্যজোট ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন এর নাম উল্লেখ করা যায়। এর মধ্যে শুধু শেষোক্ত সংগঠন ছাড়া আর সকল দলই ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকার গঠনে সমর্থন দান করেছে। একজন আলেম (জামায়াত নেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী) মন্ত্রীসভার সদস্যও রয়েছেন। সরকারের নীতি নির্ধারণে স্বাভাবিকভাবেই তাদের প্রভাব রয়েছে।

১৯৮২ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করার পর জেনারেল হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ জাতীয় পার্টি গঠন করেন। জমিয়তুল মোদারেসীন নেতা মওলানা এম.এ. মান্নান ও শর্ষীনার পীর হযরত মওলানা আবু জাফর সালেহ (র.) তাঁকে দিয়ে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণার ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও মাদ্রাসা শিক্ষকদের অর্থনৈতিক সুবিধাদি বৃদ্ধিতেও তাঁরা এরশাদ সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতাসীন থাকার এক পর্যায়ে তার সঙ্গে আটরশীর পীর মরহুম মওলানা হাশমত উল্লাহ এর সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। এরশাদের ক্ষমতা হারানোর পর সে সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায়। চর মোনাইয়ের পীর মওলানা ফজলুল করীমের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টির প্রতি এই দলের সমর্থন রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

তাহের: শুধু নীতি নির্ধারণ ও সংশোধনের ক্ষেত্রেই নয় সরকার পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও আলেমদের ভূমিকা এ দেশের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত সত্য। বিগত আওয়ামী সরকারের পতন ঘটিয়ে ৪দলীয় জোটের সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পেছনে এ দেশের ওলামা সমাজের বিরাট ভূমিকা কেউ অস্বীকার করতে পারবে?

কাদের: বাংলাদেশের সরকার গঠনকারী দলসমূহের নীতি নির্ধারণ ও নীতি সংশোধনের ক্ষেত্রে আলেম সমাজের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। প্রত্যেকটি দলকেই নীতি নির্ধারণে ইসলামকে বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। এর প্রধান কারণ আলেম সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপ। প্রতিটি দলকেই উলামা ফ্রন্ট গঠন করতে হয়েছে । স্ব স্ব দলের উলামা ফ্রন্টের মাধ্যমে দেশের উলামা সমাজ ও জনগণের কাছে স্বীয়

দলের নীতি ও কর্মসূচিকে ইসলাম সম্মত প্রমাণের চেষ্টা করতে হয়েছে। তদুপরি দলের ধর্মীয় নীতি নির্ধারণে প্রতিটি দলের উলামা ফ্রন্টের কিছু না কিছু চাপ/প্রভাব রয়েছে। প্রতিটি দলকেই নির্বাচনে "ইসলাম বিরোধী আইন পাশ না করার" অঙ্গীকার করতে হয়েছে। আওয়ামী লীগের পোস্টারে "আল্লাহু আকবর/আল্লাহ সর্বশক্তিমান" ব্যবহার, বিএনপির "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম " আর জাতীয় পার্টির "রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম" সবই আলেম সমাজের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ প্রভাবের ফল।

শফিকুল্লাহ: বাংলাদেশে সরকার গঠনকারী দলসমূহের নীতি নির্ধারণে আলেমদের ভূমিকা ও প্রভাব দেখা গিয়েছে। আলেমগণ কোনও কোনও সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য থেকে নীতি নির্ধারণে প্রভাব সৃষ্টি করেছেন। আবার কখনও বিরোধী দলে থেকে সরকারের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করেছেন।

মজিদী: সরাসরি কোন প্রভাব ছিলনা। তবে কিছুটা পরোক্ষ ও পরিবেশগত প্রভাব অবশ্যই ছিল। আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি যে নিজেদের ইসলামের বিরোধী নয় বরং ইসলামের বন্ধু বলে প্রমাণের চেষ্টা করে, বিশেষতঃ নির্বাচনের সময়, তা ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী নেতাদের কারণে। একই কারণে, ক্ষমতায় গিয়ে এসব দল সরাসরি ইসলাম বিরোধী কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকে। অবশ্য ইসলাম, ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামপন্থীদের দুর্বল করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ পরোক্ষ পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। বিএনপি দল হিসাবে তা না করলেও এ দলে অনুরূপ চরিত্রের অর্থাৎ ইসলাম বিরোধী লোক আছে। আর জাতীয় পার্টির ভূমিকা কার্যতঃ ইসলাম বিরোধী প্রবণতা বৃদ্ধির সহায়ক, যদিও মুখে দলটি ইসলামের কথা বলে। বিগত নির্বাচন (অক্টোবর ২০০১) কালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাথে জাতীয় পার্টির জোট গঠন কোন ইসলামী প্রভাবের ফল ছিলনা। জাতীয় পার্টির লক্ষ্য ছিল বিএনপিকে ক্ষতিগ্রস্ত ও আওয়ামী লীগকে লাভবান করা।

***প্রশ্ন-ছয়:** বাংলাদেশের রাজনীতিতে (রাষ্ট্রীয় ও প্রধান দলসমূহের ক্ষেত্রে) প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ায় এ দেশের আলিমদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী-দল-জোটগত সমস্যা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন কী?*

গফুর: বাংলাদেশের মুসলমান জনগোষ্ঠী অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ। ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর চেতনা তাদের মধ্যে বিদ্যমান। এ দেশের ইসলাম প্রচারে ও মুসলিম সমাজের বিকাশে সপ্তম শতাব্দী থেকেই আরব দেশ থেকে সমুদ্র পথে আগত একনিষ্ঠ মুবাল্লিগদের বিরাট ভূমিকা ছিল। পরবর্তীকালে স্থল পথে আগত বহু প্রচারক ও মুসলিম সমাজ গঠনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। বখতিয়ার খিলজী কর্তৃক বঙ্গ বিজয় ও মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরও ইসলাম প্রচারে এদের ভূমিকাই প্রধান ছিল। একারণে এ অঞ্চলের জন সমাজে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রভাব খুব গভীর, যদিও সমাজের প্রভাবশালী উচ্চ স্তরের বহু ক্ষেত্রে ইসলামের প্রভাব এতটা ব্যাপক নয়। এসব কারণে আমাদের পল্লী অঞ্চলে আলেম সমাজের প্রভাব সীমাবদ্ধ।

এর পেছনে আরও ঐতিহাসিক কারণ রয়েছে। বাংলা ভাষার শৈশব ও কৈশোরে এই ভাষা উন্নয়নে মুসলমানদের বিরাট অবদান থাকলেও এবং মধ্য যুগের সাহিত্যে মুসলমান কবিদের ঈর্ষণীয় অংশ গ্রহণ থাকলেও মুসলিম শাসনের অবসান কালে যে উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়, তার উন্নয়ন মূলত মুসলমানদের হাতেই ঘটে। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশে। এমনিতেই ইংরেজদের প্রতি মুসলমানরা বিরূপ ছিল। তদুপরি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলার সংস্কৃতায়ন প্রচেষ্টার প্রতিবাদে প্রায় পৌনে এক শত বৎসর মুসলমানরা বাংলা সাহিত্য চর্চা থেকে দূরে সরে থাকে। উনিশ শতকের শেষ ভাগে মুসলমানরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সাহিত্য চর্চায় ফিরে আসলেও আলেমদের মধ্যে বাংলা ভাষা চর্চা খুব কম ছিল। বৃটিশ ভারতের প্রধান ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র দেওবন্দ উর্দু বলয়ে অবস্থিত থাকায় এবং কলিকাতায় বিটিশ প্রতিষ্ঠিত আলীয়া মাদাসায় উর্দু মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হত বিধায় আলেম সমাজে বাংলা ভাষার চর্চা ছিল অত্যন্ত সীমিত এবং কতিপয় ব্যতিক্রমী সাধকের (যেমন মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা রুহুল আমীন, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী প্রমুখ) মধ্যে সীমাবদ্ধ। এর ফলে বিকাশমান আধুনিক মুসলিম শিক্ষিত সমাজের উপরে আলেমদের প্রভাব ততটা থাকলো না। তদুপরি আলীয়া ও কওমী উভয় শিক্ষাব্যবস্থায় যুগের প্রয়োজনানুগ বিষয়সমূহ স্থান

লাভ না করায় আলেম সমাজ আধুনিক রাষ্ট্র ও অর্থনীতি পরিচালনার ব্যাপারেও থাকলেন অপ্রস্তুত। এর ফলে সাধারণ জনসমাজের উপর আলেমদের প্রভাবের ভয় ছাড়া রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে আলেমদের কোন প্রভাবই থাকেনি।

এই পটভূমিতে দেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারে আলেমদের বাস্তব ভূমিকা খুবই সীমিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইরানের বিপ্লবে আলেমদের যে ভূমিকা দেখা যায়, তার মূলে ছিল সে দেশের আলেমদের ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি আধুনিক রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাদের পারদর্শিতা। বাংলাদেশে সে পর্যায়ের আলেম সৃষ্টিতে মাদ্রাসা শিক্ষায় আরও ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজন হবে। তা না হওয়া পর্যন্ত এ দেশের আলেমদের জীবিকা নির্বাহ (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) মাদ্রাসার শিক্ষকতা, মসজিদের ইমামতি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও ওয়াজ-মাহফিলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এ অবস্থায় সমাজে আলেমদের স্বাধীন, সম্মানিত ও প্রভাবশালী ভূমিকা আশা করা যায় না।

বর্তমানে দেশের সকল বড় রাজনৈতিক দলেই একটি করে আলেম ফ্রন্ট রয়েছে। এই আলেম ফ্রন্টের আলেমগণ মূল দলের নীতি নির্ধারণের পরিবর্তে অ-আলেম নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত প্রচার ও বাস্তবায়নেই অধিক ব্যবহার হন। দেশে যে সব ইসলামী রাজনৈতিক দল রয়েছে, সেখানেও আলেম নেতা-কর্মীগণ ততটাই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, যতটা রাজনৈতিক নেতৃত্বদানের ক্ষেত্রে তারা দক্ষতা প্রমাণ করতে পারেন। আধুনিক ও মাদ্রাসা লাইনে শিক্ষিত নির্বিশেষে ইসলামী দলসমূহে সকল নেতা-কর্মীই ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে ওয়াকিবলাহল থাকেন বলে এসব দলে আলেমদের বিশেষ মর্যাদা থাকার কথা নয়।

অবশ্য যেসব রাজনৈতিক দল আলেম-প্রধান, সেসব দলে আলেমদের প্রভাব প্রায় নিরংকুশ। তবে প্রধানত এই কারণেই এসব দলের বিকাশ ও অগ্রগতি অদ্যাবধি তেমন সন্তোষজনক নয়।

পরিশেষে বলতে হয়, জাতীয় রাজনীতিতে আলেম সমাজের অবস্থান অদ্যাবধি মর্যাদাজনক নয়। এই অবস্থান আরও কার্যকর ও মর্যাদাজনক করতে মাদ্রাসা শিক্ষার এবং দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আরও অনেক সংস্কার প্রয়োজন। যতদিন তা না হচ্ছে, ততদিন কিছু ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছাড়া এবং আলেমদের দৃঢ় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে আলেম সমাজের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার আশা করা যায় না।

কাংখিত সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংঘবদ্ধ প্রয়াস সাধিত হলে এ দেশের রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে আলেম সমাজের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

তাহের: আমাদের দেশের আলেমদের বিরাট অংশ রাজনীতি বিমুখ, তাছাড়া বিভিন্ন ছোট খাট মাসয়ালা ও বিষয়াদি নিয়ে তারা পরস্পর মতবিরোধ বা ইখতেলাফে ব্যস্ত। সংকীর্ণ মতবিরোধ পরিহার করে তারা যদি বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হন তাহলে এ দেশের রাজনীতিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা রয়েছে।

কাদের: বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ায় এ দেশের আলেমদের ব্যক্তিগত, গোষ্ঠি ও দলগত কিছু সমস্যা রয়েছে। সমস্যা থাকা সত্ত্বেও আলেম সমাজের রয়েছে প্রভূত সম্ভাবনা। সমস্যাগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে:

ক. সাধারণভাবে আলেম সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যাপারে সচেতনতা ও সক্রিয়তার অভাব,
খ. আলেম সমাজের অনৈক্য,
গ. যুগের সমস্যা, দাবি, যুগ মানস ও যুগের জটিলতা ও যুগ পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব,
ঘ. সাংগঠনিক দুর্বলতা এবং
ঙ. ব্যাপক গণসম্পৃক্ততার অভাব।

সম্ভাবনা: রাজনীতিতে আলেম সমাজের সম্ভাবনা মূল্যায়ন করতে উপরোক্ত সমস্যাগুলোর পাশাপাশি নিম্নোক্ত বাস্তবতা ও অগ্রগতির দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন,

ক. আলেম সমাজের মধ্যে রাজনীতি বিষয়ে দিন দিন সচেতনতা ও আগ্রহ বাড়ছে।

খ. আলেমদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রাজনীতিতে সক্রিয় হচ্ছে।

গ. আলেমদের মধ্যে ইসলামী আদর্শের আলোকে রাজনীতি/রাষ্ট্র পুনর্গঠনের চিন্তা ও তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঘ. দেশের আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর সাথে আলেমদের সম্পৃক্ততা বাড়ছে। শিক্ষিত শ্রেণী ও আলেমদের মধ্যে দূরত্ব ক্রমশঃ দূর হচ্ছে। এসব অগ্রগতি আলেম সমাজের রাজনৈতিক ভূমিকা পালনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

ঙ. সময় যতই যাচ্ছে রাজনীতিতে আলেম সমাজের অবস্থান ও ভূমিকা জোরদার ও অর্থবহ হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে আলেম সমাজ তার দুর্বলতাগুলো কাটাতে পারলে বা কমিয়ে আনতে পারলে এ দেশের রাজনীতিতে তারা অন্যতম মূখ্য রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

শফিকুল্লাহ: বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়ায় এ দেশের আলেমদের যথেষ্ট সম্ভাবনার দিক রয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ধর্মভীরু। দ্বীনের প্রতি তাদের আন্তরিকতা রয়েছে। আলেমদের প্রতি তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে। ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও ইসলামী অনুশাসনের সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেকেই অবগত নয়। শিক্ষিত সমাজও ইসলামের জ্ঞান আহরণে উদাসীন। ইসলামী রাষ্ট্রের কল্যাণকর দিকগুলো জনসমক্ষে সঠিকভাবে উপস্থাপন করা হলে জনগণ এরূপ রাষ্ট্রের পক্ষে রায় দেবে। আর এ ক্ষেত্রে আলেমগণের প্রতি তারা অধিক বিশ্বাসী। ব্যক্তিগত এবং দলগত উভয় পদ্ধতিতেই এ কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে। গত নির্বাচনে আমরা আলেম সমাজের প্রচেষ্টার একটি সুদূর প্রসারী সুফল প্রত্যক্ষ করেছি। তবে এ ক্ষেত্রে বেশ কিছু সমস্যাও রয়েছে। দেশের আলেম সমাজ বিভিন্ন দলে বিভক্ত। পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় নেই। এমনকি চরম বিরোধিতাও দেখা যায়। ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে সকল স্তরের আলেমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে অগ্রসর হলে এ দেশের রাজনীতিতে একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। সদ্য সমাপ্ত পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচন আমাদের জন্য একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মজিদী: প্রভাব বিস্তারের জন্যে আলেমগণ এবং ইসলামী দল ও জোটের মধ্যে কতগুলো বৈশিষ্ট্য থাকা অপরিহার্য। তা হচ্ছে:

(১) জীবন ও জগত সম্বন্ধে সঠিক ও সুস্পষ্ট ধারণা এবং দেশের ও বিশ্বের সর্বশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবগত থাকা ও তার সঠিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা,

(২) বিচারবুদ্ধি, কুরআন মজীদ, ইজমায়ে উম্মাত ও মুতাওয়াতির হাদীসের ভিত্তিতে ইসলাম সম্পর্কে চরমপন্থা ও শিথিলপন্থা থেকে মুক্ত ভারসাম্যপূর্ণ সঠিক ধারণা ও তদনুযায়ী ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ এবং যুগ জিজ্ঞাসার জবাবদানে সক্ষমতা তথা মুজতাহিদ হওয়া,

(৩) যুক্তিবিজ্ঞান, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি সকল মানবিক বিজ্ঞানে দক্ষতা এবং মাতৃভাষায় প্রভূত দক্ষতাসহ প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগানোর যোগ্যতা,

(৪) দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর স্বরূপ ও প্রকৃত সমাধান সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা,

(৫) ক্ষমতাসীন ও অন্যান্য দলকে প্রভাবিত করে নিজেদের ও তাদের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করাকে অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ, নিঃস্বার্থ ও গঠনমূলক সহযোগিতাকে অন্যতম নীতি হিসাবে গ্রহণ এবং "সর্বাবস্থায় বিরোধিতা ও সমালোচনা, সহযোগিতা ও সমর্থন কখনোই নয়"- এই সেক্যুলার রাজনৈতিক ভূমিকা পরিহার।

বাংলাদেশে ওলামায়ে কেরাম, ইসলামী দল-গোষ্ঠী-জোট ও তাদের নেতারা উপরোক্ত গুণাবলীর বিচারে খুবই পিছিয়ে রয়েছেন। এ কারণে তারা তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছেন না এবং নিজেরাও ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হতে পারছেন না।

মাওলানা সাইফুদ্দিন ইয়াহইয়া: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরীষ্ঠতা লাভ করলে ইয়াহইয়া খান সাহেব ও জুলফীকার আলী ভূট্টোর

উচ্চাভিলাসে যুদ্ধ শুরু হয়। টেককা খান সাহেবের মত জালেমকে পাঠানো হয় তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানে। জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ এবং নিজামে ইসলামীর কতিপয় নেতারা ক্ষমতার ভাগী হন। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে দেশ ভারত হয়ে যাবে তাই পাকিস্তান রক্ষা করা সকলের ঈমানী দায়িত্ব বলে তারা অনেক আলিম-ওলামাদের বুঝাতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানী সৈন্যদের সহযোগীতা করার জন্য তৈরী করে রাজাকার আল বদর ও আল সাম্‌স বাহিনী। প্রতিটি থানা ও ইউনিয়ন ভিত্তিক গঠন করে পিস কমিটি। রাজাকার আল বদর ও আল সাম্‌স বাহিনীতে অংশ নেয় অধিকাংশ জামাত সমর্থিত ছাত্র সংঘ ও অন্যান্য কিছু যুবকরা। বদর ও সাম্‌স বাহিনীতে নেয়া হয় মাদ্রাসায় পাঠ রত কিছু যুবক ও ছাত্র সংঘের ছাত্রদের। দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের সময় অধিকাংশ ইসলাম মনা লোকেরা পক্ষ নেয় পাকিস্তান রক্ষাকারীদের। অন্য দিকে আ'লীগ ও বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসীরা পক্ষ নেয় স্বাধীনতাকামীদের। কিন্তু দেশের ৯০% ভাগ আলেম উলামা সে সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের কিছু পদক্ষেপের কারণে ইসলামপন্থীরা মাজলুম হতে থাকেন। রক্ষী বাহিনী, মুজিব বাহিনী টুপি-দাঁড়ি ওলাদের উপর নানা প্রকার জুলুম-অত্যাচার করতে থাকে। এমনকি অনেক নামকরা উলামাদের ধরে নিয়ে শাহাদৎ বরণ করায়। সে সময় প্রকাশ্যে ইসলামী দল করতে রাষ্ট্রীয় নিষেধ থাকায় কোন ইসলামী দল রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেনি। আলেম উলামা, পীর-মাশায়েখগণ ইসলামী জালসা, সিরাতুন নবী (স.) মাহফিল করতেন অত্যন্ত সতর্ক অবস্থায়। তাই বলা যায় ১৯৭২-১৯৭৫ পর্যন্ত উলামাগণ রাজনীতিতে সক্রীয় ছিলেন না।

১৯৭৫-৮২: ৭৫ সনের ১৫ই আগষ্টের ঘটনার পর ক্ষমতায় বসেন শেখ মুজিবের মন্ত্রী পরিষদের বিশেষ ব্যক্তি মোশতাক আহমদ। সে সময় খালিদ মোশাররফের নেতৃত্বে কতিপয় সেনারা পাল্টা ক্যু করার চেষ্টা করে। ৭ই নভেম্বর সেনা ও জনতার প্রতিরোধের মুখে খালিদ মোশাররফ নিহত হয়। পরে জিয়াউর রহমান মুক্ত হয়ে ক্ষমতাসীন হন। ১৯৭৭ সালে ইসলামী দল করার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হলে সকল ইসলামী দল ও ব্যক্তিরা তাদের অতীত কষ্টের কথা স্মরণ করে অনেক নেতা কারাগারের শপথ মোতাবেক গঠন করেন আই,ডি,এল। তার প্রধান হন তৎকালিন নেজামে ইসলামীর আমীর খতীবে আজম হযরত মাওলানা সিদ্দিক আহমদ সাহেব। সেক্রেটারী জেনারেল হন প্রখ্যাত গবেষক আল্লামা আবদুর রহীম। কিছু দিন যেতেই জাতীয় সংসদে নির্বাচনে আই,ডি, এল-এর পক্ষ হতে ৬জন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়। সে সময় সংসদে তারা ইসলাম মুসলমান ও দেশের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এর মধ্যে ১৯৭৭ সালে ছাত্র সংঘ নাম পরিবর্তন করে ছাত্র শিবির নামে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। ছাত্র সংঘের যুব নেতারাই মূলত ছাত্র শিবির পরিচালনা করত। অন্য দিকে ৭২ সালে মাওলানা আবদুর রহীম যুদ্ধ না করে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার পক্ষে থাকায় এবং পত্রিকায় বয়ান দেওয়ার অপরাধে তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতের আমীরত্ব হারান। আমীর হন পাকিস্তানের পক্ষের নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম। তিনি ও ছাত্র সংঘের যুব নেতারা জামাত নামে কাজ করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ নামে পার্টির কাজ শুরু করেন। অধ্যাপক গোলাম আযম দেশে ফিরে নাগরিকত্ব না পাওয়ার কারণে ভারপ্রাপ্ত আমীর করেন মাওলানা আব্বাস আলী খানকে। অন্য দিকে জামাতের কতিপয় নেতার কুটচালে খতীবে আযম সিদ্দিক আহমদ সাহেব ও আল্লামা আব্দুর রহীম সাহেবের মধ্যে ভুল বুঝা-বুঝির সৃষ্টি হয়। পরে আইডিএল হতে খতীবে আযম সাহেবকে সরানো হয়। তিনি তখন বাধ্য হয়ে নিজামে ইসলামের নামে তার সাথীদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। অন্য দিকে আই,ডি, এল ভেঙ্গে দিয়ে জামাতে ইসলামী নামে কাজ করতে আল্লামা আবদুর রহীমের আপত্তি থাকার যুক্তি ছিল এখনিই আই,ডি, এল ভেঙ্গে দিলে ৬জন সংসদ সদস্য তাদের সদস্য পদ হারাবেন। দ্বিতীয়ত স্বাধীনতা যুদ্ধকালে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা নিয়ে দেশবাসীর নানা প্রশ্ন আছে। কিন্তু তার এ যুক্তি জামাত নেতারা কানে না তুলেই জামাতে ইসলামীর নামে কাজ শরু করে। তখন হতে ইসলামী দলগুলি নতুনভাবে পুরাতন নামে কাজ করে। ১৯৮১ সালে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে খেলাফত আন্দোলন নামে নতুন সংগঠন জন্ম লাভ করে। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করে দেশব্যাপী পরিচিতি লাভ করেন।।

১৯৮২-৯০: জিয়াউর রহমান বিসমিল্লাহ্ সংবিধানে সংযোগ করা ও ইসলামী দলগুলোর উপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ ইসলামী ভাবধারা লালনকারী হিসাবে দেশবাসির আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তার নিহত হওয়ার মাধ্যমে ইসলামী মনা মানুষরা যখন হতাশ প্রায় তখন ক্ষমতা দখল করেন সেনা প্রধান হিসাবে হোসাইন মুহম্মদ এরশাদ। পরে জাতীয় পার্টি গঠন করে দেশ শাসন করতে থাকলে নতুন দলের সৃষ্টি হয় হযরত মুহাম্মদ উল্লাহ হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে। তার নাম দেয়া হয় 'খেলাফত আন্দোলন।' হাফেজ্জী হুজুরের স্বৈরাচার বিরোধী ভূমিকায় গোল টেবিল বৈঠক এর পর গঠন করা হয় সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ। তাতে অংশ গ্রহণ করে আই, ডি,এল (পরে নাম পরিবর্তন করে নাম দেয়া হয় ইসলামী ঐক্য আন্দোলন) মাওলানা আব্দুর রহীম-এর নেতৃত্বাধীন, যুবশিবির আহমদ আব্দুল কাদের বাচ্চুর নেতৃত্বাধীন, মেজর এম,এ জলিল সাহেবের মুক্তি আন্দোলন, নেজামে ইসলামীসহ ছোটখাট কয়েকটি ইসলামী দলও ব্যক্তিদের সমন্বয়। একমাত্র জামাতে ইসলামী এতে অংশ গ্রহণ করেনি। এরশাদের সঙ্গে দ্বিতীয় বারে সমজোতার নির্বাচন করায় খেলাফত আন্দোলন ভাগ হয়। মাওলানা আজিজুল হক ও আব্দুল গাফ্ফার সাহেবের নেতৃত্বে তার নাম দেয়া হয় (আ-গা) খেলাফত আন্দোলন। পরে মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী ও মাওলানা ব্যারিস্টার কোরবান আলীসহ কিছু যুব নেতাদের প্রচেষ্টায় অনেক আলোচনার পর দেশ বরেণ্য ওলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখদের সমন্বয়ে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ৩রা মার্চ হোটেল শরিফ ইন্সে নতুন আন্দোলন গঠনের উদ্দেশ্যে নাম দেয়া হয় 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন'। সাংবাদিক সম্মেলনের দিন সমাবেশের তারিখ ঘোষণা হয় ১৩ই মার্চ মতিঝিলের শাপলা চত্বরে। তৎকালীন সরকারের বাধায় বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে রক্তক্ষয়ী এক পরিবেশে এ আন্দোলন জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলনে শরিক যুব শিবির ও খেলাফত আন্দোলন পরে খেলাফত মজলিস নামে, মাওলানা আজিজুল হক ও মাওলানা আব্দুল গাফ্ফার ও আহমদ আব্দুল কাদের বাচ্চুর দল একিভূত হয়। পরে ১৯৯০ সনে মাওলানা সৈয়দ মোঃ ফজলুল করিম পীর সাহেব চরমোনাইর একক নেতৃত্বে শাসনতন্ত্র আন্দোলন চলতে থাকে। সকল সময়ে জামাতে ইসলামী একলা চল ও আলিম-উলামাদের ব্যবহারের লক্ষে চলার নীতির কারণে আলাদা থাকেন। এ সময় অধিকাংশ উলামাগণ রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন। হাফেজ্জী হুজুর রাজনীতির অঙ্গনে আসার কারণে কাওমী মাদ্রাসার আলিমদের রাজনীতি করার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কারণ তারা মনে করতেন শুধুমাত্র কতিপয় লোক এ কাজ করলেই অন্যান্যদের ফরজে কেফায়া আদায় হয়ে যাবে। হাফেজ্জী হুজুর এ পথে আসায় তাদের সে ভুল ভেঙ্গে যায়। অন্যদিকে চরমোনাইয়ের পীর সাহেব হুজুর শাসনতন্ত্র আন্দোলন শুরু করায় পীর মাশায়েখগণও আন্দোলন করতে বা সম্মতি দিতে বাধ্য হন। এক কথায় বলা চলে এ সময় আলিম সমাজ রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৯১-৯৬: সেনা ছাউনি হতে উর্দি পরে ক্ষমতায় বসেন হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ। তিনি জিয়াউর রহমানের রেখে যাওয়া চালাকির পর্ব হতে শুরু করেন জনগণকে ভুলানোর জন্য ইসলামী কালচার চালু করে। ধর্মমন্ত্রী করেন জমিয়াতুল মুদাররিসিন নামক মাদ্রসা শিক্ষকদের সংগঠনের সভাপতি মাওলানা আবদুল মান্নানকে। তিনি পাকিস্তান আমল হতে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকদের পূজি করে নিজের আখের গোছানো ব্যক্তি। এরশাদ সাহেব সকল দলের সুবিধাবাদীদের নিয়ে গঠন করেন জাতীয় পার্টি। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন ভাতা স্কুল কলেজের সমান করেন। মসজিদের বিদ্যুৎ বিল মাফ ও রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম করায় ইসলামমনা মানুষগুলি তার উপর মোটামুটি খুশী থাকে। কিন্তু নির্বাচন না দেয়া ও স্বৈরাচারী আচার আচরণের ফলে আলীগ, বিএনপি ও ইসলামী কয়েকটি দল এরশাদ বিরোধী ভূমিকা নেয়। ফলে গণজোয়ারে এরশাদের পতন হয়। বিচারপতি সাহাবুদ্দিন অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হয়ে যে নির্বাচন দেয় এ নির্বাচনে জামাতে ইসলামীর কারণে ইসলামী মোর্চা তেমন ফল করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে উলামায়ে কেরাম অনেকটা রাজনীতি হতে দূরে অবস্থান নেন। জামাত ১৮টি সিট নিয়ে খালেদা জিয়াকে সমর্থন করলে ইসলামে মহিলা নেতৃত্ব হারাম হওয়াতে উলামারা ইসলামী ঐক্যজোট এর পক্ষ নেয়। এ নির্বাচনকালে নির্বাচনী জোট হয় ইসলামী ঐক্য জোট নামে। খেলাফত মজলিশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, নিজামে ইসলাম, ফরায়েজী জামাত, ইসলামী মোর্চার নামের মুফতি ফজলুল হক আমেনী ও ওলামায়ে ইসলাম।

তাসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিরোধী ভূমিকায় উলামায়ে কেরামদের রাজনীতিকদের সাথে মাঠে নামাতে সক্ষম হয়েছিল। মূলত সে সময় উলামায়ে কেরাম রাজনীতিতে তেমন সক্রিয় হননি।

১৯৯৬-২০০১: বিএনপি দেশ চালাতে যতটুকু সক্ষম ছিলেন তার চেয়ে বেশি ব্যর্থ ছিল জামাতে ইসলামীদের মন রক্ষা করতে। এছাড়া নাস্তিক মুরতাদরাও আশকারা পেয়েছে অতিতের চেয়ে বেসুমার। জামাতে ইসলামী হঠাৎ তাদের ঐক্য ভঙ্গ করে আওয়ামীলীগের সাথে গাট ছড়া বাধে এবং বিএনপির বিরুদ্ধে ময়দানে জিহাদ ঘোষণা করেন। ইসলামী দাবি দাওয়া ছেড়ে দিয়ে কেয়ার টেকার সরকারের ফর্মুলা দেওয়ার হিরো বনে যায় জামাত নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম। তখন ইসলামী ঐক্যজোট ও জামাত আলাদাভাবে নির্বাচন করলে আলীগ সরকার গঠন করে। ক্ষমতায় এসেই ইসলাম পন্থিদের উপর মৌলবাদী, ধর্মান্ধ, তালেবান, লাদেন বাহিনী বলে তাদের উপর সরকারের জুলুম অত্যাচার শুরু হয়। যেখানে যাই হউক তার দায় দায়িত্ব চাপানো হয় আলিম সমাজের উপর। এর মধ্যে বি-বাড়ীয়াতে ৮জন শহীদ; মাওলানা আজিজুল হক ও মুফতি আমিনীসহ বেশ কিছু তরুণ যুবক উলামাদের আ'লীগ সরকার গ্রেফতার করলে গোটা আ'লীম সমাজ আঃ লীগকে নাপছন্দ করা শুরু করেন। বিশেষ করে কাওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা আতংক গ্রস্থ হয়ে চার দলীয় জোটে শরিক হয় খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে। আ'লীগ দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় গেলে মুসলমানদের উপর আরো বেশি মছিবত আসার আশঙ্কা প্রকাশ করতে থাকায় ১৯৯৬ এর পর হতেই উলামারা দ্বিতীয় শক্তি খুজতে থাকে। ২০০১ এর নির্বাচনে অঘোষিতভাবে উলামায়ে কেরাম আঃলীগ বিরোধী ভূমিকা হিসাবে চারদলীয় জোটের পক্ষে দেশব্যাপী ৯৫% আলিম ভূমিকা রাখেন। যার ফলে বলা যায় প্রকাশ্যে না হলেও রাজনীতিতে আলিম সমাজ সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। মহিলা সরকার প্রধান করার সমস্যার কারণে চরমোনাইয়ের পীর সাহেবের শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও খেলাফত আন্দোলন চার দলে শরিক না হওয়ার ফলে কিছু আলিম রাজনীতি হতে দূরে থাকেন। এক কথায় শেখমুজিবের পর এসময়তেই গোটা আলিম সমাজ আঃলীগের বিপক্ষে রাজনীতির অঙ্গনে একত্রিত হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট ১ক

বাংলাদেশে উলামা নেতৃত্বের জোট গঠনে সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলিম রাজনীতির দুই বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক ও মাসুদ মজুমদার -এর অভিমত

***প্রশ্ন:** বাংলাদেশে উলামা নেতৃত্বের টেকসই জোট কেনো হয়নি এবং তেমন জোটগঠন কিভাবে সম্ভব হবে?*

অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক: প্রথম কথা হচ্ছে, সম্মিলিত সংগাম পরিষদ হল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখ ও দ্বীনদার লোকদের সমন্বয়ে গঠিত নিছক একটি দ্বীনী সংগঠন। তদানিন্তন সরকারের ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টির জন্যেই ছিল তাদের আন্দোলন।

অবশ্য ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন শুরুতে ওলামা মাশায়েখদের একটি রাজনৈতিক জোট ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তা চরমোনাইর পীর সাহেবের দলে রূপান্তরিত হয়। তেমনি মুফতী আমিনী সাহেবের 'ইসলামী মোর্চা' মোর্চা গঠনের উদ্দেশ্য থাকলেও এখনও তা সফল হয়নি। তাই সেটা তার একক দল হিসাবে ছিল ও আছে।

মূলতঃ ইসলামী ঐক্যজোটই হল ওলামা মাশায়েখদের নেতৃত্বে ইসলামপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের একমাত্র জোট। বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হকের নেতৃত্বে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, ইসলামী মোর্চা, নেজামে ইসলাম পার্টি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও ফরায়েজী আন্দোলনের সমন্বয়ে এ জোট গঠিত হয় ও এ জোট পরপর তিনটি নির্বাচনে অংশ নেয় এবং শেষ নির্বাচনে তাদের তিনজন সংসদে নির্বাচিত হন।

মূলতঃ ইসলামী ঐক্যজোট ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী জোট। তাই নির্বাচন ঘনিয়ে এলে তারা জোটবদ্ধ হয় এবং নির্বাচনের পরে তারা ধীরে ধীরে দলীয় কার্যে মনোনিবেশ করে। গত নির্বাচনের প্রাক্কালে ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন চারদলীয় ঐক্যজোটে নারী নেতৃত্ব এসেছে বলে ইসলামী ঐক্যজোট ছেড়ে এরশাদ সাহেবের সাথে নির্বাচনী জোট করে। মুফতী আমিনী সাহেব ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব হিসাবে নির্বাচনে এমপি হয়ে মন্ত্রী হবার প্রয়াসী হন এবং ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান হলে মন্ত্রীত্ব লাভ সহজতর হবে ভেবে আলাদা ইসলামী ঐক্যজোট গড়ে তার চেয়ারম্যান হন। অবশ্য সে পন্থা ফলপ্রসূ না হওয়ায় তিনি হয়ত অচিরেই পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবেন। বলাবাহুল্য, চরমোনাইর পীর সাহেব ও মুফতী আমিনী সাহেব শায়খুল হাদীস সাহেবের দীর্ঘ সময়ের প্রিয় ছাত্র। সেক্ষেত্রে ছাত্ররা ক্ষেত্র বিশেষে ওস্তাদের সাথে অন্যকিছু করলেও সময়মতো ঠিক হয়ে যায়। ইত্যবসরে বরেণ্য ওলামা-মাশায়েখরা ঐক্যজোটকে আবার ঐক্যবদ্ধ করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। আশা করি শীঘ্রই এর সুফল দেখা দেবে। (১১.০৩.২০০৩)।

মাসুদ মজুমদার: প্রচলিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় রাজনৈতিক দল আলেম ওলামাদের মর্জি নির্ভর নয়, জজবা থেকে তারা দল করে, শিথীল সমঝোতায় জোট বাঁধে, শরয়ী এখতেলাফের মত জোট গড়া ভাঙ্গাকে তারা বড় ক্ষতি ও বিচ্যুতি ভাবে না। ট্রাডিশনাল ধারায় তাৎক্ষণিক পূর্বাপর শিক্ষা কাজ দেয় না। 'শিক্ষা' নিয়ে বড় ভাবনা তাদের নেই, প্রয়োজন হলে তারা আবার এক হবে। সেটাও ভঙ্গুরই হবে। স্বল্প মেয়াদী জোট এমনই হয়। দীর্ঘ মেয়াদী জোট হবার নয়। প্রভাবশালী যৌথ নেতৃত্ব কাঠামো টেকসই ও লাগসই স্ট্রাকচার হলে ওলামা জোটগুলোর আয়ু বাড়বে, একজন নেতা এখানে প্রায় অসম্ভব। এক 'মস্তক' কল্পনাতীত, এক ধারা হবার নয়, তাই শিথিল সমঝোতায় একোমডেশন এর সুযোগ বাড়াতে হবে। এরা কমিটম্যান্টের মধ্যে যায় না। ইস্যুর ঐক্যে আগ্রহী। সঙ্গত কারণেই অতীতের চেয়ে ভবিষ্যৎ সুখকর হবে না। তবে আলেমদের নতুন প্রজন্ম লড়াকু, জেহাদী প্রেরণা ও রাজনৈতিক চেতনায় অধিকতর সমৃদ্ধ। সময় ও ইস্যু তাদেরকে টেকসই করেও দিতে পারে (২২.১১.২০০২)।

পরিশিষ্ট ২

বাংলাদেশ দালাল আদেশ ১৯৭২ ও এর ৩টি সংশোধনী

বাংলাদেশ দালাল আদেশ ১৯৭২ (মূল আইন)

BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS) ORDER, 1972*

President's Order No. 8 of 1972.

Whereas certain persons, individually or as members of organizations, directly or indirectly, have been collaborators of the Pakistan Armed Forces, which had illegally occupied Bangladesh by brute force, and have aided or abetted the Pakistan Armed Forces of occupation in committing genocide and crimes against humanity and in committing atrocities against men, women and children and against the parson, property and honour of the civilian population of Bangladesh and have otherwise aided or co-operated with or acted in the interest of the Pakistan Armed Forces of occupation or contributed by any act, word or sign towards maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by the Pakistan Armed Forces or have waged war or aided or abetted in waging war against the People's Republic of Bangladesh;

And whereas such collaboration contributed towards the perpetration of a reign of terror and the commission of crimes against humanity on a scale which has horrified the moral consciences of the people of Bangladesh and of right thinking people throughout the world;

And whereas it is imperative that such persons should be dealt with effectively and be adequately punished in accordance with the due process of law;

And whereas it is expedient to provide for the setting up of Special Tribunals for expeditious and fair trial of the offences committed by such persons;

Now therefore, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following order:

1. (1) This order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972.
   (2) It extends to the whole of Bangladesh.
   (3) It shall come in force at once and shall be deemed to have taken effect on the 26th day of March, 1971.
2. In this Order,-
   a) "Code" means the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act. V of 1898):
   b) "Collaborator" means a person who has-
   (i) Participated with or aided, or abetted the occupation army in maintaining, sustaining, strengthening, supporting or furthering the illegal occupation of Bangladesh by such army;
   (ii) rendered material assistance in any way whatsoever to the occupation army by any act, whether by words, signs or conduct;
   (iii) waged war or abetted in waging was against the People's Republic of Bangladesh;
   (iv) actively resisted or sabotaged the efforts of the people and the liberation forces of Bangladesh in their liberation struggle against the occupation army;
   (v) by a public statement or by voluntary participation in propaganda within or

outside Bangladesh or by association or any delegation or committee or by participation in purported bye-elections attempted to aid or aided the occupation army in furthering its design of perpetration its forcible occupation of Bangladesh.

Explanation - A person who has performed in good faith functions which he was required by any purported law in form at the material time to do shall not be deemed to be a collaborator:

Provided that a person who has performed functions the direct object or result in which was the killing of any member of the civil population or the liberation forces of Bangladesh or the destracting of their property or the rape of or criminal assault on their womenfolk, even done under any purported law passed by the occupation army, shall be deemed to be a collaborator.

c) "Government" means the Government of the People's Republic of Bangladesh.

d) "Liberation forces" includes all forces of the Peoples' Republic of Bangladesh engaged in the liberation of Bangladesh.

e) "Occupation army" means the Pakistan Armed Forces engaged in the occupation of Bangladesh.

f) "Special Tribunal" means a Tribunal set up under this Order.

3. (1) Any Police Officer or any person empowered by the Government in that behalf may, without a warrant, arrest any person who may reasonably be suspected of have been a collaborator.

(2) Any Police Officer or person making as arrest under clause (1) shall forthwith report such arrest to the Government together with precise of the information or materials on the basis of which the arrest has been made, and pending receipt of the order of the Government, may, by order in writing, commit any person so arrested to such custody as the Government may by general or special order specify.

(3) On receipt of a report under clause (2) the Government may by order in writing, direct such person to be detained for an initial period of six months for the purpose of inquiry of the case.

(4) The Government may extend the period of detention if, in the opinion of the Government further time is required for completion of the inquiry.

(5) Any person arrested and detained before the commencement of this Order who is alleged to be a collaborator, shall be deemed to be arrested and detained under this Order and an order in writing authorising such detention shall be made by the Government:

Provided that the initial period of detention of six months in the case of such person shall be computed from the date of his arrest.

4. Notwithstanding anything contained in the Code or in any other law for the time being in force, any collaborator who has committed any offence specified in the schedule shall be tried and punished by a Special Tribunal set up under this Order and no other court shall have any jurisdiction to take cognizance of any such offence.

5. (1) The Government may set up as many Special Tribunals as it may deem necessary to try and punish offences under this Order for each district or for such area as may be determined by it.

(2) A Special Tribunal shall consist of one member.

(3) No person shall be qualified to be appointed as a member of a Special Tribunal unless he is or has been a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge.

6. (1) A Special Tribunal consisting of a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge shall try and punish offences enumerated in Parts I and II of the Schedule.

(2) A Special Tribunal consisting of an Assistant Sessions Judge shall try and

punish offences enumerated in Parts III and IV of the schedule.

7. A Special Tribunal shall not take cognizance of any offence punishable under this Order except upon a report in writing by an officer-in-charge of a police station.

8. (1) The provisions of the Code insofar as they are not inconsistent with the Provisions of this Order, shall apply to all matters connected with, arising from or consequent upon a trial by a Special Tribunal.

9. (1) A Special Tribunal shall not be bound to adjourn a trial for any purpose unless such adjournment is, in its opinion, necessary in the interests of justice.

(2) No trial shall be adjourned by reason of the absence of any accused person if such accused person is represented by counsel, or if the absence of the accused person or his counsel has been brought about by the accused person himself and the Special Tribunal shall proceed with the trial after taking necessary steps to appoint an advocate to defend an accused person who is not represented by counsel.

10. A Special Tribunal may, with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in, or privy to the offence, tender a pardon to such person on condition of his making a full and true disclosure of the whole circumstances within his knowledge relative to the offence and to every other person concerned, whether as principal or abettor, in the commission thereof and any pardon so tendered shall, for the purpose of section 339 and 339A of the Code, be deemed to have been tendered under section 338 of the Code.

11. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force,-

a) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part I of the Schedule shall be punished with death or transportation for life and shall also be liable to a fine;

b) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part II of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding ten years and shall also be liable to a fine;

c) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part III of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding five years and shall also be liable to a fine;

d) any collaborator who is convicted for any of the offences specified in Part IV of the Schedule shall be punished with rigorous imprisonment for a term not exceeding two years and shall also be liable to a fine.

12. Without prejudice to any sentence passed by the Special Tribunal, the property immovable, movable, or any portion thereof, of a collaborator may, on his conviction, be forfeited to the Government, upon an order in writing made in this behalf by the Government.

13. If any accused is convicted of and sentenced for more than one offence, the sentences of imprisonment shall run concurrently or consecutively, as determined by the Special Tribunal.

14. Notwithstanding anything contained in the Code no person who is in custody, accused or convicted of an offence punishable under this Order shall be released on bail.

15. The provisions of Chapter XXVII of the Code shall apply to a sentence of death passed by a Special Tribunal.

16. (1) A person convicted of any offence by a Special Tribunal may appeal to the High Court.

(2) The Government may direct a Public Prosecutor to present an appeal to the High Court from an order of acquittal passed by a Special Tribunal, upon intimation to the Special Tribunal by the Public Prosecutor that such an appeal is being filed, the person in respect of whom the order of acquittal was passed shall continue to remain in custody.

(3) The period of limitation for an appeal under clause (I) shall be 30 days from

the date of sentence and for an appeal under clause (2) shall be 30 days from the date of the order of acquittal.

(4) The appeal may lie on matters of fact as well as of law.

17. (1) If the Government has reasons to believe that a person, who, in the opinion of the Government, is required for the purpose of any investigation, enquiry or other proceedings connected with an offence punishable under this Order, is absconding or is otherwise concealing himself or remaining abroad to avoid appearance, the Government, may, by a written proclamation published in the Official Gazette or in such other manner as may be considered suitable to make it widely known:

a) direct the person named in the proclamation to appear at a specified place at a specified time;

b) direct attachment of any property, moveable or immovable, or both, belonging to the proclaimed person.

Explanation- "Property belonging to the proclaimed person" shall include property movable and immovable, standing in the name of his wife, children, parents, minor brothers, sisters or dependants or any benamdar.

(2) If the property ordered to be attached is a debt or other movable property the attachment shall be made,-

a) by seizure; or

b) by the appointment of an administrator; or

c) by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or

d) by all or any two of the methods mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) as the Government may direct.

(3) If the property ordered to be attached is immovable, the attachment shall be made in the case of land paying revenue to Government, by the Deputy Commissioner of the district in which the land is situate, and in all other cases,-

a) by taking possession of the property; or

b) by the appointment of an administrator; of

c) by an order in writing prohibiting the payment of rent or delivery of the property to the proclaimed person or to any one on his behalf: or

d) by all or any two of the methods mentioned in sub-clauses (a), (b) and (c) as the Government may direct.

(4) If the property ordered to be attached consists of livestock or is of a perishable nature, the Government may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide by the order of the Government,

(5) The powers, duties and liabilities of an administrator appointed under this Article shall be the same as those of a receiver appointed under chapter XXXVI of the Code of Civil Procedure, 1908. Act V of 1908).

(6) If any claim is preferred to, or objection made to the attachment of, any property attached under this Article, within seven days from the date of such attachment, by any person other than the proclaimed person, on the ground that the claimant or objector has an interest in such property, and that such interest is not liable to attachment under this Article, the claim or objection shall be inquired into, and may be allowed or disallowed in whole or in part:

Provided that any claim preferred or objection made within the period allowed by this clause may, in the event of the death of the claimant or objector, be continued by his legal representative.

(7) A claim or an objection under clause (6) may be preferred or made before such person or authority as is appointed by the Government.

(8) Any person whose claim or objection has been disallowed in whole or in part

by an order under clause (6) may, within a period of one month from the date of such order, appeal against such order to an appellate authority, constituted by the Government, for such purpose, but subject to the order of such appellate authority, the order shall be conclusive.

(9) If the proclaimed person appears within the time specified in the proclamation, the Government may make an order releasing the property from the attachment.

(10) If the proclaimed person does not appear within the time specified in the proclamation, the Government may pass an order forfeiting to the Government the property under attachment.

(11) When any property has been forfeited to the Government under clause (10), it may be disposed of in such manner as the Government directs.

18. Notwithstanding the provisions of the Code or of any other law for the time being in force, no action or proceeding taken or purporting to be taken under this Order shall be called in question by any Court, and there shall be no appeal from any order or sentence of a Special Tribunal save as provided in section 16.

SCHEDULE

PART I

Offences under sections 121, 121-A, 302, 304, 307, 376, 396, of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of such offences.

PART II

Offences under sections 308, 325, 326, 328, 329, 330, 331, 333, 354, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 380, 382, 386, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 397, 435, 436, 437, 438, 449, and 450 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of such offences.

PART III

Offences under sections 324, 332, 338, 343, 346, 348, 355, 356, 379, 384, 427, 428, 429, 430, 431 and 440 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of offences.

PART IV

(a) Offences under sections 336, 337, 341, 342, 352, 357, 374, 426, 447 and 448 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of the offences.

(b) Any act which is mentioned in Clause (b) of Article 2 of this Order but which is not covered by any item under any of the parts in this schedule.

No. 58 Pub-24th January, 1972-The above Order made by the President on the advice of the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh on the 24th January, 1972, is hereby published for general information.

[Published in the Bangladesh Gazette Extra, dated the 24th January, 1972]

বাংলাদেশ দালাল আদেশ ১৯৭২(১ম সংশোধনী)

THE BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS) (AMENDMENT) ORDER, 1972

President's Order No. 11 of 1972.

Whereas it is expedient to amend the Bangladesh Collaborators (Special Truibunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972), for the purpose hereinafter appearing;

Now, Therefore, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972 and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order: -

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Amendment) Order, 1972.
   (2) It shall come into force at once.
2. In the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972),-
   (1) In Article 3-
   a) In clause (2), for the word "Government", occurring for the first and second times, the words "Subdivisional Magistrate" shall be substituted; and
   b) In clause (3), for the word "Government", the words "Subdivisional Magistrate" shall be substituted;
   c) Article 8 shall be renumbered as clause (1) of that Article, and after clause (1) as so renumbered, the following new clauses shall be added, namely: -
   (2) "A Special Tribunal shall, for the purposes of the provisions of the Code, be deemed to be a Court of Session trying cases without the aid of assessors or jury and without the accused being committed to it by a Magistrate for trial, and shall follow the procedure prescribed by the Code for the trial of summons-cases by Magistrates.
   (3) A person conducting prosecution before a Special Tribunal shall be deemed to be a Public Prosecutor.";
3. In Article 17,-
   a) In clause (2), for the words and comma "shall be made," the words "shall be made by the Subdivisional Magistrate" shall be substituted, and the words "as the Government may direct" be omitted;
   b) in clause (3), for the words and commas "in the case of land paying revenue to Government, by the Deputy Commissioner of the district in which the land is situate, and in all other cases," the words "by the Subdivisional Magistrate" shall be substituted, and the words "as the Government may direct" shall be omitted; and
   c) in clause (4), for the words and comma "Government may, if it thinks" the words and comma "Subdivisional Magistrate may, if he thinks" shall be substituted;
4. in Article 18, for the word and figure "section 16", the words and figure "Article 16" shall be substituted; and
5. after Article 18, the following new Article shall be added, namely:-

   "19. The Government may, by order published in the Official Gazette, direct that any power or duty which is conferred or imposed by this Order upon the Government shall, in such circumstances and under such condition, if any, as may be specified in the direction, be exercised or discharged by any officer or authority subordinate to it."

No. 58 Pub-24th January, 1972-The above Order made by the President on the advice of the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh on the 24th January, 1972, is hereby published for general information. [Published in the Bangladesh Gazette Extra, dated the 24th January, 1972]

বাংলাদেশ দালাল আদেশ ১৯৭২(২য় সংশোধনী)

THE BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS) (SECOND AMENDMENT) ORDER, 1972

President's Order No. 60 of 1972

Whereas it is expedient further to amend the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972), for the purposes hereinafter appearing;

Now, therefore, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order:

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Second Amendment) Order, 1972.
   (2) It shall come into force at once.
2. In the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals). Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972), hereinafter referred to as the said Order, for Article 6 the following shall be substituted, namely:
   "6. 1. A Special Tribunal consisting of a Sessions Judge or an Additional Sessions Judge may try and punish any of the offences specified in the Schedule.
   2. A Special Tribunal consisting of an Assistant Sessions Judge may try and punish any of the offences specified in Parts III and IV of the Schedule.
   3. A Special Tribunal consisting of a Sessions Judge may transfer any case for trial to, or withdraw any case from, any other Special Tribunal within his jurisdiction.".
3. In the said Order, in the Schedule-
   a) in Part III, after the word "sections" the figure and comma "148," shall be inserted; and
   b) in Part IV, after the word "sections" the figures and commas "143, 147," shall be inserted.

No. 58 Pub-24th January, 1972-The above Order made by the President on the advice of the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh on the 24th January, 1972, is hereby published for general information. [Published in the Bangladesh Gazette Extra, dated the 24th January, 1972]

বাংলাদেশ দালাল আদেশ ১৯৭২(৩য় সংশোধনী)

THE BANGLADESH COLLABORATORS (SPECIAL TRIBUNALS) (THIRD AMENDMENT) ORDER, 1972

President's Order No. 103 of 1972

Where as it is expedient further to amend the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) Order, 1972 (P.O. No. 8 of 1972), for the purposes hereinafter appearing;

Now, therefore, in pursuance of the Proclamation of Independence of Bangladesh, read with the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, and in exercise of all powers enabling him in that behalf, the President is pleased to make the following Order: -

1. (1) This Order may be called the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Third Amendment) Order, 1972.
   (2) It shall come into force at once and shall be deemed to have taken effect on the 24th day of January 1972.
2. In the Bangladesh Collaborators (Special Tribunal) Order, 1972 (P O. No. 8

of 1972), hereinafter referred to as the said Order, in Article 2.-

a) In clause (b), the Explanation shall be renumbered as Explanation I and *after* Explanation I as so renumbered, the following new Explanation shall be added, namely: -

"Explanation II A person shall be deemed to have participated in any purported bye election, even if he withdrew his candidature afterwards;"; and

b) for clause; (c) the following shall be *substituted,* namely; "(d) Schedule" means the schedule to this order; "(e) Special Magistrate" means a Special Magistrate appointed under this Order; "(f) Special Tribunal" means a Special Tribunal set under this Order".

3. In the said order, *after* Article 2, the following new Article shall be *inserted* namely: -

"2A. The provisions of this Order shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force."

4. In the said Order, in Article 3.-

a) in clause (1) *after* the words "Police officer" a comma and *after* the words "that behalf" another comma shall be *inserted*;

b) In clause (3), *after* the words "of inquiry" the words "or investigation" shall be *inserted*; and

c) In clause (4), *after* the words "the inquiry", the words "or investigation" shall be *inserted.*

5. In the said Order, after Article 3, the following new Articles shall be *inserted,* namely: -

"3A. (1) Notwithstanding anything contained in this Order, any person may make a written complaint to a Subdivisional Magistrate of an offence punishable under this order.

(2) Upon receipt of a complaint under clause (1), the Subdivisional Magistrate may direct and inquiry or investigation to be made by any Magistrate subordinate to him, or by a Police Officer not below the rank of Sub. Inspector, or by any other person as he thinks fit, for the purpose of ascertaining the truth or falsehood of the complaint.

(3) The Magistrate or the Police Officer or the person making the inquiry or investigation shall submit a report to the Subdivisional Magistrate within such time as the Subdivisional Magistrate may specify.

(4) Upon receipt of the report under clause (3), the Subdivisional Magistrate shall consider the result of the inquiry or investigation and, after such consideration, if he is of the opinion that there is no sufficient ground for proceeding against any person, he shall dismiss the complaint, and if he is of the opinion that there is sufficient ground for proceeding against any person, he shall direct a Police Officer not below the rank of Sub-Inspector to cause the arrest of such person and produce the arrested person before him.

(5) When the arrested person is produced before the Subdivisional Magistrate, he shall commit the person to jail custody and simultaneously forward the report received by him under clause (3), with all relevant papers, to the Special Tribunal, or the Special Magistrate, as the case may be, having jurisdiction for trial of the case.

(6) The Subdivisional Magistrate shall also inform the complainant of the fact of forwarding the report to the Special Tribunal or the Special Magistrate under clause (5).

(7) The complaint may produce evidence before the Special Tribunal or the Special Magistrate, as the case may be, at the time of trial of the case and the Special Tribunal or the Special Magistrate shall issue summons to such witnesses as it or he may consider necessary for the trial.

3B. Notwithstanding anything contained in this Order, as Subdivisional Magistrate may on application or of his own motion, direct a Police Officer to make

an investigation or to expedite an investigation or to make further investigation in any case relating to an offence punishable under this Order.

3C. A Public Prosecutor, specified by the Government by notification in the official Gazette, may, at any time before the trial of an offence begins in any case, withdraw the report made by the Police Officer in that case, for further investigation by the Police Officer.

Provided that a fresh report shall be made by the Police Officer within such time as the Special Tribunal or the Special Magistrate concerned may fix."

6. In the said Order. In Article 4 *after* the words "Special Tribunal set up" the words "or a Special Magistrate appointed" shall be *inserted*.

7. In the said Order, in Article 5.-

a) in clause (1),after the words " Special Tribunal" the words "and appoint as many Special Magistrate" shall be *inserted*; and

b) *after* clause (3), the following new clause shall be added namely: -

"(4) No person shall be qualified to be appointed a Special Magistrate unless he is or has been a Magistrate of the first class.

8. "In the said Order, in Article 6, -

a) In clause (2), *after* the words "in Parts", the figures and comma "II", shall be *inserted*;

b) *After* clause (2), the following new clause shall be *inserted*, namely:-

"(2a) A Special Magistrate may try and punish any of the offences specified in Part IV of the Schedule,"; and

c) *after* clause (3), the following new clause shall be added namely: -

"(4) A Subdivisional Magistrate may transfer any case for trial to, or withdraw any case from, any Special Magistrate within his jurisdiction."

9. In the said Order, *for* Article 7, the following shall be *substituted*, namely-

"7. A Special Tribunal or a Special Magistrate my take cognizance of any offence triable by it or him under this order –

a) Upon a report in writing of facts which constitute such offence made by any Police Officer not below the rank of Sub-Inspector;

b) Upon receiving a report forwarded by a Subdivisional Magistrate under clause (5) of Article 3A: Provided that when, during the trial of an offence under this Order, a Special Tribunal or a Special Magistrate finds from the evidence that a report should have been made to it or him against a person for committing an offence punishable under this Order, the Special Tribunal or the Special Magistrate as the case may be, may, upon such evidence, take cognizance of such offence:

Provided further that if, in the course of a trial before a Special Magistrate, the evidence appears to him to warrant a presumption that the case is one which should be tried by a Special Tribunal, he shall stay proceedings and submit the case, with a brief report explaining its nature, to a Special Tribunal having jurisdiction to try the case, and the Special Tribunal, to which the case is submitted, shall try the case.".

10. In the said Order, in Article 8,-

a) In clause (1), *after* the word "Tribunal", the words "or a Special Magistrate" shall be *inserted*;

b) *After* clause (2), the following new clause shall be *inserted*, namely:-

'(2a) A Special Magistrate trying an offence under this Order shall try such offence summarily and in trying such offence such Magistrate shall follow the procedure laid down in the Code for summary trial of summons cases."; and

c) In clause (3), *after* the word "Tribunal", the words "or a Special Magistrate" shall be *inserted*.

11. In the said Order, *for* Article 9 the following shall be *substituted*, namely: -

"9(1) A person may be tried *in absentia* for an offence punishable under this order.

(2) A person accused of more offences than one punishable under this Order may be tried at one trial for all such offences.

(3) A person accused of an offence publishable under this Order may be tried by a Special Tribunal or a Special Magistrate, as the case may be, anywhere in Bangladesh.

(4) A Special Tribunal or a Special Magistrate shall not be bound to adjourn a trial for any purpose unless such adjournment is, in its or his opinion, necessary in the interests of Justice,

(5) Where a trial is held in the absence of the accused person or where the accused person is not defended by a legal practitioner of his choice, the Special Tribunal or the Special Magistrate shall proceed with the trial after taking necessary steps to appoint a legal practitioner to defend the accused person.".

12. In the said Order, in Article 10, *after* the word "Tribunal" the words "or a Special Magistrate" shall be *inserted.*

13. In the said Order, *after* Article 10, the following new Article shall be *inserted*, namely: -

"10A. In a trial of an offence punishable under this Order, -

a) no fact shall be deemed to be disproved or not proved merely on the ground that there is no post mortem report medical report, or report of any Chemical Examiner or Assistant Chemical Examiner to the Government or of any other expert or that there is delay in giving information to the police or in making a complaint or that the dead body was not found;

b) whenever any official document is produced by any officer having the custody of such document in the ordinary course of official duty before the Special Tribunal or a Special Magistrate purporting to contain any names of members of any force raised to as it's the occupation army or members or office bearers of any committee, the Special Tribunal or Special magistrate shall, unless the contrary is shown, presume that the names contained in the document are truly and duly written by the person or the authority and at the time and place by whom or at which they purport to have been written;

c) judicial notice may be taken by a Special Tribunal or a Special Magistrate of any facts of common knowledge or of any official document produced by any officer having the custody of such document in the ordinary course of official duty or of reports or photographs published in any news paper, periodical or magazine.".

14. In the said Order, in Article 11,-

a) In clause (a), *after* the words "specified in" the words and brackets "paragraph (a) of" shall be *inserted*;

b) *After* clause (a), the following new clause shall be *inserted*, namely:-
"(aa) any collaborator who is convicted of any of the offences specified in paragraph (b) of Part 1 of the Schedule shall be punished with transportation for life or with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, and shall also be liable to fine;'; and

c) in clause (d), *for* the words "not exceeding two years" the words "which may extend to five years but shall not be less than three years" shall be *substituted.*

15. In the said Order *after* Article 11, the following new Articles shall be *inserted*, namely:-

"11A (1) Whoever knowingly or having reason to believe that a person is a proclaimed person under Article 17, harbours such person shall be deemed to be a collaborator and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to five years but shall not be less than three years, and shall also be liable to fine.

(2) Any offence under this Article shall be deemed to be an offence specified in

Part IV of the Schedule.

11B. When trying an offence under this Order a Special Tribunal or a Special Magistrate may also try other offences not so triable with which the accused person may, under the provisions of the Code relating to the joinder of charges, be charged at the same trial.

11C. (1) A Special Tribunal or a Special Magistrate shall have power to punish any person who, with intent to cause injury to any person, institutes or causes to be instituted before it or him any criminal proceeding against that person or falsely charges any person with having committed an offence triable by it or him, knowing that there is no just or lawful ground for such proceeding or charge against that person, with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fire, or with both.

(2) Any offence under this Article shall be deemed to be an offence triable under this Order."

16. In the said Order, in Article 12, *after* the word "Tribunal" the words "or the Special Magistrate" shall be *inserted.*

17. In the said Order, in Article 13, after the word "Tribunal", the words, "or the Special Magistrate" shall be inserted.

18. In the said Order, in Article 16,-

a) In clause (1), *after* the word "Tribunal", the words "or a Special Magistrate" shall be *inserted*;

b) In clause (2), *after* the word "Tribunal" occurring for the first time, the words "or a Special Magistrate" and *after* the word "Tribunal", occurring for the second time, the words "or the Special Magistrate" shall be *inserted*;

c) in clause (3), *for* the figures "30" occurring twice the word "sixty" shall be *substituted*; and

d) *after* clause (4), the following new clause shall be *added*, namely: -

"(5) Notwithstanding anything contained in this Order, the Government may, within sixty days from the date of commencement of the Bangladesh Collaborators (Special Tribunals) (Third Amendment) Order, 1972 (P.O. No. 103 of 1972), apply to the High Court for revision of sentence of any person convicted, before such commencement, of any offence specified in Part I or IV of the Schedule.".

19. In the said Order, in Article 17, in clause (1), in the Explanation, before the word "standing" the words and comma "including funds in bank," shall be *inserted.*

20. In the said Order, after Article 17, the following new Article shall be *inserted*, namely: -

"17A (1) Whenever any person is arrested under this Order, the Government may, by an order in writing, attach any property belonging to such person.

Explanation- "Property belonging to such person" includes any property, moveable or immoveable, including funds in banks, standing in his name or in the name of his wife, children, parents, minor brothers, sisters or dependents or any *benamdar.*

(2) In the matter of attachment of any property under clause (1), the provisions of clauses (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8) of Article 17 shall, *mutantis mutandis*, apply.

(3) Any property which is attached under clause (I) shall, unless sooner released from such attachment, remain under such attachment until the person arrested is released from custody.

(4) The Government may, on application or of its own motion, direct the release of any property attached under clause (1)",

21. In the said Order, in Article 18, *after* the word "Tribunal", the words 'or a Special Magistrate" shall be *inserted.*

22. In the said Order, in the Schedule, -

a) *For* Part I the following shall be substituted, namely:-

"PART-I"

a) offences under sections 121, 121A, 124A, 302, 304, 364, 376 and 396 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of such offences.

b) offences under sections 307, 326, 329, 366, 367, 392, 394, 395, 436, 438, 449 and 450 of the penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of such offences,"; and

c) *for* Part II the following shall be *substituted*, namely: -

"PART-II"

Offences under sections 308, 325, 328, 330, 331, 333, 354, 363, 365, 368, 369, 380, 382, 386, 388, 389, 393, 397, 435, and 437 of the Penal Code and attempts to commit or the abetment of the commission of any of such offences.".

No. 58 Pub-24th January, 1972-The above Order made by the President on the advice of the Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh on the 24th January, 1972, is hereby published for general information. [Published in the Bangladesh Gazette Extra, dated the 24th January, 1972]

পরিশিষ্ট ৩

দালালদের ক্ষমা, ত্রিদেশীয় চুক্তি ও সাধারণ ক্ষমার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ দালাল আদেশ ১৯৭২-এ অভিযুক্তদের প্রতি আংশিক ক্ষমা

দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত কয়েক শ্রেণীর প্রতি বঙ্গবন্ধু সরকারের অনুকম্পা

সরকার গতকাল (বুধবার) বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশে কয়েক শ্রেণীর অভিযুক্ত এবং সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, কয়েক শ্রেণীর ব্যক্তি এবং কয়েক শ্রেণীর অপরাধের ক্ষেত্রে এই ক্ষমা প্রয়োজ্য হইবে না।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা যুদ্ধের প্রচেষ্টা, রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি ১৮ ধরনের এক বা একাধিক বা সকল অভিযোগে সাজাপ্রাপ্ত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শিত হইবে না।

উপ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দখলদার সেনাবাহিনীর সপক্ষে দেশের ভিতরে বা বাহিরে প্রচারণায় অংশগ্রহণ, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান সরকার বা পাকিস্তান সরকারের মন্ত্রীরা, উপদেষ্টার পদ গ্রহণের জন্য দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত এবং আল-বদর বা আল-শামস-এর সদস্য ও রাজাকার কম্যাণ্ডার হওয়ার কারণে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার দায়ে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও অনুকম্পা প্রদর্শনের আওতায় পড়িবেন না।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়: সরকার ঘোষিত অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক সকল ব্যক্তিকেই জেল বা হাজতে থাকিলে এই ঘোষণা প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে। অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট, গ্রেফতারী পরোয়ানা বা হাজির হওয়ার নির্দেশ থাকিলে ঘোষণা প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যেই তাহাদের মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

অনুকম্পা লাভে ইচ্ছুক সকলকেই সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকটে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মুচলেকা দিতে হইবে এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকারের ঘোষণা দিতে হইবে।

বঙ্গবন্ধুর সরকার গতকালই (বুধবার) প্রথম দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনুকম্পা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। দালাল আইনে অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনুকম্পা প্রদর্শনের বিষয় কিছুদিন যাবৎ সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন ছিল। সমগ্র বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বিবেচনার পর সরকার নিম্নলিখিত ঘোষণা প্রকাশ করিয়াছেন:

১. চতুর্থ প্যারায় উল্লেখিত ব্যক্তি এবং অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে, পূর্বে উল্লেখিত আদেশ (দালাল আদেশ) বলে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের সাজা মওকুফ করা হইবে এবং জেল হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে, অবশ্য যদি তাদের বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ ছাড়া অন্য কোন আইন অনুযায়ী অভিযোগ না থাকে এবং তাহারা যদি সদাচরণের ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করেন এবং লিখিতভাবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও বাধ্যতা স্বীকার করেন।

২. চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি ও অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে উল্লেখিত আদেশ অনুযায়ী বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট বা বিশেষ আদালতে বিচারাধীন সকল ব্যক্তির মামলা সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালতের অনুমোদনক্রমে প্রত্যাহার করা হইবে এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের হাজত হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে, অবশ্য যদি তাহারা দালাল আদেশ ছাড়া অন্য কোন বিচারযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য আইনে বিচারাধীন না থাকেন এবং যদি তাহারা সদাচরণের ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করেন। এবং লিখিতভাবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও বাধ্যতা স্বীকার করেন।

৩. চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তি ও অপরাধসমূহ ব্যতিরেকে উক্ত আদেশ বলে দায়েরকৃত সকল মামলা তদন্ত এবং অনুসন্ধানমূলক কাজ প্রত্যাহার করা হইবে এবং সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা, হাজির হওয়ার নির্দেশ ও সম্পত্তি দখলের আদেশ বাতিল করা হইবে এবং এই কারণে ইতিমধ্যেই কেউ হাজতে থাকিলে মুক্তি দেওয়া হইবে, অবশ্য অন্য কোন শাস্তিযোগ্য বা বিচারযোগ্য আইনে যদি কোন অভিযোগ না থাকে এবং যদি তাঁহারা সদাচরণের ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান করেন ও লিখিতভাবে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করেন।

৪. ১, ২ ও ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনুকম্পা নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি এবং নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের প্রতি প্রযোজ্য হইবে না:

ক. যাহারা উল্লিখিত আদেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত অপরাধসমূহের একটি বা সব কয়টি অপরাধের দায়ে সাজাপ্রাপ্ত, বা অভিযুক্ত কিংবা এই সব অপরাধ সংগঠন করিয়াছে বলিয়া কথিত:

১। ১২১ (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা যুদ্ধের প্রচেষ্টা),
২। ১২১ (ক) (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র),
৩। ১২৪ (ক) (রাষ্ট্রদ্রোহিতা),
৪। ৩০২ (হত্যা),
৫। ৩০৪ (অপরাধযোগ্য নরহত্যা),
৬। ৩৬৩ (অপহরণ),
৭। ৩৬৪ (হত্যার জন্য অপহরণ),
৮। ৩৬৫ (আটক রাখার জন্য অপহরণ),
৯। ৩৬৮ (অপহৃত ব্যক্তিদের গোপন করা এবং আটক রাখা),
১০। ৩৯৬ (ধর্ষণ),
১১। ৩৯২ (চুরি),
১২। ৩৯৪ (জখম করিয়া চুরি),
১৩। ৩৯৫ (ডাকাতি),
১৪। ৩৯৬ (খুন করিয়া ডাকাতি),
১৫। ৩৭৯ (খুন বা গুরুতর রূপে আহত করার চেষ্টা করিয়া চুরি বা ডাকাতি),
১৬। ৪৩৫ (আগুন বা বিস্ফোরক উপাদানের সাহায্যে দুস্কৃতি),
১৭। ৪৩৬ (ঘর নষ্ট করার মতলবে আগুন বা বিস্ফোরক উপাদানের সাহায্যে দুস্কৃতি),
১৮। ৪৩৮ (আগুন বা বিস্ফোরকের সাহায্যে কোন নৌযানে দুস্কৃতি),

খ. দখলী আমলে উপ-নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত, অথবা অভিযুক্ত, অথবা কথিত;

গ. দখলদার বাহিনীর অনুকূলে স্বদেশে বা বিদেশে প্রচার চালাইবার জন্য কোন পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল বা কমিটির সদস্যরূপে বিদেশে গমন করিয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত;

ঘ. দখলী আমলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান বা পাকিস্তান সরকারের গভর্ণও, মন্ত্রী বা উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করিয়া যাহারা দখলাদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত, অভিযুক্ত বা কথিত;

ঙ. আলবদর বা আলশামস সংগঠনের সদস্য হইয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহ-যোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত;

চ. রাজাকার কম্যাণ্ডার হইয়া দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত;

ছ. দখলী আমলে জেলা, মহকুমা বা থানা শান্তি কমিটির প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, আহবায়ক বা সেক্রেটারী হইয়া দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত, অভিযুক্ত বা কথিত;

জ. দখলী আমলে সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কর্মকর্তা হইয়া যাহারা দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত;

ঝ. মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা ও সংগঠন দমন বা পার্থিব সুবিধা আদায়ের মানসে দখলদার বাহিনীকে তথ্যাদি সরবরাহ এবং সাহায্যদানের মাধ্যমে দখলদার বাহিনীর সহিত সহযোগিতার অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া যাহারা সাজাপ্রাপ্ত বা অভিযুক্ত বা কথিত।

৫. এই ঘোষণার আওতায় অনুকম্পা প্রার্থনা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ যাহারা জেলে বা হাজতে আছে, অথবা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে যাহাদের হাজির করা হইবে বা হাজির হওয়ার জন্য যাহাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা বা হুলিয়া জারি হইয়াছে এবং যাঁহারা পালাইয়া বেড়াইতেছে, ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করার জন্য এই ঘোষণা প্রকাশের তিন সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইতেছে।

৬. প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত মুচলেকা প্রদান এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার ঘোষণার পর, অনুরূপ মুচলেকা প্রদানকারী ও ঘোষণাকারী ব্যক্তিবর্গকে, তাহারা যদি দণ্ডপ্রাপ্ত হয় তবে ৪০১ নং ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত দণ্ডাদেশ মওকুফের যথাযথ নির্দেশ অনুযায়ী জেল হইতে খালাস করা হইবে, অথবা তাহারা যদি বিচারাধীন থাকে তবে ৪৯৪ ফৌজদারী কার্যবিধির আওতাধীনে চলতি মামলা বিশেষ টাইবুন্যাল অথবা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি লইয়া মামলা প্রত্যাহারের পর হাজত হইতে মুক্তি দেওয়া হইবে, অবশ্য মুক্তির শর্ত হইতেছে যে, তাহাদের যদি উপরোক্ত আদেশের বাহিরে বিচারযোগ্য ও শাস্তিযোগ্য অন্য কোন অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নহে এবং গ্রেফতারের জন্য জারিকৃত সকল পরোয়ানা ও হাজির হওয়ার জন্য সকল ঘোষণা এবং তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াফত করার আদেশ বাতিল ও প্রত্যাহার করা হইবে এবং ফিরাইয়া নেওয়া হইবে।(সূত্র: *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭মে ১৯৭৩)।

পরিশিষ্ট ৩(ক)

বাংলাদেশ দালাল আদেশ ১৯৭২-এ অভিযুক্তদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা

দেশগড়ার কাজে আত্মনিয়োগের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্তদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর আহবান: ধর্ষণ ও হত্যাকারীদের ক্ষমা নেই: দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্তদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা

সরকার বাংলাদেশ দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুনাল) আদেশ ১৯৭২ বলে যারা আটক হয়েছেন, যাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা অথবা হুলিয়া রয়েছে, এবং যারা এই আইনে সাজা ভোগ করছেন তাদের সকলের প্রতিই এই সাধারণ ক্ষমা প্রযুক্ত হবে এবং তারা অবিলম্বে মুক্তিলাভ করবেন। তবে নরহত্যা, নারী ধর্ষণ এবং অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরকের সাহায্যে ঘরবাড়ী ধ্বংস অথবা জলযান ধ্বংসের অভিযোগে অভিযুক্ত ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এই সাধারণ ক্ষমা প্রযুক্ত হবে না। গতকাল শুক্রবার রাতে প্রকাশিত এক সরকারি প্রেসনোটে এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কথা প্রকাশিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গতরাতে বলেন, দলমত নির্বিশেষে সকলেই যাতে আমাদের মহান জাতীয় দিবস ১৬ই ডিসেম্বরে ঐক্যবদ্ধভাবে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেশ গড়ার শপথ নিতে পারে সরকার সেজন্যে বাংলাদেশ দালাল আইনে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শন করছেন।

বাংলাদেশ দালাল আদেশে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা যাতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর অনতিবিলম্বে জেল থেকে মুক্তিলাভ করতে পারেন এবং আসন্ন ১৬ই ডিসেম্বরে বিজয় দিবসের উৎসবে যোগদান করতে পারেন বঙ্গবন্ধু সেজন্যে তাদের মুক্তি ত্বরান্বিত করতে স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। সাধারণ ক্ষমায় যারা মুক্তি পাবেন তাদের বিজয় দিবসের উৎসবে একাত্ম হতে এবং দেশ গঠনের পবিত্র দায়িত্ব ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার শপথ গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু তাঁর সরকারের সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের কথা ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, মুক্ত হয়ে দেশ গঠনের পবিত্র ও মহান দায়িত্ব গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ তারা গ্রহণ করবেন এবং তাদের অতীতের সকল তৎপরতা ও কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন তিনি এটাই কামনা করেন।

বঙ্গবন্ধু বলেন, বহু রক্ত ত্যাগ তিতিক্ষা আর চোখের পানির বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। যে কোনো মূল্যে এই স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এবারের বিজয় দিবস বাঙালীর ঘরে ঘরে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি ও কল্যাণের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় কিছু লোক দখলদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে আমাদের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন। পরে বাংলাদেশ দালাল আদেশ বলে তাদের গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই পরিচিত ব্যক্তি। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দখলদার বাহিনীর সঙ্গে তাদের সহযোগিতার ফলে বাংলাদেশের মানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশা নেমে এসেছিলো।

বঙ্গবন্ধু বলেন, এসব লোক দীর্ঘ দিন ধরে আটক রয়েছেন। তিনি মনে করেন যে এতদিনে তারা নিশ্চয়ই গভীরভাবে অনুতপ্ত। তারা নিশ্চয়ই তাদের অতীত কার্যকলাপের জন্যে অনুশোচনায় রয়েছেন। তিনি আশা করেন তারা মুক্তিলাভের পর তাদের সকল অতীত কার্যকলাপ ভুলে গিয়ে দেশ গঠনের নতুন শপথ নিয়ে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

গতকাল স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত প্রেসনোট ইস্যু করা হয়:

প্রেসনোট

যারা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনালস) আদেশ (পিও নং ৮, ১৯৭২ সালের) বলে আটক রয়েছেন অথবা সাজা ভোগ করছেন তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নটি সরকার আরও বিবেচনা করে দেখেছেন। সরকার এ সম্পর্কে এখন নিম্নোক্ত ঘোষণা করছেন:

১। দু'নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত ব্যক্তিদের ও অপরাধসমূহের ক্ষেত্র ছাড়া-

(ক) ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০১ নং ধারা অনুযায়ী উল্লিখিত আদেশ বলে আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের রেহাই দেয়া হচ্ছে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অপর কোনো আইনবলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না থাকলে তাদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার অনতিবিলম্বে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

(খ) কোনো বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সম্মুখে অথবা কোনো বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে উক্ত আদেশবলে বিচারাধীন সকল মামলা সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল ও ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে প্রত্যাহার করা হবে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অপর কোনো আইনে তাদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন কোনো মামলা বা অভিযোগ না থাকলে তাদের হাজত থেকে মুক্তি দেয়া হবে।

(গ) কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে উল্লিখিত আদেশ বলে আনীত সকল মামলা ও তদন্ত তুলে নেয়া হবে এবং উল্লিখিত আদেশ ছাড়া অপর কোনো আইনে বিচার ও দণ্ডযোগ্য আইনে সে অভিযুক্ত না হলে তাকে মুক্তি দেয়া হবে। উল্লিখিত আদেশ বলে ইস্যু করা সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা, হাজির হওয়ার নির্দেশ অথবা কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে হুলিয়া কিংবা সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেয়া থাকলে তা প্রত্যাহার বলে বিবেচিত হবে, এবং গ্রেফতারী পরোয়ানা, অথবা হুলিয়ার বলে কোনো ব্যক্তি ইতিপূর্বে গ্রেফতার হয়ে হাজতে আটক থাকলে তাকে অনতিবিলম্বে মুক্তি দেয়া হবে। অবশ্য সে ব্যক্তি উল্লিখিত দালাল আদেশ ছাড়া বিচার ও দণ্ডযোগ্য অপর কোনো আইনে তার বিরুদ্ধে যদি কোনো মামলা না থাকে তবেই।

যাদের অনুপস্থিতিতেই সাজা দেয়া হয়েছে অথবা যাদের নামে হুলিয়া বা গ্রেফতারী পরোয়ানা ঝুলছে তারা যখন উপযুক্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করে ক্ষমা প্রার্থনা এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করবে কেবল তখনই তাদের বেলা ক্ষমা প্রযোজ্য হবে।

২। দণ্ডবিধির ৩০২ নম্বর ধারা (হত্যা), ৩০৪ নম্বর ধারা, ৩৭৬ ধারা (ধর্ষণ), ৪৩৫ ধারা (গুলি অথবা বিস্ফোরক ব্যবহার) করে ক্ষতি সাধন এবং ৪৬৬ ধারা (ঘর জ্বালানী) এবং ৪৪৮ ধারায় (নৌযানে আগুন বা বিস্ফোরণ) অভিযুক্ত বা সাজাপ্রাপ্তগণ এক নম্বর অনুচ্ছেদে উলিখিত ক্ষমার আওতায় পড়বে না।

সূত্র: *দৈনিক বাংলা*, ১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

পরিশিষ্ট ৩(খ)

যুদ্ধাপরাধী, যুদ্ধবন্দী ও আটকেপড়া নাগরিকদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত- পাকিস্তানের ত্রিদেশীয় চুক্তি

তিন দেশের মধ্যে প্রথম চুক্তি

নয়াদিল্লী, ৯ই এপ্রিল (ইউএনআই)- বাংলাদেশ, ভারত আর পাকিস্তানের মধ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে পাঁচ দিনব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পর আজ সন্ধ্যায় একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটাই তিন দেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রথম চুক্তি। ভারতীয় সময় আজ রাত ৮টা ৪৭ মিনিটে তিনটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। আজ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি পৃথক দ্বিপাক্ষিক চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ স্বদেশ রওয়ানা হয়ে গেছেন।

আগামীকাল বুধবার চুক্তির বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হবে। আজ চুক্তিতে স্বাক্ষরের পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেছেন উপমহাদেশের শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এটা একটি অগ্রবর্তী পদক্ষেপ। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং বলেছেনঃ এ চুক্তি উপমহাদেশে শান্তির পক্ষে একটি ঐতিহাসিক দলিল।

ত্রিপক্ষীয় চুক্তির বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিস্তারিত এখনও কোনো কছু জানা যায়নি। তবে বিবিসির এক খবরে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশ ভারত আর পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ১৯৫জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধী এবং বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানের অবশিষ্ট নাগরিকদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নে একটি চুক্তিতে পৌঁছেছেন।

নয়াদিল্লী থেকে বাসসর প্রতিনিধি আতাউস সামাদ এক খবরে উল্লেখ করেছেন যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং, ড. কামাল হোসেন এবং জনাব আজিজ আহমেদ দুটি প্রধান প্রশ্নে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে আজ সন্ধ্যায় আবার এক বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এর আগে অপরাহ্নে এবং দুপুরের কিছু আগে তাঁরা আরও দুটি বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। উপমহাদেশে স্বাভাবিক সম্পর্ক এবং স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে গত শুক্রবারে বৈঠক শুরু হওয়ার পর বারো দফায় তিনটি দেশের মধ্যে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এই বারো দফা আলোচনার মধ্যে তিনটি দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে আট দফা। বাকী চার দফা আলোচনা হয়েছে তিনটি দেশের প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে।

গতরাতে ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এক দীর্ঘ আলোচনায় মিলিত হয়েছিলেন। এই আলোচনা শুরু হয়েছিলো ভারতীয় সময় রাত সোয়া এগারোটায় এবং শেষ হয়েছিলো রাত সোয়া দুটোয়। মাঝখানে এক সময় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং বৈঠক থেকে উঠে বাইরে গিয়েছিলেন। পরে তিনি আবার বৈঠকে ফিরে এসেছিলেন এবং তারপরও আলোচনা প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ধরে চলেছিলো। শ্রী শরণ সিং যেসময় ছিলেন না সে সময়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা আলোচনা চালিয়ে গিয়েছিলেন।

গতরাতে তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের মধ্যে সোমবারের গভীর রাত পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার ফলাফল বাংলাদেশ ও পাকিস্তানী প্রতিনিধি দল তাদের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে জানিয়ে দিয়ে পরবর্তী নির্দেশের জন্যে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন।

সূত্রঃ *দৈনিক বাংলা*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭৪।

পরিশিষ্ট ৩(গ)

যুদ্ধাপরাধী, যুদ্ধবন্দী ও আটকেপড়া নাগরিকদের প্রত্যাবাসন বিষয়ে বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের ত্রিদেশীয় চুক্তি

পাকিস্তান ক্ষমা চাওয়ায় ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর প্রতি বাংলাদেশের অনুকম্পা প্রদর্শন

দখলদার আমলে বাংলাদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে বর্বরতা চালিয়েছে তার জন্যে পাকিস্তানের গভীর অনুশোচনা ও নিন্দে প্রকাশ এবং বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব ভূট্টোর 'ক্ষমা করো এবং ভুলে যাও' আবেদনে বাংলাদেশ ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে তার বাকী নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়েছে। গত বছর আগস্টে সম্পাদিত দিল্লী চুক্তি অনুযায়ী ত্রিমুখী লোক বিনিময় ব্যবস্থার অধীনে পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে তার অবশিষ্ট নাগরিকদের ফিরিয়ে নেবে এবং তার কোনো সংখ্যাসীমা নির্দিষ্ট থাকবে না।

গতকাল ভারতের রাজধানী দিল্লীতে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক ত্রিপক্ষীয় চুক্তিতে দুটি দেশের এই সিদ্ধান্তের উল্লেখ রয়েছে। বাসস পরিবেশিত খবরে প্রকাশ, গত রাতে একযোগে ঢাকা, নয়াদিল্লী ও ইসলামাবাদ থেকে এই চুক্তির পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা হয়।

১৬ দফা চুক্তির পূর্ণ বিবরণ নীচে দেয়া হলঃ

১৯৭২ সালের ২রা জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী সিমলায় একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতদিন ধরে মোকাবিলা ও সংঘর্ষের কারণে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিঘ্নিত হচ্ছিল, সেজন্য তাঁরা সম্পর্ক গড়ে তোলা ও উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করার সংকল্পের কথা চুক্তিতে বলা হয়। চুক্তিতে তাঁদের মধ্যকার বিরোধ দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা পরস্পরের স্বীকৃত অন্য কোন শান্তিপূর্ণ পন্থায় সমাধান করার কথাও বলা হয়েছে।

(২) বাংলাদেশ সিমলা চুক্তিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী চুক্তির সমঝোতা স্থাপন, সৎ প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের প্রতি জোর সমর্থন জানান।

(৩) ১৯৭১ সালের দুঃখজনক ঘটনাবলীর ফলে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাসমূহ উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সমঝোতা ও সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বীকৃতির অভাবে বাংলাদেশ মানবিক সমস্যা সমাধানে ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় সম্মত হতে পারেনি। কারণ সার্বভৌম সমতার ভিত্তি ছাড়া বাংলাদেশ এ ধরনের বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে পারে না।

(৪) ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল মানবিক সমস্যা সমাধানে অচলাবস্থা দূরীকরণে ভারত ও বাংলাদেশ স্বীকৃতির রাজনৈতিক দিক বাদ দিয়ে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৭ই এপ্রিলে এক ঘোষণায় বলা হয় যে তারা উপমহাদেশে উত্তেজনা হ্রাস, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য একযোগে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। এতদুদ্দেশ্যে ও উপমহাদেশে সমঝোতা, শান্তি, স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার বৃহত্তর স্বার্থে কতিপয় অভিযোগ বিচারের জন্য কয়েকজন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ছাড়া আটক ব্যক্তিদের সমস্যা মানবিক কারণে বিবেচনা করে তারা যৌথভাবে একযোগে এদের স্বদেশে পাঠানোর প্রস্তাব করেন।

(৫) এ ঘোষণার পর ভারত ও বাংলাদেশ এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক দফা আলাপ-আলোচনা হয়। এসব বৈঠকের পর ১৯৭৩ সালের ২৮শে আগস্ট দিল্লীতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মানবিক সমস্যার কথা বিবেচনা করে বাংলাদেশ এতে সম্মতি দেয়।

(৬) এ চুক্তি মোতাবেক ১৯৭৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ত্রিমুখী লোক বিনিময় শুরু হয়। এ পর্যন্ত তিন লাখ লোক নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ায় সমঝোতার পরিবেশ সৃষ্টি এবং উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

(৭) ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে স্বীকৃতি আসে। ফলে দিল্লী চুক্তিতে উল্লিখিত সার্বভৌম সমতার ভিত্তিতে ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় বাংলাদেশের অংশগ্রহণের পথ সুগম হয়। এরপর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের বিদেশমন্ত্রী শরণ সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী জনাব আজিজ আহমদ ১৯৭৪ সালের ৫ই এপ্রিল থেকে ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত আলাপ আলোচনা করেন। তাঁরা দিল্লী চুক্তির বিভিন্ন বিষয়, বিশেষ করে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দী ও পাকিস্তানে আটক বাঙালী, বাংলাদেশে অবস্থানকারী পাকিস্তানী ও ভারতে আটক প্যাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ত্রিমুখী বিনিময় পদ্ধতির সমাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

(৮) তিন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা ১৯৭৩ সালের ২৮শে আগস্ট-এর স্বাক্ষরিত দিল্লী চুক্তির অধীন ত্রিমুখী লোক বিনিময়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন। তিন দেশে আটক বিপুলসংখ্যক লোক নিজ নিজ দেশে ফিরে যাওয়ায় তাঁরা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

(৯) সন্তোষজনকভাবে ত্রিমুখী লোক বিনিময় তাড়াতাড়ি শেষ করার উপায় ও পদ্ধতি সম্পর্কেও তারা আলোচনা করেন।

(১০) ভারতীয় পক্ষ জানান যে এখন ভারতে আটক যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক নাগরিকদের সংখ্যা আনুমানিক সাড়ে ছয় হাজার। একদিন পর পর নিয়মিতভাবে ট্রেনে তাদের স্বদেশে পাঠানো হবে। ১০ই এপ্রিল থেকে ১৯শে এপ্রিল পর্যন্ত কুম্ভ মেলা উপলক্ষে ট্রেন বন্ধ থাকবে। এর ফলে এদের স্বদেশে পাঠানোতে যে বিঘ্ন হবে ১৯শে এপ্রিলের পর থেকে অতিরিক্ত ট্রেনের সাহায্যে এদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে। কাজেই আশা করা যায় যে ১৯৭৪ সালের এপ্রিলের মধ্যেই লোক বিনিময় শেষ হয়ে যাবে।

(১১) পাকিস্তানী পক্ষ বলেন যে পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালীদের স্বদেশ পাঠানোর কাজ সমাপ্তির পথে। কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি ছাড়াই অবশিষ্ট বাঙালীদেরও স্বদেশে পাঠানো হবে।

(১২) বাংলাদেশে অবস্থানরত অবাঙালীদের সম্পর্কে পাকিস্তানী পক্ষ জানান যে ইতিমধ্যেই পাকিস্তান সরকার সেসব অবাঙালীদের যারা সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে ডোমিসাইল্ড, কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরে ও তাদের পরিবারবর্গ অথবা বিভক্ত পরিবারের সদস্য অবাঙালিদের তারা সাবেক পাকিস্তানের যে অংশেই ডোমিসাইল্ড হয়ে থাকুক না কেন তাদের পাকিস্তানে যাবার ছাড়পত্র দিয়েছেন। ২৫ হাজার অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে ছাড়পত্র দানের কাজও এগিয়ে চলেছে। পাকিস্তানী পক্ষ আবারও বলেন যে প্রথমোক্ত তিনটি ক্যাটেগরীর অন্তর্ভুক্ত তাদের সংখ্যা যতই হোক না কেন সকলকেই গ্রহণ করতে পাকিস্তান রাজী। যাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে তার কারণ জানতে চাওয়া হলে পাকিস্তান সরকার তা জানাবেন। প্রত্যাখ্যাত যে কোন আবেদনকারী তার পাকিস্তানে যাবার দাবির সমর্থনে প্রথমোক্ত তিনটি ক্যাটেগরীর মধ্যে যে কোনটির অন্তর্ভুক্তির সমর্থনে নয়া কোন তথ্য সংযোজন করে তার আবেদন পুনর্বিবেচনা করার জন্য পাকিস্তান সরকারের কাছে যে কোন সময় দরখাস্ত করতে পারবেন। এ ধরনের আবেদনকারীদের কোন সময়সীমা থাকবে না। কোন আবেদনকারীর পুনর্বিবেচনার ফল সন্তোষজনক না হলে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে তার মীমাংসা করতে পারবেন।

(১৩) উপমহাদেশে সমঝোতা, শান্তি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠায় সংশ্লিষ্ট তিনটি দেশের সরকারের গভীর আগ্রহের প্রেক্ষিতে তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ১৯৫জন যুদ্ধবন্দী প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করেন। *বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে এসব যুদ্ধবন্দীরা জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনের চোখে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে এবং গণহত্যার জন্য দায়ী*। ১৯৫জন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী এসব অপরাধের জন্য দায়ী এবং আইন মোতাবেক এদের বিচারের ব্যাপারে বিশ্ববাসী একমত। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিমন্ত্রী বলেন যে পাকিস্তান সরকার এ ধরনের অপরাধের নিন্দা ও গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

(১৪) তিনটি দেশের সমঝোতার জন্য কাজ করে যাওয়ার সংকল্পের প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারটি বিবেচনা করা প্রয়োজন বলে তিন মন্ত্রীই অভিমত প্রকাশ করেন। তারা আরো বলেন যে স্বীকৃতির পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশ সফর করবেন। সমঝোতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের জনগণের কাছে অতীতের ভুলভ্রান্তির জন্য তিনি ক্ষমা চেয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীও ১৯৭১ সালের বর্বরতা ও ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, *জনগণ অতীত ভুলে নতুন করে অভিযাত্রা শুরু করুক তিনি তাই চান*।

তিনি আরো বলেছিলেন যে, *বাংলাদেশের জনগণ ক্ষমা করতে জানে*।

(১৫) ঘটনার গতিধারা লক্ষ্য করে বিশেষতঃ অতীতের ভুল ভ্রান্তির জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশের জনগণের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের সরকার ক্ষমা প্রদর্শন করে বিচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে ড. কামাল জানান। দিল্লী ঘোষণা মোতাবেক অন্য যুদ্ধবন্দীদের সাথে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকেও দেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে তারা একমত হন।

(১৬) ১৯৭১ সালের *সংঘর্ষের* ফলে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাসমূহ সমাধানে এ চুক্তি একটা দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে বলে তিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীই আশা প্রকাশ করেন। উপমহাদেশের তিনটি দেশের ৭৩কোটি অধিবাসীর শান্তি ও সমৃদ্ধির আকাঙ্খার কথা উল্লেখ করে তারা আবার উপমহাদেশে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় তাদের সরকারের সংকল্পের কথা ঘোষণা করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক বাংলা*, ১১ এপ্রিল ১৯৭৪।

পরিশিষ্ট ৩(ঘ)

শেখ মুজিব সরকারের সাধারণ ক্ষমা বিষয়ে একটি মূল্যায়ন

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষাপট

১. সরকারের উদ্যোগের অভাব ছিলো না

১. যুদ্ধ, হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং অস্থিতিশীলতা বিশেষ করে রক্তের বৃন্তের মধ্য হতে সদ্যজাত বাংলাদেশের উত্তেজনাকর এক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সনের ২৪শে জানুয়ারী বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ/ দালাল আইন জারী হয়। [পরিশিষ্ট-১০] দেশজ প্রেক্ষিতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশকারী দালালদের বিষয়টির মীমাংসায় আইনানুগ পথেই বঙ্গবন্ধুর সরকারকে অগ্রসর হতে হয়েছে। দালাল প্রসঙ্গটি শুধু জাতিক পর্যায়ে দৃশ্যতঃ বিবেচিত হলেও -প্রশ্নটির সঙ্গে জড়িয়ে ছিলো পাকিস্তান হতে চারলক্ষ বাঙালীকে ফিরিয়ে আনা এবং যুদ্ধোপরাধীদের বিচারের প্রশ্নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

দালাল আইনটি দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল এবং সর্ব মহল কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। আইনটির বিভিন্ন বিশেষ দিক যেমন-

ক. ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারদের ক্ষমতা প্রদান,
খ. দালাল সংজ্ঞার ব্যাপক বিস্তৃতি,
গ. প্রথম ছয়মাস অন্তরীণ রাখার ক্ষেত্রে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটদের ক্ষমতা,
ঘ. গ্রেফতারকৃত বা পলাতক ব্যক্তিদের সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার,
ঙ. জামিন প্রদানে অস্বীকৃতি, এবং
চ. পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিচারপতি আবদুস সাত্তার কর্তৃক নির্বাচনের তফশীলের প্রেক্ষাপটে ঘোষিত স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা করে। এই উপ-নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য চিহ্নিত দালালদের বিচার এবং এতদসম্পর্কিত উল্লেখিত বিধানসমূহ স্বাভাবিক নিয়মে ব্যতিক্রমী হওয়ার বিষয়গুলো জনগণের দৃষ্টিতে প্রাথমিক উত্তেজনাকর পরিবেশে ধরা পড়েনি।

২. কিন্তু আইনের বাস্তবায়ন শুরু হবার সঙ্গে জনমনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকলো। ১৯৭২ সাল এবং ১৯৭৩ সালের কিছু কালব্যাপী বিশেষ ট্রাইব্যনালে দালাল আইনে শত শত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ব্যক্তি বিশেষ এ সংক্রান্ত অসংখ্য মামলা দায়ের করেছে। দালাল আইনের বিচারের জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যু নালে অভিযোগ স্তুপীকৃত হতে থাকে।

পুলিশের উপর সার্বিক দায়িত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা হলেও অসংগঠিত এবং অপ্রতুল পুলিশ কর্মকর্তাদের পক্ষে সুষ্ঠু তদন্তানুষ্ঠান করে পূর্ণাঙ্গ চার্জশীট প্রণয়ন ও দাখিল করা তাদের জন্য হয়ে পড়েছিলো দুরূহ এবং একটি ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তাছাড়া এমনও বহু অভিযোগ স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ও বঙ্গবন্ধুর গোচরীভূত হচ্ছিলো যে পুলিশের লোকেরা দালালদের গ্রেফতারের দায়িত্ব খুব একটা ত্বরিত এবং যোগ্যতার সঙ্গে করছেন না। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুলিশের লোকেরাই দালালদের আত্মগোপন বা পলাতক হতে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সাহায্য করছিলো। বলতে গেলে পুলিশ অধিকাংশ জনগণের দাবি অনুযায়ী দালালদের গ্রেফতারে এবং পলাতক হতে প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সাহায্য করছিলো। বলতে গেলে পুলিশের অধিকাংশ জনগণের দাবি অনুযায়ী দালাদের গ্রেফতারে এবং তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে নিরুৎসাহ ছিলেন। কিন্তু দালাল আইনে দালালদের গ্রেফতার এবং তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের তারাই ছিলেন প্রশাসনিকভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত মূল কর্মকর্তা। পুলিশ কর্মকর্তাদের চাতুযপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার প্রেক্ষিতে দালাল আইনের সংশোধন করে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযোগ দায়ের এবং অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্তানুষ্ঠানের ক্ষমতা দেয়া হলেও অবস্থার তেমন কোন হেরফের হয়েছিলো বলে মনে করার কোন বাস্তব প্রমাণ নেই।

৩. সরকারের দিক থেকে এ ব্যাপারে কোন উদ্যোগের অভাব ছিলোনা। সেজন্য যদিও সরকার ময়না তদন্ত রিপোর্ট, মেডিকেল রিপোর্ট বা রাসায়নিক পরীক্ষায় অন্য কোন রিপোর্ট বা মৃতদেহ পাওয়া না গেলে বা পুলিশের রেকর্ডে তা না থাকলেও সংঘটিত কোন অপরাধ প্রমাণের অযোগ্য হবে না বলে দালাল আইনে সংশোধনী এনেছিলেন; এমনকি, হানাদার বাহিনীকে সহায়তাদান সংক্রান্ত কোন দলিল আদালতে তোলা হলে এবং এর প্রতিবাদ না হলে সে সমস্ত দলিল গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে বলে আইনে বিধান করেছিলেন।

৪. ১৯৭২ সালের দালাল আইন জারীর পর হতে ১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশে ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো। এতসব আইনগত বিধান, ছাড় ও ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ১৯৭৩ সনের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ২৮৪৮টি মামলার নিস্পত্তি হয়। তার মধ্যে মাত্র ৭৫২ ব্যক্তি দণ্ডিত। বাকী অবশিষ্ট ২০৯৬ ব্যক্তি খালাশ পান। অর্থাৎ অভিযোগকৃত ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের তিন চতুর্থাংশই অভিযোগ হতে অব্যাহতি পান। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিলেন, তবুও ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলার বিচার কার্য সম্পন্ন হলে মাসে ১৩০টির এবং দিনে ৩/৪টির বেশি বিচার নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

উত্তেজিত বাঙালীর গরম মাথা ঠাণ্ডা হয়ে আসছিলো এবং দালাল আইনে ধৃত এবং বিচারের সম্মুখীন ব্যক্তিদের বিচারসংক্রান্ত বিষয়টি সামাজিক প্রতিক্রিয়া ও জটিলতার সৃষ্টি করে চলছিলো অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে।

ক. আপাতঃ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও শত্রুতার নেপথ্যে বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ হলো 'কমপ্যাক্ট সোসাইটি।' আবহমানকাল থেকে শাশ্বত গ্রাম্য সালিশ বিচার ব্যবস্থার প্রচলনে গ্রামীণ সমাজে যে ভারসাম্য বর্তমান ছিলো মুক্তিযুদ্ধের সময় তা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তা নতুন আঙ্গিকে ও নেতৃত্বে স্থিতিশীল হয়ে আসতে শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধের উত্তেজনা কেটে যেতে থাকে এবং মুক্তিযোদ্ধাগণও সমাজের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে থাকেন।

খ. স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তীতে উত্তেজনা প্রশমনে, রক্তের বন্ধন, আত্মীয়সূত্রতা এবং সমাজ গোষ্ঠীর বন্ধনে অপরাধকৃত দালালদের আশ্রয় দেবার ব্যাপক প্রবণতা মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে লক্ষ্য করা গেছে।

গ. 'ক্ষমাই মহত্ত্বের লক্ষণ' এই মহানুভবতার চিরন্তনী আবহে লালিত বাংলার মানস-গঠন শাস্তি বিধানের পরিবর্তে সামাজিক সালিশ ও সমঝোতার পথেই অগ্রসর হয়েছে।

ঘ. মুক্তিযুদ্ধে একই পরিবারে পিতা শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছে, অপরদিকে পুত্র মুক্তিযুদ্ধে একই পরিবারে পিতা শান্তি কমিটির সদস্য হয়েছে, অপরদিকে পুত্র মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। পিতা ও পুত্রের এই বিপরীত অবস্থান দীর্ঘদিন আক্রোশী মনোভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধাপুত্র দালাল পিতাকে বাঁচানোর জন্য তদ্বির শুরু করতে কুণ্ঠিত হয়নি।

ঙ. অনেক দালাল এমনও ছিলো যে, তারা গোপনে মুক্তিবাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছে, খাদ্য দিয়েছে এবং প্রয়োজনমত নিরাপত্তাও দিয়েছে। দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত ঐ ব্যক্তিটি পরবর্তীকালে ঐ সব মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং আশ্রয় পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৃত অবস্থায় বা ভিন্নভাবে যাই হোক না কেন, মুক্তিযোদ্ধাগণ প্রায় দু'হাতে ধৃত ও অভিযুক্ত দালালদের ছেড়ে দেবার সুপারিশ করতে থাকে। যা প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর দপ্তরকে পর্যন্ত আক্রান্ত করে তোলে।

চ. গ্রাম্য সালিশ, দেন দরবার, তদ্বির, হাতে পায়ে ধরে ক্ষমা চাওয়া এবং ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাকার কারণে পরবর্তীকালে কিছু ব্যতিক্রম ব্যতীত বাদী পক্ষগণ মামলা চালাতে উদ্যাগ গ্রহণ হতে পিছিয়ে আসে, এমনকি মামলার ন্যূনতম সাক্ষ্য জোগাড় করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ছ. বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে সরকারি পর্যায়ে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ/শীর্ষ পর্যায়ের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ও রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বও বঙ্গবন্ধুর নিকট দালাল ক্ষমা করার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন।

৫. সামাজিক এবং মানবিক সমস্যার পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মুখোমুখি হতে হয়। ১৯৭২ সনের মার্চ হতেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ দালালদের মুক্তি দেবার জন্য আবেদন ও বিবৃতি প্রচার করতে থাকেন। এককালীন আওয়ামী লীগ নেতা এবং সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এক বিবৃতিতে বলেন "জাতি পুনর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধা না করে সরকার সারা দেশে দালাল ও কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত আছেন। মনে হচ্ছে, এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য"। তিনি বলেন, "যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘণ্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের উপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোন উপকার হবে না।" তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধীতা করেছিলেন, তাদের অনেকে সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়েছেন, অথচ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা পাকবাহিনীকে সমর্থনদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে কিংবা শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন।" তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, "এই আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এই আইনের মাধ্যমে বিচার একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।" তিনি জাতির এই জরুরী মুর্হূতে "বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার ও সকল বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ করেন।"

এই আপাত অপক্ষপাতমূলক বিবৃতির অন্তরালে সমগ্র বাংলাদেশে এমনি একটি ধারণা দেওয়ার প্রয়াস চলতে থাকে যে, দালাল আইনটি 'হিন্দু- ভারতের' উস্কানীতেই করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর কম্পাশন: ওদের ফিরিয়ে আনতে হবে

এই উস্কানির ধারণা দেশীয়ভাবে সৃষ্টি করা হলেও এর মূল নিহিত ছিলো 'মুসলিম বাংলা' প্রচারণার মাধ্যমে। রাষ্ট্রীয়ভাবে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ১৯৭৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারীর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তান নিরবিচ্ছিন্নভাবে অপপ্রচার চালিয়ে আসছিলো। পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে-

ক. প্রেসিডেন্ট ভুট্টো কর্তৃক জারীকৃত সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদের ৩নং ধারায় সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশেকে পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে চিহ্নিত করে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। এবং 'মুসলিম বাংলা' প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ ঘোষণা করেন,

খ. বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী প্রচার মাধ্যমগুলো সর্বদা সক্রিয় ছিলো এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোতে অব্যাহতভাবে প্রচার করা হচ্ছিলো যে 'বাংলাদেশ হিন্দুস্তানের দখলকৃত একটি প্রদেশ।' মুসলিম জগতের মান সম্মান ও 'মুসলিম ভাইদের' পুনরুদ্ধারের জন্য এ লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে -এই লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের মুসলিম অধ্যুষিত আরাকান সীমান্তে রাজাকারগণ তাদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে কয়েকটি ফাঁড়ি দখল করে রাখতে সমর্থ হয়;

গ. সমগ্র বিশ্বপরিসরে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রশ্নে পাকিস্তান ও গোলাম আজমের মত দালালেরা সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলো; এবং

ঘ. জাতিসংঘে বাংলাদেশ যেন সদস্যপদ লাভ না করতে পারে তজ্জন্য পাকিস্তান ও তার মিত্র চীন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলছিলো।

এসব প্রচারণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো আরো ৩টি মারাত্মক সমস্যা: পাকিস্তানী যুদ্ধোপরাধীদের বিচার, পাকিস্তানে আটক ৪ লক্ষ বাঙালীকে ফিরিয়ে আনা এবং পাকিস্তানী নাগরিকদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর প্রশ্ন।

১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমাণ্ডের নিকট ৭৪ হাজার সামরিক এবং ১৬ হাজার সিভিল (সামরিক বাহিনীতে কর্মরত) কর্মচারী সর্বমোট ৯০ হাজার সামরিক বাহিনীর লোক আত্মসমর্পণ করে।

একই সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ২,৬০,০০০ বিহারী যারা পাকিস্তানী নাগরিক হিসেবে হলফনামায় স্বাক্ষর পূর্বক 'অপশন' দিয়েছিলো তাদের ফেরত পাঠানোর প্রশ্নটি গুরুতর মানবিক সমস্যার সৃষ্টি করেছিলো।

বাংলাদেশে প্রায় প্রতিদিনই পাকিস্তানে আটকে পড়া ৪লক্ষ বাঙালীদের ফিরিয়ে আনার দাবিতে মিটিং মিছিল অনশন বঙ্গবন্ধুর সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলছিলো। একদিকে দালাল আইনের গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবি এবং পাকিস্তানে আটকে থাকা বাঙালীদের ফেরত আনার প্রশ্নে দেশে ব্যাপক সামাজিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে থাকে।

৬. দালালদের বিচার ও আটকে পড়া বাঙালীদের ফেরত আনার প্রশ্নের পাশাপাশি জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত ও স্থিতিশীল করার স্বার্থে জরুরী হয়ে দাঁড়ায় জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ। ১৯৭২ সালের ৪ঠা এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও তখন পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ দেশ স্বীকৃতি দানে বিরত ছিলো। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে বাংলাদেশকে পীড়াদায়ক পথ অতিক্রম করতে হচ্ছিলো।

৭. বাংলাদেশ ৮ই আগস্ট '৭২ সনে জাতিসংঘে সদস্যপদের জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদন করে। সদস্যপদ লাভের জন্য বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সদস্য দেশগুলোর নিকট বিশেষ পত্র প্রেরণ করেন। ২৫শে আগস্ট সদস্যপদ লাভে চীন ভেটো প্রদান করে বাংলাদেশের সদস্যপদ প্রাপ্তির পথকে আটকে দেয়।

পাকিস্তানের অব্যাহত প্রচারণার মুখে মধ্যপ্রাচ্যের পাকিস্তান অনুগত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তাবেদার দেশগুলো বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান নেওয়ার প্রেক্ষিতে ভারতে আটক পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর মধ্যে ১৯৫ জনকে যুদ্ধোপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। তাদের বিচারের প্রস্তুতি চলছিলো। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত পাকিস্তানের জন্য এটা ছিলো গুরুতর এক সমস্যা। পাকিস্তান বিশ্বপরিসরে বুঝাতে চেষ্টা করছিলো ভারতে আটক পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যুদ্ধবন্দী নয়। তারা নিজ দেশে সরকারের হুকুমে দেশরক্ষায় নিয়োজিত ছিলো। ভারত তাদের আটকে রাখার নৈতিক ও আইনগত অধিকার রাখে না। কিন্তু ভারত বিজয়ী মনোভাব নিয়ে পাকিস্তানের:নেতাদেও বলে আসছিলো যে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে 'প্যাকেজ ডিল' প্রয়োজন। ভারত সরকারের অনড় মনোভাবের প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের ২রা জুলাই তারিখে সিমলা চুক্তির সমাধান করে উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের দ্বার উন্মোচনে এগিয়ে আসা ব্যতীত প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর অন্য পথ খোলা ছিল না। কিন্তু তখন পর্যন্ত পাকিস্তান শাসনতন্ত্রে

বাংলাদশকে তাদের নিজস্ব সীমান্তভুক্ত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যাচ্ছিলো। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে আটকে থাকা বাঙালীদের ফেরত আনার পথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও অমানবিক আচরণ শুরু করে। ৪ লক্ষ বাঙালীকে পাকিস্তানে আটকে রাখা হয়। এর মধ্যে ১,৬০,০০০ ছিলো সরকারি কর্মচারী যাদের ১৯৭২ সনের জুলাই মাস হতে চাকুরীচ্যুত করা হয়েছে তাদের পরিবারবর্গসহ আটকানো হয়েছে। ৩৩ হাজার সামরিক বাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এবং অনেককে জেলে পাঠানো হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিবকে লেখা ২২শে ফেব্রুয়ারী '৭২ সনের একপত্রে পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের উদ্বেগজনক অবস্থা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু লিখেছেন তাদের খাবার ও পানি বন্ধ করা হয়েছে, বিদ্যু সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। করাচীতে হত্যা ও লুটতরাজের মত ঘটনার খবরও আসছিল।

যদিও বাংলাদেশে অবাঙালীদের যথাযথ নিরাপত্তাসহকারে মানবিক সুবিধাগুলো প্রদান করা হচ্ছিল। কিন্তু পাকিস্তান এর বিপরীত ভূমিকা গ্রহণ করে আটক বাঙালীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়েই চলছিলো। ঐ একই বছরে ১৪ই অক্টোবর জাতিসংঘের মহাসচিবকে লিখিত একপত্রে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু "পাকিস্তানের অবস্থিত সামরিক বাহিনী, বেসামরিক কর্মচারী এবং বেসামরিক বাঙালীদের চাকুরী ও জীবিকা হতে শুধু বঞ্চিত করাই হয়নি তাদের নানাভাবে দেশে ফিরে আসতে দেয়া হচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যে সমস্ত বাঙালী অপসন দিয়েছেন তাদের বাংলাদেশে আসতে না দিয়ে নিদারুণ অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছে। তাদের বিচারের সম্মুখীন ও হয়রানির হাত থেকে বাঁচানোর জনা আপনার উদ্যোগ কামনা করি।' ঐ একই দিনে আন্তর্জাতিক রেডক্রস প্রধানকে লিখিত একপত্রে বঙ্গবন্ধু গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন "সেপ্টেম্বর মাসে জেনেভায় আমি পাকিস্তানে আটক বাঙালীদের বিষয় বলেছিলাম। বাঙালী সেনাবাহিনী ও বেসামরিক অফিসার যারা বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য ফর্ম পূরণ করেছে তাদের ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং তাদের অমানবিক ও অসহনীয় অবস্থায় রাখা হচ্ছে।"

১৯৭২ সনের ২৭শে নভেম্বর জাতিসংঘের মহাসচিব বরাবর বঙ্গবন্ধু আরো একটি পত্র লেখেন। সে পত্রে তিনি পাকিস্তানের অমানবিক আচরণে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বাংলাদেশ ভারতে অবস্থিত বেসামরিক মহিলা শিশুদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান মাত্র ১০,০০০ বাঙালী নারী শিশুদের ফেরত পাঠানোর কথা ঘোষণা দিয়েছে। বাকিদের যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে তুলনা করে তাদের আটক রাখা হয়েছে।

১৯৭২ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে বঙ্গবন্ধু আড়াই লক্ষ পাকিস্তানী নাগরিকদের ফেরত পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন। পাকিস্তানকে মিথ্যা প্রপাগান্ডায় না গিয়ে বিষয়টি মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুধাবন করতে বলেন।

১৯৭৩ সনের ২৯শে মার্চ জাতিসংঘের মহাসচিবকে পাঠানো এক বার্তায় বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানে আটক ১৫ হাজার বাঙালী যাদের অধিকাংশ করাচীতে থাকেন, তাদের জাতিসংঘ পতাকা বহনকারী জাহাজে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করতে এবং ঐ একই জাহাজে চট্টগ্রাম হতে ২০ হাজার পাকিস্তানীদের নিয়ে যেতে অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন ঘোষণা করেন, জেনেভা কনভেনশনের ৩নং ধারা যুদ্ধ, হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ-এর অভিযোগে পাকিস্তানের ১৯৫ জন যুদ্ধ অপরাধীদের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের দ্বারা গঠিত বিশেষ ট্রাইবুনালে ঢাকায় বিচার করা হবে।

১৯৭৩ সনের ২৮শে আগস্ট বাংলাদেশর সম্মতিক্রমে ভারত পাকিস্তান চুক্তিতে বলা হয় পাকিস্তান হতে বাঙালীদের প্রত্যাবর্তন এবং ভারতে যুদ্ধবন্দীদের ও বাংলাদেশে যারা পাকিস্তানের প্রতি অপশন দিয়েছে তাদের ফেরত নেওয়ার পূর্বে ১৯৫ জন যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার করবে না।

১৯৭৪ সনের ৯ই এপ্রিল বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তানের এক যুক্ত স্বাক্ষরে যুদ্ধোপরাধীদের ব্যতীত সকলকে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিমধ্যে ১৯শে সেপ্টেমর '৭৩ এর মধ্যে বাংলাদেশে ৩লক্ষ বাঙালী ফেরত আসে। ঐ ঘোষণার ১৩নং ধারায় পরিষ্কারভাবে তিনদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীত্রয়ের স্বাক্ষরে

উপমহাদেশের পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে যায়। [পরিশিষ্ট-১১] কিন্তু এতসব সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টোর বাংলাদেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকে এবং তার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে এ দেশের অতিবিপ্লবী গ্রুপ ও স্বাধীনতা বিরোধীচক্র। ...

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ঃ অপরাধীদের ক্ষমা করা হয়নি

১. ৯০ হাজার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের জন্য ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে প্রতিদিন ভারতীয় মুদ্রায় ৩লক্ষ ৪২ হাজার টাকা ব্যয় করতে হচ্ছিল- ১৯৭৩ সনে মার্চ পর্যন্ত খরচের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৯ কোটি রূপী। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের এককোটি শরণার্থীদের জন্য তার নিজস্ব তহবিল হতে ৯ মাসে ৩০৯ কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়েছিলো। এর উপর ছিলা একটি ঝুঁকিপূর্ণ যুদ্ধ ব্যয়। ভারতীয় জনগণ ও সরকারের এই অংকের বোঝা বহন প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো। এ অবস্থায় তবুও ১৯শে মার্চ ১৯৭২ সনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাক্ষরিত যুক্ত ঘোষণার দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে, "The prime Minister of India assures the Prime Minister of Bangladesh that the Government of India will fully Cooperate with the Government of Bangladesh in bringing those guilty persons to justice who are responsible for the worst genocide in recent times."

২. বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক নির্ধারণ ও সমঝোতার ক্ষেত্রে দুটি শর্ত নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলো-

এক. পাকিস্তানী যুদ্ধোপরাধীদের বিচার, এবং

দুই. স্বীকৃতির পূর্বে ইসলামাবাদের সঙ্গে কোন কথা নয়।

বঙ্গবন্ধুর এই অনমনীয় মনোভাবের বিষয়টি ভারত এবং পাকিস্তানের অজানা ছিলো না। কিন্তু এই দৃঢ় মনোভাবের উপর প্রতিনিয়তই চাপ আসছিলো পাকিস্তানে আটক বাঙালী পরিবার ও আত্মীয় স্বজনদের তরফ হতে। এর মধ্যে ৩৩ হাজার সৈন্য এবং তাদের পরিবারবর্গ, ১৬০ হাজার বেসামরিক ব্যক্তি ও পরিবারবর্গ সহ ৪লক্ষ বাঙালী পাকিস্তানে আটক ছিলো। এদের দিক থেকে চাপ আসছিলো প্রচণ্ড।

সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হচ্ছিলো। এই তীব্রতরকরণের নেপথ্যে পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসুবিধাগুলো যাই থাক না কেন এই বিষয়টিকে সামনে রেখে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে একদিকে চীনপন্থী দলগুলো এবং অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার উৎসর্গীকৃত জাসদ নেতৃত্ব পাকিস্তানী দালালদের সমর্থন আদায়ের জন্য তৎপরতা শুরু করে। কেননা পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর আটককৃত অফিসার ও বেসামরিক অফিসার পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের অধিকাংশই মুসলিম লীগ পরিবার থেকে আগত। দালাল আইনে ধৃত শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধনে সম্পৃক্ত থাকার কারণে পাকিস্তানে আটক বাঙালী সমস্যার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য একটি সমীকরণে এসে দাঁড়ায় যে শেখ মুজিব বাঙালীদের ফেরত আনার ব্যাপারে তৎপর তো ননই বরং উদ্বিগ্ন নয়। কারণ বাহ্যতঃ বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক কৌশলী খেলায় বাঙালীদের ফেরত আনার 'নন্ ইস্যুটিকে' ইস্যু হিসেবে তুলে ধরতে চাননি।

৩. কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো আটক বাঙালীদের 'নন ইস্যুকে' ইস্যু হিসেবে উপস্থাপনের কৌশল হিসেবে আটক বাঙালীদের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ উত্থাপন করে ১৯৭২ সনের ২০শে এপ্রিল আটক ১৪জন বাঙালী সামরিক অফিসারদের বিচারের ঘোষণা দেন এবং বাঙালী সামরিক বাহিনীর সদস্যদের কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে টেনে হিঁছড়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘের মহাসচিব এবং একই সাথে আন্তর্জাতিক রেডক্রসের প্রেসিডেন্ট বরাবর কমপক্ষে অর্ধডজন পত্র এবং একডজন বার্তা প্রেরণ করে এসব আটক বাঙালীদের যথাযথ হেফাজত করার অনুরোধ করেছিলেন, যা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৪. সদ্যজাত বাংলাদেশের অস্থিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি ও অবকাঠামো এবং ক্রম অবনতিশীল আইন শৃংখলার পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে তেলের উর্ধমুখি মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বিশ্ব অর্থনীতিতে যে মারাত্মক অবস্থা সৃষ্টি করেছিলো তারই ভয়াবহ প্রভাব বাংলাদেশের সমাজ ও

রাজনীতিতে এক বিপর্যয়কর আবর্তে টেনে নেয়। এর সংগে ভয়াবহ খরা এবং অভূতপূর্ব বন্যায় ফসল নষ্ট ও ফসল ডুবে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে।

এমন অবস্থায় বিবেচনায় পাকিস্তানকে ছাড় দেবার চিন্তা করাটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শত প্রতিকূলতার মুখে নীতির প্রশ্নে অটল ছিলেন যদিও ভারত ব্যতীত বাংলাদেশের অন্যান্য মিত্র দেশগুলো 'যুদ্ধজনিত সমস্যাগুলোকে ভুলে যেতে' বঙ্গবন্ধুকে অনুরোধ করেছিলেন। উপমহাদেশের পরিস্থিতির স্বাভাবিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অনমনীয় মনোভাবকে নমনীয় করার সার্বক্ষণিক চাপ ও কৌশলের পথ ঐ অবস্থায় দাতাদেশগুলো ভালোভাবেই কাজে লাগাতে সচেষ্ট হন।

যদিও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭২ সনের ২রা জুলাই সিমলাচুক্তির প্রাক্কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে কথা দিয়েছিলেন যে, আগস্টের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবেন।

৫. কিন্তু সে পথে ভুট্টো অগ্রসর না হওয়ার ফলে বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বপরিসরে নিদারুণ ঝুঁকি পোহাতে হয়। বিশেষ করে তেলসমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে এক ইরাক ব্যতীত কেউই '৭৩ এর শেষ বা ৭৪ এর প্রথম দিকের আগ পর্বের পূর্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। পাকিস্তান-মার্কিন বলয়ে স্থিত দেশগুলো নানাভাবে বাংলাদেশকে অসুবিধায় ফেলতে থাকে বিশেষ করে যখন সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন ছিলো সর্বাত্মক। লাহোর ইসলামিক কনফারেন্সের সুযোগে ইরাক, মিশর, প্যালেস্টাইনে, মালয়েশিয়ার উদ্যোগে বাংলাদেশকে ঐ সংস্থা সদস্যপদে অন্তর্ভুক্ত করার চাপ প্রদানের ফলে ভুট্টো এক নাজুক পরিস্থিতির সম্মুখীন হন। ভুট্টো বাধ্য হয়ে তার পূর্বেকার সকল শর্ত স্থগিত রেখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। পাকিস্তান থেকে ২২শে ফেব্রয়ারী ১৯৭৪ সনে স্বীকৃতি পাওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে বঙ্গবন্ধু লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হন। যুদ্ধবন্দীদের ফেরত এবং যুদ্ধোপরাধীদের বিচারের প্রশ্নটি তখন পর্যন্ত ঝুলতে থাকে। এ বিষয়ে ২৭শে জুন '৭৪ ভুট্টো বাংলাদেশে আগমন করে পাকিস্তানের কৃৎ অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। তার পূর্বে ৯ই এপ্রিল বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয়ের এক যৌথ ঘোষণায় পাকিস্তানের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পাকিস্তানের ১৯৫জন যুদ্ধোপরাধীদের কৃৎকর্মের নিন্দা এবং তার জন্য চরম দুঃখপ্রকাশ করেন।

৬. যুদ্ধোপরাধীদের বিচার করার আইনানুগ আন্তর্জাতিক বিধানগত বিশ্বযুদ্ধের পর নুরেমবার্গ বিচার হয়েছে। কিন্তু তখন বিচারক রাষ্ট্রগুলির ঐ বিচারের ফলে কিছু মাত্র হারাবার কোন ভয় ছিলো না। পরাজিত জার্মানদের হাতে এসব রাষ্ট্রের কোন নাগরিকই আটক ছিলেন না। তাই তারা নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায় নাজী যুদ্ধোপরাধীদের বিচার করতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা ভিন্ন, বলতে গেলে উল্টো। বাংলাদেশের হাতে বন্দী পাকিস্তানীর সংখ্যা ৯০ হাজার (বিহারী অপশন ব্যতীত) এবং পাকিস্তানের হাতে বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী ও ট্রেইণ্ড লোকের সংখ্যা ছিলো এর দ্বিগুণ। সব মিলিয়ে ৪লক্ষ বাঙালী তখন পাকিস্তানে আটক ছিলেন। যে অবস্থায় জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করেনি এমন একটি রাষ্ট্রকে যুদ্ধোপরাধীদের বিচার করতে গিয়ে যে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হতে হতো তাতে সদ্যজাত ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি দেশের জন্য কতদূর কল্যাণ বয়ে আনতো তা বিশেষজ্ঞমহল বলতে পারেন।

৭. বঙ্গবন্ধু আটক বাঙালীদেরকে ফেরত এনে, স্বীকৃতি আদায় করে বাংলার স্বাধীনতাকে সংহত করতে সমর্থ হন। এ সকল ঘটনাপর্ব এবং কালক্রমিক কার্যকারণগুলোর পারস্পরিক সূত্রগুলোর ফলাফল বিবেচনায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সনের ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশ দালাল আইনে ধৃত ব্যক্তিদের যারা খুন, হত্যা, ধর্ষণ অগ্নিসংযোগের মতো গুরুতর অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলো না তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন।

বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সাধারণ ক্ষমা

৩০শে নভেম্বর সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তি ধর্ষণ, খুন, অগ্নিসংযোগ অথবা পরিকল্পিত হত্যার দায়ে অভিযুক্ত অথবা দণ্ডপ্রাপ্ত তারা ছাড়া বাংলাদেশ দালাল আইন (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) '৭২ বলে অভিযুক্ত অথবা সাজাপ্রাপ্ত সকলকে অনতিবিলম্বে মুক্তিদান করা হবে।

বঙ্গবন্ধু এই ক্ষমা প্রদর্শনের নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা প্রাপ্তদের প্রতি দেশের কল্যাণ ও পুনর্গঠনের কাজে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানিয়েছেন। নিম্নে প্রেস নোটের পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হল:

"সরকার ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ, ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতি ৮নং আদেশ মোতাবেক অপরাধের দায়ে দণ্ডিত অথবা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা প্রদর্শনের প্রশ্নটি পুনরায় বিবেচনার পর ঘোষণা করিতেছেন:

(১) এই আদেশের ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত (ক) উক্ত আদেশ মোতাবেক যে কোন অপরাধের দায়ে দণ্ডিত ব্যক্তিদের দণ্ড ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৪০১ ধারা মোতাবেক মওকুফ করা হইল এবং উক্ত আদেশ ব্যতিত অপর কোন আইন বলে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধের সহিত জড়িত থাকার জন্য গ্রেফতারী পরওয়ানা না থাকিলে সেইসব ব্যক্তিকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হইবে;

(খ) উক্ত আদেশ বলে যে সকল ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট অথবা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মামলা বিচারাধীন রহিয়াছে উল্লিখিত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে সে সব প্রত্যাহার করিতে হইবে এং এই আদেশ ব্যতিত অপর কোন আইনে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধের হুলিয়া না থাকিলে তাদেরকে সরকারি হেফাজত হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে;

(গ) এই আদেশ বলে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য অপরাধের দায়ে যে সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হইয়াছে অথবা তদন্ত চলিতেছে সেই সব মামলা ও তদন্ত কার্য বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং সব গ্রেফতারী পরওয়ানা অথবা আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ এবং এই আদেশ বলে কোন ব্যক্তির ব্যাপারে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ থাকিলে উহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং অপর কোন আইনে বিচার্য ও শাস্তিযোগ্য না হইলে তাহাদেরকে সরকারি হেফাজত হইতে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে; তবে কোন ব্যক্তি অনুপস্থিতিতে দণ্ডিত হইয়া থাকিলে অথবা কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা থাকিলে তাহাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত আদালতে হাজির হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকিবে।

(২) এই আদেশ বলে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা (হত্যা), ৩০৪ ধারা (হত্যার চেষ্টা কিন্তু হত্যার শামিল নয়), ৩৭৬ ধারা (ধর্ষণ), ৪৩৫ ধারা (অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন) ৪৩৬ ধারা (ঘরবাড়ী ধ্বংসের অভিপ্রায়ে অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন) এবং ৪৩৮ ধারা (জাহাজে অগ্নিসংযোগ অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা অপকর্ম সাধন) মোতাবেক অভিযুক্ত ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ১নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ক্ষমা প্রদর্শন প্রযোজ্য হইবে না।"

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা: নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া

মওলানা ভাসানী

বঙ্গবন্ধু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষাপটে ১লা ডিসেম্বর ভাসানী ন্যাপের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও সম্পাদক মণ্ডলীর পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয় ন্যাপ বহু আগে থেকেই নিরপরাধ ব্যক্তিদের মুক্তি দাবি করে আসছে। এই বিবৃতিতে বাংলাদেশ দালাল আইনের ৮নং ও ৫০ নং ধারা বাতিল করার দাবি জানান।

১৫ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ সনে পল্টন ময়দানে মাওলানা ভাসানী বলেন, সরকারকে হটাতে হলে সশস্ত্র বিপ্লব প্রয়োজন। তিনি বলেন তার বয়স ৯১, বয়স থাকলে তিনিই এই সশস্ত্র বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতেন। তিনি আরো বলেন যারা বিপ্লব করবে তাদের জন্য আমি দোয়া করি। যারা সশস্ত্র হামলা করবে তাদের তিনি বাংলার বীর সেনানী আখ্যা দেন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা প্রদর্শনের উল্লেখ করে বলেন 'ক্ষমা চাই। সমানাধিকার চাই। রাষ্ট্রপতি আদেশের ৫০ ও ৮ ধারা বাতিল করার দাবি জানান।

আতাউর রহমান খান

বাংলাদেশ জাতীয় লীগের সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান দালাল আইনে আটক ব্যক্তিদের ক্ষমা ঘোষণাকে অভিনন্দিত করে বলেন "আরো আগেই দেশের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত ছিলো। এর ফলে

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে এবং মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ দেশ গঠনের কাজে আত্ম নিয়োগ করে বিশ্বস্ততার প্রমাণ দেবেন বলে তিনি আশা করেন।

আবুল হাশিম

দালাল আইনে অভিযুক্তদের ক্ষমা প্রদর্শন করায় প্রবীণ রাজনীতিক ও চিন্তাবিদ জনাব আবুল হাশিম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু ও তার সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন "জনগণের ভাগ্যকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার সঠিক পন্থাই বেছে নিয়েছেন। গণতন্ত্রের এ উদ্যম বজায় থাকলে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।"

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকারের এই ক্ষমা ঘোষণাকে অভিনন্দন জানান।

আবুল মনসুর আহমদ

তিনি লিখেছেন, "আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় সরকার যখন একবার অনুকম্পার দরজা খুলিয়াছেন, ষোলো হাজারের মতো বন্দীকে মাফ করিয়া দিয়াছেন, তখন বাকী সবার ক্ষেত্রেও তেমনি উদারতা প্রদর্শন করুন। অন্যথায় দুই বছর পরে আজ যেমন চারশ লোককে প্রমাণের অভাবে মুক্তি দিতে হইল, বার বছর পর (৩৭ হাজার দালালদের বিচারে ১২ বছর লাগবে) মানে গ্রেফতারের সময় হইতে চৌদ্দ বছর পর আরো অনেক লোককে তেমনি মুক্তি দিতে হইতে পারে।" -ইত্তেফাক ২রা নভেম্বর '৭৩।

*** মূল বই-র কিছু অশুদ্ধ বানান সেরকমই রাখা হলো-গবেষক।**

সূত্রঃ অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, *সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার প্রেক্ষিত ও গোলাম আযম* (ঢাকাঃ মুক্তি প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ৫৩-৬১ ও ৬৮-৭৪।

পরিশিষ্ট ৪

ফতওয়া নিষিদ্ধের রায়, আমিনীর ফতওয়া ও গোলাম রাব্বানীর পূর্ব রেকর্ড

ফতোয়ার বিরুদ্ধে আদালতের রায়

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রায়

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ

উপস্থিত বিজ্ঞ বিচারপতিবৃন্দঃ

জনাব বিচারপতি মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী।

জনাবা বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা।

সম্পাদক, দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা ও অন্য দুইজন আবেদনকারীদের রীট আবেদন নং- ৫৮৯৭/২০০০ এ ০১.০১.২০০১ তারিখে প্রদত্ত রায়।

মুহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, জে

মামলার উদ্ভবঃ

বর্তমান সুয়োম্যুটো রুলটির উদ্ভব হয় বিগত ২রা ডিসেম্বর ২০০০ ইং তারিখের দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের সূত্র ধরে। ঐ রিপোর্টে বলা হয় নওগাঁ জেলার সদর উপজেলার কির্তিপুর ইউনিয়ন পরিষদের আতিথা গ্রামের হাজী আজিজুল হকের ফতোয়ার ভিত্তিতে-গোলাম মোস্তফার পুত্র সাইফুলের স্ত্রী শাহিদাকে জোরপূর্বক তার স্বামীর চাচাত ভাই শামছুলকে হিল্লা বিয়ে করতে বাধ্য করা হয়। হাজী আজিজুল হক এ মর্মে ফতোয়া দিয়েছিলেন যে, এক বছর আগে সাইফুল ক্রোধবশতঃ তার স্ত্রী শাহিদার উদ্দেশ্যে 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করায় তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে কিন্তু তারপরও তারা তাদের দাম্পত্য জীবন চালিয়ে যায়।

বাংলাদেশ মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদ পরবর্তী পুনঃবিবাহ সংক্রান্ত আইন মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭ নং ধারায় বিধৃত হয়েছে এবং উহার ৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে, অপর কোন আইন, বিধি অথবা প্রচলিত রীতিতে যাই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর হবে। এখন আমরা উক্ত অধ্যাদেশের ৭ নং ধারার উদ্ধৃতি দিচ্ছিঃ

১. কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিতে চাইলে, তিনি যে কোন পদ্ধতির তালাক ঘোষণার পর যথাশীঘ্র সম্ভব চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে নোটিশ দিবেন এবং স্ত্রীকে উক্ত নোটিশের একটি অনুলিপি (নকল) প্রদান করবেন।

২. কোন ব্যক্তি (১) উপ-ধারার বিধান লংঘন করলে তিনি এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয় প্রকার দণ্ডনীয় হবেন।

৩. নিম্নের (৫) উপধারার বিধান অনুসারে প্রকাশ্যে বা অন্য কোনভাবে তালাক, আগে প্রত্যাহার করা না হয়ে থাকলে, (১) উপধারা মোতাবেক চেয়ারম্যানের কাছে নোটিশ প্রদানের তারিখ হতে নব্বই দিন অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকরী হবে না।

৪. উপরোক্ত (১) উপধারা অনুযায়ী নোটিশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পুনর্মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে একটি সালিশী পরিষদ গঠন করবেন এবং উক্ত সালিশী পরিষদ এই জাতীয় পুনর্মিলনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা করবেন।

৫. তালাক ঘোষণার সময় স্ত্রী গর্ভবতী থাকলে, (৩) উপধারায় বর্ণিত সময়কাল অথবা গর্ভাবস্থা, যেটি পরে শেষ হয়, অতিবাহিত না হওয়া পর্যন্ত তালাক বলবৎ হবে না।

৬. অত্র ধারা অনুযায়ী কার্যকর তালাক দ্বারা যে স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে সেই স্ত্রী, এই জাতীয় তালাক তিনবার এইভাবে কার্যকরী না হলে, কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে বিবাহ না করে পুনরায় একই স্বামীকে বিবাহ করতে পারবে।

অত্র অধ্যাদেশে 'চেয়ারম্যান' বলতে বোঝাবে:

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

(২) পৌরসভার চেয়ারম্যান।

(৩) মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক।

এবং সালিশী পরিষদ বলতে বুঝাবে চেয়ারম্যান এবং এই অধ্যাদেশে উল্লেখিত কোন বিষয়ের সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রত্যেকের একজন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত পরিষদ।

১৯৮১ সালের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এলিয়ার ক্যানেথ তাহার Crowds and Power পুস্তকে বলেন, "যখন কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিদেরকে শাসন করতে চায় প্রথমত: সে তাদেরকে অপমানিত করে, তাদেরকে অধিকার বঞ্চিত করে এবং তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা হরণ করে যতক্ষণ না তারা তার কাছে জন্তুবৎ ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে।"

প্রাক ইসলামী যুগে সামাজিক রীতি মোতাবেক বিবাহের ধারণা ছিল এরূপ:

একজন মহিলার পিতা অথবা নিকটাত্মীয় তাকে তার স্বামীর নিকট একটি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করে দিত ফলে মালিক স্বামী তার ক্রেতা হিসাবে যে কোন মুহূর্তে তাকে পরিত্যাগ করতে পারতো।

কোরআন বিক্রয়পণ্য থেকে একজন স্ত্রীকে একটি চুক্তিবদ্ধ ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করে এবং এ ক্ষেত্রে একটি সোজা নিয়ম হচ্ছে যে, শুধুমাত্র স্ত্রীই স্বামী প্রদত্ত মোহরানার হকদার। "এবং স্ত্রীলোকদেরকে যৌতুক দাও উপঢৌকন হিসাবে বিনামূল্যে।" কোরআন-৪ ঃ ৪। কোরআন বিবাহ বিচ্ছেদকে স্থগিত করেছে যতক্ষণ না ইদ্দত অতিবাহিত হয় আর ইদ্দত ৩টি রজঃস্রাব পর্যন্ত স্থায়ী হয় অথবা যদি গর্ভবর্তী হয় তাহলে সন্তান জন্মদান পর্যন্ত। এই সময়ে তাদেরকে একটি সমঝোতার সুযোগ দেয়া হয় এবং ইদ্দত কালে স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে ভরণ পোষণ এবং বাসস্থান পাওয়ার হকদার।

কোরআন বলে "যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পালন করে তাহলে তাদেরকে সম্মানজনক শর্তে ফিরিয়ে নাও অথবা সম্মানজনক শর্তে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। কিন্তু তাদেরকে আহত করা অথবা অযৌক্তিক সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে ফিরিয়ে নিও না, যদি কেউ এরূপ করে সে তার আত্মাকে কলুষিত করে।"- (২/২৩১) (আল্লামা ইউসুফ আলীর দি হলি কোরআন, টেক্সট, ট্রান্সলেশন এণ্ড কমেন্টারীর ৩য় সংস্করণ।)

একই বৈঠকে তালাক শব্দটি এক অথবা তিনবার তালাক শব্দটি উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদ কোরআন ও হাদীসের অনুশাসনের পরিপন্থী, এমনকি মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের ৭নং ধারায়ও অবৈধ। এই ধরনের তালাককে সঠিকভাবে তালাকুল বিদায়াত বলা হয়েছে। তালাকুল বিদায়াতের নাম থেকেই বুঝা যায় ইহা একটি অনিয়মিত তালাক পদ্ধতি যাহা মোহাম্মদীয় যুগের ২য় শতাব্দীতে চালু হয়েছে। তৎকালীন উমাইয়া শাসকগণ রসূল (সাঃ) এর আরোপিত বিবাহ বিচ্ছেদের উপর বিধি নিষেধের সুযোগে তাদের খেয়াল খুশীমত আইনের কড়াকড়ি প্রয়োগ থেকে বাঁচার পথ খুঁজে এবং এ ক্ষেত্রে তারা ইসলামী ফকীহদের নমনীয়তার সুযোগ নিয়েছে। বস্তুতঃ শুরুতে স্বামীর হাতে অর্পিত এই ধরনের খেয়াল খুশীমত ও অনিয়মিত বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতা অতিশক্তভাবে আল্লাহর রসূল (সাঃ) অননুমোদন করেছেন। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে একবার রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে সংবাদ পৌছল যে, তাঁর একজন সাহাবী একই বৈঠকে তিন তালাক উচ্চারণ করে তালাক দিয়েছেন। তিনি তখন রাগে তার গালিচার উপর দাঁড়িয়ে যান এবং ঘোষণা দেন যে, লোকটি আল্লাহর কথা নিয়ে তামাশা করেছে এবং তিনি সে ব্যক্তিকে তার স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করেন। (সৈয়দ আমীর আলী, মোহামেডান ল' ভলিউম-২, ৫ম সংস্করণ, পৃষ্ঠা-৪৭৪)

উপরোক্ত বিষয় ও আইনানুগ অবস্থানে আমাদের অভিমত এই যে, সাইফুল এবং শাহিদার মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেনি এবং যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেয়া হয় যে, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে এমনকি তখনও শাহিদার পক্ষে সাইফুলকে পুনঃবিবাহ করাতে কোন আইনানুগ বাধা নাই, এ ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির সাথে হিল্লা বিবাহের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। কথিত ফতোয়াটি ভুল।

আইন ও শালিস কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ড. কালাম হোসেন এফিডেভিট ও সংযুক্তি উপস্থাপন করে ইন্টারভেনার হিসাবে নিবেদন করে বলেন, শাহিদার ট্রাজেডী কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় দেশের সর্বত্র এবং প্রায়শঃই এরূপ ঘটনা ঘটছে। সংযুক্তির মধ্যে ১৯৯৩ সাল হইতে ২০০০ সাল পর্যন্ত আমরা ফতোয়ার একটি লোমহর্ষক সংখ্যা পাই যাহা আশ্চর্যজনকভাবে বিস্তৃত এবং বহুরকমের।

ড. হোসেন আরও নিবেদন করেন যে, ঐ সমস্ত ফতোয়া সংবিধানের ২৭, ২৮, ৩১ এবং ৩৫ অনুচ্ছেদ স্বীকৃত মৌলিক অধিকারের সম্পূর্ণ খেলাফ।

রাষ্ট্র সেই মত মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে ব্যর্থ হয়েছে। ফতোয়া অর্থ আইনানুগ মত। ইহার অধিকতর অর্থ আইনানুগ ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের আইনানুগ মত। বাংলাদেশের আইন ব্যবস্থা মুসলিম এবং অন্যান্য প্রচলিত আইন যেভাবে আছে তার উপর উত্থাপিত সকল প্রকার আইনানুগ সমস্যার সমাধান প্রদানের ক্ষমতা কেবলমাত্র আদালতকেই দিয়েছে। তাই আমাদের অভিমত হচ্ছে- যেকোন ধরনের ফতোয়া বর্তমানে কথিত ফতোয়াটিসহ সকলই কর্তৃত্বহীন এবং অবৈধ।

মিস তানিয়া আমির তার নিবেদনে বলেন- দণ্ডবিধির ৫০৮ ধারা অনুসারে কথিত ফতোয়াটি একটি দণ্ডনীয় অপরাধ, দণ্ডবিধিতে আরও ধারা রয়েছে যার দ্বারা ফতোয়াটি কার্যকরকারীদের শাস্তি প্রদান করা যায়। এ ক্ষেত্রে কার্যকারীতার প্রকৃতির দ্বারা দণ্ডবিধির ধারা নির্ধারণ করা যাবে যার দ্বারা তাকে অথবা তাদেরকে শাস্তি দেওয়া যাবে।

আমরা আরও সুপারিশ করছি যে, কোন কর্তৃত্বহীন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের দেওয়া কোন ফতোয়া অবশ্যই দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে এবং এই মর্মে সংসদ অনতিবিলম্বে ফতোয়া কার্যকরী নয় বলে আইন পাশ করবে।

আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ এম, আমীরুল ইসলাম, ড. কামাল হোসেন ও মিস্ তানিয়া আমীরের যুক্তি সমর্থন করেন।

আমাদের আরও অভিমত হচ্ছে এই যে, প্রতিপক্ষ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের ফৌজদারী কার্যবিধির ১৯০ ধারার অধীনে তাৎক্ষণিকভাবে এই অপরাধ আমলে নেওয়া উচিত ছিল। যা হোক আমরা প্রতিপক্ষের নেওয়া পদক্ষেপে যা তার এফিডেভিট ইন-অপজিশনে ব্যক্ত করেছেন তাতে সন্তুষ্ট। আমরা আশা করি যে ইহা অন্যান্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্যে সর্বশেষ সতর্কবাণী হিসেবে গণ্য হবে। এই ব্যাপারটি নিস্পত্তির আগে আমাদের একটি প্রশ্নের জবাব খুঁজে বের করা প্রয়োজন কেননা একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক মাদ্রাসা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা কোন ধর্মীয় দল গঠন করে তাদের ভুল দৃষ্টিভংগি নিয়ে গোঁড়া হয়ে যায়। তাদের শিক্ষা এবং দৃষ্টিভংগিতে অবশ্যই কোন ত্রুটি থেকে থাকবে।

তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা সুপারিশ করছি যে, মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ স্কুল এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কারিকুলামে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং সমস্ত মসজিদের খতিবদেরকে তাদের শুক্রবারের খুৎবায় অধ্যাদেশটি আলোচনা করার অবশ্যই নির্দেশ দিতে হবে, এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায় আমরা একটি এক ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করছি এবং সংবিধানের ৪১(১) অনুচ্ছেদের অধীনে আইন, জনশৃংখলা এবং নৈতিকতার নিশ্চয়তার শর্তে ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন করতে হবে। রাষ্ট্র অবশ্যই জনশৃংখলা এবং নৈতিকতার সংজ্ঞা প্রদানকারী এবং উহা অবশ্যই সমাজকে শিক্ষিত করে তুলবে।

উপরোক্ত বক্তব্যের আলোকে আমরা খরচার বিষয়ে কোন আদেশ ছাড়া রুলটিকে নিরংকুশ করলাম। দপ্তরকে এই রায়ের কপি অনতিবিলম্বে স্বরাষ্ট্র, আইন, শিক্ষা এবং ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশ দেওয়া গেল।

মিস নাজমুন আরা সুলতানা, জে

আমি সম্মত।

(সূত্র: ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার, ঢাকা)

পরিশিষ্ট ৪(ক)

ফতওয়া বিরোধী হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে মুফতী ফজলুল হক আমিনীর ঐতিহাসিক ফতওয়া

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'

গতকাল ১লা জানুয়ারী ২০০১ ইংরেজী তারিখে হাইকোর্টের দুইজন বিচারপতি যথাক্রমে বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী এবং বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানার ডিভিশন বেঞ্চ 'সব ধরনের ফতোয়া অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য' অপরাধ ইত্যাদি আইন পাশ করে যে রায় ঘোষণা করেছে তা সরাসরি কুরআন-হাদীস ও ইসলামী শরীয়ত পরিপন্থী। তাছাড়া এই রায়ে শুধু কুরআন-হাদীসকে অস্বীকার করা হয়নি, সেই সাথে ইসলামী রাজনীতি ও ইসলামী ব্যক্তিত্ব নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে। একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের নামে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের পাঁয়তারা চালানো হয়েছে। কাজেই কোন মুসলমান এই রায় মানতে পারে না। ঈমানী তাগিদে এর প্রতিবাদ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে প্রতিবাদ করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ। বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলঃ

(১) এই রায়ের দ্বারা কুরআন এবং হাদীসের আইনকে কার্যতঃ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। কেননা এই রায়ে বলা হয়েছে "যে কোন ধরনের ফতোয়া অবৈধ।" কুরআন হাদীসে মূলতঃ মানব জীবনের বিধান এবং বিভিন্ন বিষয়ে ফতোয়াই বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা সূরা নিসায় ইরশাদ করেছেনঃ 'হে নবী! আপনি বলে দিন আল্লাহ্ তোমাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছেন।'

হাদীস শরীফে হাজারো ফতোয়া হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জারি করেছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং খেলাফতে রাশেদার যুগে মূলত রাষ্ট্র পরিচালিত হয়েছে ফতোয়ার মাধ্যমেই। যে কোন ধরনের ফতোয়া অবৈধ, এর দ্বারা কুর'আন হাদীসের আইন অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

যে ব্যক্তি কুরআনের আইনকে অবৈধ ঘোষণা করবে সে মুসলমান থাকতে পারে না। পবিত্র কুর'আনের সূরা নিসার ৬৫ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা ইরশাদ করেনঃ

'অতএব তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায় বিচারক মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবেনা এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নিবে।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রুহুল মাআ'নীতে বলা হয়েছে-

'হযরত জাফর সাদেক (রাঃ) বর্ণনা করেন, যদি কোন জাতি আল্লাহর ইবাদত করে, নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে, হজ্ব করে। কিন্তু যে কাজ হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সাবেত আছে এমন কোন কাজের ব্যাপারে এই ধরনের মন্তব্য করে যে, তিনি এমন কেন করলেন? বিপরীত কেন করলেন না? এবং তা পালনের ক্ষেত্রে নিজের মনে সংকীর্ণতা অনুভব করে তাহলে নিঃসন্দেহে সেই জাতি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।'

এই আয়াত এবং তার ব্যাখ্যার দ্বারা একথা প্রমাণ হল যে, হুযূরের উপর ঈমান আনার মর্মার্থ হচ্ছে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ পোষণ না করে নিশ্চিন্তে মেনে নেয়া।

অথচ হাইকোর্টের এই রায়ের দ্বারা আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীসকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে। কাজেই বিচারপতিদ্বয় ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে।

(২) এই রায়ে ফতোয়া দেয়াকে "অবশ্য দণ্ডনীয় অপরাধ" বলা হয়েছে। যেখানে আল্লাহ তায়ালা কুরআন হাদীসের আহকাম আইন বর্ণনা করার জন্য স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন, আমর বিল মারুফ নাহী আনীল

মুনকার (সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধ) কে জরুরী এবং ফরজ হিসাবে ঘোষণা করেছেন, সেখানে ফতোয়া বর্ণনা 'দণ্ডনীয় অপরাধ' বলে 'সৎ কাজের আদেশ কর অসৎ কাজ থেকে নিষেধ কর' এই ধরনের বহু আয়াত ও বহু হাদীসকে অস্বীকার করা হয়েছে। আল্লাহ ও রাসূলের কোন হুকুমকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়।

(৩) 'সব ধরনের ফতোয়া অবৈধ' এবং দণ্ডনীয় অপরাধ এই উক্তির দ্বারা কুরআন হাদীসের সাথে উপহাস করা হয়েছে। কুরআন হাদীসের অবমাননা এবং উপহাস করলে কাফের হয়ে যায়। শরহে আকায়েদের ব্যাখ্যা গ্রন্থ নেবরাসের ৫৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) এই রায়ে সামরিক শাসক আইয়ূব খান কর্তৃক মুসলিম পারিবারিক আইনকে কার্যকর ও পূনর্বহাল করার আদেশ দেয়া হয়েছে আর এই মুসলিম পারিবারিক আইনের অধিকাংশ ধারা কুরআনের সাথে সাংঘর্ষিক। এই আইনের ধারাগুলো কার্যকর করা কুরআন হাদীস পরিবর্তন করার শামিল। যেমন মুসলিম পারিবারিক আইনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ ও বিচ্ছেদ পরবর্তী পুনঃবিবাহ সংক্রান্ত আইন মুসলিম পারিবারিক আইনে বিধৃত হয়েছে এবং ৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে কোন বিধি অথবা প্রচলিত রীতিতে যাই থাকুক না কেন এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী কার্যকর হবে। আর এই ৭নং ধারা সবটাই কুরআন হাদীস বিরোধী। এই ধারায় তালাকের যে পদ্ধতি বলা হয়েছে তা কুরআন হাদীসের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। এই ধারায় তিনবার তালাক দিলে কোন স্বামী তাকে কার্যকরী ঘোষণা না করে অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ ছাড়া পুনরায় প্রথম স্বামীকে গ্রহণের অধিকার দেয়া হয়েছে। কুরআনের বিধান হল প্রকৃত পক্ষে তিন তালাক হয়ে গেলে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সহবাস হওয়ার পর তালাক দিলেই ইদ্দতের পর প্রথম স্বামী ইচ্ছা করলে বিবাহ করতে পারবে। পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় ২৩০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে -

'স্বামী যদি স্ত্রীকে (তিন) তালাক দেয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর অন্য লোকের কাছে বিবাহ বসে তার সাথে সহবাস না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই (প্রথম) স্বামীর সাথে তার বিবাহ হালাল হবে না।'

কুখ্যাত বিচারকদ্বয় এখানে এতো ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে, তারা রায়ে বলেছে তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া হয় যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে এমন কি তখনও শাহিদার পক্ষে সাইফুলকে পুনঃবিবাহ করাতে কোন আইনানুগ বাধা নেই এ ক্ষেত্রে তৃতীয় ব্যক্তির সাথে হিলা বিবাহের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। আর কুরআন বলেছে যে, যদি তিন তালাক হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে সহবাসের পর তালাক দিলে ইদ্দত শেষে প্রথম স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। এই বিচারকদ্বয়ের যদি সামান্যতম আল্লাহর ভয় থাকত তাহলে কুরআনের সাথে এহেন উপহাস করার দুঃসাহস দেখাতে পারত না। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় বিচারকদ্বয় ঈমানের গণ্ডি থেকে বের হয়ে গেছে।

(৫) এই রায় এদেশ থেকে ইসলামকে ধ্বংস করার এবং ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে খতম করার ষড়যন্ত্রমূলক রায়। একটা বিবাহ সংক্রান্ত রায় দিতে গিয়ে বিচারকদ্বয়ের এই কথাগুলোর দ্বারা কি প্রমাণ হয়?

অ) যে কোন ধরনের ফতোয়া অবৈধ দণ্ডনীয় অপরাধ।

ই) সংসদকে এই অপরাধের শাস্তির জন্য আইন প্রণয়নের পরামর্শ প্রদান।

ঈ) মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে বিষোদগার করা।

উ) ইসলামী দলগুলোর প্রতি কটাক্ষ করা। যেমন রায়ে বলা হয়েছে একটি নির্দিষ্ট গ্রুপের লোক মাদ্রাসা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে অথবা কোন ধর্মীয় দল গঠন করে তাদের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গোঁড়া হয়ে যায়। তাদের শিক্ষা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই কোন ত্রুটি থেকে থাকবে।

ঊ) বাধ্যতামূলক কুরআন বিরোধী মুসলিম পারিবারিক আইন স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষা কারিকোলামে অবশ্য অন্তর্ভুক্ত করা।

ঋ) সমস্ত মসজিদের খতীবদেরকে কুরআন বিরোধী এই আইনকে জুমার খুৎবায় পাঠ করার নির্দেশ দেয়া।

এ) অভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। যার অর্থ হল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বাদ দিয়ে এককভাবে পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।

ঐ) ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়ন করা।

একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই ধরনের রায় ঘোষণা করে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলোর দ্বারা এবং বিচারকদ্বয়ের মন্তব্যের দ্বারা এ কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে বিচারকদ্বয় সুপরিকল্পিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। ইসলামকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করছে। ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনাকারী মুসলমান থাকতে পারে না।

(৬) শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান হল, যদি কোন বিচারক কিংবা বাদী কুরআন-হাদীস পরিপন্থী কোন ফায়সালা প্রদান করে বা ফায়সালা দাবি করে এবং সেই ফায়সালা প্রদানকারী বিচারক এবং এই ধরনের ফায়সলার বাদী মুমিন থাকতে পারেনা। এর অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। এখানে তারই একটি তুলে ধরছি।

'আত্‌তাশরীহুল মাজনাই' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে -

আল্লাহ্ তা'আলা যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার উপর অবতারিত বিধানাবলীর অনুসরনের হুকুম করেছেন এবং অন্য কারও অনুসরন থেকে নিষেধ করেছেন তাহলে কোন মুমিনের এই অধিকার নেই যে সে আল্লাহ তা'আলা এবং তার রাসূলের ফায়সালা পরিপন্থী কোন ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকবে।

তদুপরি যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের ফায়সালা পরিপন্থি অন্যকোন ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকে তাহলে সে ব্যক্তি কখনও মুমিন থাকতে পারেনা।

(জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া-খণ্ড-২-পৃষ্ঠা-৫৪৬)

বিচারপতি দুইজন তাদের প্রদত্ত কুরআন হাদীস ও শরীয়ত পরিপন্থী রায়ের উপর শুধু সন্তুষ্টই নয় বরং তারা এই রায়কে আইন হিসাবে পাস করার জন্য জাতীয় সংসদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

এই রায়কে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে। এমনকি জুমআর খুৎবায় খতিবদেরকে এই ব্যাপারে বয়ান করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

তারপরও কি এই কথার কোন অবকাশ থাকতে পারে যে এই কুখ্যাত দুই বিচারপতি মুরতাদ হয়নি? নিঃসন্দেহে তারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে।

উপরে উল্লেখিত কারণসমূহের যে কোন একটি কারণই বিচারকদ্বয়ের মুরতাদ হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ইকফারুল মুলহিদীন নামক গ্রন্থে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং দলীল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, মুরতাদ হওয়ার জন্য পূর্ণ শরীয়ত অস্বীকার করা জরুরী নয়। বরং দ্বীনের কোন একটি প্রমাণিত বিধান অস্বীকার বা উপহাস করলেই মুরতাদ হয়ে যাবে।

যেমন কোন ব্যক্তি যদি যাকাত অথবা নামায অথবা হজ্ব অথবা রোযা অথবা কিয়ামত অস্বীকার করে বা উপহাস করে তাহলে সে দ্বীনের অন্য যাবতীয় বিষয়ে আমল করা সত্ত্বেও মুরতাদ হয়ে যাবে।

এখানে আমি মুরতাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরছি।

মুরতাদের শরয়ী ব্যাখ্যা হল:

'নিজের কথা, কাজ বা নিয়তের দ্বারা ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়াকেই মুরতাদ বলে'। মুরতাদ হওয়ার বিভিন্ন কারণ ও পদ্ধতি রয়েছে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এখানে তুলে ধরছি।

১. কোন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করে সরাসরি কুফরী মতবাদ বা ধর্ম গ্রহণ করা। যেমন ইহুদী, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ ইত্যাদি হয়ে যাওয়া।

২. ইসলামের প্রামাণ্য বিধানকে অস্বীকার করা। যেমন যাকাতকে অস্বীকার করা, নামাযকে অস্বীকার করা, রোযাকে অস্বীকার করা ইত্যাদি। এর যে কোন একটি অস্বীকার করে হাজার বার মুসলমান দাবি করলেও ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে যাবে।

৩. ইসলামের যাবতীয় আহকাম পালন করার পর ইসলামের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত ইত্যাদি নিয়ে তামাশা বা উপহাস করা। এ জাতীয় ব্যক্তিও মুরতাদ হয়ে যাবে। অতএব আমি কুরআন হাদীস ও ফেকাহর আলোকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই ফতোয়া জারি করছি যে, বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী ও বিচারপতি নাজমুন আরা সুলতানা উপরোক্ত বিষয়াবলীর কারণে ইসলামের গন্ডি থেকে বেরিয়ে মুরতাদ হয়ে গিয়েছে। আর মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড। কাজেই দেশের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বিচারকদ্বয়ের শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হওয়া ঈমানী দায়িত্ব।

(সূত্র: মোজাদ্দেদ হাসান তাদনান, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্র্যাজেডি*, ঢাকা: হৃদয় প্রকাশন, ২০০১, পৃ.৮১-৮৬।)

*ফতওয়াটির আরবী উদ্ধৃতিসমূহ উল্লেখ করা হয়নি - বর্তমান গবেষক।

পরিশিষ্ট ৪(খ)

বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর পূর্ব রেকর্ড

একজন বিচারপতির আমলনামা

বিশেষ রিপোর্ট: বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী নানা কারণে আলোচিত। আদালত অবমাননা ও সম্পূর্ণ এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে শরিয়ত পরিপন্থী রায় দেয়ার দায়ে তিনি আপিল বিভাগের কাছে বারংবার তিরস্কৃত। যথেষ্ট কড়া ভাষায় ধিকৃতও হয়েছেন তিনি। ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কে তার মনগড়া ব্যাখ্যায় মহাবিরক্ত আপিল বিভাগ সর্বশেষ বলেন, তার এ অভ্যাস রোগের দিকে গেছে। তাই আপাতদৃষ্টিতে জনতা টাওয়ার মামলা ও সাম্প্রতিককালে ফতোয়াবাজিকে বেআইনি ঘোষণার রায় দিয়েই তিনি যে আলোচিত তা নয়। অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, শরিয়তের সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানকে চ্যালেঞ্জ করতে অনেক আগ থেকেই তার বিশেষ উৎসাহ। নিয়ম-কানুনের তোয়াক্কা না করে তিনি যখনই সুযোগ পাচ্ছেন, তখনই শরিয়তের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মকে একান্ত নিজস্ব স্টাইলে আক্রমণ করছেন। বিচার বিভাগের ইতিহাসে তিনিই একমাত্র বিচারক যিনি তার রায়ের আপিল চলাকালে ফুলকোর্টকে প্রভাবিত করতে সংবাদপত্রে নিবন্ধ লিখেন। আপিল বিভাগ এ জন্য তাকে দু'দু'বার তিরস্কার করেন। সাধারণভাবে তিনি সংবাদপত্রে ইসলাম সম্পর্কিত নিবন্ধ লিখে থাকেন। তার একাধিক প্রকাশনা রয়েছে। কিন্তু এর গুণগতমান এবং বিষয়বস্তুর বস্তুনিষ্ঠতা ও তা প্রকাশের উদ্দেশ্য নিয়ে খোদ আপিল বিভাগের এক রায়ে সন্দেহ পোষণ করা হয়। ইতিপূর্বে তিনি ইসলামে একাধিক বিয়ের বিধানকে অবৈধ বলে রায় দেন। আপিল বিভাগ তার এ রায়কে কেবল প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষ্যান্ত হননি তাকে তিরস্কারও করেন। বিচারপতি রাব্বানী তার রায়ের আলোকে জাতীয় সংসদকে আইন প্রণয়নের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি ইতিপূর্বে একক ফৌজদারি মামলায় নিজের একটি বইকে 'অথরিটি' ঘোষণা করে সে অনুযায়ী রায় দেন। আপিল বিভাগ তার সে অবস্থানকেও অগ্রহণযোগ্য বলে নাকচ করে দেন। আইনবিদরা বলেন, নিজের বইয়ে প্রদত্ত ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে এভাবে রায় দানও এক নজিরবিহীন ঘটনা। খোরপোসের মামলায় আপিল বিভাগ তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, শরীয়তের আইন ব্যাখ্যার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আর তা করতে হলে ইসলামী পণ্ডিতদের মতামত নেয়া উচিত। কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি। ফতোয়াবাজি বাংলাদেশ সমাজের এক অভিশাপ। এ থেকে পরিত্রাণ চায় সবাই। কিন্তু ইসলামী আইন সম্পর্কে তিনি একের পর এক 'যুগান্তকারী' রায় দিয়ে চলেন। আর যা আপিল বিভাগে নাকচ হয়ে যায়। শরিয়ত সম্পর্কিত তার দেয়া তিনটি রায়ের দু'টি আপিল বিভাগ নাকচ করেছেন। খোরপোস মামলায় পবিত্র কোরআনের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করে তিনি যে রায় দিয়েছিলেন, তা নিয়ে ১৯৯৫ সালে খুব হৈ চৈ হয়। কিন্তু আপিল বিভাগের রায়ে

তার যুক্তির অসারতা প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। হরতাল নিয়ে তার আরেকটি সুয়োমটো মামলার রায় আপিল বিভাগে পেন্ডিং। তিনি রায় দেন, ৬ জনের বেশি যদি হরতাল আহ্বান করে, তবে তা হবে শাস্তিযোগ্য।

বহু বিবাহ সংক্রান্ত মোহাম্মদ ইলিয়াস বনাম জেসমিন সুলতানা মামলায় ১৯৯১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আপিল বিভাগ তার আচরণ সম্পর্কে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এতে খোরপোস মামলার একই বিচারক সমন্বয়ে গঠিত ফুলকোর্ট বলেছেন, 'খোরপোস মামলায় যেভাবে তিনি বিচার বিভাগীয় রীতিনীতি লঙ্ঘন করে সুয়োমটো মত দিয়েছেন, একইভাবে তিনি ইসলামের বহু বিবাহ সংক্রান্ত বিধান সম্পর্কে সুয়োমটো মত দিয়েছেন। মুসলিম পারসোনাল ল' সংশোধনে করতে বলেছেন'। তার এ অনুশীলন সম্পূর্ণভাবে অবৈধ, যা তার জন্য 'প্যাথলজিক্যাল' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ রায়ে বহু বিবাহ বন্ধ সম্পর্কিত বিচারপতি রাব্বানীর মতামতকে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৯২ সালে তিনি বিচারক হন। জেনারেল এরশাদের দল তিনি করেছেন।

কেস স্টাডি: খোরপোষ মামলা

হেফজুর রহমান ১৯৮৫ সালে গার্মেন্টস কর্মী শামছুন নাহার বেগমকে বিয়ে করেন। দেনমোহর ধার্য হয় ৫০ হাজার এক টাকা। তাদের ছেলে হয় ১৯৮৭ সালের ১৫ ডিসেম্বর। অর্থ মন্ত্রণালয়ের টাইপিস্ট হেফজুর রহমান স্ত্রীকে তালাক দেন ১৯৮৮ সালের ১০ আগস্ট। ১৯৮৮ সালে শামছুন নাহার দেনমোহর ও খোরপোষের দাবি করে দাউদকান্দির পারিবারিক আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালত বাদিনীকে অবশিষ্ট দেনমোহর বাবদ ৪৮ হাজার টাকা ও ৩ মাসের উদ্দত সময়ে শামছুন নাহারকে মাসে ৩ হাজার টাকা ও ছেলে শাওন মিয়াকে ১ হাজার টাকা করে প্রদানের নির্দেশ দেয়। এ আদেশের বিরুদ্ধে হেফজুর কুমিল্লা জজের আদালতে আপিল করেন। কুমিল্লার জেলা জজ ১৯৯২ সালের ২০ এপ্রিল এক রায়ে স্ত্রীর খোরপোষের টাকা বহাল রাখেন। কিন্তু ছেলের এক হাজার টাকা কমিয়ে ছ'শ টাকা ধার্য করেন। জেলা জজ খোরপোষের পরিমাণ কমিয়ে দিলেও শামছুন নাহার এ রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবি করেননি। জেলা জজ সব মিলিয়ে ৮৯ হাজার টাকার ডিক্রি কমিয়ে ৭২ হাজার ৬শ' টাকা পরিশোধের নির্দেশ দেন। এ রায়ের বিরুদ্ধে হেফজুর রহমান হাইকোর্টে সিভিল রিভিশন করেন। হাইকোর্ট ১৯৯২ সালের ৩০ আগস্ট স্থগিত আদেশ দেন। এই মামলার কোনো পক্ষ থেকেই তালাক পরবর্তী ইদ্দত উত্তীর্ণ সময়ের জন্য ভরণপোষণের ব্যয় নির্বাহের প্রশ্ন তোলা হয়নি। ১৯৯৫ সালের ৯ জানুয়ারি বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী এ মামলার রায় দানকালে জেলা জজের রায় দানকে অবৈধ ঘোষণার পাশাপাশি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে অর্থাৎ সুয়োমটো তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ইদ্দত উত্তীর্ণ সময়ের ভরণপোষণের প্রশ্নটি তোলেন। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী দাউদকান্দির পারিবারিক আদালত ও জেলা জজ আদালতের উভয়ের রায় নাকচ করেন। তিনি নির্দেশ দেন যে, শামছুন নাহার বেগম পুনঃবিবাহ না করা পর্যন্ত প্রতি মাসে তাকে ছেলে ও মায়ের ভরণপোষণ বাবদ প্রত্যেককে ১ হাজার টাকা করে দিতে হবে। বিচারপতি গোলাম রাব্বানীর সাথে এই বেঞ্চে যদিও আরেকজন বিচারপতি ছিলেন এবং রায়টি দু'জনের রায় হিসেবেই বিবেচ্য। কিন্তু অপর বিচারক একটি বাক্যও জুড়ে দেননি। সিনিয়র বিচারপতি হিসেবে জনাব রাব্বানীই রায়টি লেখেন।

বিচারপতি রাব্বানীর যুক্তি

পবিত্র কোরআন বোঝা সহজ- বিচারপতি রাব্বানী সূরা বাকারার ২৪১ নম্বর আয়াতের আক্ষরিক ব্যাখ্যা করার আগে এ বিষয়টির আলোকপাত করেন। সূরা আল ইমরানের ৭ নম্বর আয়াতের বরাত দিয়ে বলেন, কোরআন নিজেই তাকে অধ্যয়নের নিয়ম বেঁধে দিয়েছে। আয়াতটি নিম্নরূপ: 'তিনিই আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন। তাতে কিছু আয়াত রয়েছে সুস্পষ্ট, সেগুলোই কিতাবের আসল অংশ। আর অন্যগুলো রূপক। সুতরাং যাদের অন্তরে কুটিলতা রয়েছে তারা অনুসরণ করে ফিৎনা বিস্তার এবং অপব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে। তন্মধ্যেকার রূপকগুলোর আর সেগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলেন, আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি। এই সবই আমাদের পালন কর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। আর বোধ শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ছাড়া আর কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না'। বিচারপতি রাব্বানী

এরপর 'তাই কোরআন বোঝা সহজ' মন্তব্য করেই বলেন, 'এ থেকেই বোঝা যায় কোরআন তার পণ্ডিতির আক্ষরিক গঠনের নিয়ম নির্দেশ করেছে। এই নিয়ম সার্বজনীন। তিনি বলেন, এক শ্রেণীর মুসলমান কোরআনের এই আক্ষরিক অধ্যয়নকে নিরুৎসাহিত করেছে। তাদের মতে, অনুমোদিত আদি পণ্ডিতদের দেয়া যে কোনো একটি ব্যাখ্যা পাঠকদের অনুসরণ করতে হবে। তারা একথাও বলেন যে, কোরআন ব্যাখ্যার দরজা এখন বন্ধ। প্রিভি কাউন্সিলেও এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিধ্বনিত ও গৃহীত হয়েছে। আগাম মোহাম্মাদ জাফির বিন্দামিন বনাম কুলসুম বিবি (ILR 25 Cal 9) মামলায় প্রিভি কাউন্সিল কোরআনের স্পষ্ট আক্ষরিক পাঠ গহণ করেননি। 'আদালতের জন্য কোরআনের এমন আক্ষরিক ব্যাখ্যা গ্রহণ ঠিক হবে না যা কিনা ইসলামের মহান ও উচ্চ কর্তৃপক্ষের ঘোষিত মতামতের বিরুদ্ধে যায়।' প্রিভি কাউন্সিলের এই ডিক্টাম উল্লেখ করে বিচারপতি রাব্বানী বলেন, প্রিভি কাউন্সিল ওই মতামত দিয়েছেন প্রায় ১০০ বছর আগে ১৮৯৭ সালে।' কিন্তু তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রিভি কাউন্সিলের বিজ্ঞ বিচারকগণ অমুসলিম ছিলেন। তারা স্বাধীনভাবে মুসলিম জুরিস্টদের মতামত উপেক্ষা করে ওই ধরনের ইসু নিস্পত্তির প্রশ্নে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বিচারপতি রাব্বানী বলেন, আমরা তাই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, 'কোরআন শরিফে যে আইন রয়েছে, সেটিকে অনুসরণ করার পূর্ণ এখতিয়ার একটি সিভিল কোর্টের আছে। কোনো আইনবেত্তা বা ভাষ্যকার, তা তিনি যত প্রাচীন এবং উচ্চ মার্গের কর্তৃত্বসম্পন্ন হোক না কেন এবং তাদের মতামত যত দীর্ঘদিন ধরেই অনুসরণ করা হোক না কেন সিভিল কোর্ট যদি দেখেন যে, সেই মতামত বা প্রথা কোরআনের ভাষ্যের বিরোধী তাহলে সেই কোর্ট তা অগ্রাহ্য করার অধিকার রাখেন। হিন্দু আইনে লিখিত আইনের বিপরীতে যদি কোনো প্রচলিত পরিষ্কার প্রথা বিদ্যমান থাকে তাহলে তা লিখিত ভাষ্যের ওপরে স্থান পায়। কিন্তু ইসলামী আইনের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। কারণ একজন মুসলমানের জন্য এটা ঈমানের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কোরআনে যা অবতীর্ণ হয়েছে কোনো প্রশ্ন না করে সে তাকে অনুসরণ করবে এবং কোরআন শরিফকে অমান্য করাটা একটা পাপ।'

এনজিও আইনজীবীদের হাতে ছিলা একটি বুকলেট

আপিল বিভাগের এ মামলার শুনানি পেন্ডিং থাকাকালে একটি অভিনব ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি ও ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্রেটিক রাইটস নামের দু'টি এনজিওকে বিনামূল্যে একটি বুকলেট বিতরণ করতে দেখা যায়। বুকলেটটির নাম 'এ ওয়ে টু ইসলাম'। এর কাভার পৃষ্ঠায় বইটির সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়-inspiring and demanding। জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি এ বিরোধপূর্ণ মামলার সমর্থনে ইন্টারভেনর হিসেবে আপীল বিভাগের সামনে হাজির হন এবং এই বুকলেটটির বক্তব্যের ভিত্তিতেই সূরা বাকারায় ২৪১ নম্বর আয়াতকে উদ্ধৃত করে মাতা-অর্থ খোরপোষ দাবি করা হয়। বিচারপতি মোস্তফা কামাল তার রায়ে এই বিবরণ দিয়ে বলেন, এই বুকলেটটির লেখক হলেন বিজ্ঞ বিচারক মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী। তার বইয়ের বরাতে কোরআন ব্যাখ্যায় এক জোরপূর্বক উপসংহারে পৌঁছানো হয়। কিন্তু কোরআনের ১৪টি স্থানে মাতা অর্থ খোরপোষ বা ভরণপোষণ নয়। 'যদি আমরা এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করি, তবে তা সূরা বাকারার ২৩৩, ২৩৬ ও ২৩৭ আয়াতের ও সূরা আততালাকের ৬ ও ৭ নম্বর আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক হবে। এভাবে একজন ব্যক্তির উপর তার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণপোষণ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চাপিয়ে দেয়া হবে অমানবিক, বেঠিক, বৈষম্যপূর্ণ ও অশোভন।

বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেন, কোরআন ব্যাখ্যায় নিজেদের মত চাপিয়ে দেয়া থেকে বিরত থেকে প্রিভি কাউন্সিলের বিচারকরা সঠিক কাজটি করেছেন। কারণ তারা অমুসলিম। মহান মুসলিম মনীষী ও উচ্চতর কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত মতামতের বিরোধিতা করতে তারা যাননি। কারণ তাদের সেই যোগ্যতা ছিলো না। তিনি অবশ্য বলেন, আমরা কোরআনের ব্যাখ্যায় হাইকোর্টের বিজ্ঞ বিচারক ও বিজ্ঞ আইনজীবীদের যোগ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন তুলছি না। তবে এ ক্ষেত্রে আমরা আমাদের নিজেদের যোগ্যতা সম্পর্কে রীতিমতো সন্দিহান। আমরা পরিস্থিতির চাপে ও কম্পমান হৃদয়ে বিষয়টি নিয়ে মতামত ব্যক্ত করছি। পাছে অজ্ঞতাসারে যদি কোনো ভুল করে বসি, সেজন্য মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে আগাম ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেন, মাতা-কখনই আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য নয়। কারণ এটি

দান মাতা-সম্পর্কে গত ১৪০০ বছরে প্রতিষ্ঠিত ইজমাও হচ্ছে তাই। এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধানকে ভেঙে ফেলার কোনো বৈধ কারণই আমরা দেখিনা। আমরা তাই এই মত দিচ্ছি যে, বিজ্ঞ বিচারকরা এমনি একটি বিষয়ে নতুন করে হাত দিয়েছেন যা কিনা পবিত্র কোরআন শরিফ, হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর হাদিস, সাহাবী ও তাবেয়ীগণ, চার ইমামের চার মাযহাব এবং গত ১৪শ' বছরের ভাষ্যকারগণ নিরঙ্কুশ অবস্থায় রেখেছেন। সুতরাং এই উদ্যোগ 'অবাঞ্ছিত ও অননুমোদনীয়'। এর কোনো কারণই নেই। বিজ্ঞ বিচারকরা সূরা বাকারার ২শ' ৪১ নম্বর আয়াতের ইংরেজী অনুবাদের এবং অপর ইংরেজী হরফের ব্যাখ্যা আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন। তারা উক্ত আয়াতের আরবী টেক্সটকে অবলম্বন করেননি। কিন্তু পবিত্র কোরআনের অনুবাদ পবিত্র কোরআন নয়। কিন্তু তারা সেই কাজটি করে 'greatest blunder' করেছেন।

বিচারপতি লতিফুর রহমান (বর্তমান প্রধান বিচারপতি) সে অনুশীলনকে 'বাতিক ও খেয়ালখুশি' (Whims and caprice) বলে চরম উপহাস করেন। বিচারপতি এটিএম আফজাল (তৎকালীন প্রধান বিচাপতি) হাইকোর্ট ডিভিশনের ওই রায়কে 'নৈতিকভাবে নিন্দার্হ' (morally despicable) ও 'বিচার বিভাগীয় মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যানের নামান্তর' (Verge on sacrilege) বলে বর্ণনা করেন। বিচারপতি মোস্তফা কামাল (সাবেক প্রধান বিচারপতি) ওই রায়কে 'এক বিরাট ধ্বংসকর ভুল' হিসেবে চিহ্নিত করেন। বিচারপতি লতিফুর রহমান গভীর অনুশোচনা ও আক্ষেপের সাথে মন্তব্য করেন- 'এটা সত্যিই বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক যে, আজকের মুসলিম বিচারকরা বিচ্যুত হয়েছেন এবং বাস্তবে তারা মুসলিম আইনের সন্ধান ও তা বঝতে ব্যর্থ। তারা তাদের বাতিক ও খেয়ালখুশি মোতাবেক ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ভরণপোষণ প্রশ্নে সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। তারা এটা করতে গিয়ে অতীতের মুসলিম পণ্ডিতদের ঘোষণা ও মতামতসমূহ বিবেচনায় নেননি। সত্যি বলতে কি? প্রিভি কাউন্সিলের ব্রিটিশ বিচারকরা যেখানে মুসলিম জুরিস্টদের মতামতের ওপর রায় দিয়েছেন, সেখানে আজ মুসলিম বিচারকরা মুসলিম জুরিস্টদের উপেক্ষা করে স্বাধীন মত দিয়েছেন। এই রায় প্রতিষ্ঠিত মুসলিম আইনের নীতি অনুসারে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থনযোগ্য। সে কারণে তারা যেসব যুক্তিতে প্রিভি কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করেছেন তা বিভ্রান্তিকর।' বিচারপতি লতিফুর রহমান এরপর তীব্র বিদ্রূপের বাণ হেনে বলেন, 'হাইকোর্ট বেঞ্চের এ রায়টি অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতায় ঠাসা- তারা এক নিঃশ্বাসে বলে ফেলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোরআনের লুকায়িত অর্থ আর কারো জানা নেই। কিন্তু একই সঙ্গে তারাই যেন কোরআনের নিগুঢ় অর্থ বুঝে ফেলেছেন এবং কেবল আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলীর ইংরেজী অনুবাদ গ্রহণ করেছেন। সত্যি বলতে কি, এই ইংরেজী অনুবাদটি ছাড়া হাইকোর্ট ডিভিশনের কোরআন ব্যাখ্যার আর কোনো ভিত্তিই আমি খুঁজে পাই না। পবিত্র কোরআনের আয়াত ব্যাখ্যার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার ভিত্তি কি একটি অভিধান হতে পারে? এই মামলায় আপিল বিভাগ পবিত্র কোরআন ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আইনজীবী ছাড়াও বিজ্ঞ আলিম ও ইসলামি পণ্ডিতদের মতামত গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সে কারণে ফুলকোর্ট তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ভরণপোষণ প্রশ্নে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক ও মাসিক মদিনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দিন খানের মতামত নেন। হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে মাওলানা ওবায়দুল হকের লিখিত মতামত সমর্থন করেও বিচারপতি লতিফুর রহমান নিশ্চিত করেন যে, তালাকপ্রাপ্তা মহিলার 'নাফাকা' (ভরণপোষণ) কেবল তার ইদ্দতকাল পর্যন্তই পাবেন।

বিচারপতি মোহাম্মদ আব্দুর রউফ বলেন, এ আপিল গ্রহণে আমার বিজ্ঞ ব্রাদার জজগণ যে কারণসমূহের ভিত্তিতে উপসংহারে পৌঁছেছেন তার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণরূপে একমত। আমি এর সঙ্গে আর কিছুই যোগ করতে চাই না। বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী বলেন, আমার বিজ্ঞ ব্রাদারদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ রায় আমি পড়েছি। এই মামলায় সাধারণ ও সেক্যুলার দিক সম্পর্কে তাদের উপস্থাপিত যুক্তি সম্পর্কেও তাদের সিদ্ধান্তের সাথে পুরোপুরি একমত। তাদের সমর্থনে আমি শুধু এটুকু যোগ করছি যে, শামছুন নাহার বেগম বিচারিক আদালতের ডিক্রির বিরুদ্ধে কখনো আপিল করেননি। তিনি কোনো রিভিশনও চাননি। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই মামলা বিবেচনায় নিয়ে তাকে বাড়তি সুবিধা প্রদানে হাইকোর্ট বেঞ্চের কোনো এখতিয়ারই ছিলো না। তবে সূরা বাকারার ২৪১ নম্বর আয়াতের আওতায় তালাকপ্রাপ্ত মহিলা তার পুনঃবিবাহ না মৃত্যু পর্যন্ত খোরপোষ পাবেন তা নির্ধারণের প্রশ্ন সত্যিই কঠিন। এ প্রশ্নে বিচারপতি মোস্তফা কামাল উল্লেখ করেন যে, কেন এ মামলাটিতে তারা সুয়োমটো অনুশীলনে ব্রতী হলেন, তার কোনো কারণ

তারা ব্যাখ্যা করেননি। তার ভাষায়, 'A reasonless judgement justifies the appellant's submission that the learned judges held some personal views on maintenance from before and took this revisional case as an opportunity to convert their views.' তিনি বলেন বিজ্ঞ বিচারকরা কোনো নির্দিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তির মতামত নেননি। এমনটা নিতে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই তবে তা নিলে আদালতের উপকারই হতো। তিনি বলেন, কিছু তফসির এবং ভারতের কেরালা ও শ্রীলংকার কয়েকটি উলেমা বোর্ডের স্মারকলিপি ছাড়া গত ১৪০৪ বছর ধরে অনুসৃত ও প্রতিষ্ঠিত এ সংক্রান্ত কোরআনে ব্যাখ্যার প্রতিকূলে বিজ্ঞ আইনজীবীরা একটি মাত্র রায়ও দখাতে পারেননি। কোনো নারী আজ পর্যন্ত (সূরা বাকারার) ২৪১ নম্বর আয়াতের ওপর ভিত্তি করে পুনঃবিবাহ পর্যন্ত খোরপোষের দাবি করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। যে মামলাটিকে নিয়ে বিচারকরা রায় দিলেন, সে ক্ষেত্রে মহিলা নিজেই কেবল ৩ মাসের খোরপোষ চেয়েছেন।

বিচারপতি মোস্তফা কামাল বলেন, 'হাইকোর্টের ডিভিশনাল এখতিয়ারে হাইকোর্ট ডিভিশন যদি মূল আইন এবং কার্যবিধি আইন দুটোরই ওপর বেপরোয়া অশ্বচালনা করতে থাকেন তাহলে মামলাকারী জানতে পারে না যে, তার মামলার চেহারাটা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে, এটা কোন রাস্তা দিয়ে চলবে এবং যেসব প্রতিকার চেয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে সেই প্রতিকারগুলো বিচারকের হাতে কি চেহারা নেবে। এটা হলো বিচারের বিপরীতমুখী যাত্রা। বিচার বলতে আমরা যা বুঝি, যেভাবে এ মামলায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে খোরপোষ সম্বন্ধে বিচার চালানো হয়েছে, সেটা এখতিয়ারের বাইরে তো থাকেই। তাছাড়াও এটা বিচার কার্যে সংযমহীনতার চরম বহিঃপ্রকাশ। কোন অনিশ্চয়তা না রেখেই আমরা এ ধরনের প্রয়াসকে অনুমোদনহীন ঘোষণা করছি।'

বিচারপতি রাব্বানীর কোরআন ব্যাখ্যার একান্ত স্টাইলের সুদূরপ্রসারী ক্ষতিকর দিক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ওই রায় সিভিল কোর্টের সব বিচারক তাদের নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা এবং তাকে আইনের বাধ্যবাধকতা তৈরীতে 'ব্লাঙ্ক চেক' দিয়েছে। তিনি ১৯৩৭ সালে মুসলিম পার্সোনাল ল' (শরিয়ত) অ্যাপ্লিকেশনস এ্যাক্টের ২ ধারার বরাত দেন। সেখানে বলা আছে, যে ক্ষেত্রে পক্ষসমূহ মুসলমান সেখানে খোরপোষসহ কতপিয় বিষয় নিস্পত্তির ক্ষেত্রে মুসলিম পার্সোনাল আইন (শরিয়ত) অনুসরণ করতে হবে। শরিয়া একটি আরবী শব্দ। এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে, দ্য ওয়ে টু এ ওয়াটারিং প্লেস। কিন্তু পবিত্র কোরআন হচ্ছে শরিয়ার প্রথম প্রাথমিক উৎস। দ্বিতীয় হচ্ছে সুন্নাহ। তিনি বলেন, বিচারকরা যে উপায়ে রায় দিয়েছেন তাতে মনে হয়, সুন্নাহ ইজমা ও কিয়াসের সাহায্য ছাড়াই সিভিল কোর্টের সব বিচারক কোরআন ব্যাখ্যা করতে পারবেন এমনকি তাদের সে নিজস্ব মতামত যদি সুপ্রতিষ্ঠিত রেওয়াজসমূহের সঙ্গে দ্বন্দ্বপূর্ণও হয়। বিচারপতি মোস্তাফা কামাল এ পর্যায়ে জোরালো মত দেন যে, 'এ রায় হলো নৈরাজ্য ও অরাজকতার প্রতি একটি আমন্ত্রণ এবং এর ফলাফল হলো বিষময়।'

বিচারপতি এটিএম আফজাল বলেন, হাইকোর্টের ওই রায়ে বিজ্ঞ বিচারকরা সূরা বাকারার ২৪১ নম্বর আয়াতের প্রথম অংশের শুধু আক্ষরিক অর্থ বিবেচনায় নিয়ে মত দেন যে, তালাকপ্রাপ্ত মহিলার ভরণপোষণ তার পুনঃবিবাহ অর্থাৎ অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তার সাবেক স্বামীকে বহন করতে হবে। এই রায় দেয়া হয়, ১৯৯৫ সালের ৯ জানুয়ারী। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই রায় দেয়া হয়, সেক্ষেত্রে ফরিয়াদি মহিলা কিন্তু তার স্বামীর কাছে ইদ্দত উত্তীর্ণ অর্থাৎ পুনঃবিবাহ পর্যন্ত ভরণপোষণ দাবি করেননি। এই দিকটি বিবেচনায় নিয়ে বলা হয়, এরকম একটি বিষয়কে সুয়োমটো নেয়ার কোনা এখতিয়ারই আদালতের ছিলো না। তাই ওই রায় আসলে ছিলো বিচারকদের ব্যক্তিগত। যা মানতে সংশ্লিষ্টদের কোনো বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে না। বিচারপতি আফজাল বলেন, কোরআনের ভুল ব্যাখ্যার ভিত্তিতে দেয়া রায়টি প্রথমত খারাপ, দ্বিতীয়তও খারাপ। বিচারকরা তাদের পক্ষে গত ১৪শ' বছর সময়ে প্রণীত একটি কর্তৃপক্ষীয় সিদ্ধান্তও হাজির করতে পারেননি। বিরোধপূর্ণ রায়টি তাই 'বিচিত্র'। এ রায়ে প্রশ্ন তোলা হয় কোরআনের আইন কি এবং বিজ্ঞ বিচারকরা বলেন, একটি সাধারণ আইন যেভাবে আমরা ব্যাখ্যা করি, সেভাবেই আমরা কোরআনের ভাষাগত রচনাশৈলীর আক্ষরিক ও সাধারণ অর্থ করেছি। বিচারপতি আফজাল পবিত্র কোরআন ব্যাখ্যায় এ প্রসঙ্গটি তার রায়ে এভাবে উল্লেখ করেন: 'And what is this law in the Quran? The learned judges says we find it to mean by giving a literal construction and ordinary meaning to its words and phrases in as much the same may as we interpret an ordinary statute.

This is the entire rationale of the impugned judgement.' বিচারপতি আফজাল কোরআন ব্যাখ্যায় বিচারকদের এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কেবল 'আইনগতভাবেই ভ্রান্ত নয়, 'নৈতিকভাবে নিন্দার্হ্য' বলে বর্ণনা করেন। তিনি এরপর বলেন, 'আমি যদি আরেকটু বাড়িয়ে বলি, তাহলে বলবো এটা বিচার বিভাগের মূল্যবোধ প্রত্যাখ্যানের নামান্তর।'

থ্যাঙ্কস গড

বিচারপতি রাব্বানী তার রায়ে ৬ বার 'গড' শব্দটি উল্লেখ করেন। বিচারপতি লতিফুর রহমানসহ অন্য বিচারকরা বিচারপতি রাব্বানীর বর্ণিত 'গড' লেখা অনুচ্ছেদের বরাত দিতে গিয়ে 'আল্লাহ' লেখার প্রয়াস পেয়েছেন।

বাংলাদেশের সংবিধানেও আল্লাহ শব্দের ইংরেজী 'গড' করা হয়নি।

বিচারপতি রাব্বানী তার অন্যান্য রায়েও 'গড' শব্দটি ব্যবহারে উদগ্রীব। যেমন একটি মামলায় তিনি মন্তব্য করেন, 'থ্যাঙ্কস গড, সমস্যাটা কোথায় বুঝতে পেরেছি।' [18 BLD (AD) 59]. বিচারপতি এটিএম আফজাল বলেন, খোরপোষ মামলার রায়কে 'অবিচনাপ্রসূত ও দুর্মতিপ্রসূত' বলেও মন্তব্য করেন। কারণ দৃশ্যত তারা বিয়ে ও তালাক সংক্রান্ত মুসলিম আইনের পুরো বিধানগুলোকে বিবেচনায় নিতে ব্যর্থ হয়েছেন। এমনকি তালাক প্রশ্নে একই সূরা বাকারার, সূরা আত-তালাক এবং আল আহজাবের অন্যান্য আয়াতও তারা বিবেচনায় নেননি। বিজ্ঞ বিচারকরা সূরা বাকারার ২৪১ নম্বর আয়াতের 'মাতাউন বিল মারুফ' ব্যাখ্যা করতে ইউসুফ আলির ওপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে, তালাকপাপ্ত মহিলা পুনঃবিবাহ না করা পর্যন্ত একটি সঙ্গত মাত্রায় খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী হবেন। কিন্তু এই একই 'মাতাউন বিল মারুফ' কথাটি একই সূরার ২৩৬ নম্বর আয়াতে আছে। ইউসুফ আলীর অনুবাদেই দেখা যায়, এখানে তিনি কথাটির মানে করেছেন A gift of a reasonable amount। বিচারপতি আফজাল এর পরে প্রশ্ন রাখেন তাহলে একই কথার দুই অর্থ ঘটবে কিভাবে? যদি বিজ্ঞ বিচারকরা তাদের ব্যাখ্যায় সঠিক হন তাহলে উক্ত দুই আয়াতের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। (নাউযুবিল্লাহে মিন যালিক)। এরপর তিনি ইউসুফ আলি অনূদিত সূরা আত-তালাকের দুটি আয়াতের ইংরেজী তরজমার উদ্বৃতি দিয়ে নিশ্চিত করেন যে, খোরপোষের বিষয়টি কেবল ইদ্দতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং বলেন, এভাবে বিজ্ঞ বিচারকদের গুণগত ব্যাখ্যার সাথে কোরআনের অন্যান্য সূরার সংঘাত দেখা দেয়। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, বিজ্ঞ বিচারকেরাই হবেন শেষ ব্যক্তি যারা মনে করবেন যে, কোরআনে দ্বন্দ্বপূর্ণ আয়াত রয়েছে। বিচারপতি আফজাল সূরা জুমার ২৮ নম্বর আয়াতের বরাতে বলেন আল্লাহতায়ালা নিজেই ঘোষণা করেছেন, 'আরবী ভাষায় এই কোরআন বৈপরীত্য মুক্ত যাতে মানুষ সাবধানতা অবলম্বন করে'। 'এই মামলাটি হাইকোর্ট ডিভিশন বড়ই অসতর্কতার সাথে নিয়েছে', উল্লেখ করে প্রধান বিচারপতি তার রায়ে বলেন, 'এ মামলার আপিলের পরিবর্তিত অবস্থা ও ধারণার আলোকে মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা দিতে আদালতের এখতিয়ার আছে কি নেই সে প্রশ্ন তোলা হয়নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো সূরা বাকারার ২৪১ নম্বর আয়াত সঠিক ব্যাখ্যা করেছেন কি না। একজন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা তার ইদ্দতকাল পর্যন্ত খোরপোষ পাবেন। এটা এক অতি প্রাচীন ও সুপ্রতিষ্ঠিত আইন। বিবাদী ও তার সমর্থকরা কেবল দেখাতে পারেন যে বিভিন্ন মুসলিম দেশ কতিপয় নির্দিষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সংসদে আইনের মাধ্যমে মাতা বা ক্ষতিপূরণ দানের বিধান ইদ্দত উত্তীর্ণ সময়ের জন্যও করেছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রশ্নে তারা বিশ্বের কোনো একটি জুরিসপ্রুডেন্স থেকে এই দৃষ্টান্ত দিতে পারেননি যেখানে ২৪১ নম্বর আয়াতের এই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, খোরপোষ পুনঃবিবাহ হওয়া পর্যন্ত দিতে হবে। হাইকোর্ট ডিভিশন অন্তত সততার সাথে স্বীকার করছেন যে, তারা তাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কোনো একটি মাত্র 'অথরিটি' বা দৃষ্টান্তের ধার ধারেননি। বিজ্ঞ বিচারকরা ২৪১ নম্বর আয়াতের শব্দগুলো এবং আপন বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী তার একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছেন, যা কিনা বিচিত্র। এ ধরনের রায় এই প্রথম। তাদের এই রায় আমি এতটুকু দ্বিধান্বিত না হয়েই প্রত্যাখ্যান করছি।'

(সূত্রঃ দৈনিক *মানবজমিন*, ১৪ জানুয়ারী ২০০১)

পরিশিষ্ট ৫

ঢাকায় পল্টন ময়দানে ২ ফেব্রুয়ারী ২০০১-এ অনুষ্ঠিত উলামা-মাশায়েখ মহাসমাবেশের বিবরণ

ইসলাম বিরোধী শক্তির মোকাবেলায় বুকের তাজা খুন ঢেলে দিতে হবে

১ জানুয়ারী হাইকোর্টের দুই বিচারপতি কর্তৃক সব ধরনের ফতোয়া অবৈধ ঘোষণা করে প্রদত্ত রায়ের প্রতিবাদে এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম হাদীস বিশারদ ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান আমীরে মজলিস শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হকের নেতৃত্বে সর্বস্তরের ওলামা-মাশায়েখের ডাকে ২ ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে স্মরণকালের সর্ববৃহৎ মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লক্ষ জনতার তাকবির ধ্বনিতে মুখরিত হয় সুবিশাল পল্টন ময়দান ও আশেপাশের রাজপথ। দুপুর ১২টায় মহাসমাবেশের অনুষ্ঠানের ঘোষণা থাকলেও সকাল ১০টার আগে থেকেই জনতার ঢল নামতে শুরু করে সেখানে। বেলা বাড়ার সাথে সাথে পল্টনের প্রবেশদ্বার ও পার্শ্ববর্তী রাজপথ জনস্রোতে পরিণত হয়। ঘোষিত সময়ের পূর্বেই কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় গোটা ময়দান। উপচেপড়া সমাবেশের সীমা পল্টন ময়দান ছাড়িয়ে বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ গেট, মতিঝিলের শিল্প ভবন, দৈনিক বাংলার মোড়ে গিয়ে ঠেকে।

নারায়ে তাকবীর আর জেহাদী শ্লোগানের উর্মিমুখর জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে ওলামা-মাশায়েখ ও তৌহিদী জনতার ঈমানদীপ্ত সমাবেশে শায়খুল হাদীস ঘোষণা করেনঃ আল্লাহর জমীনে আল্লাহ্‌র আইনই চলবে। সৃষ্টি যার আইন তাঁরই। কোরআন-হাদীসের অনুশাসন, ফতোয়া আছে-থাকবে। ইসলামী মূল্যবোধ, তাহযীব-তমুদ্দুনের বিরুদ্ধে ইসলাম বিরোধী কুফরী গোষ্ঠীর কোন আঘাত ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় সর্বাত্মক জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে। ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য বুকের তাজা খুন ঢেলে দিয়ে শাহাদাতের জন্য সবাইকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

মহাসমাবেশের শুরুতে উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন সমাবেশের সভাপতি মুফতি ফজলুল হক আমিনী। প্রধান অতিথির ভাষণ দেন ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক।

মহাসমাবেশে সারাদেশের ১৩ কোটি জনতার প্রতিনিধিত্বশীল ওলামা-মাশায়েখগণ অংশগ্রহণ করেন। ইসলামী ঐক্যজোটের মহাসচিব মুফতি ফজলুল হক আমিনীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বিশাল মহাসমাবেশে বক্তব্য রাখেনঃ ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের আমীর সৈয়দ ফজলুল করিম-পীর সাহেব চরমোনাই, খেলাফত মজলিসের সিনিয়র নায়েবে আমীর অধ্যাপক মাওলানা আখতার ফারুক, ইসলামী ঐক্যজোটের ভাইস চেয়ারম্যান মাওলানা মুহিউদ্দিন খান, খেলাফত আন্দোলনের ভারপ্রাপ্ত আমীর মাওলানা সোলায়মান আহমদ নোমানী, বেফাকুল মাদারিসের মহাসচিব মাওলানা আবদুল জব্বার, খেলাফত মজলিসের মহাসচিব এ.আর.এম. আবদুল মতিন, চট্টগ্রাম জামেয়া ইসলামিয়া পটিয়ার মহাপরিচালক আল্লামা হারুন ইসলামাবাদী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নির্বাহী সভাপতি মাওলানা আশরাফ আলী বিশ্বনাথী, খেলাফত মজলিসের নায়েবে আমীর মাওলানা ইসহাক ও অধ্যাপক আহমদ আবদুল কাদের, ই.শা. আন্দোলনের নায়েবে আমীর মাওলানা মোস্তফা আল হোসাইনী, হাজী শরীয়তুল্লাহ্‌র উত্তরসূরী মাওলানা মুসলেহ উদ্দিন আহমদ আবুবকর মিয়া, চট্টগ্রাম দারুল মাআরিফ আল-ইসলামিয়ার মহাপরিচালক মাওলানা সুলতান যওক নদভী, নেজামে ইসলাম পার্টির নির্বাহী সভাপতি মাওলানা মুফতি ইজহারুল ইসলাম চৌধুরী, মহাসচিব মাওলানা আবদুল লতিফ নেজামী, ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মুফতি মুহাম্মদ তৈয়্যেব, জমিয়তে ওলামার মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস, সিলেটের মাওলানা নেজাম উদ্দিন, কিশোরগঞ্জের মাওলানা আনোয়ার শাহ, মালিবাগ মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা মুতাসিম বিল্লাহ্‌, নূর হোসাইন কাসেমী, খুলনার মাওলানা রফিকুর রহমান, মোমেনশাহীর শাহ মোশাররাফ হোসাইন, হবিগঞ্জের মাওলানা তাফাজ্জুল হক, গওহরডাঙ্গার মাওলানা রুহুল আমীন, গাজীপুরের মুফতি আবদুল কাইয়ুম, নোয়াখালীর

মাওলানা আজিজুল্লাহ, বি বাড়িয়ার বড় হুজুরের ছাহেবজাদা মাওলানা মনিরুজ্জামান সিরাজী, মাওলানা রেজাউল করিম জালালী, মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ মিসবাহ, নওগাঁর এমপি শামসুদ্দিন আহমদ, মাওলানা এটিএম হেমায়েত উদ্দিন, মাওলানা জুনায়েদ আল হাবীব, মাওলানা নূরুল ইসলাম জেহাদী প্রমুখ।

সমাবেশে আগন্তুকদের গাড়ি অবরোধ-হামলা-গ্রেফতার

মহাসমাবেশে অংশগ্রহণের জন্য সারা দেশ থেকে অজস্র জনতা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কিন্তু ঢাকার বিভিন্ন প্রবেশ দ্বারে ওঁৎ পেতে থাকা আওয়ামী সন্ত্রাসী, এনজিও এবং পুলিশ বাহিনী যৌথভাবে আক্রমণ করে ঢাকাগামী তৌহিদী জনতার বাসের উপর। গাজীপুর চৌরাস্তা, টঙ্গী, মানিকগঞ্জ, নরসিংদী, কাঁচপুরসহ বিভিন্ন স্থানে বাস কাফেলা থামিয়ে তৌহিদী জনতার উপর হামলা চালিয়ে সারাদিন আটক রাখা হয়। কোথাও কোথাও নিরীহ এসব যাত্রীকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যায়।

মহাসমাবেশ ফেরত জনতার উপর পুলিশী একশন

সন্ধ্যা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ শেষে লাখ লাখ জনতা যখন ঘোষিত কর্মসূচী নিয়ে বাড়ী ফিরছিলেন তখন রাস্তায় রাস্তায় শুরু হয় পুলিশী নির্যাতন, একশন, বেধড়ক লাঠিচার্জ। গুলিস্তান থেকে পল্টন মোড় পর্যন্ত এলাকায় চতুর্দিক ঘেরাও করে পুলিশ বিনা উস্কানিতে মেতে উন্মত্ত পাশবিকতায়। টিয়ার শেল গ্যাস নিক্ষেপ, বন্দুকের বাটের আঘাত আর বেধড়ক লাটিচার্জে আহত হন হাজার হাজার মানুষ। মারাত্মক আহত হয়ে হাত-পা ভেঙ্গে রাস্তায় পড়ে কাতরাতে থাকে বেশ কজন কর্মী। বেশ ক'জনকে ধরে জেলে নিয়ে যায় পুলিশ। মারাত্মক আহত হন ইসলামী ছাত্র মজলিস ঢাকা মহানগরী নেতা খন্দকার সাইফুদ্দিন আহমদ, মতিঝিল থানা সভাপতি আ.ন.ম. হেলাল উদ্দিন, ডেমরা থানা সেক্রেটারী শাহাদাত হোসেনসহ অসংখ্য কর্মী।

-এম মুনতাসির আলী

সূত্রঃ *মজলিস সংবাদ*, বিশেষ সংখ্যা, ঢাকা, মে ২০০১, পৃ. ১০।

পরিশিষ্ট ৬

ঢাকার মোহাম্মদপুরস্থ নূর মসজিদে নিহত বলে কথিত পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়ার হত্যাকাণ্ড বিষয়ে ঢাকার কয়েকটি দৈনিকের অনুসন্ধানী রিপোর্ট

পরিশিষ্ট ৬(ক)

ক্ষমতাধর মহলের নির্দেশ পালন করতে গিয়েই নিহত হয়েছেন পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়া

অলি উল্লাহ নোমান: তিনদন পর ৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার মোহাম্মদপুর নূর মসজিদে পুলিশী প্রহরায় নামাজ অনুষ্ঠিত হলেও অন্য ৩টি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনো তালা ঝুলছে। মাদ্রাসাগুলোর সামনে এখনো পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের লোকজনকে ধারে কাছেও ঘেঁষতে দেয়া হচ্ছে না। অনেকেই মনে করছেন, আদৌ মাদ্রাসাগুলো খুলবে কি না তা অনিশ্চিত। এলাকাবাসীর মতে মসজিদ ও মাদ্রাসার জমি দখল করে মার্কেট বানানোর নীল নকশা বাস্তবায়ন করতেই ৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার পরিকল্পিতভাবে মোহাম্মদপুর নূর মসজিদে বর্বরোচিত হামলা চালানো হয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পরিকল্পিত এই হামলার নেপথ্যে একজন প্রভাবশালী সংসদ সদস্য ও ওয়ার্ড কমিশনারও থাকতে পারেন বলে এলাকাবাসী ধারণা করছেন। এই হামলা ও সংঘাত সৃষ্টির মূল ভূমিকা পালনকারীরা তাদেরই নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী বাহিনী হতে পারে।

পুলিশের একটি সুত্র জানিয়েছে, ক্ষমতাধর মহলের নির্দেশ পালন করতে গিয়েই দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন মোহাম্মদপুর থানার কনস্টেবল বাদশা মিয়া। আর এই দুর্ঘটনার সুযোগটি লুফে নিয়ে অবৈধ ফায়দা লোটার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠেছে কুচক্রী মহলটি। সুযোগ বুঝে তারা কনস্টেবলের মৃত্যুর সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে অবৈধভাবে ঐতিহ্যবাহী নূর মসজিদসহ ৪টি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে। নির্দয়ভাবে পশুর ন্যায় পিটিয়ে বের করে দিয়েছে মাদ্রাসার ছাত্রদের। পুলিশের উপর অবৈধ প্রভাব বিস্তার করে পাইকারী হারে গ্রেফতার করিয়েছে নিরীহ মুসল্লীদের। মসজিদ-মাদ্রাসায় ঝুলিয়ে দেয়া হয় বড় বড় তালা। গত ৩দিন ধরে মসজিদে আজান-নামাজ হয়নি। মসজিদ বন্ধ করে দেয়ায় এলাকাবাসীর মাঝেও লক্ষ্য করা গেছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। এলাকার অন্যান্য মসজিদে মুসল্লীরা নূর মসজিদ ও মাদ্রাসার সপক্ষে কোন আলোচনা করেন কিনা তার নজরদারী করা হচ্ছে। গতকাল সোমবার দুপুরে নূর মসজিদের তালা খুলে ভিতর থেকে রক্তে ভেজা চাদর ও আলামত সরিয়ে নেয়া হয়েছে। কড়া পুলিশী প্রহরার মধ্যে জোহরের নামাজ পড়ানো হয়। মোহাম্মদীয়া আশরাফিয়া মাদ্রাসার মাওলানা মোঃ নূরুল হুদার ইমামতিতে ২০/৩০ জন মুসল্লী নামাজ আদায় করেন। এলাকার সাধারণ বাসিন্দারা এখনো নূর মসজিদে পুলিশের পাহারায় নামাজ আদায়ের সাহস পাচ্ছেন না। এদিকে নূর মসজিদ থেকে শনিবার গ্রেফতারকৃত হুমায়ুন কবির, আকরাম ও হিযবুল্লাহর ৩দিনের রিমান্ডের প্রথম দিন গতকাল অতিবাহিত হয়েছে। পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।

আকরাম ও হিযবুল্লাহ বলেছে, পুলিশ তাদের ধাওয়া করে নূর মসজিদের ভিতরে নিয়ে যাওয়ার পর লাঠি দিয়ে বেদম প্রহার করে ও বুট দিয়ে পাড়াতে থাকে। পুলিশ ও কিছু বহিরাগতের নির্যাতনে তারা দু'জনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। জ্ঞান ফিরার পর পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে। কাজেই কনস্টেবল বাদশা মিয়া কিভাবে মারা গেছে সে ব্যাপারে তারা কিছুই জানে না। অপরদিকে হুমায়ুন কবির বলেছে, পুলিশ যখন হামলা চালায় তখন মসজিদের ভিতরে শায়খুল হাদীস ও তার ছেলে ছিলেন। এছাড়াও ইসমাইল নামের এক ছেলে বাদশা মিয়ার শটগানটি নিয়ে মাদ্রাসার পুকুরে ফেলে দেয়। থানার একটি সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ এই হুমায়ুন কবিরকে রাজসাক্ষী বানিয়ে তাদের ইচ্ছামত কথা বলিয়ে নেয়ার ফন্দি এঁটেছে।

এদিকে কনস্টেবল বাদশা মিয়ার মৃত্যু কিভাবে হয়েছে সে বিষয়টি এখনো সুস্পষ্ট হয়নি। কেউ বলেছে, মসজিদের ভিতরে মুসল্লীদের সাথে ধস্তাধস্তির সময় তার শর্টগান থেকে গুলী বের হয়ে তার চোয়ালে বিদ্ধ হয়েছে। আবার কেউ বলছে, পুলিশের সাথে একদল সাদা পোশাকের সন্ত্রাসী মসজিদের ভিতরে ঢুকে হামলা করেছিল। স্যাবটাজের জন্যই তারা বাদশা মিয়াকে মসজিদের ভিতরে গুরুতর জখম করে বের হয়ে যায়। সংঘাতের ভিতরে এই ঘটনা ঘটায় কে মসজিদের লোক আর কে বহিরাগত তা বুঝা যায়নি। মূলত বাদশা মিয়ার মৃত্যুর দায়ভার হুজুরদের উপরে চাপানোর জন্যই বহিরাগতরা পরিকল্পিতভাবে তাকে মেরে দেয়। পরে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে নিয়ে মসজিদের ভেতর থেকে লাশ বের করে আনা হয়। অবশ্য পুলিশ বাদশা মিয়ার মৃত্যুর সমস্ত দায়দায়িত্ব হুজুরদের উপরে চাপিয়েছে। অন্যদিকে জামিয়া মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বেশ কয়েক বছর ধরে উক্ত সংসদ সদস্য ও ওয়ার্ড কমিশনারের ইন্ধনে বাজারের কিছু লোকজন মাদ্রাসার জমি দখলের জন্য উঠেপড়ে লেগেছিল। ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়ার চক্রান্ত করা হয়। জনকণ্ঠ ভবনে বোমা আবিষ্কারের পর পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে দিয়ে মাদ্রাসার কর্মকর্তাদের গ্রেফতার করানো হয় এবং ছাত্রদের বের করে দিয়ে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হয়। শনিবারের ঘটনা এই ষড়যন্ত্রেরই অংশ ছাড়া আর কিছু নয়। এলাকাবাসীও জানিয়েছেন, তারা দীর্ঘদিন থেকেই শুনছেন মাদ্রাসা-মসজিদ ভেঙ্গে সেখানে মার্কেট তৈরী হবে। তাদের ধারণা, খুব শীঘ্রই মাদ্রাসার জমিটি দখল হতে পারে।

টার্গেট দাঁড়ি টুপি পাঞ্জাবি

সারা ঢাকা শহরে ধর্মপ্রাণ মুসল্লীদের মাঝে চাপা আতংক পরিলক্ষিত হচ্ছে। পুলিশ এবং আওয়ামী লীগরা যেখানেই দাড়িওয়ালা, টুপি ও পাঞ্জাবি পরিহিত মুসল্লী দেখছে, সেখানেই তাদের ওপরে হামলা চালাচ্ছে। নাজেহাল করছে নানাভাবে। পুলিশের ওপরে নাকি নির্দেশ রয়েছে, দাড়ি, টুপিওয়ালা দেখলেই তাদের হাত-পা ভেঙ্গে দিতে হবে। এমতাবস্থায় ধর্মপ্রাণ মুসল্লীরা মসজিদে নামাজ পড়তে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। বিশেষত মোহাম্মদপুর এলাকার মসজিদগুলোতে নামাজের ওয়াক্তে মসজিদের সামনে দিয়ে পুলিশ ঘোরাফেরা করে ভয়ভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করছে। একটি সূত্রে জানা গেছে, কোন মসজিদে হুজুরদের সপক্ষে আলোচনা হয় কিনা সেই খবর সংগ্রহের জন্য একজন সংসদ সদস্যের নির্দেশে কিছু লোকজনও তৎপর রয়েছে। তবে অধিকাংশ মুসল্লিরই মতামত, কোন পরাশক্তিই ইসলাম ধর্মপালন ও অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে রাখতে পারবে না।

কাকরাইল মসজিদের সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন

বিশ্ব তাবলীগ জামাতের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাত কাকরাইল মসজিদের সামনেও অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। গত শনিবারের হরতালের দিন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি সেখানে পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। এক ট্রাক সশস্ত্র পুলিশ বসিয়ে মসজিদের মুসল্লীদের ওপরে মানসিক চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যেই এই পরিকল্পনা নেয়া হতে পারে বলে মুসল্লীরা মনে করছেন।

কথিত শক্তিশালী টাইম বোমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ কর্তৃক কথিত শক্তিশালী টাইম বোমার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। গতকালও থানার পাম্প হাউসের পাশে খোলা আকাশের নিচে সবুজ বালতিতে বোমাগুলো ভিজানো ছিল। এই বোমার প্রতি গতকাল পুলিশের কোন আগ্রহও দেখা যায়নি। বোমা আছে নাকি নিয়ে গেছে সে ব্যাপারে ডিউটি অফিসার তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য করতে পারেননি। অন্য অফিসারের কাছ থেকে জেনে নিয়ে তাকে মন্তব্য করতে হয়েছে। পুলিশের উদ্দেশ্য ছিল প্রমাণ করা যে, মাদ্রাসার ভিতরে বোমা তৈরী ও মজুদ রাখা হয়েছিল। বিভিন্ন পত্রিকায় তার ব্যাপক প্রচারও করা হয়েছে। একটি টেলিভিশন চ্যানেলের খবরে তো বলাই হয়েছে যে, বোমা ও বোমা তৈরীর সরঞ্জামাদি উদ্ধার হয়েছে। সেখান থেকে ৪টি পাসপোর্টও উদ্ধার করা হয়। পাসপোর্টের বাহকরা পাকিস্তানে যাতায়াত করতো। অর্থাৎ পাকিস্তান থেকেই এই বোমা তৈরীর ট্রেনিং নিয়ে এসেছে মাদ্রাসার ছাত্ররা। পরোক্ষভাবেই এই কথা প্রচার করা হয়েছে। এই পত্রিকায় বলা হয়েছে, বোমাগুলো এতই শক্তিশালী যে, সেগুলো বিস্ফোরিত হলে আশপাশের বিশাল

এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হত। কাজেই তাদের বক্তব্য মতে, বোমাগুলো শুধু ভয়ংকরই নয়, শংকার কারণও বটে। কিন্তু এত ভয়ংকর বোমা পুলিশ উদ্ধার করার পর গত ২ দিন ধরে কোন বিবেকে থানা কম্পাউন্ডের ভিতরে ফেলে রেখেছে। সেনাবাহিনীর বোমা বিশেষজ্ঞ দলকেও তারা বোমার ব্যাপারে অবহিত করেনি। ইতিপূর্বে রাজধানীতে ডজনখানেক বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারই দেখা গেছে, বোমার ধারে কাছে যেতেও পুলিশের সাহস হয়নি। সেনাবাহিনীই দ্রুততার সাথে সেগুলো ক্যান্টনমেন্টের ফায়ারিং জোনে নিয়ে নিষ্ক্রিয় করেছে। কিন্তু শনিবার রাতে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের এত সাহস এল কোত্থেকে? তারা সিভিলিয়ানদের (যুবলীগ-ছাত্রলীগ) নিয়ে ভয়ংকর সেই টাইম বোমা কিভাবে উদ্ধার করলো? আর উদ্ধারের পর সেগুলো কোন সাহসে থানায় ফেলে রাখলো? সেগুলোর প্রতি এখন পুলিশেরই বা এত অনীহা কেন?

বোমা সংগ্রহে সময় লেগেছে চার ঘন্টা

শনিবার সকালে নূর মসজিদ থেকে পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়ার লাশ উদ্ধারের পর সেই মসজিদসহ ৪টি ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে চারবার তল্লাশি চালানো হয়। প্রতিবারই পুলিশের সাথে আওয়ামী লীগের লোকজন ছিল। তারা তল্লাশির নামে মসজিদ, মাদ্রাসা এবং ছাত্রাবাস তছনছ করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা কোন কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ করে রাত সাড়ে ১১টায় তারা শেষবারের মত তল্লাশিতে যায়। সে সময় তারা কথিত টাইম বোমা, রিমোট কন্ট্রোল ও পাসপোর্ট উদ্ধার করে। রাত ৭টায় যখন তারা কিছু পেল না, তখন রাত সাড়ে ১১টায় কোত্থেকে সেগুলো আসলো? অনেকেই মন্তব্য করেছেন, উদ্ধারকারীদের সেগুলো সংগ্রহ করতে প্রায় ৪ ঘন্টা সময় লেগেছে।

সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব, ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০০১

পরিশিষ্ট ৬(খ)

ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে পুলিশ কনস্টেবল বাদশা হত্যা রহস্য

ইনকিলাব রিপোর্ট।। ৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার হরতাল চলাকালে মোহাম্মদপুর নূর মসজিদে পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়াকে যে প্রভাবশালী মহল তাদের হীনস্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে কৌশলে হত্যা করেছে তা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। যদিও সরকারি নির্দেশে এবং প্রভাবশলী মহলের মদদে পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব মসজিদ ও মাদ্রাসার লোকজন তথা আলেমদের এবং এক কথায় বলতে গেলে বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে দিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছে। অপরদিকে প্রভাবশালী মহলটির উদ্দেশ্য হচ্ছে মাদ্রাসার মহামূল্যবান জায়গা জবরদখল করে কোটি টাকা কামিয়ে নেয়া। সুযোগ সন্ধানী মোহাম্মদপুরের প্রভাবশালী মহলটি ওঁৎ পেতে ছিল একটি 'স্পর্শকাতর' মুহূর্তের অপেক্ষায়। আর তাদের সে সুযোগটিই মিলে যায় শনিবার ইসলামী আইন বাস্তবায়ন কমিটি আহূত হরতাল চলাকালে। একাধিক সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে, ওই দিন সকালে এলাকায় হরতালের পক্ষে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি মোহাম্মদপুর থানার সামনে গেলে পুলিশ মিছিলকারীদের বাধা দেয়। পুলিশী বাধার সম্মুখীন হয়ে মিছিলকারীরা এলাকার দিকে ফিরে যায়। এ সময় সেখানে কয়েকজন ফটো সাংবাদিক উপস্থিত হন। মোহাম্মদপুর থানার ওসি মহসিনউজ্জামান তাদের বলেন, 'ভাই এখানে পরিস্থিতি কন্ট্রোলে আছে। আপনারা যান। এখানে কিছু পাবেন না।' এর পরপরই সেখানে একটি হরতাল বিরোধী মিছিল আসে। এই মিছিলটি দেখে কর্তব্যরত পুলিশও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মিছিলকারীরা হরতালের পক্ষের মিছিলকারীদের ধাওয়া করে। এ সময় তাদের সাথে পুলিশও যোগ দেয়। পুলিশ আর হরতাল বিরোধীরা মিলে হরতাল সমর্থকদের ধাওয়া করলে তারা মসজিদে ঢুকে যায়। এ সময় কয়েকজন পুলিশ ও এলাকার চিহ্নিত সশস্ত্র সন্ত্রাসীও মসজিদের ভিতরে ঢুকে পড়ে। এ সময় শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক মাদ্রাসায় একটি ক্লাস নিচ্ছিলেন। পুলিশই আগ্রহী হয়ে তাকে সেখান থেকে চলে যাবার পরামর্শ দেয়। তিনি পুলিশের অনুরোধে তার ছেলেকে সাথে নিয়ে চলে যান। চলে যাবার সময় রাস্তায় তাকে সন্ত্রাসীরা লাঞ্ছিত করে। সে যাই হোক, ঘন্টা দুয়েক পরে নূর মসজিদের অভ্যন্তরে পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়ার লাশ 'আবিস্কার'

করা হয়। এরপর পুলিশ কর্মকর্তাগণ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। তাদের সামনে লাশ উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় কিন্তু এ সময় ফটো সাংবাদিকদের লাশের ছবি তুলতে দেয়া হয়নি। কাউকে লাশ দেখতেও দেয়া হয়নি। প্রথমে পুলিশ প্রচার করে যে, বাদশাকে জবাই করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাকে জবাই করা হয়নি। লাশ উদ্ধারকালে তার বাম কান দিয়ে অঝোরে রক্ত ঝরছিল। লাশ উদ্ধারকালে স্থানীয় এমপিও ঘটনাস্থলে আসেন এবং উচ্চস্বরে প্রচার করতে থাকেন যে, 'তালেবানরা বাদশা মিয়াকে হত্যা করেছে।'

বিকেল সাড়ে তিনটায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে বাদশার লাশের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করা হয়। এজন্য সহযোগী অধ্যাপক মিজানুর রহমান মিজানকে তার বাসা থেকে ডেকে আনা হয়। তিনি একাই ময়না তদন্ত সম্পন্ন করেন। জানা গেছে, প্রাথমিকভাবে তিনি অভিমত দিয়েছেন, "মাথায় আঘাতজনিত কারণে বাদশার মৃত্যু হয়েছে।" ময়না তদন্ত শেষে সেখান থেকেই লাশ সরাসরি মাদারীপুরে বাদশার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। পরদিন সকালে সেখানে দাফন করা হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণত একাধিক ডাক্তার ময়না তদন্তকালে উপস্থিত থাকেন। কিন্তু বাদশার লাশ শুধুমাত্র একজন ডাক্তারকে বাসা থেকে ডেকে এনে তড়িঘড়ি ময়না তদন্ত সম্পন্ন করে বাড়িতে পাঠানো হলো কেন?

এছাড়া যে শায়খুল হাদিসকে মাদ্রাসা থেকে পুলিশই বের করে দিলো চলে যাবার জন্য তাকে আবার মসজিদের লাশের ঘটনায় মামলার ৬ নম্বর আসামী করা হলো কেন এবং কিভাবে? পুলিশ প্রচার করছে বাদশা নূর মসজিদে নামাজ পড়তেন। তিনি থাকতেন থানা ব্যারাকে। এখান থেকে নূর মসজিদের দূরত্ব তিন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার। এছাড়া পথে আরো কয়েকটি মসজিদ আছে। তাহলে সাড়ে তিন কিলোমিটার দূরে তিনি কেন নামাজ পড়তে যাবেন? ঘটনা ঘটেছে কিংবা ঘটানো হয়েছে নূর মসজিদে। তাহলে জামেয়া মোহাম্মদীয়া মাদ্রাসাসহ অন্যান্য মাদ্রাসা আক্রমণ করা হলো কেন? এসব মাদ্রাসা থেকে শত শত ছাত্র-শিক্ষককে থানায় ধরে এনে জিজ্ঞাসাবাদের নামে হুমকি দেয়া হলো কেন? এখনো সেখানে পুলিশ প্রহরা বসিয়ে মাদ্রাসায় ছাত্র শিক্ষকদের ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না কেন।

নূর মসজিদের পাশের নূরানী তালিমুল কোরআন বোর্ড মাদ্রাসাটির ছোট ছেলেমেয়েদের বয়স ৭/৮ বছরের বেশি নয়। এদের তো কখনও কোন রাজনীতি বোঝার কথা নয়। তাই জড়িত থাকার বিষয়টিও অবান্তর। এখানকার এই শিশুদের নিরাপত্তার জন্য তৈরী মাদ্রাসার মূল গেট ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে ছাত্র-শিক্ষক সকলকে থানায় নিয়ে যায়। পরে থানা থেকে সবাইকে ছেড়ে দেয়া হয়। অথচ মাদ্রাসাটি বন্ধ করে রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকায় অবস্থানরত অনেক আত্মীয়-স্বজন তাদের সন্তানদের নিয়ে গেছে। যাদের বাড়ি দূরে তারা মাদ্রাসায় অবস্থান করছে। কিন্তু তারা ভয়ে কান্নাকাটি করছে। এলাকাবাসী মাদ্রাসাটি অবিলম্বে খুলে দিয়ে শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে ওই মাদ্রাসার মোয়াল্লেম মাওলানা সাদেকুল ইসলাম ও মাওলানা রফিকুল ইসলাম জানান, তারা দু'মাসের জন্য মাদ্রাসার শিশুদের কোরআন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। তারা ২০৮ জন মোয়াল্লেম ১ জানুয়ারি আসেন। ঘটনার দিন পুলিশের সাথে আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরাও মাদ্রাসায় ঢুকে তাদের মূল্যবান মালামাল ও টাকা পয়সা লুটপাট করে নিয়ে যায়। তাদেরকে থানায় নিয়ে ভোর ৪টা পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। ৪টায় ছেড়ে দিয়ে ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার বজলুর রহমান বলেন, 'দু'জন করে যার যার পথে চলে যাবি। মাদ্রাসায় তো দূরের কথা, কখনও মোহাম্মদপুরে যাবি না। গেলে কিন্তু জানে মারা পড়বি।' সাদেকুলের বাড়ি পার্বতীপুরে। আর রফিকুলের বাড়ি রংপুরে। তারা এখন পথে পথে ঘুরছেন। প্রিন্সিপাল আহমদ উল্লাহকেও মাদ্রাসায় যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সেখানে এখনও কড়া পুলিশী প্রহরা বহাল আছে। মাদ্রাসা বন্ধ করে ছাত্র-শিক্ষকদের তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে কার স্বার্থে, কিসের জন্য-এটাই সকলের জিজ্ঞাসা।

সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব, ৭ ফেব্রুয়ারী ২০০১

পরিশিষ্ট ৬(গ)

কি ঘটেছিল নূর মসজিদে

ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ১১টা। মোহাম্মদপুর নূর মসজিদের সামনে এসে থামে একটি হোন্ডা। আরোহী দু'জন। ক'জন তরুণ আগে থেকেই সেখানে ছিল অপেক্ষমান। আগন্তুক দু'জনের সাথে তাদের কথা হয়। তারপরই শুরু হয় উত্তেজনা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা গত ৩ ফেব্রুয়ারির চাঞ্চল্যকর পুলিশ হত্যাকাণ্ডের বিবরণ দিতে গিয়ে মানবজমিন-এর কাছে পুনঃ পুনঃ একটি হোন্ডা, তার দুই আরোহী, কয়েকজন যুবকের সম্পৃক্ততার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। যদিও তাদের বিবরণেও স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। তবে যুবকদের পরিচয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য তাদের জানা থাকলেও নিরাপত্তার স্বার্থে তারা তা এড়িয়ে যান বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের সবারই প্রশ্ন হোন্ডারোহী ওই দু'যুবক কে? মাদ্রাসা ছাত্রদের মিছিলে হামলাকারী যুবকরা কারা? মসজিদে পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়াকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতারকৃত মাদ্রাসা ছাত্রদের জবানীতে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এসেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকের মনেই চাপা ক্ষোভ। স্বগতোক্তি করেছেন কেউ কেউ; কি দেখলাম, আর কি হলো? 'আমাদের চোখের সামনে পুলিশকে পিটিয়ে হত্যা করেছে যুবকরা।' জানিয়েছেন মোহাম্মদী হাউজিং-এর হোমসে কর্মরত আব্দুর রহিম। বুয়েটের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নূর মসজিদের পাশের বাড়ির বাসিন্দা, তিনি বলেন, 'পুলিশ কনস্টেবলকে মসজিদের ভেতরে কিভাবে মেরেছে তা দেখিনি। তবে মসজিদের ভেতরে হতভাগ্য পুলিশকে টেনে হেঁচড়ে নেয়ার সময় ছাত্রদের সক্রিয় দেখেছি'। অন্য প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, 'যুবকরা মসজিদের পাশে থাকা কনস্টেবলকে প্রহার করতে করতে মসজিদের ভেতরে নিয়ে যায়। মসজিদের ভেতরেও সংঘর্ষ হয়।' এলাকাবাসীদের অনেকেই বলেছেন, নিহত বাদশা মিঞাকে মসজিদের ভেতরে নেয়ার ঘটনায় কতিপয় যুবক ও মাদ্রাসা ছাত্রদের মধ্যে কারা কোন উদ্দেশ্যে কাজ করেছে সেটাই এক বড় প্রশ্ন।

'পুলিশ এ সময় মসজিদের ভেতর গিয়ে আবারও ছাত্রদের বেধড়ক পেটাতে থাকে। এক পর্যায়ে পুলিশ বেরিয়ে আসে। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে আসে কয়েকজন স্থানীয় যুবক ও তাদের সহযোগীরা। সাথে সাথে ছাত্রদের মসজিদের ভেতর রেখে পুলিশ একটি তালা এনে মসজিদে ঝুলিয়ে দেয়। দেড় ঘন্টা তালাবদ্ধ থাকার পর বেলা সাড়ে ১২টায় পুলিশ তালা খুলে শায়খুল হাদিস ও তার ছেলে আবুল হাসনাতকে বের করে'। একজন প্রত্যক্ষর্শী ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেন।

৩১ নং হাউজিং সোসাইটির শফিকুল ইসলাম বলেন, ঘটনার সময় আমি বাসায় অবস্থান করছিলাম। দোতলা থেকে আমি দেখলাম, কয়েকজন যুবক একজন পুলিশের মাথায় কি একটা দিয়ে আঘাত করছে। তারপর মসজিদের ভেতর নিয়ে যেতে দেখলাম। তার মতে, এই যুবকদের বের করলেই রহস্য বেরিয়ে আসবে। নূর মসজিদ ও নূরানী তালীমুল মাদ্রাসা সংলগ্ন রিং রোড বস্তির বাসিন্দা সুলতান কাজীও সেদিনের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি বলেন, আমরা ওসি মহসিনের ডাকে সেদিন পুলিশের পক্ষ নিয়ে মাঠে নেমেছিলাম। ওসি আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছেন। আমরা বস্তির লোকজন, বাজার কমিটি ও আওয়ামী লীগের লোকজন মিলে তাদের হটিয়ে দিয়েছি। তিনি বলেন, ঘটনার সময় একজন পুলিশকে মারতে মারতে মসজিদে নিয়ে যেতে দেখেছি। হুজুরের বেশে হয়তো কেউ এ ঘটনা ঘটিয়ে থাকতে পারে।

মোহাম্মদী হাউজিং এলাকার আশরাফুল মাদারিস ও এতিমখানার বেশ ক'জন ছাত্র ও শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার অনুরোধ জানিয়ে বলেছেন, সকাল ১০টায় শায়খুল হাদীস মাদ্রাসা ছাত্রদের নিয়ে ২ রাকাত নফল নামাজ আদায় করেন। পরে তিনি সকলকে নির্দেশ দেন 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' শ্লোগান দিতে দিতে যেন তারা মিছিল করে। মিছিলটি চলে গেলে তিনি তার ছাত্রদের নিয়ে ক্লাস করতে বসেন।

শিক্ষকদের বক্তব্য, এ ঘটনাটি পরিকল্পিতভাবে ঘটানো হয়েছে। জামেয়া মোহাম্মদীয়া মাদ্রাসা দখল করার জন্য দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছে বাজার কমিটির লোকজন। মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল আবুল কালামের

সাথেও দ্বন্দ্ব চলছিল। উভয় পক্ষের মামলাও বিচারাধীন। বাজার কমিটির সেক্রেটারি সোলায়মান ও কমিটির সভাপতি সালাম খান বিভিন্ন জনের কাছ থেকে দোকান দেবে বলে টাকাও নিয়েছে। স্বার্থসিদ্ধির জন্য একটি পক্ষ পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে। আপনারা তদন্ত করলেই আসল রহস্য বের হয়ে যাবে।

কেমন আছে নূর মসজিদ

নামাজের সময় এখনো নূর মসজিদ ফাঁকা থাকে। গত ৩ ফেব্রুয়ারির হরতালের দিনে এখানে এক পুলিশ কনস্টেবলের মৃতদেহ পাওয়ার পর থেকে এলাকার মুসল্লিরা এই মসজিদে না এসে অন্যত্র নামাজ আদায় করছেন। মসজিদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে নতুন ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেম। মসজিদের মুয়াজ্জিন মাওলানা সাইফুল বলেন, আমি আসার পর থেকে মসজিদে ২/৩ কাতারের বেশি মুসল্লি দেখিনি। আগে পুরো মসজিদ টইটম্বুর থাকতো মুসল্লিতে। হরতালের দিনের ঘটনার পর এলাকার মুসল্লিরা ভয়ে এই মসজিদ এড়িয়ে চলছেন। নূর মসজিদের বর্তমান খাদেম মোঃ শাহজাহান মীর আগে রিকশা চালাতেন। সেদিনের ঘটনার তিনি একজন প্রত্যক্ষদর্শী। পুলিশ কনস্টেবলের লাশ সরিয়ে নেয়ার পর মসজিদ পরিস্কার করেছিলেন এই মোঃ শাহজাহান মীর। মসজিদ কমিটি গত ৫ফেব্রুয়ারি থেকে তাকে খাদেম হিসেবে নিয়োগ দেন। মোঃ শাহজাহান মীর বলেন, ৩তারিখের হরতালের সময় রিকশা কাঁচাবাজারের কাছে রেখে তিনি নূর মসজিদের কাছে দাঁড়িয়ে গণ্ডগোল দেখছিলেন। তিনি বলেন, হুজুররা পুলিশ হত্যা করেনি। তাকে জিন্সের প্যান্টপরা ক'জন মাস্তান মসজিদের ভেতর নিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরেছে। এর আগে মসজিদে ঢোকার সময় তার মাথায় একটি ইট এনে মারলে তিনি আহত হন।

তিনি বলেন, সাড়ে ১২টার দিকে পুলিশ তালা খুলে শায়খুল হাদিস হুজুরকে রিক্সায় উঠিয়ে দেয়। এ সময় ক'জন এসে তাকে চড় ও কিল-ঘুষি মারে। ক'জন পুলিশ তাকে রক্ষা করে এগিয়ে দেয়। শায়খুল হাদিসকে যে চড় মেরেছে তার নাম এলএমজি মুক্তিযোদ্ধা। এরপর পুলিশ এসে মসজিদে যারা ছিল তাদের পেটাতে পেটাতে বের করে আনে এবং ভ্যানে ঢোকায়। এর কিছুক্ষণ পরই লাশ বের করে পুলিশ। তখন পৌনে একটা বাজে। মোঃ শাহজাহান মীর বলেন, সেদিন পুলিশের সাথে বাজারের নেতারাও মাদ্রাসা ছাত্রদের পিটায়। তারা লাঠি নিয়ে পুলিশের সাথে মসজিদের ভিতরে ঢুকে ছাত্রদের পিটিয়েছে। লাশ বের করার পর তারা নূরানী মাদ্রাসা ভাঙচুর করে।

নূরানী কোরআন বোর্ডের বাবুর্চি আব্দুস সালাম বলেন, পুলিশ ও বাজার কমিটির ৫০/৬০জন লোক ছাত্রদের তাড়িয়ে মসজিদের ভেতরে রাখা শেলফ, কিতাব উল্টে পাল্টে ফেলে। এরপর বের হয়ে তারা মসজিদের গেটে তালা মেরে রাখে। পরে পুলিশ তালা খুলে শায়খুল হাদিস হুজুরকে বের করে চলে যেতে বলে এবং ছাত্রদের গ্রেফতার করে। এরপরই মসজিদ থেকে একজন পুলিশের লাশ বরে করে তারা। নূর মসজিদে নিয়মিত নামাজ আদায় করেন, এলাকার এমন ক'জন মুসল্লি জানান, মসজিদে আসতে ভয় পাচ্ছেন সাধারণ মুসল্লিরা। ঘটনার দু'দিন পর মসজিদের তালা খুলে দিলেও পুলিশ সার্বক্ষণিক নজরদারী করছে। এতে মুসল্লিরা মসজিদে আসতে ভয় পাচ্ছেন। মসজিদে আসলে কোন সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন কিনা-এই ভয়।

আরও কিছু প্রশ্ন ও তথ্য

হোন্ডারোহী উলিখিত দু'যুবক কে? মাদ্রাসা ছাত্রদের মিছিলে হামলাকারী যুবকরা কারা? পুলিশ বর্বরোচিত মসজিদ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এ প্রশ্নের সন্ধান করেছে কিনা তা জানা যায়নি। তবে এলাকাবাসী এ প্রশ্ন তুলেছেন যে, কেনই বা মাদ্রাসা ছাত্রদের নূর মসজিদে আটকে রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে রাখা হলো? জামেয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার চাবি কেন এখনো বাজার কমিটির হাতে? কেন পুলিশ শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হককে দ্রুত ঘটনাস্থল ত্যাগে বাধ্য করে? প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসী বলেছেন, এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই পাওয়া যাবে কনস্টেবল বাদশা মিঞা হত্যার মূল রহস্য।

মোহাম্মদী হাউজিং এর হোমসে কর্মরত আব্দুর রহিম জানান, সাত মসজিদ এলাকার জামেয়া রহমানীয়া মাদ্রাসা আওয়ামী লীগ সমর্থকরা দখল করে নেয়ার পর সেখানকার দাওরায়ে হাদীসের শেষ বর্ষের ছাত্ররা

জামেয়া রহমানীয়া আরাবিয়া হাকীকীয়া মাদ্রাসায় চলে আসে। সেখানে স্থান সংকুলানের অভাবে নূর মসজিদের ভিতরে পূর্ব দিকের উঁচু জায়গায় তাদের ক্লাস নেয়া হতো। শায়খুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক তাদের ক্লাস নিতেন। গত ৩ফেব্রুয়ারি হরতালের দিন মাদ্রাসা ছাত্রদের মিছিলের কর্মসূচি ছিল। সকাল ১০টায় মাওলানা ইউসুফ-এর নেতৃত্বে মিছিল বের হয়। এ সময় পুলিশ তাদের বাধা দিয়ে বলে, উপরের নির্দেশ রয়েছে, আপনারা আজ মিছিল করতে পারবেন না। মাওলানা ইউসুফ পুলিশকে আশ্বস্ত করেন যে, তারা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে ফিরে আসবে। এ সময় আঃ রহিম মিছিলে অংশ নেন। রহিম জানান, মিছিলটি যখন নূরজাহান রোড হয়ে আবারও মোহাম্মদী হাউজিং এলাকায় আসে, তখনই বেশ ক'জন যুবক, বজলু কমিশনার ও তার লোকজন এবং কাঁচাবাজার কমিটির লোকজন মিছিলে হামলা চালায়। শুরু হয় পুলিশ-ছাত্রদের সংঘর্ষ। পুলিশের পক্ষ নিয়ে এগিয়ে আসে অন্যরা। পুলিশ এ সময় টিয়ার শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। ছাত্ররা দৌড়ে গিয়ে প্রবেশ করে নূর মসজিদে। নূর মসজিদে এ সময় শায়খুল হাদিস ক্লাস নিচ্ছিলেন। ঘড়িতে ১১টা। এ সময়ই একটি হোন্ডায় করে দু'জন লোক নূর মসজিদের সামনে আসে। ঘটনার আরেক প্রত্যক্ষদর্শী মোহাম্মদী হাউজিং অফিসের পাশের চা দোকানদার আবদুল্লাহ্ বলেন, হুজুরদের মিছিল পূর্বদিক থেকে আসছিল নূর মসজিদ অভিমুখে। আর পশ্চিম দিক থেকে এনজিওদের একটি মহিলা মিছিল আসছিল। এ সময় পুলিশ বাধা দেয়। শুরু হয় পুলিশ ও মাদ্রাসা ছাত্রদের সংঘর্ষ। পুলিশ টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ছুঁড়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মাদ্রাসা ছাত্রদের তালাবদ্ধ করে রাখে। হঠাৎ ২টার দিকে শুনতে পাই পুলিশ কনস্টেবল খুন হয়েছে। কিভাবে হয়েছে বলতে পারবো না।

৬১/বি মোহাম্মদী হাউজিং-এর বাসিন্দা ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শাহাবউদ্দিন বলেন, হঠাৎ উত্তেজনা দেখতে পাই। মাদ্রাসা ছাত্ররা আত্মরক্ষার জন্য মসজিদের দিকে চলে যাচ্ছিল। এ সময় আশপাশের লোকজন এসে পুলিশের পক্ষ নেয়। তিনি বলেন, আমি ইট ও বালু ব্যবসায়ী। এখানেই আমার ইট জমা রাখি। সেদিন এলাকার লোকজন আমার এখান থেকেই ইট নিয়ে ছাত্রদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে। আর নূরানী তালীমুল মাদ্রাসার ভেতর থেকে ঢিল ছুঁড়ছিল ছাত্ররা। তিনি বলেন, লাশটা মসজিদের ভেতর থেকে উদ্ধার হয়। সাদা কাপড় দিয়ে তখন লাশটি ঢাকা ছিল। ঘটনার পর তিন দিন নূর মসজিদে নামাজ হয়নি। ৩ দিন পর কমিশনার তালা খুলে দেয়। এখনো তালাবদ্ধ থাকে মসজিদটি। শুধুমাত্র নামাজের সময় খুলে দেয়া হয়। তিনি বলেন, ঘটনার পর থেকে এলাকায় কোন হুজুরকে দেখা যাচ্ছে না। সর্বত্র বিরাজ করছে আতঙ্ক। এ ব্যাপারে কথা হয় মোহাম্মদীয়া কাঁচা বাজার সমিতির সভাপতি সালাম খান-এর সাথে। তিনি বলেন, আমরা বাজার কমিটি, আওয়ামী লীগ ও বজলু কমিশনার সাহসী ভূমিকা না নিলে সেদিনের ঘটনা অন্যরকম হতো। বজলু সাহেবের সাথে ছিল আওয়ামী লীগের কর্মীরা। আমাদের বাজার কমিটির ৪০/৫০ জন কর্মী সব সময় পুলিশকে সহযোগিতা করেছে। মাদ্রাসার চাবি বাজার কমিটির কাছে রয়েছে-এ প্রশ্নে তিনি বলেন, চাবি আছে বজলু কমিশনারের কাছে। পুলিশ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সালাম খান বলেন, আমি এ ব্যাপারে কিছুই জানি না। উত্তেজনা হ্রাস পাওয়ার অনেক পরে শুনেছি পুলিশ কনস্টেবল হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। মঙ্গলবার সকালে মোহাম্মদী হাউজিং এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, সর্বত্র বিরাজ করছে নীরব আতঙ্ক। নূর মসজিদে তালা ঝুলছে। পার্শ্ববর্তী নূরানী মাদ্রাসায় রয়েছে পুলিশী প্রহরা। ছাত্র-শিক্ষক কেউ নেই। জামেয়া আরাবিয়া মাদ্রাসাও পুলিশ প্রহরায় রয়েছে। তালা ঝুলছে তাতেও। এ মাদ্রাসার ১টি চাবি পুলিশের কাছে এবং আরেকটি চাবি রয়েছে বাজার কমিটির কাছে।

সূত্রঃ দৈনিক মানবজমিন, ১০ফেব্রুয়ারী ২০০১

পরিশিষ্ট ৬(ঘ)

কনস্টেবল বাদশা হত্যাকাণ্ড তদন্তে পুলিশ 'তাদের পরিকল্পনা' মতই এগুচ্ছে

পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়ার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত নিয়ে থানা পুলিশ তাদের পরিকল্পনামতই এগুচ্ছে। তাদের ভাষ্য হচ্ছে, গ্রেফতারকৃত হুমায়ুন কবির, হিযবুল্লাহ ও আকরামসহ মাদ্রাসা ছাত্ররাই বাদশা মিয়াকে হত্যা করেছে। এই বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যেই তারা গ্রেফতারকৃতদের তাদের কথামত বক্তব্য দিতে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের অভিমত হচ্ছে, এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটি উচ্চ পর্যায়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থান্বেষী মহলের প্রভাব বলয়ে আবদ্ধ হয়ে তদন্ত পরিচালিত হলে কোনদিই প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসবে না। থানা পুলিশের পক্ষে কখনো এই প্রভাব বলয়ের বাইরে তদন্ত করা সম্ভব নয় বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা মত প্রকাশ করেছেন। মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোহাম্মদপুর থানার এসআই মোর্শেদ তোহা গতকাল বুধবার জানান, 'গ্রেফতারকৃত তিনজনই স্বীকার করেছে তাদের সাথে আরো ৩০/৪০জন মেরেছে। শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক এ সময় মসজিদের পূর্ব পাশে বৈঠকখানায় বসেছিলেন। তাঁকে গ্রেফতারের পর গুলশান থানায় বসে তিনি সেখানে উপস্থিত থাকার কথা স্বীকার করেছেন। হুমায়ুন কবির, হিযবুল্লাহ ও আকরাম ৩০/৪০জনের মধ্যে ৬জনের নাম বলতে পেরেছে। তিনজনকে তিনদিনের রিমান্ড শেষে আজ আদালতে হাজির করা হবে। তারা আদালতে ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী দিতে রাজি না হলে আবার রিমান্ডে আনার আবেদন জানানো হবে। তিনজন যে ৬জনের নাম বলেছে তারা ইতিপূর্বে অন্য একটি মামালায় গ্রেফতার হয়ে জেলহাজতে রয়েছে। তাদেরকেও রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ৩০/৪০জনের মধ্যে বাকিরা মসজিদের একটি টিনের বেড়া ভেঙ্গে পালিয়ে যায় বলে এসআই তোহা উল্লেখ করেন।

একটি সূত্র জানায়, গ্রেফতারকৃত হিযবুল্লাহ ও আকরাম শুরু থেকেই বলে আসছে পুলিশের বেধড়ক পিটুনিতে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তাই কারা বাদশা মিয়াকে মেরেছে, লাশ মসজিদে কিভাবে এসেছে, কিংবা মসজিদের ভিতরে বাদশা মিয়া একা কিভাবে এলেন এসবের কিছুই তারা জানে না। হুমায়ুন কবিরও সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য দিতে পারেনি। কিন্তু পুলিশ নানা চাপের মধ্যে তাদের শেখানো মত বক্তব্য দিতে বাধ্য করছে তিনজনকেই। শেখানো বক্তব্য দিতে রাজি না হলেই তাদের নানাভাবে নির্যাতন করা হচ্ছে। উপরন্তু আরো নির্যাতনের হুমকিও দিচ্ছে। অকথ্য ভাষায় গালিগালাজও করছে।

বলা হচ্ছে, ৩০/৪০জন এক সাথে বাদশা মিয়ার মুখ চেপে ধরে। এক সঙ্গে ৩০/৪০জন একজন মানুষের মুখ কিভাবে চেপে ধরল? প্রথমে বলা হয়েছিল, তাকে জবাই করা হয়েছে। পরবর্তীতে জানা যায়, মাথায় আঘাতের কারণে তার মৃত্যু ঘটেছে। ময়না তদন্তকারী ডাক্তারও তার প্রাথমিক রিপোর্টে সে কথাই বলেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, যদি ৩০/৪০জন মানুষ একজনকে এলোপাতাড়ি প্রহারও করে তাহলেও তার সারা শরীরে চিহ্ন থাকার কথা। কিন্তু লাশের সুরতহাল রিপোর্টে শরীরের অন্য কোথাও কোন দাগের কথা উল্লেখ নেই। শুধু মাথায় ও চোয়ালে কিভাবে আঘাত করলো? তাহলে কি বাদশা মিয়ার হত্যাকাণ্ড পরিকল্পিত? কোন ঝানু অপরাধী ঠান্ডা মাথায় তাকে হত্যা করেছে? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহলে। তৃতীয় কোন পক্ষ ওই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে প্রতীয়মান হলেও পুলিশ এদিকটি আমলেই নিচ্ছে না। বরং তারা একতরফা তদন্ত পরিচালনা করে যাচ্ছে।

এদিকে গত পাঁচদিনেরও মাদ্রাসাগুলো খোলা হয়নি। যথারীতি প্রত্যেকটি মাদ্রাসার সামনে কড়া পুলিশী প্রহরা মোতায়েন রয়েছে। কোন ছাত্র কিংবা শিক্ষককে মাদ্রাসায় ঢুকতে দেয়া হাচ্ছে না। গেটে তালা লাগিয়ে ওসি মহসিন ও স্থানীয় কমিশনার চাবি নিয়ে গেছে। এ নিয়ে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করলেও ভয়ে কেউ মুখ খুলতে পারছেন না। এলাকায় থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। পুলিশ আবার কখন কাকে ধরে নিয়ে যায় মানুষ সেই আতঙ্কের মধ্যেও রয়েছেন।

সূত্রঃ *দৈনিক ইনকিলাব*, ৮ ফেব্রুয়ারী ২০০১

পরিশিষ্ট ৬(ঙ)

আওয়ামী সন্ত্রাসীরাই পুলিশ হত্যা করেছে। বিচার বিভাগীয় তদন্ত করুন- প্রিন্সিপাল জামিয়া আরাবিয়া

মোহাম্মদপুর জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আবুল কালাম ৪ ফেব্রুয়ারি রোববার পুলিশের ছত্রছায়ায় স্থানীয় সন্ত্রাসীদের জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া মাদ্রাসা, রাহমানিয়া হাকিকিয়া মাদ্রাসা, নূরানী তালিমুল কুরআন বোর্ড মাদ্রাসা ও আশরাফুল মাদারিস মাদ্রাসা জবরদখলের পাঁয়তারা করছে বলে অভিযোগ করে বলেন, ইতোমধ্যে সন্ত্রাসীরা কাঁচাবাজার সংলগ্ন মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসা ও মসজিদে কোবাসহ জামিয়ার বাকি অংশ দখল করে নিয়েছে।

মাওলানা আবুল কালাম বলেন, গত '৮৮ সাল থেকে এ অঞ্চলের মাদ্রাসা ও মসজিদগুলো জবর-দখলের কয়েকবার যে অপপ্রায়াস চলে তারই অংশ হিসেবে ৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার হরতাল চলাকালে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ন্যায় স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা নিজেরাই হরতালের বিপক্ষে মিছিল বের করে পুলিশী সমর্থনে এ মাদ্রাসা ও মসজিদে হানা দেয় ও হরতালকারীদের ধাওয়া করে। পুলিশের সহায়তায় সন্ত্রাসীরা মাদ্রাসার সকল মালামাল ও নগদ দু'লাখ টাকা লুট করে নিয়ে যায় এবং ২ শতাধিক ছাত্র-শিক্ষককে গ্রেফতার করে ও তাদের ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালায়। এখন পর্যন্ত মাদ্রাসার কোন ছাত্র-শিক্ষক ভয়ে মাদ্রাসার আশপাশে ভিড়তে পারছে না। এক পর্যায়ে আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হাতে পুলিশ কনস্টেবল বাদশা মিয়া নিহত হয়। মাওলানা আবুল কালাম পবিত্র মসজিদ ও মাদ্রাসার সেবায় নিয়োজিত আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখের চরিত্র হননের আওয়ামী সরকারের চিরাচরিত অভ্যাসের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন স্থানীয় জনগণ সাক্ষী, এখানে কারা সন্ত্রাসী কারা মাদ্রাসা ও মসজিদের সম্পত্তি দখলের চেষ্টাকারী আর কারাই বা সেদিন কনস্টেবলকে দিনে-দুপুরে হত্যা করে? মাওলানা আবুল কালাম প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন। সেই সাথে তিনি প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের গ্রেফতার ও শাস্তি বিধান নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

সূত্রঃ *দৈনিক সংগ্রাম*, ৫ ফেব্রুয়ারী ২০০১

নির্ঘন্ট

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ঐ

ও

ঔ

ক

ঢ

ফ

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

ত্র

ষ

'বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজ : ভূমিকা ও প্রভাব (১৯৭২-২০০১)' শীর্ষক বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশে সংশ্লিষ্ট হতে পেরে আমরা আনন্দিত। সংশ্লিষ্ট ধারণা তথা রাজনীতিতে আলিমসমাজের প্রভাব বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এ বইটি কেবল বাংলাদেশের নয়, সারা বিশ্বের প্রেক্ষাপটেই প্রথম উদ্যোগ। এটি নিঃসন্দেহে একটি শ্লাঘার বিষয়। এমন একটি উপস্থাপনার জন্য আমরা লেখককে অভিনন্দন জানাই।

নির্দিষ্টভাবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলিমসমাজের উপস্থিতি দীর্ঘ দিনের। এ দেশের রাজনীতিতে তাদের নানামাত্রিক অংশগ্রহণ এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনকালের ইতিহাসের সাথে যুক্ত। *ভূমিকা* অর্থে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে তাদের অংশগ্রহণ অব্যাহতভাবেই ছিলো। তবে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মতো আলিমসমাজের অংশগ্রহণ সবসময় ছিলো না। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিতে আলিমসমাজের *প্রভাব বিস্তারকারী* অংশগ্রহণ বিষয়ে ব্যাপকমাত্রায় বিশ্লেষণের এলাকাটি এতোদিন অনাবিষ্কৃত ছিলো। রাজনীতি বিজ্ঞানের খ্যাতিমান পণ্ডিত প্রফেসর তালুকদার মনিরুজ্জামানের সক্ষম তত্ত্বাবধানে উদ্যমী তরুণ গবেষক তারেক মুহম্মদ তওফীকুর রহমান প্রথমবারের মতো এ তাৎপর্যপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের স্থানটি অর্জন করলেন।

গবেষক নিজে হাদীসশাস্ত্রে একজন কামিল-স্নাতকোত্তর হবার কারণে বর্তমান গবেষণা ক্ষেত্রের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা পূরণে ন্যায্য আচরণে বাড়তি সুবিধা পেয়েছেন বলে বিশ্বাস করা হচ্ছে। একাডেমিক প্রেস এন্ড পাবলিশার্স লাইব্রেরীর চেয়ারম্যান ও রাজনীতি বিজ্ঞানের বিশিষ্ট পণ্ডিত প্রফেসর মীজানুর রহমান শেলী পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনা করে সন্তোষ প্রকাশ করায় আমরা এ কাজটির গুণগত উৎকর্ষ বিষয়ে আরো বেশী আস্থাবান হতে পেরেছি। সুধি গবেষক সমাজে এ প্রচেষ্টা সমাদৃত হবে বলে আমরা আশাবাদী।

শাহীনা রহমান
প্রকাশক